প্রভাত দে সরকার

নিশি

প্রভাত দে সরকার

আমার দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা

সীমাকে

ভূমিকা

লেখালেখির শুরুটা সেই ১৯৮০ সাল থেকে। তবে শুরুটা হয়নি পদ্য লেখা দিয়ে, বরং তা শুরু হয়েছিল নিজের বানানো বাংলা ক্রশওয়ার্ড পাজলের সূত্র হিসেবে টু-লাইনার লিখে।

এভাবেই একদিন আমার এক মাস্টারমশাইয়ের দৌলতে পেলাম তাঁর সংগ্রহের বই পড়ার অধিকার। তবে শর্ত দিলেন যে মাসে একবার তাঁর বইয়ের আলমারি সাফসুতরো করতে হবে। আমি এককথায় রাজি। শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, দেশি-বিদেশি নানান ভাষার অনুবাদ সাহিত্যও পড়ে সমৃদ্ধ করতে লাগলাম নিজেকে। এভাবেই নানান ধরণের বই পড়তে পড়তে হঠাৎই একদিন হাতে পেলাম নরেন দেবের বাংলায় অনুবাদ করা 'মেঘদূত'। প্রতিটা পাতায় একটা করে শ্লোকের অসাধারণ সহজ অথচ কাব্যিক অনুবাদ আর সেই সঙ্গে দুদার্ন্ত সব অলংকরণ। পড়তে পড়তে স্রেফ মজে গেলাম। এখন বইটা তো আর নিজের কাছে রাখা যাবে না; তাই একটা বাঁধানো খাতায় টুকে নিলাম পুরো বইটাই। তবে এই ঘটনাটাই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

তখন আমি যাকে বলে কাঠবেকার। টিউশনি করে বেড়াই আর সেটা করতে গিয়ে দেখলাম যে মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের যে অংশটুকু স্কুলের সিলেবাসে ছিল, তা বুঝতে ছাত্র-ছাত্রীদের খুবই অসুবিধে হচ্ছে। তারই ফলশ্রুতিতে আমি শ্রদ্ধেয় নরেন দেবের অনুকরণে সহজ মিত্রাক্ষর ছন্দে লিখে ফেললাম 'মেধনাদ বধ'। হ্যাঁ পুরো কাব্যটাই। দেখলাম সেই সরলীকৃত ছন্দোবদ্ধ লেখা সহজেই গ্রহণ করতে পারছে সকলে।

ইতিমধ্যে ১৯৮০-তে রিলিজ করেছে সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে'। সেই সিনেমার ছন্দোবদ্ধ সংলাপ শুনে তাজ্জব সবাই। কিন্তু আমি ততোটা অবাক হইনি। তাই একদিন পাওয়ার-কাটের খপ্পরে পড়ে চায়ের দোকানের আড্ডা ছেড়ে ঘন্টাদুয়েকের চেষ্টায় লিখে ফেললাম একটা একাঙ্ক ছড়া-নাটক 'ছায়া'। তবে তখন মাথা ছিল কাঁচা আর সেই কাঁচা মাথা নির্গত নাটক মনে মনেই নিবেদন করলাম বাংলা সিনেমার সেই দীর্ঘকায় পরম পুরুষকে যাঁর সৃষ্টি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

এরপর ১৯৮২-তে জোটে চাকরি। তখন অফিসের কাজ আর সাংসারিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে থেকেই সময় বের করে লিখে ফেললাম জটিল ধাঁধাঁ ভাঙার এক গোয়েন্দা উপন্যাস আর আরও কতকিছু। তবে সবকিছুই জমা হতে লাগলো একটা সুটকেসে।

তবে ২০১৫ সালের ২৫ এপ্রিলে ফেসবুকে আমার ছেলে সপ্তদীপ দে সরকার খুলল একটা পেজ। নাম Akashbari (আকাশবাড়ি)। আবার শুরু হল কলম ধরা। বেরিয়ে আসতে লাগলো একের পর এক ননসেন্স ছড়া, গল্প আর অণুগল্প।

এরপর ৩৪ বছর পরে চাকরি জীবনের শেষে আমার ছেলে শিল্পী সপ্তদীপের তাড়নায় লিখতে শুরু করলাম এই পিরিয়ড থ্রিলার 'নিশি' যার সময়কালের ব্যাপ্তি ১৮৫৫ থেকে ১৯৬৫।

এখানে 'নিশি' কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। এটা একটা ঘরাণা, যারা সমাজের অন্ধকার দিকগুলোকে সরিয়ে দিতে চায়।

তবে ১ বছর ৩ মাস ধরে যে এই কাহিনিটা লিখতে পারলাম তার জন্যে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সহযোদ্ধা সীমা দে সরকার আর সপ্তদীপ দে সরকারের কাছে।

সেইসঙ্গে সঞ্জয় দে, স্টুডিয়ো Iframes media solutions আর টিম বুক ফার্ম-এর সোনাল দাস, বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতেই হয়; কারণ এঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দিলে 'নিশি' দিনের আলোর মুখ দেখতে পেত না।

পরিশেষে পাঠককূলের উদ্দেশ্যে বলি যে— এই বই পড়ে আপনাদের মূল্যবান মতামত আমার ফেসবুকের অথর পেজ Provat Dey Sarkar-এ জানান; কিংবা আমার মেইল আইডিতে লিখুন। আপনাদের সৃষ্টিমূলক সমালোচনা পেলে একদিকে আমি যেমন কৃতজ্ঞ থাকব, তেমনি অন্যদিকে পরবর্তী সময়ে আমার কলম আরও উন্নীত হবে।

প্রভাত দে সরকার

deysarkarpk@gmail.com

১৯৪৩, জানুয়ারি

জাপানি বোমা, তাইকোন্ডো আর রজনীকান্ত

গ্রামের একপাশে একটা দু-কামরার মাটির বাড়ি। খড়ের ছাউনি দেওয়া। সেই বাড়ির আধ মাইল দূর দিয়ে বয়ে গেছে দামোদরের এক শাখানদী। বর্ষাতে এই নদী ভরভরন্ত থাকে। তখন নদীর বুকে ঘোলা জলের ঘূর্ণী পাক খেয়ে খেয়ে ওঠে। মাঝে মাঝেই ঝুপ-ঝাপ আওয়াজ তুলে স্রোত টেনে নেয় চাঙড়-চাঙড় পাড়ের মাটি। খসে পড়া সেই মাটি মিলিয়ে যায় নদীর ঘোলা জলে। আবার কখনো কখনো নদীর জলে দূরের কোনো বানভাসি গ্রাম থেকে ভেসে আসে খড়ের চাল, কাঠকুটালি আর গোরু ছাগলের ফুলে ফেঁপে ওঠা শব। এইসব নিয়েই বয়ে চলে নদী তার আপন পথে।

আবার শরৎ এলে ক্রমে কমতে থাকে নদীর জল। তখন নদীর বুকের জলঘেরা ছোটো ছোটো চড়ায় গজিয়ে ওঠা কাশফুলের ঝাড় তাদের সাদা মাথা দুলিয়ে জানান দেয়— আর ক-দিন পরেই সন্ধের বাতাসে লাগবে হিমের ছোঁয়া।

ক্রমে হেমন্ত আসে। এরপরে যত দিন যায়, ততোই কমতে থাকে জল। দক্ষিণে হেলে পড়তে থাকে সূর্য। তারপরে একসময় শীতের শুখা মরশুমে বালির চড়া আর ছিপছিপে জল মিলেমিশে থাকে নদীর বুকে। সেই জলে ফুরফুরে ঝিলিক তুলে খেলে বেড়ায় সোনালি রোদ্দুর আর তখন গায়ে শীতের রোদ্দুর মেখে নদীর ওই ছিপছিপে জলে দাপাদাপি করে গ্রামের ছেলেরা। তারা কেউ আধভেজা বালির ওপরে গড়াগড়ি খায় আবার কেউবা নদীর পাতাডোবা জলে চিত হয়ে শুয়ে পা দিয়ে জল ছোঁড়ে। শীতের রোদ্দুরের তাপে সেই ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করে ভারি আরাম। তবে মাঝনদীর দিকে গ্রামের কেউই যাবার সাহস করে না; কারণ মাঝনদীর বুকে যেখানে সেখানে ওঁত পেতে বসে আছে চোরাবালি। একটু বিপথ হলেই গিলে খাবে সে। তবে গ্রীষ্মকালে এ ধারের দিকের নদীর চড়ায় কোথাও কোথাও কেউ কেউ তরমুজের চাষ করে আর শিয়ালের হাত থেকে ফসল বাঁচাতে সেই ক্ষেত ঘিরে দেয় বাবলা কাঁটার বেড়া দিয়ে, কেন না সেই শুকনো নদীর ওপারেই শুরু হয়ে গেছে জঙ্গল। সেই জঙ্গলে বাঘ, চিতাবাঘ কিংবা হরিণ নেই বটে; তবে সেখানে ঘর বেঁধে থাকে বুনো শুয়োর, বেজি, শজারু, ভাম, নানান জাতের সাপ, পাখপাখালি আর শিয়ালের দল। সন্ধের আগে তারা অনেকেই জল খেতে আসে নদীতে। তাই ওই জঙ্গলে গ্রামের মানুষ বড়ো একটা কেউ ঢোকে না। তবে ওপাড়ের দিকে মাঝেমাঝে আদিবাসীরা ঢোকে ওই জঙ্গলে। তারা ঢোকে শজারু মারতে। মাংস খাবে বলে। তাই গ্রামের মানুষ পারতপক্ষে এড়িয়েই চলে জঙ্গলকে। বিশেষত বিষাক্ত সাপের জন্যে।

কিন্তু সবাই কি? কেউ একজন, এই গ্রামেরই মানুষ, প্রায়ই ঢোকে ওই জঙ্গলে। বিশেষ করে রাতের আঁধারে। নদীর বুককে সে চেনে তার হাতের তালুর মতো। তবে তার এই ব্যাপারের কথা গ্রামের মানুষ কেউ জানে না।

আজ শুক্রবার। তবে ক-দিন অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে রজনী। বেলা প্রায় তিনটে হবে। খানিক হেলে পড়া শীতের সূর্যে সবে সোনালি রং ধরতে শুরু করেছে। হালকা ধোঁয়াশায় ঢাকতে শুরু করেছে ওপাড়ের জঙ্গল। পড়ন্ত বেলায় দাওয়ায় বসে সে তাকিয়ে আছে দূরের ওই জঙ্গলের দিকে। ছোটোবেলার কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে তার ওই জঙ্গলকে ঘিরে। ওই জঙ্গল যে তাকে অন্যভাবে লড়তে শিখিয়েছে, বাঁচতে শিখিয়েছে, শিখিয়েছে নানান গুপ্তবিদ্যে। সে জানে জঙ্গলেরও ভাষা আছে। সে ভাষা সবাই বোঝে না। সে ভাষাকে পড়তে, জানতে হয়। জঙ্গলকে ভালোবাসতে জানলে, দিনের পর দিন তার সাথে মিশলে তবেই জানা যায় তার সেই অব্যক্ত ভাষা। ছোটোবেলা থেকে সে মিশেছে ওই জঙ্গলের সঙ্গে। তাই আজ সে জানে জঙ্গল কখন কী বলতে চায়।

পুরোনো স্মৃতিতে একটু ডুবে গিয়েছিল রজনীকান্ত।

এমন সময় মাথার ওপরে গোঁ-গোঁ শব্দ।

রজনী আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে-উড়ে যাচ্ছে একটা প্রমাণ সাইজের যুদ্ধবিমান। গায়ে তার ইউনিয়ন জ্যাকের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে সেই ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তাই মাঝেমধ্যেই যুদ্ধবিমানের আওয়াজ শোনা যায় এই গ্রামের শান্ত আকাশেও। হয়তো রসদ বা গোলাবারুদ নিয়ে তারা উড়ে যায় কলকাতার দিকে। তবে তাদের গ্রামে যুদ্ধের আঁচ তেমন না পড়লেও, সেখানে বাংলার দুর্ভিক্ষের ছাপ ক্রমে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। চালটা, আলুটা না হয় এখানে হয়; কিন্তু ডাল, তেল, নুন আর নানান মনিহারী জিনিসের দাম আক্রা। আর কলকাতায়? সেখানে নির্মম দুর্ভিক্ষ আর নির্দয় বিশ্বযুদ্ধ দুটোরই ছাপ অত্যন্ত প্রকট। নেহাত কলকাতায় চাকরি করে বলেই রজনীকান্ত জানে সে কথা।

সেখানে বিমান হানা থেকে বাঁচাতে হাওড়া ব্রিজের দু-পাশে স্টিলের দড়িতে বেঁধে আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পটলের মতো দেখতে সারি সারি গ্যাস ভরা বেলুন; যাতে নাকি জাপানি যুদ্ধবিমান গোঁত্তা খেয়ে ব্রিজের ওপর বোমা ফেলতে এলে জড়িয়ে যায় ওই গ্যাস বেলুনে; মুখ থুবড়ে পড়ে নীচের নদীর জলে। ওদিকে রেড রোডেও গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে। সেখানে এখন ব্রিটিশের যুদ্ধবিমান ওঠানামা করে। ধর্মতলা থেকে খিদিরপুরের দিকে যেতে রেড রোডের পরেই যে রাস্তাটা বাঁয়ে চলে গেছে, সেখানের মাঠে শালখুঁটি পুঁতে, তার ওপরে খড়ের চাল তৈরি করে বানানো হয়েছে যুদ্ধবিমানের জন্যে অস্থায়ী হ্যাঙ্গার আর খিদিরপুরের দিকের রাস্তার পাশের মাঠে ব্রিটিশ সেনা ছাউনি গেড়েছে। সেখানে বসিয়েছে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান। জাপানি-বিমান এলেই সেগুলো আকাশমুখী হয়ে গর্জে ওঠে। এদিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দুধসাদা পাথরের ওপরেও পড়েছে কালো রঙের পোঁচ; যাতে নাকি রাতের আঁধারে ওই ধবধবে সাদা সৌধ শত্রু-বিমানের নজরে না পড়ে।

অন্যদিকে সরকারি নির্দেশে রাস্তার টিমটিমে বিজলী বাতির বাল্বগুলোর ওপরের দিকটায় কালো রং করে দেওয়া হয়েছে। যাতে ওই বাতি থেকে শুধুমাত্র রাস্তাতেই আলো পড়ে। অফিস-কাছারি, বসতবাড়ির সমস্ত কাঁচের জানলায় কাগজ সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

সেখান দিয়ে যেন ভেতরের এক চিলতে আলোও বাইরে না আসে। তা ছাড়া কাগজ সাঁটা থাকলে বোমার ভাইব্রেশনে জানলার কাঁচও ভেঙে পড়বে না। এদিকে আবার সব গাড়ির হেডলাইটের কাঁচের ওপরের আধখানাও কালো রং করা হয়েছে, যাতে সেই আলো শুধুমাত্র রাস্তাতেই পড়ে। সব মিলিয়ে একেই বলে 'ব্ল্যাক-আউট'। এর ফলে আকাশ থেকে কলকাতাকে শহর বলে চেনা মুশকিল হবে কিংবা শত্রু-বিমান তার টার্গেট গুলিয়ে ফেলবে আলো-আঁধারির খেলায়।

কিন্তু তবু তারা আসে। দু-চারদিন ছাড়া ছাড়াই আসে। আকাশ কাঁপিয়ে আসে, মানুষের বুক কাঁপিয়ে আসে— বিমানের ইঞ্জিনের শব্দে, সাইরেনের তীক্ষ্ণ ওঠাপড়া গোঙানিতে আর অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানের রাট-ট্যাট-ট্যাট শব্দে। তাদের টার্গেট কলকাতা আর তার আশেপাশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো। ফোর্ট উইলিয়ম, হাওড়া ব্রিজ, টালার জলের ট্যাঙ্ক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, খিদিরপুরের ডক আর পোর্ট, দমদম আর বারাকপুরের বিমানবন্দর, ডালহৌসির অফিসপাড়া, এইরকম আরও কত কিছু।

সরকার থেকে বলা হয়েছে যে বিপদসংকেতের সাইরেন বাজলেই গৃহস্থেরা যেন সবাই আলো নিভিয়ে বা একেবারে কম করে ঘরের খাট বা তক্তপোশের নীচে ঢুকে উপুড় হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে কনুইয়ে ভর রেখে কানে আঙুল গুঁজে শুয়ে থাকে। তাতে বিপদ থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া যাবে। ছাদ ধ্বসে পড়লেও খাটের নীচে থাকা মানুষগুলো প্রাণে বাঁচবে। অন্যদিকে অফিস-কাছারির সামনে খোলা জায়গায় বালির বস্তা সাজিয়ে ঘেরা জায়গা তৈরি করা হয়েছে। এমনকী ব্যস্ত রাস্তার দু-পাশেও মাঝে মধ্যেই করা হয়েছে এমনই অনেক বালির বস্তার ঘেরাটোপ। সাইরেন শুনলেই পথচলতি মানুষ আশ্রয় নেয় সেখানে। বোমার স্প্লিনটার ছিটকে এলেও আটকে যাবে ওই বস্তার বালিতে। বাঁচবে মানুষের প্রাণ। এন সি সি-র ছেলেরা আর সিভিক ভলেন্টিয়াররা শহরের সমস্ত বাড়ি আর অফিস-কাছারিতে ঘুরে হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়ে গেছে সব। বিমানহানা হলে কী করা উচিত আর কী উচিত নয়, তার নির্দেশিকা ছাপিয়ে বিলি করে গেছে সর্বত্র।

এই যেমন সেদিন। ডালহৌসিতে ফ্রেডরিক সায়েবের অফিসে বসে নিজেরই একখানা চাকরির দরখাস্ত টাইপ করছিল রজনী। সে শুনেছে যে কলকাতার জাদুঘরে নাকি লোক নেবে। তাই এই দরখাস্ত লেখা। আসলে এখনকার এই চাকরিটাতে মাইনে খুব একটা বেশি নয়। তাই সে একটা ভালো চাকরি খুঁজছে। এমনসময় হঠাৎই বেজে উঠল ওঠানামা গোঙানির সাইরেন। মানে বিমানহানা শুরু হয়েছে। বেলা তখন প্রায় চারটে। সাইরেনের আওয়াজ শুনেই হুড়মুড় করে সবাই নামতে লাগল নীচে। একেবারে নীচের উঠোনে বালির বস্তার ঘেরাটোপে আশ্রয় নিতে হবে জলদি।

সব্বাই দুদ্দাড় করে নামছে পুরোনো বাড়ির কাঠের তৈরি সিঁড়ি বেয়ে। এমন সময় ঘটল বিপত্তি। আর সেই বিপত্তিটা ঘটালেন হেডক্লার্ক আমিনুল হক। সাঁকরাইলে বাড়ি। একটু ভারী চেহারার মানুষ। হুড়মুড় করে নামতে গিয়ে তাঁর ঝুলন্ত ধুতির পাড় জড়িয়ে গেল পাম্প সু-র ডগায়। হাত থেকে ছিটকে গেল পানের ডিবে। ল্যান্ডিং-এ ছড়িয়ে পড়ল সেই ডিবে আর জর্দাপানের খিলিগুলো আর তিনি দুটো সিঁড়ি টপকে হুমড়ি খেয়ে সরাসরি গিয়ে ল্যান্ড করলেন তাঁর পানের ডিবের পাশেই। কাঠের মেঝেতে ঠুকে দাঁতের ঘায়ে কেটে গেছে নীচের ঠোঁটটা। রজনী আর শম্ভু ঘোষ দু-জনে মিলে টেনে তুলল তাদের আমিনদাকে। ঠোঁট থেকে তখন রক্ত গড়াচ্ছে, কিন্তু তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি তাঁর সাধের নেশার জর্দাপানের খিলিগুলো তুলে ডিবেতে রাখতে ব্যস্ত। তাই দেখে রজনীরা তাঁকে বারণ করছে। কিন্তু বারণ করলে শুনছে কে? ভাগ্যিস তখন ফ্রেডরিক সায়েবের

আর্দালি রডরিক্স ডি-ক্রুজ অফিসে তালা লাগিয়ে হুড়মুড় করে নামছিল নীচে। তারই হাঁটুর গোঁত্তা খেয়ে সোজা হলেন আমিনদা। ডি-ক্রুজ ধ্যাতানি দিলে— 'গড ড্যাম আমিনবাবু, গেট ডাউন ইমিডিয়েটলি। গেট ডাউন।' গোয়ানিজ হয়ে রডরিক্সের এই নিজেকে সায়েব ভাবাটা রজনীর মোটেই সহ্য হয় না। তবে এখন তার ধ্যাতানিতেই কিন্তু কাজ হল। বাকি ক-টা পানের খিলি তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ডিবেতে ভরতে ভরতে ভারী শরীর নিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব নীচে নেমে উঠোনে পৌঁছে গেলেন। বালির বস্তার ঘেরাটোপে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন সেই রডরিক্সেরই পাশে। দাঁতে দাঁত চাপতে গিয়েই টের পেলেন যে তাঁর নীচের ঠোঁটটা কেটেছে। নোনতা স্বাদ রক্তের। তবুও ডিবে খুলে একখিলি পান মুখে পুরে ডিবে বন্ধ করে পকেটে রাখলেন। তারপরে দু-কানে আঙুল গুঁজে কনুইয়ের খোঁচা মেরে রডরিক্সকে জিজ্ঞেস করলেন— 'এই রাড়ু, মুখের লালা আর পানের রসে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, না রে? তাহলে আর টিটেনাস নিতে হবে না, কি বল?' ভাগ্যিস দু-কানে আঙুল গোঁজা ছিল, তাই রডরিক্স আমিনদার কথা শুনতে পায়নি। তার ওপরে সাইরেনের আওয়াজ। রীতিমতো টেনশন। তাই কনুইয়ের খোঁচা খেয়ে দুর্মুখ রডরিক্স খিঁচিয়ে উঠল— 'ইউ শাট আপ, ব্লাডি আমিনবাবু।' ব্যাস, আমিনদা চুপ। আর তারপরই একটা বিকট আওয়াজ। দূরে কোথাও বোমা ফেলেছে জাপানিরা আর তাতেই থরথর করে কেঁপে উঠেছে ডালহৌসির অফিসপাড়া। গোঁ-গোঁ করে আকাশ দাপিয়ে উড়ে যাচ্ছে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমানও। কী হবে কে জানে? এবার কি অফিসপাড়াতেই পড়বে বোমা? এর আগেও তো পড়েছে এই পাড়ায়। ভাবতে না ভাবতেই আবার বিকট আওয়াজ। মানে, আবার বোমা। কিন্তু কোথায় পড়ল? সাইরেন তো বেজেই চলেছে একটানা যুদ্ধবিমানের আওয়াজকে সঙ্গী করে। সবার মনেই মৃত্যুর আতঙ্ক। প্রতিটা মিনিট যেন এক এক ঘন্টার সমান।

এইভাবে মিনিট পনেরো চলার পরে আস্তে আস্তে কমে এল বিমানের শব্দ। একটানা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে দম ফুরিয়ে থামল সাইরেন। স্বস্তি, এবার স্বস্তি। তাই উঠে দাঁড়াল সবাই। এতক্ষণের তীব্র টেনশন থেকে মুক্তি। আমিনদার খদ্দরের পাঞ্জাবির বুকটা ধুলোমাখা। অবশ্য সবারই অবস্থা তথৈবচ। তবে উঠে দাঁড়িয়ে রজনীকান্তর কাছে এসে ধুলোমাখা পাঞ্জাবির বুকটা ঝাড়তে ঝাড়তে আমিনদা বললেন— 'বুঝলে রজনী, ভেবেছিলাম বুঝি জীবনের শেষ পানটা খাওয়া হয়ে গেল আজ। উঃ, যা ঝড় গেল। আরেকটু হলেই মুখের পানটা বেরিয়ে পড়ে যাচ্ছিল আর কী।' এমনসময় ফ্রেডরিক সায়েব বস্তার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে কোট ঝাড়তে ঝাড়তে হুকুম দিলেন সবাইকে ওপর থেকে নিজের নিজের ব্যাগট্যাগ নিয়ে বাড়ি চলে যেতে আর ডি-ক্রুজকে বললেন তাঁর ব্যাগটা নিয়ে অফিসে আবার তালা লাগিয়ে নীচে নেমে আসতে। পাঁচটা তো প্রায় বাজতেই চলল। এখন আর অফিস খুলে কী হবে।

তিনতলা থেকে ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নিয়ে আমিনদার সঙ্গে হাওড়ার দিকে যাবার পথে রজনীকান্ত লোকমুখে শুনলো যে জাপানিরা নাকি খিদিরপুরের ডকে বোমা ফেলতে এসেছিল। তবে টার্গেট মিস হওয়ায় দুটো বোমা পড়ে ওয়াটগঞ্জ অঞ্চলে আর একটা গঙ্গার জলে পড়েছিল বলে ফাটেনি।

পরের দিন। শীতের শনিবারের কুয়াশামাখা বিকেল তিনটে। ওয়ার্ম আপ, ডিপস, স্ট্রেচ ইত্যাদি সেরে আখড়ার একপাশের সিলিং থেকে ঝুলিয়ে রাখা বালি আর নুড়ি পাথর বোঝাই করা বস্তায় পাঞ্চ প্র্যাকটিস করে জমির এককোনায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা

তালগাছের সামনে এসে দাঁড়ায় রজনী। গাছটার গায়ে সাড়ে ছ-ফুট উঁচুতে চটের বস্তা দিয়ে মুড়ে মোটা করে একটা চওড়া প্যাড বানিয়ে রেখেছে সে। আর গাছের গোড়া থেকে সাড়ে চার ফুট উঁচুতে আরেকটা প্যাড। নীচেরটা ছোটোদের জন্যে। তারপর শুরু করে কিক প্র্যাকটিস। অফিসে যাওয়ার আগে এটা তার নিত্যকর্ম। তবে আজ টিউবওয়েলের মিস্ত্রি এসেছিল বলে সকালে 'চাগি', 'জিরিউগি' করা হয়ে ওঠেনি। তাই এখন সেটা সেরে নিচ্ছে সে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, কোনোদিন এর ব্যতিক্রম হয় না। একমাত্র শুধু শরীর খুব খারাপ হলে নিজের প্র্যাকটিস বন্ধ রাখে। তাইকোন্ডো যে তার কাছে একটা নেশার মতো। একটা সাধনা।

নিজের বাড়ির সামনে দশ কাঠা ফাঁকা জমির মাঝখানে একটা আটখুঁটির চালা বানিয়ে রজনীকান্ত তৈরি করেছে তার তাইকোন্ডো শেখানোর আখড়া। সেই চালার নীচে ঠিক মাঝখানে নদী থেকে সাদা মিহি বালি আনিয়ে বিছিয়ে দিয়েছে বারো ফুট বাই বারো ফুট জায়গায়। তার ওপরে একটা নারকেল ছোবড়ার তোষক পাতা হয়। সেখানেই লড়াই প্র্যাকটিস করে তার ছেলেরা। বছর তিনেক ধরে প্রতি শনি, রবি আর অন্যান্য ছুটিছাটার দিনে নিজে হাতে ধরে ধরে প্রতিটা ছেলেকে প্যাঁচ শেখায়, স্টাইল আর টেকনিকের ভুল শুধরে দেয় সে। বাকি দিনগুলোতে বিকালে স্কুল ছুটির পরে ছেলেরা নিজেরাই এসে প্র্যাকটিস করে। প্রায় জনা কুড়ি ছেলে তার কাছে শিখতে আসে। তারা বেশিরভাগই বেশ গরিব। তবু তারা তাদের রজনীস্যারের কাছে আসে কারণ স্যার যে তাদের আপন করে নিয়েছে, আর স্যারকে তারা যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনই ভালোওবাসে। তা ছাড়া ছোটোদের মধ্যে তো লড়াই করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকেই, থাকে অন্যদের মধ্যে নিজেকে বীর প্রতিপন্ন করার একটা ইচ্ছে। সেটাকেই কাজে লাগিয়েছে রজনী। তাই তাদের প্রত্যেকের লড়াইয়ের পোশাক সে তার মাইনের একটু একটু করে জমানো টাকা থেকে কিনে দিয়েছে। ভাগ্যিস রজনী সংসারধর্ম করেনি। নইলে কি আর এইসব কাজ করতে পারত?

হঠাৎই ছেলেদের চিৎকার কানে ভেসে আসে। গাছের গায়ে শেষ কিকটা করার আগেই আখড়ায় ঢুকে পড়েছে তারা। তাই শেষ কিকটা করে নিজের প্র্যাকটিস থামায় রজনী। এবার ওদের জন্যে সময় দিতে হবে। তবে তার আগে ওরা সামান্য কিছু খেয়ে ওয়ার্ম-আপ করবে। ওরা জানে কী কী রুটিনবাঁধা কাজ করতে হয়। সেগুলো ওরা নিজেরাই সেরে নেবে আর তারপরে রজনী যাবে আখড়ায়। মাঝের এই সময়টুকু একান্তই তার একটু জিরিয়ে নেবার সময়। আখড়ার বাইরে এসে দাওয়ায় ঠেস দেয় সে। আজ কেন জানি না তার মনে ভেসে উঠছে বছর আটেক আগেকার ঘটনা। তার প্রথম তাইকোন্ডো শেখার কথা।

ছোটোবেলা থেকেই সে ছিল দাদু নিশিকান্ত রায়ের বড়ো ন্যাওটা, কারণ তার বাবা তমোনাথ রায় কলকাতায় চাকরি করতেন আর ছুটির দিনে জমিজমার দেখাশোনা করার পরে ছেলের জন্যে বিশেষ সময় থাকত না তাঁর হাতে। অন্যদিকে দাদু তাকে ফল পাড়া, গাছে চড়া শেখাত। শেখাত নানান পশুপাখির ডাক। সেসব ভারি ভালো লাগত তার। আগ্রহ নিয়ে শিখত সেসব রজনী। তারপর সে একটু বড়ো হতে দাদু তাকে শিখিয়েছিল আরও নানান বিদ্যে। কখনো প্রশ্রয়ে আবার কখনো বা শাসনে। দাদু নিশিকান্তর কাছ থেকেই সে জেনেছিল যে জাপানে নাকি একধরণের কুস্তি হয় যার নাম 'জুজুৎসু'। সেই কুস্তিতে নাকি খালি হাতেই মোকাবিলা করা যায় লাঠি, সড়কি, বল্লম এমনকী তরোয়ালধারী শত্রুরও। বাবা তমোনাথ তখন কেরানিগিরি করতেন রজনী এখন যেখানে কাজ করে সেই ফ্রেডরিক সায়েবের অফিসেই। আরও বড়ো হয়ে সে যখন কলেজে

পড়তে কলকাতায় এল, তখন কলেজের বন্ধুদের মাধ্যমে জানতে পারল যে সুকুমার ভদ্র নামের একজন নাকি গড়ের মাঠে রোজ বিকেলে 'তাইকোন্ডো' শেখান। এটাও নাকি জুজুৎসুর মতো একটা মার্শাল আর্ট। সুকুমারবাবু একসময়ে শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছিলেন আর সেই সময়ে নাকি সেখানে শিনজো তাগাকির কাছে জুজুৎসু শেখার সুযোগ পান। এই শিনজো তাগাকি বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণেই শান্তিনিকেতনে আসেন জুজুৎসু শেখাতে। পরে সুকুমার ভদ্র কোরিয়ায় পড়াশোনা করতে গিয়ে তাইকোন্ডো শেখেন। সেদেশে নাকি কলেজেও ওই মার্শাল আর্টটা শেখানোর ব্যবস্থা আছে।

তখনই রজনীকান্ত ঠিক করে ফেলে যে সে সুকুমার ভদ্রের কাছে তাইকোন্ডো শিখবে। বাবা আর দাদুকে সেকথা বলতে তাঁরা রাজি হয়ে যান। এভাবেই একদিন কলেজ ছুটির পরে বাবার সাথে সুকুমার ভদ্রের কাছে নাড়া বাঁধা। আগ্রহী ছাত্র রজনীকে কিছুদিন দেখেই সুকুমারবাবু বুঝে যান যে এই ছেলেটি একটি রত্ন। তাই ধীরে ধীরে নিজের শেখা সবটুকুই দিতে থাকেন রজনীকে। মোট আটটা বছর শীত, গ্রীষ্ম আর বর্ষাকে উপেক্ষা করে রজনী পৌঁছে যেত স্যারের বিকেলের ক্লাসে। অবশ্য বর্ষার দিনে ক্লাস হত স্যারের জোড়াসাঁকোর বাড়ির বিরাট গাড়িবারান্দায়। সেখানে একপাশের দেওয়ালে কাঁচের শোকেসে রাখা ছিল চারফুট লম্বা একটা কুমিরের চোয়ালের হাড়। সেই কুমিরটাকে সুকুমার স্যারের ঠাকুরদা একসময় শিকার করেছিলেন। তাই ট্রোফি হিসেবে ওটা রাখা ছিল ওইখানে। তবে হাঁ করা কুমির-চোয়ালের সেই সুপ্ত আগ্রাসনের ছাপ অভিজ্ঞ সুকুমার স্যার লক্ষ্য করেছিলেন রজনীর আক্রমণে। রজনী রোজ 'কিয়ুগনেত'এর আগে মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকে ওই কুমির-চোয়ালের দিকে। সেটার থেকেই সে যেন রোজ আরও আরও শক্তি সংগ্রহ করে। সেকারনেই রজনী হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রিয়তম শিষ্য আর তাই সুকুমার স্যার তাঁর বিদ্যে অকৃপণ হাতে বিলিয়েছিলেন রজনীকে। তাকে করে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী। আর রজনী?

সব ঠিকঠাকই চলছিল। সে তখন কলকাতায় যেত শুধু সুকুমার স্যারের কাছে তাইকোন্ডো শিখবে বলে। কিন্তু হঠাৎই চার বছরের মাথায় ঘটে গেল ছন্দপতন। রজনীর তখন কলেজ শেষ। এমন সময় দুরারোগ্য কলেরায় তে-রাত্তিরেই রজনীকে হারাতে হল বাবা-মা দু-জনকেই। গ্রামের লোকেরা মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করিয়েছিল বটে, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। আকস্মিক আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে যায় সে। একরাশ বিহ্বলতা নিয়ে তাই সে একা একা ঘুরে বেড়াত কখনো দামোদরের চড়ায় আবার কখনো বা জঙ্গলের গভীরে। কলকাতায় যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই সময়ে সবচেয়ে বেশি পাশে ছিল যে মানুষটা সে হল তাদের প্রৌঢ় ভাগচাষি সুরেশ বাগদি। ছোটোবেলা থেকেই সে সুরেশকে 'সুরেশ কাকা' বলেই ডাকত। সুরেশ কাকাই তার শূন্যঘর পরিষ্কার করে দিত, তাকে ভাত রেঁধে দিত। সেই সুরেশ কাকাই তাকে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করত। বলত— 'ছোরদাবাবু, অত ভেঙে পড়লে চলবেনি গো। মনে কর বরদা ঠাউরের কতা। সেইই তো তোমায় গড়েচে। সেইই তো শেকেয়েচে শক্ত হয়ে বেপদের মোকাবেলা করতে। বেপদ হল গে দুষমন। তাকে ঠান্ডা মাতায় শক্তহাতে শেষ না কল্লে জেবন চলবে ক্যামন করে? শোক, তাপ তো জেবনে আসবেই। তবু উটে দাঁড়াতে হয় যে গো।'

সুরেশ কাকার এই কথাগুলো রজনীকে বেশ কিছুটা চাগিয়ে তুলেছিল। তারপর একদিন ওপাড়ের জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে সে পৌঁছে গিয়েছিল সেই অর্জুন গাছটার কাছে, যে গাছটাকে ছুঁইয়ে দাদু নিশিকান্ত রায় একদিন তাকে দিয়ে শপথ করিয়ে বলেছিল— 'গাচটা ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে কর, যা তোকে এ্যাদ্দিনে শিকিয়েচি আর আরও যা যা শেকাবো তা তুই

বেথা যেতে দিবিনি। যোগ্য পাত্তর না পেলে সবটা শেকাবিনি কাউকে। আর মনে রাকবি, কষ্ট পেলে রাগ জম্মায় আর সেই রাগ থেকে কিন্তু অনেক সময় মনে পিতিহিংসা জম্মায়। তাই নিজের মনের কষ্টকে আর রাগকে কক্কনো বাড়তে দিবিনি। শুদু অজ্জুনের মতো মাতা উঁচু করে থির লোক্কে এগিয়ে যাবি।'

এরপরে আরও হপ্তাখানেক লেগেছিল রজনীর নিজেকে ধাতস্থ করতে, নিজেকে আবার ফিরে পেতে। তারপরে সুরেশ কাকারই পরামর্শ মতো কলকাতায় গিয়ে ফ্রেডরিক সায়েবকে সব কথা জানাতে উনিই আমিনবাবুর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন রজনীকে। নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁকে কাজকর্ম সব বুঝিয়ে দিতে। এমনকী দু-সপ্তাহের মধ্যে তমোনাথের প্রাপ্য টাকাও মিটিয়ে দিয়েছিলেন সায়েব। একটু মেজাজি হলেও মোটের ওপর মানুষ ভালো ছিলেন ফ্রেডরিক। তাই তাঁরই সাহায্যে কলকাতার ব্যাঙ্কে খাতা খুলে একমাসের হাতখরচের টাকা নিজের কাছে রেখে বাকি টাকা সেই খাতায় জমা করে দিয়েছিল রজনী। আর কলেজ পাশ করা বলে চটপট কাজকর্ম ধরে নিতে পেরেছিল সে। এমনকী ছ-মাসের মধ্যে টাইপ করাও শিখে নিয়েছিল। ফ্রেডরিক সায়েবও তার কাজকর্মে খুশিই ছিলেন। আর কিছুদিন পর থেকেই অফিস শেষ করে আবার সে যেতে শুরু করেছিল সুকুমার স্যারের ক্লাসে। এইভাবে আরও চার বছর তাইকোন্ডো চালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই হই হই করে এসে পড়ল যুদ্ধ আর শম্ভু ঘোষ রিটায়ার করাতে অফিসের কাজও বাড়তে লাগল। তাই অনিয়মিত হতে হতে একসময় বন্ধ হয়ে গেল তার ভদ্র স্যারের ক্লাসে যাওয়া।

তবে এরপরে একদিন অফিস ছুটির শেষে সে সোজা চলে গিয়েছিল সুকুমার ভদ্রের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। তাঁর সাথে দেখা করে নিজের অপারগতার কথা জানাতে আর তাঁর মতামত জানতে। চা খেতে খেতে বৈঠকখানার সোফায় বসে সব কথা শুনে সুকুমার স্যার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ভেবে নিয়ে বললেন— 'তাহলে একটা কথা তোমায় বলি। তোমার এখন বিয়ে করাটা বড্ড জরুরি। থিতু হতে হবে। আর এখন চাকরিও তো করছ। আরও একটা ব্যাপার কী জানো, তুমিও একদিন বুড়ো হবে। তোমার সুরেশ কাকাও ততদিন হয়তো থাকবেন না। তাই শেষজীবনের জন্যে একজন সঙ্গীর বড়ো প্রয়োজন হয়। নইলে বড়ো একা হয়ে যেতে হয়। জীবনে বার্দ্ধক্য বড়ো সাংঘাতিক সময়, রজনী।'

জবাবে সে বলেছিল— 'আমি তা জানি স্যার, কিন্তু আমি ঠিক করেছি যে আপাতত জীবনটাকে একটু আমার মতো করে চালাব। তাই এখনই বিয়ে, মানে...।' কথাটা অসমাপ্ত থেকেই যায়। মাথা নীচু করে নেয় রজনী।

—'বেশ, বুঝলাম তোমার কথা। নিজের জীবনটাকে নিজের মতো করে চালাবার অধিকার সব্বার আছে; কিন্তু তার সঙ্গে তোমার বিয়ে না করার সম্পর্ক কোথায় বল তো? সদিচ্ছা থাকলে বিয়ে করেও তো কত কিছু কাজ করা যায়। কেন, তোমার দাদু আর বাবাও তো সংসারধর্ম করেছিলেন। তাহলে?' সুগন্ধি চায়ের কাপে একটা চুমুক দেন সুকুমার ভদ্র।

—'না, মানে ঠিক তা নয় স্যার... মানে আমি যে ভাবে চলতে চাই...।' আমতা আমতা করে রজনী। সে ঠিক বুঝতে পারে না স্যারকে তার মনের কথাটা কিভাবে বলবে।

—'কীভাবে? তা তুমি কি জঙ্গী রাজনীতিতে যেতে চাও নাকি?' রজনীর কথা কেটে দিয়ে বলে ওঠেন সুকুমার স্যার। তাঁর ভ্রূ-দুটো কুঁচকে গেছে।

—'না স্যার, ও জিনিস আমার জন্যে নয়। তবে এই যুদ্ধের ডামাডোলে আর একটা পরাধীন দেশে থেকে আমি আমার সামান্য সামর্থ দিয়ে মানুষের জন্যে কিছু করতে চাই।'

—'কী? কী বললে? পরাধীন দেশের মানুষের জন্যে? ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না...।'

—'স্যার, আমি ভাবছি আমার গ্রামের ছোটোছোটো ছেলেদের তাইকোন্ডো শেখাব। তার জন্যে খরচ-খরচা আছে। তাদের যথাসম্ভব লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে সাহায্য করা, কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করা, এইসব আর কী...। তাই বিয়ে থা করলে এই মাইনেতে আমি সেই বাড়তি খরচটা সামলাতে পারব না স্যার। তবে যদি কখনো একটা ভালো মাইনের চাকরি পাই তখন না হয় বিয়ের কথাটা ভেবে দেখতে পারি।' রজনী নম্রভাবে কথাটা বলে চুমুক দেয় চায়ে।

—'হুম, এইবারে বুঝলাম। খুবই ভালো ভাবনা। I appreciate it.' আসলে সুকুমার ভদ্র ধরে ফেলেছেন তাঁর প্রিয় ছাত্রের মনের ইচ্ছে। এত বছর ধরে তিনি তো দেখছেন তাকে। তাই বুঝে গিয়েছেন যে কিছু মানুষকে হয়তো সংসারের সাধারণ নিয়মে বাঁধা যায় না। তাদের জন্ম আর কর্ম হয় বৃহত্তর জগতের জন্যে। নইলে রজনী অনায়াসেই বিয়ের কথা ভাবতে পারত; কিন্তু তা না করে সে চাইছে তার নিজের টাকায় গ্রামের ছেলেদের তাইকোন্ডো শেখাতে। তবু প্রিয় ছাত্রকে আরও একবার বাজিয়ে নেবার জন্যে বললেন— 'বেশ তো, এখন বিয়ে না হয় নাইই করলে, কিন্তু এই যে বাবা মারা যাওয়ার জন্যে প্রাপ্য যে টাকাটা পেলে সেটা দিয়ে ছেলেদের শেখানোর জন্যে খরচ খরচার পাশাপাশি নিজেও একটু আরাম করে থাক না। নিজেকেও একটু দেখ। নিজের স্বাচ্ছন্দের জন্যেও না হয় কিছু খরচই করলে।'

—'স্যার, ছোটো মুখে হয়তো বড়ো কথা হয়ে যাবে, তবু বলছি, ওই টাকাটা কিন্তু আমার নিজের অর্জন করা নয়, তাই এটা নিজের জন্যে খরচ করার অধিকার আমার নেই।' চায়ের কাপটা আবার ঠোঁটে তোলে রজনী।

—'তাহলে তোমার পৈতৃক সম্পত্তি? সেটাও তো তোমার অর্জন করা নয়। তার কী হবে?' সুকুমার স্যারের স্বরে হালকা উষ্মা।

তবু রজনী শান্ত স্বরেই বলে— 'স্যার, আমি ভেবে রেখেছি যে থাকার জন্যে আমাদের দু-কামরার বাড়িটা আর তার সামনের কিছুটা জমি নিজের জন্যে রেখে বাকি সব আমাদের ভাগচাষি সুরেশ কাকাকে একসময় লেখাপড়া করে দেব। তাতে সুরেশ কাকাকে আর আমার কাছে মাথা নীচু করে থাকতে হবে না। সেই ছোটোবেলা থেকে সে আমাদের জন্যে অনেক করেছে আর এখনও করছে।'

এবার সুকুমার স্যারের পরীক্ষা শেষ। তাঁর প্রিয় শিষ্য তার নিজের কাছে করা প্রতিজ্ঞা পালনে বদ্ধপরিকর। তাই চায়ে শেষ চুমুকটা দিয়ে চোখ বুজে আধমিনিট বসে থাকার পরে বললেন— 'জানো রজনী, এক এক সময় কেন জানি না মনে হয় যে দেশের বড়ো দুর্দিন আসছে। তুমি বরং তোমার গ্রামের ডাকাবুকো ছেলেদের নিয়ে দেশের সেই দুঃসময়ের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে তৈরি হও। নিজের আর তাদের শরীর আর মনকে সেই লড়াইয়ের জন্যে গড়ে তোলো আর তুমি যেমনটা ভেবেছ তেমনটাই কর। আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। তোমার গ্রামে তুমি একটা তাইকোন্ডোর আখড়া খোল। সেখানে তাদের শেখাও। সেইসঙ্গে নতুন নতুন কিছু ঢুকিয়ে খেলাটাকে আরও ইম্প্রুভ করার চেষ্টাটাও করে যেও, যেমন তুমি আগে করতে আর কী। তা ছাড়া তুমি তো জুজুৎসুরও বেশ কিছু টেকনিক জানো। শিখিয়েছিলাম তো তোমাকে। সেইগুলোকেও কাজে লাগাও। ...কি পারবে না?' মনে হয়

সুকুমার স্যার কিছুটা আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন। তাঁর সেই আবেগ সঞ্চারিত হয় রজনীর মধ্যেও। তাই সে বলে— 'পারব স্যার, পারব। পারতে আমাকে হবেই।' গুরুর আশীর্বাদ পেয়ে, তাঁর আস্থাভাজন হয়েছে বুঝতে পেরে, চোখটা চকচক করে ওঠে রজনীর।

নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড রজনীর হাতে দিয়ে স্যার বললেন— 'বেশ, তবে তাইই হোক। আমার শুভকামনা রইল। আর হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে আমার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করো কিংবা নিজেও এসে আমার সাথে দেখা করতে পার। তোমার জন্যে আমার দরজা সবসময়েই খোলা।'

ব্যাস, সেইই শুরু।

—'বলি এ্যাই ছোঁড়ারা, এবার ইদিকে আয় দিকি। ছোলা-গুড় নে যা' সুরেশ কাকার হাঁক শোনা গেল।

লাইন করে দাঁড়ানো ছেলেদের ছোলা-গুড় আর আদার কুঁচি দিতে দিতে সুরেশ কাকা আবারও বললে— 'ছোলা খেয়ে নিয়ে দাওয়ার তক্তপোশের ওপরে রাখা তোষকটা নে গে আকড়ায় পেতে দে। পল্টু আর পুলিন আজ তোদের পালা। নে নে, চটপট খেয়ে নিয়ে জল খেয়ে বিশখানা পাক মার দেকি। তোদের স্যার ততক্কনে তৈরি হয়ে যাবে। নে নে, জলদি কর দেকি বাবারা।'

সুরেশ কাকা লেখাপড়া না জানা এক গ্রাম্য চাষি হলেও এটা বোঝে যে রজনী যা করছে তা ওই ছেলেগুলোর ভালোর জন্যেই করছে। সে এটাও বুঝতে পারে যে এই হাড়হাভাতে বেনিয়মি ছেলেগুলো পালটে গেছে রজনীর হাতে পড়ে। এখন তারা অনেক সভ্যভব্য আর নিয়মানুবর্তী হয়েছে। গ্রামের অন্য অন্য ছেলেদের তুলনায় এরা অনেক বেশি শক্তসমর্থ আর আলাদা রকমের। ছোটোবেলা থেকে এইরকম শিক্ষা পেলে সব ছেলেরাই বড়ো হয়ে এক একজন ভালো মানুষ হয়ে উঠবে। তাই সে এই ছেলেদের এত স্নেহ করে। আবার গ্রামের অন্যকোথাও এদের বেচাল দেখলে দাবড়ানিও দেয়। আর তারাও সেটাকে ভালোবাসার শাসন বলে বুঝতে পারে বলেই তাকে মান্যও করে।

ছেলেরা ছোলা-গুড় আর টিউবওয়েল থেকে জল খেয়ে মোটা তোষকটা ধরাধরি করে আখড়ার মাটিতে পেতে দিল। এতে আছড়ে পড়লেও বড়োসড়ো চোট লাগার সম্ভাবনা কমে যায়। তারপর তারা লাইন করে আখড়ার চারিদিকে দৌড় শুরু করল। দাওয়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রজনী তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে থাকল ছেলেদের দৌড়।

এই ছেলেদের অনেকে খুবই গরিব। এই আকালের যুগে অনেকেরই দু-বেলা পেটভরে ভাতও জোটে না। পুকুরের গেঁড়ি-গুগলি, ছোটো মাছ আর কখনো বা খেতের চিতি কাঁকড়া জুটলে তাই খেয়ে প্রোটিনের অভাব মেটায়। তবু এদের মুখে হাসি লেগেই আছে। অদম্য প্রাণশক্তি এদের। এরা যে রজনীর কাছে আসে, তা শুধুমাত্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার টানেই নয়। সেটা তো আছেই। কিন্তু আরও অন্য কারণও আছে। প্রথম কারণটা হল যে তারা রোজ বিকেলে প্র্যাকটিসের আগে সুরেশ কাকার কাছ থেকে ছোলা-গুড় পায়, তা সে রজনী থাকুক বা না থাকুক। তাতে তাদের টিফিনের ক্ষিদেটা মেটে আর দ্বিতীয় কারণটা হল— রজনী রবিবার সকাল দশটায় যে প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা করেছে তারপরে তাদের ভাগ্যে জোটে সুরেশ কাকার রাঁধা ঢালাও খিচুড়ি আর আলুভাজা। রজনীও তাদের সঙ্গে পংক্তিভোজনে বসে। সেইজন্যেই ওই ছেলেরা একদিকে রজনীকে গুরু বলে যেমন মান্যও করে, তেমনি ভালোওবাসে।

এই তো মাসখানেক আগে রজনীর একবার ধুম জ্বর হয়েছিল। ম্যালেরিয়া। কিন্তু সুরেশ কাকা তাকে কখনো একা ফেলে রাখেনি। খুব দরকার পড়লে রজনীদের একটেরে বাড়ির পাশের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট পথ ধরে নিজের বাড়িতে গিয়ে তার সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসের জোগান দিয়েই আবার ফিরে আসত রজনীর কাছে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, জলপট্টি দেওয়া, ওষুধ খাওয়ানো সবই করত সে। এমনকী রাত্তিরেও সে রজনীর বিছানার পাশের মাটিতে চাটাই পেতে শুতো— কখন কী দরকার পড়ে তাই। আর এই ছেলের দল তখন রোজ স্কুলে যাওয়ার আগে আর স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখা করে যেত তাদের স্যারের সঙ্গে। তবে তা সত্ত্বেও তারা কিন্তু তাদের প্র্যাকটিস বন্ধ করেনি। কোনোদিন সতেরো বছরের পুলিন আবার কোনোদিন বা এগারো বছরের কানাই প্র্যাকটিসের ভার নিত। একহপ্তা পরে রজনীর জ্বর একটু কমতে সে দুর্বল শরীর নিয়ে দাওয়ায় এসে বসে ছেলেদের কসরত দেখত। ছেলেরা তখন দাওয়ায় বসে থাকা তাদের গুরুকে 'কিয়ুগনেত', মানে 'বাও' করেই তবে প্র্যাকটিস শুরু করত। কাহিল অবস্থাতেও রজনী তাদের নির্দেশ দিত। তবে সুরেশ কাকার দায়িত্ববোধের জন্যে ছেলেদের ছোলা-গুড় বা খিচুড়ি খাওয়া বন্ধ হয়নি।

আজকেও যেমন তারা সারবেঁধে দাঁড়িয়ে তাকে 'কিয়ুগনেত' করল। তারপরে রজনী ঘরের দাওয়া থেকে কয়েকগাছা নারকেলদড়ি দিয়ে তৈরি একটা লুপ নিয়ে সবাইকে বললে তাকে ফলো করতে। তাদেরকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল সামনের ফাঁকা জমির একধারে একটা নারকেল গাছের সামনে। গাছটা খাড়াই উঠে গেছে প্রায় চারতলা বাড়ির সমান। রজনী প্রথমে দলের সবচেয়ে বড়ো ছেলে পুলিনের হাতে লুপটা দিয়ে বললে— 'নে, পায়ে এই লুপটা লাগিয়ে এই গাছটায় চড় দেখি। পাতার গোড়া ছুঁতে হবে কিন্তু।' পুলিনও বাধ্য ছেলের মতো দু-পায়ে লুপটা লাগিয়ে গাছটা আঁকড়ে ধরল দু-হাতে আর তারপরে একটা ছোট্ট লাফে পা-দুটো তুলে নিয়ে দড়ি আর পা চেপে ধরল গাছের গায়ে। নারকেলদড়ির জন্যে পা হড়কে যাবার ভয় নেই। এরপরে সে পায়ে ভর দিয়ে দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল গাছের আরও খানিকটা ওপরের অংশ। তারপরে আবার পা-দুটো তুলে চেপে ধরল গাছের আরও খানিকটা ওপরের অংশে। সেইসঙ্গে হাতদুটোও উঠে গেল ওপরে। এইভাবে পুলিন ধাপে ধাপে উঠে যেতে লাগল ওপরের দিকে। এই জিনিসটা করলে হাত, পা, কাঁধ, পিঠ আর পেটের পেশি শক্ত হয়। এটা রজনীই মাথা খাটিয়ে বের করেছে। তারপর সে ছেলেদের দিকে ফিরে বললে— 'এ্যাই, সব ভালো করে দেখ পুলিন কীভাবে উঠছে। সবাইকে উঠতে হবে এরপরে। কেউ ছাড় পাবে না।'

মিনিট চারেকের মধ্যেই গাছের পাতার গোড়া ছুঁয়ে ফেলল পুলিন। ওপর থেকেই জিজ্ঞেস করল— 'স্যার, নামব?' রজনী 'হ্যাঁ' বলতেই তরতর করে নেমে এল সে। কুড়ি পাক দৌড়োনো আর গাছে ওঠার পরেও একটুও হাঁপায়নি ছেলেটা। অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর অদম্য ফুসফুসের জোর। এরপরে রজনী কানাইকে লুপটা দিয়ে বলল— 'যা'। কানাই এই দলে সবচেয়ে ছোটো, কিন্তু তা হলে কী হবে, সবকিছুতেই চৌখস সে। রজনী জানে যে, কোনোদিন যদি কেউ তার নাম রাখে তাহলে এই পুলিন আর কানাইই তা পারবে।

কুড়িজন ছেলের গাছ বেয়ে ওঠানামা করতে করতেই প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেল। এদের মধ্যে চারজন পাতার গোড়া ছুঁতে পারেনি। রজনী সেই চারজনকে দড়ির লুপটা দিয়ে বললে— 'বাড়িতে প্র্যাকটিস করবি। সামনের সপ্তায় আমি যেন দেখি যে তোরা প্রত্যেকেই পাতার গোড়া ছুঁতে পারছিস, বুঝলি?' তারা একসঙ্গে মিলিটারি কায়দায় জবাব দিলে— 'হ্যাঁ স্যার'।

এবারে সবাই আখড়ার ম্যাটের তিনদিকে ফাঁক ফাঁক হয়ে সারি দিয়ে দাঁড়াল। অন্য দিকটায় রজনী। প্রত্যেকের দু-হাত কোমরের পাশে চাপা, কনুই থেকে জমির সমান্তরালে ভাঁজ করা আর শক্ত করে রাখা মুঠি। ওরা সবাই জানে এরপরে কী করতে হবে। বুকভরে শ্বাস টেনে নিয়েই মুষ্টিবদ্ধ ডানহাত মাথার ওপরে সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল— 'ভারতমাতা কী জয়'। এরপরে সেইহাত নামিয়ে বাঁ-হাত একই কায়দায় শূন্যে ছুঁড়ে বলে উঠল— 'বন্দে মাতরম'। আসলে রজনী ছেলেদের এগুলো শিখিয়েছে তাদের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার জন্যে। অন্যদিকে সে সুকুমার স্যারের কাছ থেকে শেখা জুজুৎসু আর তাইকোন্ডো মিশিয়ে ঢেলে সাজিয়েছে নিজেকে। তবে এই ছেলেরা তো সবে কয়েক বছর হল শিখছে। এখনও এদের সেসব জটিল আক্রমনের ট্রেনিং দেবার সময় আসেনি। সময় এলে সে ঠিকই দেবে তাদের।

এরপরে রজনীর নেতৃত্বে শুরু হল তাইকোন্ডো প্র্যাকটিস। ছেলেরা বাঁ-পা পেছনে রেখে ডান পা সামনে এগিয়ে হাঁটু থেকে খানিকটা ভাঁজ করে ডান হাতের মুঠি সর্বশক্তি দিয়ে সামনে ছুঁড়ে দিচ্ছে যেন কোনো অদৃশ্য প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে আর চিৎকার দিচ্ছে— 'কী ইহ্যাপ'। আবার বাঁ-পা সামনে রেখে বাঁ-হাতের মুঠি সামনে ছুঁড়ে চিৎকার দিচ্ছে— 'কী ইহ্যাপ'। খানিকক্ষণ এভাবে চলার পরে স্ট্রেচ করার পালা। সেই সেশনটাও চলল প্রায় মিনিট পনেরো। এর ফলে দু-পায়ের সংযোগস্থল নমনীয় হয়। 'চাগি' মানে 'কিক' করতে সুবিধে হয়। এরপরে শুরু হল 'চাগি' প্র্যাকটিস। ছেলেরা রজনীর অনুকরণে অদৃশ্য শত্রুর মাথা লক্ষ্য করে একবার ছুঁড়ে দিচ্ছে ডান পা আবার পরক্ষনেই ছুঁড়ে দিচ্ছে বাঁ-পা। সঙ্গে তীব্র 'কী ইহ্যাপ' চিৎকার। এইভাবে অনুশীলন চলল আরও মিনিট কুড়ি।

তারপরে রজনী গিয়ে ম্যাটের মাঝামাঝি দাঁড়াল। ডেকে নিলো নগেন আর সন্তোষকে। রজনীর সামনে এসে দু-পাশে দু-জনে দাঁড়িয়ে তারা 'কিয়ুগনেত' করল স্যারকে আর তারপরে দু-জনে সরে গেল তফাতে। স্যার এখন 'জু সিম', মানে রেফারি। লড়াই হবে নগেন আর সন্তোষে। লড়াই শুরু করার আগে একে অপরকে 'কিয়ুগনেত' করতেই রজনীর আলতো চাঁটা পড়ল নগেনের মাথায়। ধমক দিয়ে বলে উঠল— 'চোখ নামছে কেন? সবসময় শত্রুর চোখে চোখ রাখবি। তাতে আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারবি যে সে কীভাবে তোকে অ্যাটাক করতে পারে। চোখ থেকে চোখ কখনোই সরাবি না। তবে কখনো তোর যদি মনে হয় যে শত্রু তোর থেকেও সবল, তাহলে তখন তাকাবি তার দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানে। দেখবি শত্রু তাতে অস্বস্তি বোধ করছে আর সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েই স্ট্রাইক করবি। বুঝলি?' নগেন মাথা নেড়ে জানাতেই রজনী বললে— 'জুন বি' ... 'চি গি'। মানে 'রেডি'... 'স্ট্রাইক'।

নগেন আর সন্তোষ ম্যাটের ওপরে ছোটোছোটো লাফে অনবরত জায়গা বদল করছে আর চোখে চোখ রেখে সুযোগ খুঁজছে প্রতিপক্ষকে আঘাত হানার। লড়াই চলছে। অনেকটা যেন সাপ আর নেউল মুখোমুখি। একে অপরকে মেপে যাচ্ছে, সুযোগ খুঁজছে কে কোন অস্ত্রের প্রয়োগ করবে।

হঠাৎই সন্তোষ ঝপ করে বসে বাঁ-হাতে ভর রেখে নগেনের পা লক্ষ্য করে ডানপায়ে একটা 'চাগি' মানে 'কিক' দিতে যেতেই নগেন চকিতে পিছিয়ে গেল আর টাল সামলাতে না পেরে সন্তোষ কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তবে নগেনও সুযোগের সদব্যবহার করতে ছাড়ল না। চকিতে একটা ব্যাককিক ছুঁড়ল। কিন্তু সন্তোষ মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিল ঠিক সময়ে। আর ঘুরেও গিয়েছিল একটু। তাই নগেনের ব্যাককিক গিয়ে লাগল তার পিঠে। সেইসঙ্গে টালমাটাল সন্তোষকে

নগেন দিল 'মিলগি', মানে ধাক্কা। তাই দেখে সঙ্গে সঙ্গেই রজনী হেঁকে উঠল— 'ক্যালিও', অর্থাৎ 'স্টপ'। রজনী দু-হাতে দু-জনকে সরিয়ে দিয়ে লড়াই শেষ করে দিল। দুই যোদ্ধা একে অপরকে কিয়ুগনেত করে, স্যারকে 'বাও' করে ফিরে গেল নিজেদের জায়গায়। তারপরে রজনী বলতে শুরু করলে— 'এই লড়াইটায় নগেন জিতেছে। তবে আশা করি এরপরে সন্তোষ নিজের ভুলগুলো শুধরে নেবে। আজ সন্তোষ যখন নগেনের পায়ে 'চাগি' দিতে গেল, তখন ও নিজের বাঁ-হাত আর মাথাটাকে বড়োবেশি সামনে রেখেছিল। তাই যখন 'চাগি'টা মিস হল, তখন ও ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। সন্তোষ, এইবারে আমি দেখাচ্ছি বডিটা তখন কীভাবে রাখবি। 'এই দ্যাখ', বলে রজনী সবাইকে করে দেখাল ভুলটা ছিল কোথায় আর ঠিকটা কেমনটা হবে।

—'আচ্ছা, এরপরে আসবে পুলিন আর কানাই।'

দুই অসমবয়সি যোদ্ধা ম্যাটের ওপরে এসে দাঁড়িয়ে প্রথমে স্যারকে তারপর একে অপরকে 'কিয়ুগনেত' করল। বাও করার সময়েই রজনী লক্ষ্য করেছিল যে কানাইয়ের চোখের ফোকাস পুলিনের দুই ভুরুর মাঝখানে। কানাই খুব তাড়াতাড়িই তার কথাটা ধরে নিয়েছে। সে বুঝে গেছে যে তার প্রতিপক্ষ তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান। কানাইয়ের এই তাৎক্ষণিক গ্রহন ক্ষমতায় রজনীও খুশি। লড়াই শুরুর নির্দেশ দিতেই ম্যাটের ওপরে ক্ষিপ্রগতিতে নড়াচড়া করতে লাগল দুই যোদ্ধার শরীর। একে অপরের দুর্বলতা খোঁজার চেষ্টা করছে। দৈর্ঘ্যে ছোটো কানাই তার চেয়ে লম্বা পুলিনকে বিভ্রান্ত করতে চোখের পলকে জায়গা পালটাচ্ছে, শরীরী ভঙ্গি পালটাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি সে আক্রমণ করবে উপরের দিক থেকে আবার পরক্ষনেই মনে হচ্ছে আক্রমণ আসবে নীচের দিক থেকে।

আর তারপরেই চকিতে ঘটে গেল ঘটনাটা। সন্তোষের মতো কানাইও পায়ে টার্গেট করতে পারে ভেবে পুলিন একটু বেশিই সামনে ঝুঁকে পড়েছিল আর সেই সুযোগটাই নিল কানাই। এক লাফ মেরে 'কী ইহ্যাপ' বলে চিৎকার করে তার ডান-পা ছুঁড়ে দিল পুলিনের চোয়াল লক্ষ্য করে। কিন্তু পুলিনও দক্ষ যোদ্ধা। সে চকিতে মাথাটা হেলিয়ে দিল বাঁ-পাশে আর তার ফলে কানাইয়ের 'চাগি' সোজা গিয়ে পড়ল তার ডান কাঁধে। লাগেনি তেমন, তবে হঠাৎ আসা ধাক্কাটা সামলাতে একটু পিছিয়ে গিয়ে সোজা হতে চেয়েছিল সে। আর সেই সুযোগটাই নিলো কানাই। লাফ মেরে পুলিনের রোবটা ধরে তার পায়ের পেছনে নিজের একটা পা রেখে পুলিনের শরীরের উপরের অংশে দিল 'মিলগি'। সেইসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল— 'কী ইহ্যাপ'। সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে পুলিন চিত হয়ে পড়ল তোষকের ওপরে।

সঙ্গে সঙ্গে রজনী হেঁকে উঠল— 'ক্যালিও'। মানে লড়াই শেষ। দুই যোদ্ধা মাথা ঝুঁকিয়ে স্যারকে 'কামসা হামনি দা' অর্থাৎ 'ধন্যবাদ' জানিয়ে একে অপরকে বাও করে ফিরে গেল নিজের নিজের জায়গায়।

ঘন্টাখানেক আরও কেটে গিয়েছে প্র্যাকটিস শেষ হতে। ততক্ষণে সূর্যও ম্লান হয়ে জঙ্গলের দিকে ঢলতে শুরু করেছে। তাই রজনী ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলে— 'এবার বাড়িতে গিয়ে কিছু খেয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করবি। আর শোন, নজর সবসময় খোলা রাখবি। জানবি, সকলেরই কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে। প্রকৃত যোদ্ধা শত্রুর দুর্বলতাকে অস্ত্র বানায় আর তার গুণগুলো থেকে শেখে। আচ্ছা, ঠিক আছে, কাল সকালে আবার দেখা হবে। নে, এবার তাহলে বল ''ভারতমাতা কী জয়''।' ছেলেরাও সমস্বরে বলে উঠল— 'ভারতমাতা কি জয়', 'বন্দে মাতরম'।

ছেলের দল চলে গেলে রজনীকান্ত ঘরে ঢুকে পোশাক পালটায়। সন্ধে নেমে গেছে। বাইরের দাওয়ায় এসে একটা মোড়া নিয়ে বসে। সুরেশ কাকা ততক্ষণে ঘরে আর দাওয়ায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়েছে। শীতকালেও দু-একটা জোনাকি আখড়ায় আর তার আশেপাশে টুপটাপ করে জ্বলছে। রজনী জোনাকিগুলোকে গোনার চেষ্টা করে। কিন্তু উড়ন্ত জোনাকি গোনা? নিজের ছেলেমানুষিতে নিজেই হেসে ফেলে রজনী। পরে আবার ভেবে দেখে— উড়ন্ত জোনাকিদের ফলো করতেও তো চোখের রিফ্লেক্স অ্যাকশন দরকার। তাহলে ঠিকই আছে। প্রকৃতি তাকে আরও আরও শিখতে বাধ্য করাচ্ছে তার অজ্ঞাতেই।

—'কী গো ছোরদাবাবু হাঁসচো কেন?'

—'আর বলো না সুরেশ কাকা। আমি জোনাকি গুনছিলাম।'

—'ওমা, সে কী কতা গো। জোনাক আবার গোনা যায় নাকি?'

—'সেইজন্যেই তো হাসছি। কী বোকা আমি দেখেছ।'

—'সে তো দেকতেই পাচ্চি। নাও, বাটিটা ধর। সেই কোন দুপুরে খেয়েচো।'

খানিকটা আখের গুড় ফেলা জল-মুড়ির বাটিটা এগিয়ে দেয় রজনীর সামনে। নিজেও একটা বাটি নিয়ে মাটিতে বসে সুরেশ কাকা। দু-জনে খেতে থাকে। শীতের বাতাস বইতে শুরু করেছে। যত রাত বাড়বে, ততোই বাড়বে ঠান্ডা। এমন সময় দূরের নদীপারের জঙ্গলে প্রথম প্রহরের শিয়াল ডেকে উঠল। সবাই মিলে হাঁকাহাঁকি করে কয়েক মিনিট পরে থেমেও গেল। গ্রামের একপ্রান্তে বাড়ি বলে চারিদিক নিস্তব্ধ। তবে অন্ধকারেরও বিশেষ শব্দ আছে। সুরেশ কাকা জানে না সে কথা; কিন্তু রজনীকান্ত জানে। সে টের পাচ্ছে কত রকম শব্দ। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব শব্দের ধরণ ধারণও পালটে পালটে যায়। তার দাদু নিশিকান্ত তাকে অন্ধকারের শব্দ চিনিয়েছে, অন্ধকারে দেখতে শিখিয়েছে। ওই দূরের ঝাপসা নদীপাড়ের জঙ্গলে সে গোপনে কত রাত দাদুর সঙ্গে ঘুরেছে। দাদু তাকে দিয়েছিল একটা বুমেরাং। ওই বুমেরাং দিয়েই অন্ধকারেও শব্দভেদ করতে দাদুই তাকে শিখিয়েছিল।...

—'বলি, খালি বাটিটা এবারে দাও।' সুরেশ কাকার কথায় ঘোর কাটে রজনীর। বাটিটা সে এগিয়ে দেয়। বাটি নিয়ে সুরেশ কাকা বলে— 'শোনো ছোরদাবাবু, আজকে হাটতলায় স্বদেশিগানের আসর বসবে। বলি, শুনতে যাবে নাকি? মুকুন্দদাসের গান শোনাবে কেউ একজন। শ্যামাদাস বললে বটে নামটা, কিন্তু ভুলে গেচি বুইলে?'

—'হুঁ, যাব। তা তুমি যাবে না?'

—'হ্যাঁ, যাব বইকী। তাইলে যাই, তাড়াতাড়ি রান্নাটা সেরে ফেলিগে। তুমি না হয় একোনই বেইরে পড়। বটতলায় গে পাঁচটা লোকের সাতে গল্পগুজব কর। মনটা ভালো থাকবে। আমি রান্না সেরে ঠিকসময়ে হাজির হয়ে যাবোকোন।'

—'হুঁ, ঠিকই বলেছ। আমি তাহলে এগোই। তুমি তাড়াতাড়ি রান্নাটা সেরে এসো।' বলে দাওয়া থেকে নেমে বেরোতে যায় রজনী। পেছন থেকে সুরেশ কাকা হাঁক পাড়ে— 'আরে, টর্চটা তো নে যাও।' এগিয়ে যেতে যেতে রজনী জবাব দেয়— 'তুমি আসার সময় ওটা নিয়ে এসো। তোমার কাজে লাগবে। আমার অসুবিধে হবে না।'

—'আচ্চা।' সুরেশ কাকা জবাব দিল। সে জানে ছেলেটা বড়ো একবগ্গা।

আকাশে চাঁদ নেই, তবু কোনো অসুবিধে হচ্ছে না রজনীর। পথঘাট তার কাছে বেশ স্পষ্টই। জঙ্গলের অন্ধকারে যে দেখতে পায়, এই আঁধার তার কাছে কিছুই নয়। হাঁটতে হাঁটতে সে গুনগুনায়— 'ভয় কী মরণে, রাখিতে সন্তানে, মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে। তাথই তাথই থই, দ্রিমি দ্রিমি দ্রম দ্রম...।' দাদু নিশিকান্তই শিখিয়েছিল তাকে। বড়ো ভালো লাগে তার এই গানটা। কোথায় যেন একটা ভয়াল উন্মাদনা আছে গানের কথায় আর সুরে। আর এটাই যে তাকে তার দাদুর শেখানো শেষ গান।

১৯৩০, এপ্রিল

স্বয়ং মুকুন্দদাস, নিশিকান্ত আর বহুরূপী

হাটতলার ঠিক মাঝখানে এক বিশাল বটগাছ। তার গোড়ার চারপাশে খানিকটা জায়গা জুড়ে লাল সিমেন্টের বাঁধানো বেদি। চারপাশে শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে আর ঝুরি নামিয়ে সে যেন আগলে রেখেছে এই হাটটাকে। সেই বেদিতে গ্রীষ্মের খর দুপুরে অনেকে এসে বসে বিশ্রাম করে আর সন্ধের দখিণা হাওয়ায় সেখানে জমে ওঠে আড্ডা। আদ্যিকালের এই গাছটা অনেক কিছু দেখেছে, অনেক কিছু শুনেছে। রজনীকান্তর মনে হয় শুধু যদি গাছটা কথা বলতে পারত তাহলে হয়তো পুরোনো দিনের অনেক কথাই জানা যেত ওর কাছ থেকে। কিন্তু তবুও ও যে কেন কথা বলে না কে জানে? ভরদুপুরের নির্জনতায় যখন কখনো সখনও রজনী এই গাছটার তলায় এসে বসে, তখন ফিসফিসিয়ে বললেও সে ঠিক শুনতে পেত গাছটার বলা কথা। অন্য কেউ না বুঝলেও সে ঠিকই বুঝতে পারত। সে যে অনুভব করতে পারে প্রকৃতির অব্যক্ত কথা।

সেবার, ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসের এক সন্ধ্যায় এই গাছতলাতেই এসেছিলেন স্বয়ং চারণকবি মুকুন্দদাস। ভগৎ সিংয়ের মারা যাবার ঠিক একবছর পরেই। শ্যামাদাসের বাবাই ব্যবস্থা করেছিলেন সব। প্রচুর লোকসমাগম হয়েছিল সেবার। আশেপাশের গাঁ থেকেও অনেক পুরুষ আর মহিলারা এসেছিল। এই বটতলারই বেদিতে দাঁড়িয়ে একের পর এক দেশাত্মবোধক গান গেয়ে যাচ্ছিলেন চারণকবি। উদাত্ত গলায় তাঁর গানের সুরে আর হাতের মুদ্রায় ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন দেশাত্মবোধ। রজনী তখন বাইশ বছরের যুবক। সদ্য কলেজ পাশ করে বেরিয়েছে সে। দাদু নিশিকান্তর পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। আর যতই শুনছিল, ততোই তার গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছিল। চোখের কোল ভারী হয়ে উঠছিল জলে। দাদু নিশ্চয়ই তার এই মগ্নতা লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু কিচ্ছু বলেননি তাকে। সদ্য যুবক রজনীর স্বদেশি আবেগকে লাগাম দিতে চাননি উনি। আপ্লুত রজনীকান্তের আবেগ তুঙ্গে উঠেছিল যখন চারণকবি গাইতে শুরু করেছিলেন— 'ভয় কী মরণে, রাখিতে সন্তানে, মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে...'। তাই গানের মাঝেই সে দাদুকে বলেছিল— 'তুমি পুরো গানটা জানো?'

—'হ্যাঁ, মুকুন্দদাসের গান তো অনেক লোকেরই মুকে মুকে ফেরে। সেখান থেকেই শুনে শুনে দু-একটা শেকা।'

—'আমাকে শিখিয়ে দেবে?'

—'হ্যাঁ দেবো। অ্যাকোন মন দে গানটা শোনো দিকি।'

চারণকবি গেয়ে চলেছেন। তাঁর অন্তরের দামাল স্বদেশপ্রেম গান হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। তাঁর গানের সঙ্গে তাঁরই পাশে বেদির ওপরে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কালী সেজে নাচছে এই গ্রামেরই বাসিন্দা বহুরূপী বিষ্টুচরণ। রজনীরই প্রায় সমবয়সি সে। অপরের জমিতে চাষবাষের কাজ করে আর মাঝেমধ্যেই বহুরূপী সেজে এ গ্রাম সে গ্রামে দুটো বাড়তি পয়সা উপার্জনের আশায় ঘোরে ফেরে। কখনো সাজে শিব, কখনো শীতলা, কখনো কৃষ্ণ আবার কখনো বা কালী। আজ যেমন সে কালী সেজেছে।

চারণকবি গেয়ে চলেছেন। কখনো মাথা ঝাঁকিয়ে আবার কখনো বা দু-হাত তুলে। যখনই তাঁর গানের ওই লাইনটা ফিরে ফিরে আসছে— 'তাথই তাথই থই, দ্রিমি দ্রিমি দ্রম দ্রম...' তখনই বিষ্টুর নাচের তাণ্ডবও বাড়ছে। তার হাতে ধরা নকল নরমুন্ড নাচের তালে তালে দোল খাচ্ছে। তার কালো রংমাখা মুখের নকল লাল জিভে আর বিস্ফারিত চোখে দানবদলনের মূর্ত ছবি। নকল হাতের টিনের খাঁড়ায় ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে হ্যাজাকবাতির আলো। মনে হচ্ছে যেন গানের প্রভাবে কালী আমূল পালটে হয়ে গেছেন প্রলয় নৃত্যকারী রুদ্র। নৃত্যরত বিষ্টুর ভাঙা ভাঙা ছায়া ঘুরে ঘুরে ফিরছে বটগাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায়। সেই ছায়া দেখে মনে হচ্ছে যেন ঊর্ধে নাচছে পিশাচের দল— যেমনটা আছে চারণকবির গানের কথায়। শ্রোতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে কবির গানের সেই উদ্দাম আবেশ। তাই ওই 'তাথই তাথই থই, দ্রিমি দ্রিমি দ্রম দ্রম...' জায়গাটা এলেই তারাও গলা ছেড়ে গানের সুরে সুর মেলাচ্ছে।

ঠিক এমনই সময়ে ঘটে গিয়েছিল অঘটন। এই তালুকের থানার দারোগা নরসিংহ জনা বিশেক লাঠিধারী পুলিশ নিয়ে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সমবেত জনতার ওপরে। গানে মজে থাকায় কেউ কিচ্ছুটি বুঝতে পারেনি আগে। পুলিশের দল নিরস্ত্র জনতার ওপরে নির্মমভাবে এলোপাথাড়ি চালিয়েছিল লাঠি। আচমকা আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল সবাই। কারোর মাথা ফেটেছিল, কারোর কাঁধে লেগেছিল ভীষণ চোট আবার কেউবা মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিল। এমনসময়ে একজন পুলিশ তার আর তার দাদুর ওপরে লাঠি তুলতেই দাদু খপ করে ধরে ফেলেছিল সেই লাঠি আর পরক্ষণেই চকিতে ঘুরে পুলিশটার পেছনে গিয়ে দু-হাতে ওই লাঠিটা দিয়েই চেপে ধরেছিল পুলিশটার গলা। প্রায় আধমিনিট পরে দাদু যখন লাঠির প্যাঁচ ছেড়েছিল, তখন পুলিশটা নিজের গলা ধরে লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে। তারপর ওই বৃদ্ধ বয়েসেও পুলিশের লাঠিটা তুলে নিয়ে দাদু গিয়ে দাঁড়িয়েছিল চারণকবির পাশে। হেঁকে বলেছিল— 'কবির গায়ে হাত পড়লে তোদের কাউকে আমি ছেড়ে কতা বলবোনি কিন্তু। খবরদার।' দারোগা নরসিংহ তখন পিস্তল বের করে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে বলেছিল— 'এ্যাই বুড়ো, সরে যা। সরকারি পরোয়ানা আছে মুকুন্দদাসকে গ্রেফতার করার।'

দাদু চিৎকার করে বলেছিল— 'কেন? সরবো কেন? সে কী অপরাদ করেচে? গান শোনানো কি অপরাদ?'

জবাব এসেছিল— 'অতশত জানি না। গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে ওর নামে। ওকে গ্রেফতার করতে দে।'

ততোক্ষণে বটতলা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। শুধু শ্যামাদাসের বাবা, রজনীকান্ত আর গাঁয়ের দু-চার জন মাতব্বর দাঁড়িয়েছিল তখনও।

সেই মাতব্বরদেরই একজন বললে— 'সরে এসো নিশিকান্ত। পুলিশের কাজে বাধা দিতে গেলে তুমিও গ্রেফতার হতে পার। সরে এসো। দারোগাবাবুকে নিজের কাজ করতে দাও।'

দাদু বলেছিল— 'দারোগাবাবু, আমাকে আগে কতা দাও যে তোমরা চারণকবির কোনো অনিষ্ট করবেনি। নইলে আমি নড়চিনি। দেকি তোমার পিস্তলের কত্তো জোর। আমাকে না মেরে তোমরা কবিকে নে যেতে পারবেনি, কয়ে দিলাম।'

রজনী অবাক হয়ে দেখছিল ওই সাতাত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধের ওপরে তখন যেন স্বয়ং মহারুদ্র ভর করেছেন।

—'নিশিকান্ত, তুমি আমাকে দারোগাবাবুর কাছে যেতে দাও। এরকম অ্যারেস্ট ব্রিটিশ পুলিশ আমায় অনেকবার করেছে। তবু আমার গলা থামেনি আর থামবেও না।' বলে উঠেছিলেন স্বয়ং মুকুন্দদাস।

—'না, আমি পেরান থাকতেও পারবোনি তা।...আঃ।'

এই কথা চালাচালির মধ্যেই কোনো এক পুলিশ আলো-অন্ধকারের আড়াল আবডাল দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল দাদুর পেছনে। কেউই খেয়াল করেনি। সেইই সপাটে লাঠি কষায় বৃদ্ধের মাথার পেছনে। সেই আঘাতেই বটলার বেদিতে লুটিয়ে পড়েছিল বৃদ্ধ। হাঁ-হাঁ করে ছুটে গিয়েছিল সবাই। রক্তমাখা দাদুর মাথাটা কোলে তুলে নিয়েছিল রজনী আর স্তম্ভিত হয়ে দেখছিল— হাতে হাতকড়া পরা, কোমরে দড়ি বাঁধা চারণকবি মুকুন্দদাস ধীরপায়ে এগিয়ে চলেছেন পুলিশের সঙ্গে হ্যাজাকবাতির আলোর বৃত্ত ছেড়ে ঘোর অন্ধকারে ঢাকা পথের দিকে।

সেদিনই সবাই ধরাধরি করে গোরুরগাড়িতে চাপিয়ে দাদুকে নিয়ে গিয়েছিল সদর হাসপাতালে। সেখানে সাতদিন থাকার পরে ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরেছিল দাদু নিশিকান্ত। তবে শরীরে আর জোর ছিল না। বেশি কথা বলতে পারত না। বেশিরভাগ সময়ে শুয়ে বসেই কাটাত। তবে সেই সময়েই গানের কথাগুলো বলে দিয়েছিল রজনীকে। রজনী তা লিখে নিয়েছিল খাতায় আর সুরটা সে রপ্ত করেছিল চারণকবির গান আর দাদুর কাঁপা কাঁপা গলার সুর শুনে। তারপরে বোধ হয় আর এক পক্ষকাল বেঁচে ছিল দাদু।

তবে আজ, এই ১৯৪৩-এর এপ্রিলে শ্যামাদাসদা ব্যবস্থা করেছে ভালোই। বটগাছের চারিদিকে ছ-টা খুঁটি পুঁতে জ্বালিয়ে দিয়েছে হ্যাজাকবাতি। এই গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে বটে, তবে তা দু-একজন বিত্তশালী মানুষের বাড়িতে। অন্যদের বাড়িতে হয় টেমি, নয়তো হ্যারিকেন বা লণ্ঠন। তাই হাটতলায় আজ সেদিনের চেয়ে অনেক বেশি হ্যাজাকবাতির আলো। অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তা। ছেয়ে আছে হাটতলা জুড়ে— লোকের মনে যেমন অনেক বেশি স্বদেশিয়ানা ছেয়ে আছে আজ।

কলকাতা থেকে গাইয়ে আসবে। খরচখরচা সবই করছে শ্যামাদাসদা। সঙ্গে রয়েছে তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। আজও বিষ্টুচরণ সেদিনের মতো কালী সেজে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তার লালরঙা নকল জিভটা মুখে লাগানো নেই। হঠাৎই শ্যামাদাসের এক চ্যালা কোথা থেকে দৌড়ে এসে হাতের দামি সিগারেটের কৌটো থেকে একটা সিগারেট বের করে বিষ্টুর মুখে গুঁজে দেয়। তারপরে দেশলাই জ্বেলে সেটাকে ধরিয়ে দিয়ে বলে— 'আজ এক্কেবারে জমিয়ে দিতে হবে বিষ্টুদা। দামি সিগারেট খাওয়ালাম। জমিয়ে দিলে আরও পাঁচটা দেবো আর শ্যামাদা তোমাকে পাঁচটা টাকাও দেবে বলেছে।' সামান্য দূর থেকেই কথাটা কানে যায় রজনীর। কথাটা বলেই চলে যায় ছেলেটা। নকল নরমুণ্ডটাকে অন্যহাতের বাটির ওপরে বসিয়ে একটা হাত খালি করে নেয় বিষ্টুচরণ। দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরে সুখটান মেরে একমুখ ধোঁয়া উড়িয়ে দেয় বাতাসে। এদিকে কালীকে সিগারেট খেতে দেখে বিষ্টুর আশেপাশে ভিড় করেছে কয়েকটা কৌতূহলী বাচ্চা।

—'এই, ভাগ এখান থেকে' বলে বাচ্চাদের খেদিয়ে তার কাছে এগিয়ে যায় রজনী। তাকে দেখে একগাল হেসে বিষ্টু বলে— 'আঃ, কী খোসবাই। বিড়ি খেতে খেতে মুকে চড়া পড়ে গেসলো, বুইলে। অবিশ্যি তুমি আর এসবের কি বুইবে? কোনোদিন তো নেশা ভাং কিচ্চু কল্লেনি।'

তার দিকে হাতটা বাড়িয়ে রজনী বললে— 'দেখি কোন অমৃত তোমায় দিয়ে গ্যালো শ্যামাদাসদার চ্যালা।' বিষ্টু ভাবলে রজনীও বুঝি দু-টান দেবে। তাই সিগারেটটা বাড়িয়ে দিলে সে। হাতে নিয়ে সিগারেটের ব্র্যান্ডটা দেখে সেটা বিষ্টুর হাতেই আবার ফেরত দিয়ে দেয় রজনী। ফেরার সময় মুচকি হেসে বললে— 'নাও, আজ তো বেশ ভালোই কামাই হবে বলে মনে হচ্ছে। চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও।' কলকাতায় কাজ করার সুবাদে রজনী দেখেছে এই ব্র্যান্ডের সিগারেট খায় সেখানকার অবস্থাপন্ন লোকেরা। ফ্রেডরিক সায়েবও এটাই খায়। চায়ের দোকানে গিয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে একটা সন্ধেহ উঁকি মারে তার মনে। শ্যামাদাসদা আর তার দলবল স্বদেশি দলের সঙ্গে যুক্ত। এরা খদ্দর পরে। এরাই তো গ্রাম গঞ্জের মানুষের মনে স্বদেশিয়ানার ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে চায়। এরাই তাই আজ আয়োজন করেছে স্বদেশি গানের। তাহলে এদের হাতে বিদেশি সিগারেটের কৌটো কেন?

হঠাৎই একটা শোরগোল শোনা যায়। মুকুন্দদাসের মতো গোরুরগাড়িতে নয়, মোটরে চেপে হাজির হয়েছে কলকাতার শিল্পী। এখন এই গ্রামে ইঁটভাঙা দিয়ে তাতে রোলার চালিয়ে বাসের সড়ক তৈরি হয়েছে। দুটো বাস চলাচল করে। একঘন্টার তফাতে একটা বাস যায় আর আরেকটা আসে। সেই পথেই এসেছে মোটর। ধীরেসুস্থে চা শেষ করে ভাঁড়টা ফেলে পয়সা মেটাতে যাবে রজনী, এমনসময় একটা টর্চের আলো তার শরীর ছুঁয়ে যায়। সুরেশ কাকা হাজির হয়ে গেছে। রজনীকে দেখেই সে বললে—'চলোগে এবার। গাইয়ে তো এসে গ্যাচে। একটা ভালো জায়গা খুঁজেপেতে বসিগে চল।'

—'হ্যাঁ, চল' বলে দাম মিটিয়ে হাটতলার বটগাছের দিকে এগোয় তারা। যেতে যেতে সুরেশ কাকা বলে— 'তবে আমার কী মনে হয় জানো ছোরদাবাবু, মুকুন্দদাসের মতো গান আর এবার বোদয় হবেনি। ছেলে ছোকরাদের মোদ্দে সেই দেশভক্তি কোতায়? এরা সব মোটরে চড়ে হেতায় হোতায় গান গেয়ে দু-পয়সা কামাতেই ব্যাস্ত।'

—'তবে ছেলে ছোকরাদের মধ্যে যে দেশভক্তি থাকবে না এমনটাই বা ভাবছ কেন? কত বিপ্লবী তো কাঁচা বয়েসেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। সেকথা কি ভুলে গেলে?'

—'তা অবিশ্যি ঠিক।' বলে সুরেশ কাকা।

ওরা একটা বন্ধ দোকানের সামনে বাঁশের তৈরি বসার জায়গায় গিয়ে বসে। একটু পরেই শুরু হয় গান। সঙ্গে বহুরূপী বিষ্টুচরণের দানবদলনী নাচ। কিন্তু সেবারের মতো রজনীর গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে কই? চোখের কোলে জল জমছে কই? তাহলে কি সুরেশ কাকার কথাই সত্যি? নাকি তার বয়সটা তেরো বছর বেড়ে গেছে বলে ভেতরের আবেগটাই গেছে কমে?

যাইহোক, একসময় গানবাজনা শেষ হল।

তারপরে শ্যামাদাসদা সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে বললে— 'এবারে সবাই মিলে বলুন, ''বন্দে মাতরম'', ''ভারত মাতা কী জয়''।'

সবাই শ্যামাদাসের সুরে সুর মিলিয়ে ডাক ছাড়ল— 'বন্দে মাতরম', 'ভারত মাতা কী জয়'। সুরেশ কাকাও ডাক ছাড়ল সবার সাথে গলা মিলিয়ে।

কিন্তু রজনীর মনে হল— কই এবারে তো পুলিশ এল না?... কেন এল না কে জানে...।

তারপরে সুরেশ কাকা বললে— 'তাহলে এবার উটি? গিন্নি না খেয়ে বসে আচে। আমি সকালবেলা ঠিক পৌঁচে যাবোকন।'

—'হ্যাঁ এসো। সাবধানে যেও' বলে উঠে পড়ে রজনী। বাড়ির পথ ধরে। অন্ধকার পথ। আকাশে ছড়িয়ে আছে হাজারো তারা। আকাশ দেখতে তার বড়ো ভালো লাগে। মানুষের মনের মতো আকাশকেও পুরোপুরি চেনা সহজ নয়। কিছু কিছু চেনা যায় হয়তো, কিন্তু সবটা নয়। হ্যাঁ, ওই তো 'কালপুরুষ', ওইটা 'সপ্তর্ষি' আর ওই যে হালকা আলোয় মিটমিট করছে যে তারাটা, ওটা হল 'ধ্রুবতারা'। সর্বদাই উত্তরদিক চিনিয়ে দেয় সে। কখনো ভুলচুক হয় না। রজনীর মনে হয়— 'প্রকৃত সত্যি' ব্যাপারটাও বুঝি এমনতরো। হাজারো প্রকট 'আপাত সত্যি'র মধ্যেও তা হারিয়ে যায় না।

এইসব ভাবতে ভাবতেই বাড়ির কাছে এসে পড়ে রজনীকান্ত।

হঠাৎই তার বাড়ির দাওয়া থেকে ছিটকে আসে টর্চের আলো। সরাসরি পড়ে তার মুখে। চোখ ধঁধিয়ে যায়। এক অজানা আশঙ্কায় তার শরীরের সব স্নায়ু টানটান হয়ে যায়। সে মোকাবিলার জন্যে তৈরি হয়ে যায় মুহূর্তে। হাঁক পাড়ে— 'টর্চটা সরাও।' আলোটা এবার ঘুরে গেল টর্চধারীর দিকে। চমকে উঠল রজনী। কালো মতো ওটা কে? একটু পরেই চোখ সয়ে যেতেই সে বুঝতে পারল দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে কালীর কালো বেশে সাজা বহুরূপী বিষ্টুচরণ। অন্ধকারের সাথে মিশে রজনীর দাওয়ায় বসেছিল সে। এতক্ষণে শরীরটা স্বাভাবিক হয় রজনীর।

কাছে এগিয়ে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করে— 'কী ব্যাপার বিষ্টু? এত রাতে এইভাবে এখানে কেন? কী দরকার?'

দাওয়া থেকে টুক করে নেমে সাদা দাঁতগুলো বের করে হেসে বিষ্টুচরণ বলে —'শোনো। পরের শনিবার জলার ধারে সেনেদের পোড়ো ভিটেতে রাত দশটায় তোমায় হাজির হতে বলেচে শ্যামাদা।'

—'কিন্তু আমাকে কেন?'

—'তার আমি কি জানি। বলেচে নাকি বিশেষ দরকার আচে তোমার সাতে।'

—'বিশেষ দরকার? তা আর কিছু বলেনি শ্যামাদাসদা?'

—'নাঃ, ব্যাস এইটুকুই। বাকি কতা সাক্কাতে বলবে বলেচে। আর বলেচে যে এই কতাটা আর কেউ যেন না জানে। বুইলে? তাহলে একন আসি?' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামে বিষ্টু।

—'হ্যাঁ, এসো।'

টর্চের আলো ফেলে ফেলে দূরের অন্ধকারে ক্রমশ মিলিয়ে যায় বিষ্টুচরণ বহুরূপীর কালীরূপ। আর রজনীর মনে প্রশ্ন জাগে— কী এমন প্রয়োজনে শ্যামাদাসদা তাকে ডেকে পাঠাল সেনেদের পোড়ো বাড়িতে? এই কথাটা তো সে সুরেশ কাকাকে দিয়ে বা সে নিজেও হাটতলায় তাকে বলতে পারত। কিন্তু তা না করে...।

শুধু তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বলল সজাগ থাকতে।

১৮৫৫, জানুয়ারির প্রথমভাগ

ঠগির দল, আর্তনাদ, নীলকান্ত আর শ্যামাঙ্গিনী

নদীয়া জেলার কেষ্টনগর থেকে আঠারো জনের এক তীর্থযাত্রীর দল তীর্থ করতে চলেছে। তারা যাবে কালীঘাটে পৌষকালী দর্শন করতে। কখনো নদীর পাশ দিয়ে আবার কখনো বা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ পথ। দলে দু-চারজন বৃদ্ধ, কয়েকজন মেয়েমানুষ আর একটা বাচ্চাও রয়েছে; তাই দ্রুত পথ চলা যায় না। বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে চলতে হয়। তার ওপরে শীতের বেলা। সন্ধে নামার আগেই ঠাঁই নিতে হবে কোনো বসতির আশেপাশে। পথের রসদ সঙ্গে নিয়েছে তারা। ভাজা ছোলা, চিঁড়ে, মুড়ি আর শক্ত পাকের মণ্ডা। কিন্তু এসব তো পথচলতি খাবার। সকালে বা দুপুরে খাওয়া যায়। তবে রাতের বেলা পেটভরে দুটো ভাত খেয়ে না ঘুমোলে যে পরেরদিন পথ চলাই দায় হয়। তাই বেলা থাকতে থাকতেই কোনো জনবসতির পাশে আস্তানা গেড়ে সঙ্গে আনা কোম্পানির টাকা খরচ করে দোকান থেকে জোগাড় করে আনতে হয় জ্বালানি কাঠ, চাল, ডাল আর আনাজ। তারপর আগুন জ্বেলে দুটো ভাত ফুটিয়ে খেয়ে আগুনের কুণ্ডের ধারে বসে চলে খানিক গানবাজনা। তাতে মনে ফূর্তি আসে, পরের দিনের পথচলার মনের জোরও পাওয়া যায়। শেষমেশ দ্বিতীয় প্রহরের শিয়াল ডেকে উঠলে তারা চাটাই বিছিয়ে কম্বল গায়ে শুয়ে পড়ে আগুনের কুণ্ডের চারপাশে খোলা আকাশের নীচে। মেয়েরা, ছোটো বাচ্চাটা আর বৃদ্ধরা শোয় আগুনের কাছাকাছি। বাইরের দিকের বেড়ে শোয় জোয়ান মদ্দ পুরুষেরা। পাশে রাখা থাকে তাদের লাঠি। এদিকে শনশন করে বয়ে যায় পৌষের কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। রাত ধীরে ধীরে গভীর হতে থাকে আর প্রহরে প্রহরে ডেকে ওঠে শিয়ালের দল। তাদের ডাক শুনলেই লোকবসতির কুকুরগুলো তারস্বরে ডাক ছাড়ে আর তাতেই পুরুষদের কেউ না কেউ ঘুমমাখা চোখে আধা নিভন্ত আগুনে চাট্টি কাঠ ফেলে দেয়। শীতের হাওয়ায় ফুলকি ওঠে আগুন থেকে। তারপর আবার চোখে নেমে আসে ঘুম। সকালে সূয্যির আলো ফুটতে না ফুটতেই প্রাতঃকৃত্য সেরে, খানিক পরেই ফের শুরু হয় পথচলা। তবে তার আগে লোকবসতি থেকে বাচ্চাটার জন্যে দুধ জোগাড় করে আনতে হয়, তাদের বাড়ির কুয়ো বা পুকুর থেকে আনতে হয় খাওয়ার জল। বসতির মানুষজন সানন্দে তা করতে দেয় তাদের। কখনো কখনো কোনো বসতির জোতদার বা অতিসম্পন্ন গেরস্থ বেশকিছু আলু বা চাল দেয় তীর্থযাত্রীদের। তীর্থযাত্রীদের সেবা করাটা তারা পুণ্য বলে মানে। এতে অবশ্য তীর্থযাত্রীদের রাহাখরচও বেশ কিছুটা বাঁচে।

অথচ বছর তেইশ আগেও অবস্থাটা এত নিরাপদ ছিল না তীর্থযাত্রীদের কাছে। এতক্ষণে হয়তো সর্বস্ব লুঠ হয়ে যেত ঠগিদের হাতে আর সেইসঙ্গে যেত প্রাণটাও। তারা ছিল বড়ো নির্মম। সান্নাটা পথে চলা মানুষদের কাছে তারা ছিল মূর্তিমান আতঙ্ক। কত যে মানুষ মারা পড়েছে তাদের হাতে তা গোনা সম্ভব নয়, কারণ অনেক সময়েই তারা লাশ ভাসিয়ে দিত কোনো নদীর জলে আবার কখনো বা ফেলে দিত গভীর জঙ্গলে। সরকারি হিসেব অবশ্য বলছে ১৮৩০ সালে ঠগির দল নিশ্চিহ্ন হওয়ায় আগে দেড়শো বছরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ মরেছে তাদের হাতে। এতটাই সঙ্ঘবদ্ধ, দক্ষ আর শক্তিশালী ছিল তারা যে ছোটোখাটো অপরাধীরা পর্যন্ত তাদের সমীহ করে চলত।

কিন্তু এ তো ১৮৩০ সালের সরকারি হিসেব। ঠগিরা এত শক্তিশালী হল কী করে মাত্র দেড়শো বছরে? তারা তো আর কোনো সরকারি মদতপুষ্ট আধুনিক অস্ত্রধারী সৈন্যদল নয় যে সারা ভারতে ত্রাসের সৃষ্টি করবে?

আসলে ঠগিদের ইতিহাস প্রায় ছ-শো বছরের পুরোনো। সাতটা হতদরিদ্র মুসলিম উপজাতি থেকে তাদের উৎপত্তি হলেও কালের নিয়মে দরিদ্র হিন্দুরাও জড়িয়ে যায় তাদের সঙ্গে। প্রথমদিকে তারা ছোটোছোটো দল হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে এক একজন শক্তিশালী জিম্মেদারের অধীনে তারা এককাট্টা হয়ে এক একটা এলাকায় নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে থাকে। প্রথমদিকে তারা বড়ো রুমালের সাহায্যে বা গামছা দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করত পথিকদের। পরবর্তীকালে তাদের ভাণ্ডারে জমা পড়তে থাকে ঘরে তৈরি নানান অস্ত্র। আর আরও আশ্চর্য ব্যাপার হল এই যে ধীরে ধীরে তাদের আরাধ্যা দেবী হয়ে উঠলেন ‘ভবানী’ তথা ‘কালী’। এই ঠগিদের উপদ্রব এমনই চরমে পৌঁছেছিল যে ইংরেজ সরকার পর্যন্ত বিব্রত বোধ করতে থাকে। তাই ১৮৩০ সালে তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ঠগিদের নির্মূল করার জন্যে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যানকে দায়িত্ব দেন। সেই স্লিম্যানের বাহিনী উপমহাদেশ থেকে ঠগিদের উৎখাত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গ্রেফতার হয় ঠগিদের এক শীর্ষনেতা সইদ আমির আলি। আমির আলিকে রাজসাক্ষী করে আদায় করে নেওয়া হয় আরও ঠগি শীর্ষনেতাদের নাম। আর তারই ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশ থেকে ঠগিরা নির্মূল হয়েছে বলে মনে করা হয়। রাজসাক্ষী হওয়ার কারণে মুক্তি পেয়ে যায় সইদ আমির আলি। তারপর থেকে সরকারের খাতায় ঠগির আক্রমণে প্রাণহানির ঘটনা আর লিপিবদ্ধ নেই।

তারপরে কেটে গেছে পঁচিশটা বছর। কিন্তু সত্যিই কি তারা নেই? এই প্রশ্নের উত্তর দেবে সময়।...

তীর্থযাত্রীর দল এগিয়ে চলেছে। এখনও দিন তিনেকের পথ বাকি। কিন্তু বৃদ্ধ আর মহিলারা সঙ্গে না থাকলে বাকিরা এই পথটুকু দু-দিনে সেরে দিত। তবু শীতের দিন বলে সূর্যের তেজ কম থাকায় পথ চলতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না। খানিক চলার পরে একটা বসতি এল, কিন্তু না থেমে সেটা পেরিয়ে গেল তারা। ঠিক হল যে দুপুরের দিকে যে বসতিটা পড়বে সেখানে তারা স্নানটান সেরে হালকা কিছু খেয়ে একটু জিরিয়ে নেবে। সন্ধে নামার আগে রানাঘাটে পৌঁছতেই হবে।

দু-পাশে দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেতজমি। কোথাও আলুর পাতায় সবুজ আবার কোথাও বা সর্ষেফুলে হলুদ হয়ে আছে। কিন্তু তাদের তো থামলে চলবে না। এমন সময় দূরের মাঠ থেকে হাঁক শোনা যায়। জনা পনেরো মানুষের একটা দল হাত তুলে তাদের ইশারা করছে। দূর থেকে দেখে তো মনে হচ্ছে তীর্থযাত্রীই। তাই তারা একটু দাঁড়িয়ে যায়। দলে ভারী হলে আপদবিপদ চট করে কাছে ঘেঁষে না। তবে আগে দেখে নিতে হবে অতিথিরা কেমন, কারণ এই দলে মহিলারা আছে।

দলটা ক্রমশ এগিয়ে আসতে তারা বুঝতে পারল যে ওই দলেও পাঁচজন মহিলা আছে, তবে কোনো বৃদ্ধ বা বাচ্চাকাচ্চা নেই। যাক, তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এবার অন্তত একটা দিন দলটাকে নজরে রাখতে হবে; তবেই বিশ্বাস করা যাবে পুরোপুরি।

আগত দলটা থেকে প্রশ্ন ভেসে এল— ‘কি গো, কালীঘাট নাকি? তা কোতা থেকে আসা হচ্চে?’

—‘হ্যাঁ। কালীঘাট। আসচি কেষ্টনগর থেকে। তা তোমরা?’

—‘আমরাও কালীঘাট। আসচি হাটচালি আড়ংঘাটা থেকে।’

ক্রমে দলটা মাঠের আলপথ ছেড়ে উঠে এল রাস্তায়। ওই দলের মাতব্বর গোছের একজন প্রৌঢ় বললে— 'ভালোই হল। একসাতে থাকলে বেপদের ঝড়-ঝাপটা সহজেই কাটিয়ে ওটা যায়।'

—'তা বটে। তাইলে এগোনো যাক। সময় নষ্ট করে লাব নেই। আজ রানাঘাটে পৌঁচতেই হবে।'

দুটো দল আগুপিছু করে চলতে থাকে। দু-তিন মাইলের মধ্যেই দেখা যায় দু-দলের মাতব্বরেরা কথা বলতে বলতে আগে আগে চলেছে। মাঝখানে দু-দলের মহিলারাও হেসে হেসে গল্প করতে করতে চলেছে। এতে পথশ্রম যেমন খানিক লাঘব হয়, তেমনি চলার গতিও বাড়ে। এভাবেই কখন যেন অজান্তেই মেশামিশি হয়ে যায় দুটো দলে।

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে সন্ধে। তাই রানাঘাটেরই কাছাকাছি একটা ছোটো বসতির পাশের সবুজ খোলা মাঠে একটা বড়ো গাছের নীচে থামল তারা। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে চূর্ণী নদী। নদীর ওপার কুয়াশায় আর সদ্যনামা সন্ধের আলো-আঁধারীতে আবছা। নতুন দলের চারজনমিলে গাছের ডালে চড়ে সঙ্গে আনা চাদর জুড়ে জুড়ে একটা চাঁদোয়া খাটিয়ে ফেলল। এতে হিম পড়বে কম। দু-দলের বাকিরা মিলে চটপট আলু, আনাজ, তেল, ঘি, ফুলকপি আর চাল জোগাড় করে আনল। সেইসঙ্গে আনল আগুন জ্বালাবার কাঠও।

দু-দলের দুই মাতব্বর একটু দূরে বসে তামাক সেবা করছে। পালা করে হাতবদল হচ্ছে হুঁকো। যারা আগুন জ্বালিয়ে রান্নার তোড়জোড় করছিল তাদের একজন হাঁক পাড়লে— 'হ্যাঁগো কত্তা, কী যেন নাম তোমার?' এটা কেষ্টনগরের মাতব্বরের উদ্দেশ্যে বলা।

জবাব এল— 'রাধামাধব...রাধামাধব চক্কোত্তি। তা কী বলবে বল?'

—'বলি, হাঁড়ি কি আলাদা আলাদা হবে, নাকি একসঙ্গে?'

দুই মাতব্বর কী যেন শলা করলে। তারপরে জবাব এল— 'একসঙ্গেই হোক। তাতে হাতে হাতে তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যাবে।'

প্রথম প্রহরের শিয়াল ডেকে উঠল। ফিরতি জবাব দিল গ্রামের কুকুরেরাও। রান্নার আর খানিক বাকি। আজ খিচুড়ি হচ্ছে পৌষের আনাজ দিয়ে। এদিকে কল্কের আগুন নিভে যাওয়াতে দুই মাতব্বর আবার নতুন করে তামাক সেজে হুঁকো চালাচালি করতে করতে গল্প জমিয়েছে।

রাধামাধব বললে— 'তা আপনার নামটা জানা হলনি যে কত্তা।'

—'এঁজ্ঞে, আমার নাম রতন রায়। গাঁয়ের লোকজন রতন কত্তা বলে ডাকে।'

—'তা আপনাদের কি শুদুই পৌষকালী দেকা হবে? নাকি কারো মানতও আচে?' রাধামাধবের প্রশ্ন।

—'এঁজ্ঞে, আমাদের ওই হারাধনের বেটার গতবচরে মায়ের দয়া হয়েচিল। শইরের কোত্তাও বাদ ছেলোনি। বাঁচার আশা ছেড়েই দেছিল সক্কলে। শেষমেশ মা কালীর কাচে জোড়া পাঁটার মানত করতে তবে রক্কে হয়। তাই এবারে হারাধন যাচ্চে সেই মানত পুন্ন কত্তে। আর বাকিরা সব চলেচে মায়ের দর্শনে। তা আপনাদেরও কি মানত টানত আচে, নাকি এমনি দর্শনে চলেচেন?'

হুঁকোটা হাতবদল করে রাধামাধব বললে— 'আমাদের তো বলি নিষেদ গো কত্তা। তা আমাদেরও ব্যাপারটা পেরায় আপনাদেরই মতো। গেরামের মনুর মা আর সতের পিসি ওলাওটা থেকে বেঁচে উটে মায়ের কাচে মানত করেচিল সোনার বেলপাতা আর মায়ের কপালের টিপ দেবে বলে। তা মেয়েমানুষ বলে কতা। কোতায় কী হাইরে ফেলবে ঠিক নেই। তাই আমার কাচে গচ্চিত রেকেচে সব।'

ফিরতি হুঁকোটা চক্কোত্তির হাতে দিয়ে গম্ভীর মুখে রতন কত্তা বলতে লাগলো— 'পতে পড়বে রঘু ডাকাত, বিশে ডাকাত, চিতে ডাকাত আর মনোহর ডাকাতের দলবলের আড্ডা। তারা নাকি ঢেঁকিশালের ঢেঁকি দে অবস্তাপন্ন গেরস্তের দরজা ভাঙে। রনপা চড়ে, শিঙে ফুঁকে জানান দে ডাকাতি করে। তাই কইচিলাম কী ওইসব জিনিস সাবদানে রাকবেন চক্কোত্তি মশাই। দিনে দিনে পেরোতে হবে ওইসব জঙ্গলের পত।'

—'হ্যাঁ, তা এক্কেরে ঠিক কইচেন কত্তা। দিনে দিনে জায়গাগুলো পেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু দলে ভিড়েচে বুড়ো হাবড়া আর মেয়েছেলের দল। সঙ্গে আবার একটা বাচ্চাও আচে। এদের নিয়ে চলাই তো সমিস্যে। কাউকে তো আর ''নে যাবনি'' কওয়া যায় না। তীত্থদর্শন বলে কতা।'

রাধামাধবের বাড়িয়ে দেওয়া হুঁকোয় দুটো টান মেরে রতন কত্তা বলে— 'নিশ্চিন্তি থাকেন কত্তা। আমরা তো আচিই। সঙ্গে লাটি, বল্লমও আচে। একসঙ্গে থাকলে ডাকাতের দল কিচ্ছুটি করতে পারবেনি।'

—'তাই যেন হয়। জয় মা কালী বিপত্তারিনী। দেকো মা, যেন ঘরের সক্কলকে নে মানে মানে ঘরে ফিত্তে পারি।'

রতন কত্তা হুঁকো ধরা হাত কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বললে— 'জয় মা করালবদনী।'

খানিক পরেই ডাক পড়ল— 'এই, সব্বাই খেতে চলে এসো তাড়াতাড়ি। পেত্থম দিন বলে জোগাড় যন্তর কত্তে এট্টু দেরি হয়ে গেল। কাল থেকে আর হবেনি।'

খেতে বসার পরে দেখা গেল কেষ্টনগরের দল ওই নতুন দলটাকে বিশ্বাস করে ফেলেছে পুরোপুরি।

সদস্য সংখ্যা বেশি বলে দু-জায়গায় আগুন জ্বালানো হয়েছে। একটা চাঁদোয়ার বাইরে। সেখানে শোবে পুরুষের দল। আরেকটা জ্বালানো হয়েছে চাঁদোয়ার নীচে। সেখানে শোবে মেয়েরা। খাওয়াদাওয়ার পরে এবারে খানিক গান-বাজনা চাই। তাই খোল, বাঁশি আর খঞ্জনি নিয়ে কীর্তন ধরল কেষ্টনগরের দল। পুন্যি-যাত্রায় এর চেয়ে ভালো গান আর কী হতে পারে। নতুন দলের সদস্যেরা একটু তফাতে বসে শুনছে সেই গান। কেষ্টনগরের দলের গান শেষ হতে রতন কত্তার দলও ধরলে একটা শ্যামাসংগীত। সকলেরই মন খুশি।

গান শেষ হওয়ার একটু পরেই দ্বিতীয় প্রহরের শিয়ালের দল ডেকে উঠে থেমে গেল। এবারে শুতে যেতে হবে। উঠতে গিয়ে রতন কত্তা বললে— 'সকাল বেলা আর এক পোস্ত শুনতে চাই। সারাদিনের জন্যে মনটা বড়ো ভালো হয়ে যায় গো মাধব কত্তা।' তাই বাজনার যন্তরগুলোকে চাঁদোয়ার নীচে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হল। সকাল বেলায় নামগান সেরে হাতেহাতে গুছিয়ে নিলেই হবে।

আগুনের কাছাকাছি শুয়েছে কেষ্টনগরের পুরুষের দল। একটু তফাতে শোওয়ার তোড়জোড় করছে নতুন দলের বেটাছেলেরা। এমন সময় দেখা গেল নতুন দলের কত্তার

ছেলে নীলকান্ত আর হারাধন গাড়ু হাতে যাচ্ছে নদীর দিকে। রতন কত্তার কড়া নজর এইসব ছেলে ছোকরাদের দিকে। তাই হেঁকে বললে— 'বাহ্যি করে তাড়াতাড়ি ফিরিস।' তারপর 'এত রাত্তিরে কেন যে এদের বাহ্যি পায় কে জানে' বলে গজগজ করতে করতে শুয়ে পড়ল সে। নীলকান্ত আর হারাধন গাড়ু হাতে মিশে গেল নদীর দিকের গাঢ় অন্ধকারে।

পৌষের হাওয়ায় শীতের কুয়াশামাখা অন্ধকারকে বারবার ফুঁড়ে দিচ্ছে আগুনের ফুলকি। খানিক ওপরে উঠেই হাওয়াতেই মিলিয়ে যাচ্ছে সেগুলো। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাধামাধবের ক্লান্ত চোখে নেমে আসে ঘুম। সে তলিয়ে যেতে থাকে ঘুমের গভীর তলে।

হঠাৎই ঝপাস্। একটা বড়ো মাছধরার জালে জড়িয়ে পড়েছে কেষ্টনগরের ঘুমন্ত পুরুষেরা। তাদের ওপর চলছে দমাদ্দম লাঠির বাড়ি আর বল্লমের খোঁচা। মাথা ফেটে যাচ্ছে, হাত-পায়ের হাড় ভাঙছে, বল্লমের ফলা ফুঁড়ে দিচ্ছে কারোর বুক, কারোর পেট। আর্তনাদ উঠছে আকাশ ফাটিয়ে। কিন্তু সে চিৎকার শুনবে কে? একেই তো শীতের রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে খানিক দূরের বসতি আর তার ওপরে নতুন দলের তিন সদস্য খোল, বাঁশি আর খঞ্জনি বাজিয়ে উঁচু গলায় শুরু করেছে শ্যামাসংগীত। সেই আওয়াজে চাপা পড়ে যাচ্ছে আর্তনাদের চিৎকার। ওদিকে রতন কত্তার দলের তিন মহিলা তাদের মাথার তলায় রাখা পুঁটুলি থেকে ছোরা আর দা বের করে শাসিয়ে যাচ্ছে কেষ্টনগরের মহিলাদের যাতে তারা টুঁ শব্দও না করে। অবশ্য এই শাসানিরও দরকার ছিল না। চোখের সামনে এই নৃশংস হত্যালীলা দেখে তারা এমনিতেই থম মেরে গেছে। তাদের দলের পুরুষদের প্রাণবায়ু তাদের চোখের সামনেই আগুনের ফুলকির মতো মিলিয়ে যাচ্ছে রাতের বাতাসে। শুধু তাদের দলের বাচ্চাটা তখনও ঘুমোচ্ছে অকাতরে।

সমস্ত ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছে রতন কত্তা। কেষ্টনগরের কে একজন জাল গলে পালাতে যাচ্ছিল। কিন্তু সজাগ রতন কত্তার হাতের দড়ি সড়াৎ করে এসে পেঁচিয়ে ধরল তার গলা। ছোঁড়ার বিশেষ কায়দায় দড়ির মাথায় বাঁধা ভারী সীসের বল সজোরে আঘাত করল লোকটার মাথার পেছনে। তারপরে এক হ্যাঁচকা টানে তার দেহটা এসে পড়ল প্রায় রতন কত্তার পায়ের কাছে। একটুখানি হাত-পা ছুঁড়ে নিথর হয়ে গেল লোকটা।

কেষ্টনগরের সব পুরুষদের ভবলীলা সাঙ্গ হতে সময় লাগল মাত্র মিনিট দশেক। তারপরে নীলু আর হারু জাল ছাড়িয়ে নিতে নতুন দলের সবাই তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল প্রত্যেকটা পুঁটুলি আর মৃতদেহগুলোর ট্যাঁক। যে যা পেল নিয়ে এসে জমা করল তাদের জিম্মেদার রতন কত্তার কাছে। রতন কত্তা নিজে মাধব কত্তার কোমরে গোঁজা বটুয়া থেকে কাগজে মোড়া সোনার টিপ আর বেলপাতাটা বের করে নিজের ট্যাঁকে গুঁজে রাখল। গ্রামে ফিরে মা কালীর পায়ে সমর্পণ করবে তা। বাকি সব লুঠের মাল একটা গামছায় পুঁটুলি করে বেঁধে নিলো। সবার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হবে সেগুলো কাল সন্ধেবেলা মায়ের মন্দিরের চাতালে।

লুঠপাট শেষ হতে রতন কত্তা বললে— 'এবার লাশগুলো জলদি নদীতে আর জঙ্গলে ফেলে দে আয়। তারপর জিনিসপত্তর গুইছে নে চটপট, তাইলে ভোরের মুকেই ঢুকতে পারব গেরামে।'

কত্তার কথামতো কাজ শেষ হতে হতে গড়িয়ে গেল তৃতীয় প্রহর। তারপরে ফিরতি পথে সদলবলে এগিয়ে চলল রতন কত্তা। সঙ্গে কেষ্টনগরের মহিলারা আর বাচ্চাটাও।

পেছনে পড়ে রইল প্রায় নিভন্ত আগুনের কুণ্ডগুলো আর চূর্ণী নদীর পাড়ে ও জঙ্গলে পড়ে রইল কেষ্টনগরের পুরুষদের লাশ। আসলে কেষ্টনগরের সরল মানুষগুলো জানত না যে, পথের বন্ধুত্ব পথেই শেষ হয়ে যায়।

তবে সেদিন আর চতুর্থ প্রহরে শিয়ালগুলো ডাকেনি। তারা ব্যস্ত ছিল অন্য কাজে যে...।

গ্রামে যখন রতন কত্তার দল পৌঁছল তখন সবে ভোরের আলো ফুটছে। অন্ধকার কাটিয়ে দিয়ে কুয়াশার আড়াল থেকে আরেকটু পরেই উঁকি দেবেন সূয্যিদেব। আলোয় ভরে যাবে চারিদিক। দলের সঙ্গে আসা কেষ্টনগরের মহিলারা তখনও ফোঁপাচ্ছে। রতন কত্তার দলের তিন মহিলা তাদের ধরে ধরে নিয়ে আসছে।

দলটা গিয়ে থামল সোজা মা কালীর থানে। দলের পুরুষেরা ওই ঠান্ডার মধ্যেও পাশের পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এল। ভিজে কাপড়েই রতন কত্তা প্রতিমার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মূর্তির পায়ে অর্পণ করলে সেই সোনার বেলপাতাটা। তারপর উঠে টিপটা প্রতিমার কপালে লাগিয়ে দিয়ে দু-হাত জোড় করে বিড়বিড় করে বললে—'অপরাদ নিসনি মা। তোর বেলপাতা আর টিপ তোকেই দিলাম। তুই তো জানিস মা আমাদের দু-বেলা ঠিকমতো ভাত জোটে না। সেচের অভাবে জমিতে ফসল হয় না। তোর এই গরিব ছেলে-মেয়েরা শুধু পেটের দায়েই অপরাদ করে। আমাদের তুই ক্ষমা করিস মা।' তারপরে দলের দিকে ফিরে আদেশ দিলে— 'এই মহিলাদের এক একজন আমাদের এক একজনের ঘরে ঠাঁই পাবে। তাদের সম্মান দিয়ে শিকিয়ে পড়িয়ে আমাদের যুগ্যি করে তোলার দায়িত্ব তোমাদের। তোমরা সে কতা জানো। তবু একবার স্মরণ কইরে দিলাম।'

হঠাৎই রতন কত্তার চোখ পড়ে যায় এক যুবতী বিধবার দিকে। তার সাথে এক শ্যামলা রঙের বছর দুয়েকের ছেলে। মায়ের আঁচল ধরে তার কোলটি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। একটুক্ষণ কী যেন ভাবে রতন কত্তা। তারপর হাঁক দেয়— 'নীলকান্ত ইদিকে আয় দিকি।' নীলকান্ত ভেজা কাপড়ে উঠে আসে মায়ের মন্দিরের চাতালে। তারপরে কত্তা নিজেদেরই এক মহিলাকে বললে— 'যাও, ওই মেয়েকে নে গে একটা ডুব দে আনোগে দেকি।' সেই মহিলা ওই বিধবাকে নিয়ে গিয়ে পুকুরঘাটে একটা ডুব দিইয়ে নিয়ে হাজির করায় মন্দিরে, রতন কত্তার কাছে। তখন রতন কত্তা সেই যুবতী বিধবাকে বলে— 'মা, তুমি বেধবা। তার ওপরে তোমার সন্তান আচে। এই গেরামের কেউ তোমাকে তাদের ঘরে ঠাঁই দেবেনি। তাতে তোমার কষ্টের সীমা থাকবে না মাগো। তাই বলি কী, তোমার একজনকে দরকার, যে তোমাকে আর তোমার সন্তানকে আপদে-বেপদে রক্কে করবে। তোমাদের যত্নআত্তি করবে, ভালোবাসবে।' একটু থেমে কত্তা আবার ধীরে ধীরে বলতে থাকে— 'তা তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমার ছেলে নীলকান্ত তোমায় ঠাঁই দিতে পারে ইস্তিরির মতো। ওর অ্যাকোনো বে হয়নি। এবারে ভেবেচিন্তে কও তো মা, তুমি কি রাজি?'

বিধবা মহিলা ফ্যালফ্যাল করে একবার তাকায় নীলকান্তর দিকে আর একবার তাকায় রতন কত্তার দিকে। তারপরই আঁচলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ওঠে। বিধবা হওয়ার কারণে শ্বশুরবাড়ির লাঞ্ছনা, বাপের বাড়িতে এসে থাকার সময় ভাই আর তাদের বউদের খোঁটা, সব কিছু তোলপাড় করে দেয় তার ভেতরটাকে। তার আর তার ছেলের কি ভবিষ্যৎ; তা সে নিজেই জানে না। তাই উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ করে থাকে সে।

—'কি মা, কইলে না তো তোমার কি মত?'

যুবতী এবার মুখ নীচু করে। ভাবে, তার তো আর হারাবার কিছুই নেই। সবাইকে হারিয়ে কেষ্টনগরেও আর ফেরা যাবে না। এখন ছেলেটাকে বড়ো করা দরকার। আর তা ছাড়া কতদিন যে হয়ে গেল স্বামীসঙ্গসুখ...।

আস্তে আস্তে মুখ তুলে সে এবারে তাকায় নীলকান্তর দিকে। শ্যামলা গায়ের রং, সুঠাম দেহ নীলকান্তর। মুখটাও মোটের ওপর বেশ সুন্দর। নতুন সূর্য্যের রাঙা আলোয় চিকচিক করছে নীলকান্তর দরাজ বুকের পাটার ওপরে লেগে থাকা জলের ফোঁটাগুলো। ভারি সুন্দর লাগছে তাকে। তাই ভালোলাগার নতুন লজ্জায় মুখ নীচু করে যুবতী। তারপর আস্তে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায়।

—'তোমার নাম কী মা?'

—‘শ্যামাঙ্গিনী।’

শুনেই চমকে ওঠে রতন কত্তা। আজ থেকে তবে কি কৃষ্ণ আর কালী যুগলমূর্তিতে বিরাজ করবে এই হতদরিদ্র গ্রামে? একবার আকুতিভরা চোখে কালীমূর্তির দিকে তাকায় সে। তারপরে নীলকান্তকে বলে— ‘নীলু, মায়ের ঘটের সিঁদুর পইরে দাও শ্যামাঙ্গিনীকে।’

নীলকান্ত বুড়ো আঙুলে করে দেবীমূর্তির ঘট থেকে সিঁদুর নিয়ে রাঙিয়ে দেয় শ্যামাঙ্গিনীর সিঁথি। গ্রামের মহিলারা উলু দিতে থাকে আর পুরুষেরা তাদের হাতের লাঠি উঁচিয়ে দাপিয়ে বলে ওঠে— ‘জয় মা ভবানী, জয় মা করালবদনী।’

সবাই থামলে পরে রতন কত্তা বলে— ‘নীলকান্ত আর শ্যামাঙ্গিনী, আজ থেকে তোমরা এই গাঁয়ে আমারই বাড়িতে থাকবে সোয়ামী-ইস্তিরির মতো। আর তোমাদের এই সন্তানের আগের নাম যাইই হোক না কেন, আজ থেকে সবাই তাকে নিশিকান্ত নামেই ডাকবে। এর অন্যতা যেন না হয়। আর সব্বাই শুনে রাকো, এই ছেলের মোদ্দে শ্যামা আর কৃষ্ণ যুগলে বিরাজ করবেন। তাই তোমাদের সকলের শেকা সেরা বিদ্যে একে দেবে। আমার পরে এইই হবে এই গেরামের রক্কেকত্তা। এ আমার হুকুম। সব্বার মনে থাকে যেন।’

এই কথা বলে নিশিকান্তকে বুকে তুলে নেয় রতন কত্তা। ততোক্ষণে সূয্যি অনেকটাই উঠে গেছে।

তাহলে কি আর এক ঠগি জিম্মেদারের বীজ বোনা হয়ে গেল নিশিকান্তের মধ্যে?

আবার ১৯৪৩

নিশিকান্তের গুপ্তধন, গোখরোর ফণা আর শব্দভেদ

সুরেশ কাকার রেখে যাওয়া খাবার খেয়ে রজনী তার আখড়ার চারপাশে পায়চারি করে খানিকক্ষণ। এটা খাবার ভালো করে হজম হতে সাহায্য করে। তারপর ঘরে ঢুকে মশারি খাটিয়ে টানটান হয়ে শোয় বিছানায়। কিন্তু মনের মধ্যে একটা খচখচানি। তাই লণ্ঠনের আলোটাও কমাতে ভুলে গেছে সে। সেদিকে তাকাতেই হঠাৎ নজর পড়ে দেওয়ালে। সেখানে সারি সারি বাঁধানো ফটো— বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি সুভাষের পাশাপাশি ঠাঁই হয়েছে রজনীর বাবা-মায়ের আর দাদু নিশিকান্তের বাঁধানো ছবি।

দাদুর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কত পুরোনো কথা মনে পড়ে রজনীর। দাদুর একান্ত নিজের সবকিছু রাখা আছে একটা শক্তপোক্ত লোহার তোরঙ্গে। না, না, দাদু চোর বা ডাকাত ছিল না কখনো। চুরি বা ডাকাতি করেওনি কোনোদিন; তবু রজনীর বাবা মা বেঁচে থাকতে সেসব বাড়িতে রাখতে চায়নি দাদু। পুঁতে রেখেছিল নদীপারের জঙ্গলের সেই অর্জুন গাছটার কাছে একটা মস্ত উইঢিবির পাশে। শুধু বুমেরাংটা রাখতে দিয়েছিল রজনীকে। সেটা দিয়ে শুধু দিনের আলোতে নয়, রাতের অন্ধকারেও শব্দভেদ প্র্যাকটিস করত রজনী। দিনের বেলা গাছের আম, পেঁপে, নারকোল পেড়ে হাত মকশো করত আর রাতের বেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে দাদু তাকে চুপিচুপি ডেকে নিয়ে যেত দামোদরের চরে, চোরাবালি এড়িয়ে। সেখানে গিয়ে দাদু বিভিন্ন জায়গায় সরে সরে গিয়ে এক একবার এক

একরকম পশুপাখির ডাক নকল করে ডাকত আর কালো কাপড় দিয়ে চোখবাঁধা রজনীকে সেই ডাক শুনে শুনে ছুঁড়তে হত হাতের বুমেরাং। প্রথম প্রথম টার্গেট ফসকাত। কিন্তু নাছোড়বান্দা দাদু নিশিকান্ত। নাতিকে শিখিয়েই ছাড়বে শব্দভেদী বুমেরাং ছোঁড়া। বারবার ছুঁড়তে ছুঁড়তে আর অস্ত্রটা কুড়িয়ে আনতে আনতে হাঁফ ধরে যেত রজনীর। সে থামতে চাইত। কিন্তু দাদু যখন ওই অন্ধকারে তার চোখে বাঁধা কাপড় খুলে দিয়ে তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত, তখন আপনা থেকেই আবার অস্ত্রটা হাতে তুলে নিত রজনী। প্রখর সম্মোহন ছিল সে দৃষ্টিতে। তাই আবারও শুরু হত প্র্যাকটিস। এইভাবে দিনে রাতে প্র্যাকটিস করতে করতে অস্ত্রটায় দক্ষ হতে সময় লেগেছিল প্রায় ছ-মাস।

তবে এই ছ-মাসে আরও একটা বাড়তি লাভ হয়েছিল তার। কান পেতে শুনে শুনে সে খুব ভালো করে রপ্ত করে ফেলেছিল নানান পশুপাখির ডাক; এমনকী আরও অনেক কিছু। এইভাবে বেশ কিছুদিনে সে হয়ে উঠেছিল পাক্কা হরবোলা। এ ব্যাপারে তার দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। তার দাদুও এত ভালো এসব পারত না। সেকারণেই দাদু একদিন তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল— 'বন্দুবান্দবেরা যদি কেউ বুমেরাং ছোঁড়া শিকতে চায়, তবে তাদের তুমি তা শেকাতে পার। আমার বুমেরাংটা তুমি তো ব্যাভার কোরচোই। আর তেমন হলে আমি না-হয় ছুতোরবাড়ি থেকে মেওগনি কাটের একটা নতুন অস্তর বানিয়ে দেব তোমায়। কিন্তু এই হরবোলার ডাক তুমি কারোর সামনে ডাকবেনি আর কাউকে শেকাবেওনি। এটাকে তোমার একটা গুপ্ত অস্তর করে রেকো। আর একটা কতা বলি শোনো— তুমি কিন্তু গুরুমারা বিদ্যেও শিকে ফেলেচ। আর এই গুরুর ঘরানাটা পারলে ধরে রেখো।'

দাদুর সেই কথা রেখেছে রজনী। তবে তার আরও গুপ্ত অস্ত্রের কথা জানে না গ্রামের কেউই। তারা শুধু জানে যে রজনী তাইকোন্ডো জানে আর বুমেরাং ছুঁড়তে জানে।

না, ঘুম আসছে না রজনীর। তাই বিছানা থেকে নেমে একটা ফুলহাতা কালো গেঞ্জি আর কালো হাফ-প্যান্ট পরে নেয় সে। লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দিয়ে, বুমেরাংটা নিয়ে বেরিয়ে দরজায় তালা লাগায়। আর তারপর পা বাড়ায় নদীর চরের দিকে।

জঙ্গলে পৌঁছে মাঝে মাঝে শিয়াল, প্যাঁচা আর ধনেশ পাখির ডাক ডাকতে ডাকতে এগিয়ে চলে অর্জুন গাছটার দিকে। তারাও কেউ কেউ সাড়া দেয় সেই ডাকে আর মাঝে মাঝে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ঠাহর করতে চেষ্টা করে জঙ্গলে অন্য মানুষ ঢুকেছে কিনা। অনেক সময়ে চোরা শিকারিরা জঙ্গলে ঢোকে শজারু, ধনেশ বা প্যাঁচা ধরতে। তারা রাতের বেলা ফাঁদ পেতে যায় আর পরেরদিন সান্নাটা দুপুরে জঙ্গলে ঢোকে সেই ফাঁদে কিছু পড়ল কি না দেখতে। ধরা পড়া বনের প্রাণীগুলোকে চোরাপথে শহরের বড়োলোকদের বাড়িতে পৌঁছে দেয় তারা। ভালোই দাম পায় আর তাতেই সেজে ওঠে অবস্থাপন্ন ভদ্র মানুষদের বাড়ির শখের চিড়িয়াখানা। তবে ফাঁদ পাততে যারা আসে তারা টর্চ নিয়ে আসে আর সেই আলো থাকলে তা চোখে পড়বেই রজনীর। নাঃ, এখন সেরকম কিছু নেই। তাই আবার সে চলতে শুরু করে আর একসময় পৌঁছেও যায় সেই অর্জুন গাছটার কাছে উইটিবিটার পাশে। তারপরে বুমেরাং এর একটা মাথা দিয়ে খুঁড়তে থাকে মাটি। হাতখানেক খুঁড়তেই হদিশ মেলে নিশিকান্তর তোরঙ্গের। সাবধানে তুলে একপাশে সেটা রেখে মাটি দিয়ে ভালো করে বুজিয়ে দেয় গর্তটা। শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে দেয় জায়গাটা। তারপরে ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ে মোড়া তোরঙ্গটা খুলতেই কর্পূরের ঝাঁঝ লাগে নাকে। পাছে পোকা বা পিঁপড়ে ঢুকে কেটে না দেয় ভেতরের জিনিস, তাই দাদুর কথামতো মাস ছয়েক বাদে বাদেই তোরঙ্গে কর্পূর দিয়ে যেত রজনী। তোরঙ্গ তোলা হয়ে গেছে, এবার সেটা নিয়ে

জঙ্গল থেকে বেরোনোর পালা। এতদিন পরে দাদুর ব্যবহার করা একটা জিনিস নিজের কাছে রাখবে সে। দাদুর স্মৃতি হিসেবে। কিন্তু বেরোনোর পথেই বিপত্তি।

হঠাৎ হিসহিসানির আওয়াজ সামনে। চক্রের মাথায় সাদা ছিটে ছিটে দাগ দেখেই রজনী বুঝতে পেরেছে যে সেটা একটা গোখরো। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে, যদি সাপটা নিজে থেকেই চলে যায়। কিন্তু না, মিনিট তিনেক পরেও সাপটা নড়ে না। খালি হিস্-হিস্ শব্দ করতেই থাকে। এই হিসহিসানির অর্থ হল এই যে— রজনী সাপটার নিজস্ব এলাকায় ঢুকে পড়েছে। এখন সাপটাকে না সরালে সে এগোতে পারবে না। তাই সে পাশের গাছ থেকে ছ-ফুটের মতো একটা ডাল ভেঙে নেয়, আর তারপর সেই ডালটা দিয়ে সাপটাকে তুলে ছুঁড়ে দেয় একটু দূরের ঝোপে। তবে গাছের ডালটা হাতছাড়া করে না সে।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চরের চোরাবালি পেরিয়ে নদীর মাঝামাঝি একটা শক্ত জায়গায় আসে। তোরঙ্গ আর বুমেরাং নামিয়ে রেখে হাতের ডালটা বেশ শক্ত করে পুঁতে দেয় প্রায় পঁচিশ ফুট দূরের বালিতে। তারপর পিছিয়ে এসে হাতে তুলে নেয় বুমেরাং। ঠিকঠাক তাক করে ছুঁড়ে দেয় হাতের অস্ত্র। হাওয়া কেটে পাক খেতে খেতে উড়ে যায় সেটা। বোধ হয় দু-সেকেন্ড। তারপরই খটাস শব্দ। মেহগনি কাঠের বুমেরাং ঠিক গিয়ে লেগেছে গাছের ডালটায়। দৌড়ে গিয়ে সেটাকে কুড়িয়ে এনে আবার ছোঁড়ে অস্ত্রটা। একবার, দু-বার, বারবার। আর প্রতিবারেই টার্গেটে গিয়ে লাগে বুমেরাং।... হ্যাঁ, পেরেছে সে। অনেকদিন পরে হলেও অন্ধকারে লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছে সে। তাই তৃপ্তিতে বুকভরে শ্বাস নেয় রজনী। তারপর জিনিসপত্র গুছিয়ে, তোরঙ্গ বগলে বাড়ির পথ ধরে। রাত অনেক হয়েছে। কাল আবার রবিবার। সে ঠিক করেছে কাল ছেলেদের বুমেরাং ছোঁড়া শেখাবে। আর এখন আগের খচখচানিটা কেটে গিয়ে মনটাও শান্ত হয়েছে সাফল্যের খুশিতে। আরও ভালো লাগছে দাদুর লুকোনো তোরঙ্গটা কাছে রাখতে পেরে। এবারে দরকার শুধু ঘুমের।

১৮৮৪, মার্চ

নরেন, বুকে হাতি তোলা আর নিশিকান্তের বুমেরাং

১৮৮৪ সালের এক বসন্ত-বিকেল। সদ্য গত গ্রীষ্মে প্রয়াত হয়েছেন বাবা বিশ্বনাথ দত্ত। বাড়িতে চরম অর্থসংকট। তাই বিএ পাশ করেও শান্তি নেই নরেনের মনে। দু-দিন আগেই সে গিয়েছিল প্রকাশকের কাছে। তার বাবার লেখা উপন্যাস 'সুলোচনা'র বিক্রিবাটা থেকে যদি কিছু অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু বইটার তেমন বিক্রি নেই বলে তাকে খালিহাতেই ফিরতে হয়েছিল। তাই তার বিচলিত মন খুঁজছে সমাধান— একদিকে অর্থসংকটের মোকাবিলা করা আর অন্যদিকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তার অন্তরের প্রশ্নের সমাধান। কোনদিকে যাবে সে? এদিকে কেশবচন্দ্র সেনও মারা গেলেন বাবার মৃত্যুর ক-দিন পরেই। অন্তরের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তাই নরেন দেখা করে ব্রাহ্মসমাজের শিরোমণি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে। তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করে— 'আপনি ঈশ্বর দেখেছেন?' কিন্তু সদুত্তর দিতে পারেন না স্বয়ং মহর্ষিও। একই প্রশ্ন সে আগেও করেছে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আর

সাধু-সন্তদের কাছেও। কিন্তু সবাই তাকে হতাশ করেছে। তবু নরেনের যে তার প্রশ্নের উত্তর চাই। সংসারের দারিদ্র্যের ভাবনাকেও ছাপিয়ে তার অন্তর খুঁজে ফেরে ঈশ্বরের সত্ত্বা। সে দেখতে চায় ঈশ্বর কেমন। তাই সে সিমলে থেকে ছুটে যায় দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের পূজারি গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি তাকে বড়ো স্নেহ করেন। তাকে কাছে বসিয়ে ভালোমন্দ খাইয়ে বড়ো আনন্দ পান তিনি। নরেন ক-দিন না এলে তাঁর ভেতরটা কেমন যেন আনচান করে। একে ওকে জিজ্ঞেস করেন নরেনের কথা। অবশ্য নরেনেরও একই অবস্থা। ওই অক্ষরজ্ঞানহীন, সরল, গেঁয়ো পূজারির কাছে না গেলে তারও ভালো লাগে না।

অনেকবার সে তাঁকে প্রশ্ন করেছে যে উনি ঈশ্বরকে দেখেছেন কি না। তার উত্তরে ওই ব্রাহ্মণ স্নেহমাখা মিটিমিটি হেসে খাবারের থালা তার কোলের দিকে আরও ঠেলে দিয়ে বলেছেন— ‘ওরে, খা খা। ওসব ভারী ভারী কথা পরে হবে খন।’ তবুও উত্তর পায়নি সে।

গত পাঁচদিন নরেন দক্ষিণেশ্বরে যায়নি অভিমানে। বাড়ির বিশাল উঠোনের পাশে একটা ঘরে নিজেকে বন্দি রেখে একনাগাড়ে ধ্যান করেছে সে। খুঁজেছে ঈশ্বরকে। অবসন্ন হয়ে পড়েছে, তবু ঈশ্বর ধরা দেননি তাকে। বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত সে মনে। তাই সে ঠিক করেছে এখন মনটাকে একটু হালকা করতে হবে। অবসন্ন মন হদিশ দিতে পারে না সঠিক পথের। আনমনে তাই সে বিডন স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে থাকে, যদি স্টার থিয়েটারে আসা রামকৃষ্ণের আরেক শিষ্য জিসির মানে গিরীশ চন্দ্র ঘোষের দেখা পাওয়া যায়। লোকটা মদ্যপ হলে কী হবে, বাংলা নাটকে তাঁর মতো প্রতিভা বিরল। একইসঙ্গে সুন্দর তাঁর রসবোধ। আর জিসির নাটক রচনা করার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করাও এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। উনি ঘরময় পায়চারি করতে করতে উদাত্ত স্বরে এক একটা চরিত্রের সংলাপ মুখে মুখে অভিনয় করার মতো করে বলে যান আর তাঁর সেক্রেটারি দেবেন মজুমদার পেন্সিলে লিখে যান সেই সংলাপ। নরেন দেখেছে সেসব। এখন যেমন জিসি ‘চৈতন্যলীলা’ লেখার কাজে ব্যস্ত। আর আড্ডায়? সেখানেই টের পাওয়া যায় বিশ্বসাহিত্যে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা। নরেনের খুবই ভালো লাগে তা, তবে তার অপছন্দ শুধু জিসির ওই মদ খাওয়াটা।

কিন্তু হঠাৎই তার কানে ভেসে আসে চোঙা ফোঁকার আওয়াজ। আজ নাকি বিকেলবেলায় অম্বিকাচরণ গুহ তাঁর হাতিবাগানের আখড়ায় বুকের ওপর হাতি তুলবেন, দাঁত দিয়ে থামিয়ে রাখবেন মোটরগাড়ির গতি। একসময় এই অম্বুবাবুর আখড়ায় নিয়মিত কুস্তি আর বক্সিং করতে যেত নরেন। সেখানেই তার দেহচর্চার হাতেখড়ি। তাই গুরুর এহেন তাক লাগানো কাজকর্ম দেখতেই হবে তাকে। আর তাই সে এগিয়ে চলে হাতিবাগানের দিকে।

গ্রামে যাত্রা হবে। যদিও শীতকালে যাত্রা, তবুও এখন থেকে বায়না না করলে নিজেদের পছন্দমতো দিনে যাত্রাদলকে পাওয়া দুষ্কর। তাই তালুকের জমিদার মশাইয়ের প্রতিনিধি গোমস্তা সমররঞ্জনের সঙ্গী হয়ে নিশিকান্তর কলকাতার চিৎপুরের নটকোম্পানিতে আসা। সমরবাবুর কাছে বায়নার টাকা আছে যে। তা হাতে লাঠি নিয়ে তো আর কলকাতায় আসা যায় না। তাতে মান থাকে না। তাই নিশিকান্তর হাতে ঝোলানো চটের ব্যাগে রাখা আছে তার বুমেরাংটা।

এই নিশিকান্তকে জমিদার রণবিজয় বর্মণ ভালোবাসেন খুব, বিশ্বাসও করেন। সে এখন একত্রিশ বছরের জোয়ান। যদিও এখনও বিয়ে-থা করেনি। তবু তারই অনুরোধে তিনি তার গ্রামের জন্যে বেশ কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি দিয়েছেন চাষবাস করে খাওয়ার জন্যে। শুধু জমিদারের বিপদে-আপদে লাঠি ধরতে হয় তাদের গ্রামের মরদদের। এই বড়োমনের মানুষটার জন্যেই নিশিকান্তর গ্রামের মানুষেরা এখন আর লুঠপাট করে না, নরহত্যাও করে না।

তা বায়নার টাকা মিটিয়ে রাস্তায় নামতেই কানে এল অম্বিকাচরণের আখড়ার চোঙা ফোঁকার আওয়াজ। সমরবাবু বললেন— 'কি হে নিশিকান্ত, যাবে নাকি দেখতে? বায়না তো হয়েই গেল। শ্যালদা থেকে আটটার ট্রেনটা ধরলেই হবে।'

নিশিকান্তর মনেও কৌতূহল জমে উঠেছিল। বুকের ওপরে হাতি উঠলে যে পিষে মরে যাবে মানুষটা। এত শক্তপোক্ত শরীর কি মানুষের হয়? তাই সে বললে— 'চলুন না কত্তা, দেকেই আসি কাণ্ডকারকানা।'

হাতিবাগানের দিকে যেতে যেতে সমরবাবু বললেন— 'বুঝলে বাপু নিশিকান্ত, বড়ো আজব শহর এই কলকাতা। এখানে পথে পথে রঙ্গ তামাশা।'

—'হ্যাঁ, তাই তো দেকচি কত্তা।'

হাতিবাগানের আখড়ার কাছে লোকে লোকারণ্য। পাশের রাস্তা ঠেলাগাড়ি, হাতেটানা রিকশা, মোটরগাড়ি আর জুড়িগাড়িতে ঠাসাঠাসি। তারই মধ্যে একপাশে রাখা একটা হাতি। মাঠে ব্যায়ামাগারের দিকটায় মঞ্চ বাঁধা হয়েছে। সেখানে বসে আছেন কলকাতা আর আশেপাশের জেলার মান্যিগণ্যি মানুষেরা। তাঁদের মধ্যমণি বর্ধমানের রাজা আফতাব চাঁদ মেহতাব। বক্তৃতা-টক্তৃতা মনে হয় আগেই হয়ে গেছে, কারণ পাশের টেবিলে ফুলের স্তবক আর মালার গোছা ডাঁই করে রাখা। মাঠের একধারে দাঁড়িয়ে একটা মোটরগাড়ি। আষ্ঠেপৃষ্ঠে ভালো করে মোটা কাছি দিয়ে বাঁধা। গাড়ির দু-পাশ দিয়ে টানা সেই দড়ি প্রায় বিশ-বাইশ হাত দূরে শেষ হয়েছে গাড়ির পিছনদিকে। সেখানে দুটো দড়ির সাথে একটা লোহার আংটা সাদা কাপড় দিয়ে ভালো করে জড়ানো।

ভিড় ঠেলেঠুলে সমররঞ্জন আর নিশিকান্ত সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ভালো করে দেখবে বলে।

মঞ্চ থেকে একজন চোঙা ফুঁকে বললে— 'এবার আপনাদের সামনে দাঁত দিয়ে ওই মোটরগাড়ি থামিয়ে রাখার খেলা দেখাতে আসছেন এই আখড়ার প্রধান গুরু শ্রী অম্বিকাচরণ গুহ, যিনি আপনাদের কারোর কাছে অম্বুবাবু, আবার কারোর কাছে বা রাজাবাবু নামে পরিচিত। দর্শকদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে, এই খেলার জন্যে শারীরিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত মনঃসংযোগের প্রয়োজন হয়। তাই এই ক্রীড়াকৌশল চলাকালীন তাঁদের শান্ত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।... আসুন, আমরা সবাই স্বাগত জানাই আমাদের আখড়ার প্রাণ, প্রধান পুরুষ শ্রী অম্বিকাচরণ গুহকে।'

সাদা হাফহাতা ফতুয়া আর সায়েবদের মতো সাদা হাফপ্যান্ট পরে অম্বিকাচরণ এলেন মঞ্চে। তাঁকে মালা পরিয়ে দিলেন বর্ধমানের মহারাজা বৃদ্ধ আফতাব চাঁদ মোহতাব। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। দু-হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে অম্বিকাচরণ নেমে এলেন মাঠে। তাঁর খালি পা। দড়ির প্রান্তে এসে টানটান হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর ভাই ক্ষেত্রচরণ (নামটা অবশ্য দর্শকদের ফিসফিসানি থেকেই জানল নিশিকান্ত) দাদার হাতে তুলে দিলেন কাপড়ে মোড়া

লোহার আংটাটা। গাড়িতে একজন ড্রাইভার চড়ে বসল। স্টার্ট দিল ইঞ্জিনে। সামনে একটুখানি ঝটকা মেরে সে বুঝিয়ে দিল যে গাড়িটা সচল। অম্বিকাচরণ চোখ বুজে আধমিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরে দাঁতে কামড়ে ধরলেন কাপড়ে মোড়া আংটা। ক্ষেত্রচরণের ইশারায় ইঞ্জিনের গর্জন তুলে সামনে এগিয়ে যেতে চাইল গাড়ি আর অম্বিকাচরণ দু-দিকে হাত ছড়িয়ে পেছনে শরীরের ঊর্দ্ধাংশ হেলিয়ে বাধা দিতে লাগলেন গাড়িটাকে। খালি পা গেড়ে বসেছে মাটিতে। চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে এখুনি। হাতের, পায়ের, গায়ের, গলার সমস্ত শিরা ফুলে উঠেছে। দর্শকরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে তাদের রাজাবাবুর কীর্তি আর ভাবছে— কী অমানুষিক গায়ের জোর লোকটার। এইভাবে ঠিক এক মিনিট চলার পরেই ক্ষেত্রচরণের ইশারায় বন্ধ হল গাড়ির ইঞ্জিন। সেটা এগোয়নি একটুকুও। তারপরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অম্বিকাচরণ দাঁত থেকে ছেড়ে দিলেন আংটাটা। টানটান উত্তেজনা থেকে রেহাই পেয়ে মুগ্ধ জনতা হাততালি দিয়ে উঠল। 'সাবাশ, রাজাবাবু সাবাশ', 'ভারতমাতার মহান সন্তান রাজাবাবু কী জয়' ধ্বনিতে ভরে গেল আখড়ার মাঠ। মঞ্চে বসা মান্যিগণ্যি মানুষেরা পর্যন্ত হাততালি দিয়ে উঠলেন। উদ্বেলিত জনতার দিকে হাত নেড়ে অম্বুবাবু এক গ্লাস জল খেয়ে মঞ্চে গিয়ে বসলেন।

এবারে মঞ্চ থেকে ঘোষণা শুরু হল— 'বাঙালি আজ শরীরচর্চা করে না, অথচ তারা রোয়াকে বসে হয় গুলতানি করে নয়তো তাস-পাশা খেলে সময় নষ্ট করে। বাঙালি ভুলে গেছে যে একজন সুস্থ-সবল নাগরিক দেশের সম্পদ, দেশের ভবিষ্যৎ। সাধারণ মাছ-ভাত খেয়েও যে কতখানি শক্তিশালী হওয়া যায় তা আজ দেখিয়ে দিলেন আমাদের পরমপূজ্য গুরুদেব শ্রী অম্বিকাচরণ গুহ। তাই সুস্থ-সবল নাগরিক গড়তে তিনি স্থাপন করেছেন এই আখড়া যাতে বাঙালি ছেলেরাও কালাপানির ওপারের দেশের মানুষজনের মতো শক্তিমান হয়ে ওঠে। যাইহোক, আর কথা বাড়াবো না। এবারে দেখুন গুরুদেবের আরও শক্তিমত্তার পরিচয়। যে হাতির ভারে মানুষ ছাতু হয়ে যায়, সেই হাতিকে উনি তুলবেন বুকের ওপরে।... হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। বুকে হাতি তুলবেন আমাদের গুরুদেব। আপনারা শুধু দেখুন, একজন বাঙালির অবিশ্বাস্য শক্তির প্রদর্শন।'

ইতিমধ্যে ক্ষেত্রচরণের তদারকিতে আখড়ার মাঠের মাঝখানে রাখা হয়েছে মোটা গদি। মঞ্চ থেকে নেমে তাতে শুয়ে পড়লেন অম্বিকাচরণ। বুকের ওপর আরেকটা গদি বিছিয়ে তার ওপরে রাখা হল একটা মোটা কাঠের পাটাতন। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় জনতা চুপ। একজন মাহুত নিয়ে এল হাতিটাকে। মাহুতের ইঙ্গিতে ধীরে ধীরে হাতিটা তার সামনের দু-পা রাখল তার সামনের পাটাতনের প্রান্তে। পাটাটার সেদিকটা স্পর্শ করল মাটি। তারপরে মাহুতের ইশারায় হাতি একটা পা রাখলে পাটাতনের অপর প্রান্তে। সামনের অপর পা-টাও তুলে নিয়ে রাখলে সেখানে। পাটাতনের সেদিকটা তখন মাটি ছুঁল। হাতি এবারে তার সামনের দু-পা ওদিকের মাটিতে নামিয়ে পেছনের দু-পা ধীরে ধীরে তুলে দিল পাটাতনের প্রথম প্রান্তে। একইভাবে এগিয়ে পেছনের একটা পা রাখলে দ্বিতীয় প্রান্তে আর পরক্ষণেই তার পেছনের অপর পা-টা রাখল সেখানে। তারপরে মাহুতের ইশারায় হাতি নেমে দাঁড়াল মাটিতে।

ক্ষেত্রচরণের দলবল তাড়াতাড়ি এসে সরিয়ে নিলো অম্বিকাচরণের বুকের ওপরে রাখা পাটাতন আর গদি। অম্বিকাচরণ উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে চারপাশের দর্শকদের নমস্কার জানাতে লাগলেন। আর এহেন বিস্ময়দৃশ্য দেখে উদ্বেল জনতা হাততালি আর জয়ধ্বনিতে মাতিয়ে তুলল আখড়ার মাঠ। শুধু নিশিকান্তর মনে হতে লাগল যে, কোথায় যেন একটা কৌশল আছে এই খেলায়, যাতে নাকি হাতির পুরো ওজন কখনোই শরীরে না পড়ে। হাতি তোলার দৃশ্যটা একটু তলিয়ে ভাবতেই তার কাছে ধরা দিল কৌশলটা।

অম্বিকাচরণ উঠে গেলেন মঞ্চে। চোঙা হাতে নিয়ে বলতে শুরু করলেন— 'আজ আপনারা যা দেখলেন তা আমার দীর্ঘদিনের শরীরচর্চার ফল। এর জন্যে বিশেষ খাবারের দরকার নেই। আপনারা রোজ যা খান, তাই দিয়েই গড়া যায় শরীর। আমাদের আখড়ার উদ্দেশ্যও তাই। সেজন্যেই আপনাদের সকলকে আহ্বান করছি শরীরচর্চা করতে। আমরা চাই একটা সর্ব অর্থে শক্তিশালী জাতি গড়ে উঠুক আমাদের বাংলায়। তাই আমাদের আখড়ায় শরীরচর্চার পাশাপাশি কুস্তি, বক্সিং, লাঠিখেলা আর তরোয়াল খেলাও শেখানো হয়। তারই একটা নমুনা এবারে দেখাবেন আমাদের আখড়ার সদস্য শ্রী বলরাম পাইন। আপনারা দেখুন তার ক্রীড়াকৌশল। ধন্যবাদ।' চোঙাটা হস্তান্তর করে মঞ্চে রাখা একটা চেয়ারে বর্ধমানের মহারাজা আফতাব চাঁদ মেহতাবের পাশে বসে পড়েন অম্বিকাচরণ।

আখড়ার মাঠের মাঝখানে এবার লাঠিহাতে এসে দাঁড়ায় মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা বলরাম। বয়স আঠাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। প্রথমেই দু-হাতে লাঠিটা আড়াআড়ি ধরে ঝুঁকে প্রণাম জানায় মঞ্চে আসীন মান্যিগণ্যি ব্যক্তিদের আর একই ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে প্রণাম জানায় সমবেত দর্শকদের।

তারপর সোজা দাঁড়িয়ে লাঠির মাঝখানটা ধরে। বাতাসে সাঁই-সাঁই আওয়াজ তুলে তার শরীরের চারপাশে বনবন করে ঘুরতে থাকে তার লাঠি আর সেইসঙ্গে ছোটো ছোটো লাফে ঘোরাতে থাকে তার দেহও। মঞ্চ থেকে চোঙের আওয়াজ ভেসে আসে—'শ্রী বলরাম পাইন আমাদের আখড়ার শ্রেষ্ঠ লাঠিয়াল। এর লাঠির বেগ দেখে বুঝতেই পারছেন যে এর লাঠি বন্দুকের গুলিও আটকে দিতে সক্ষম।' সত্যিই বলরামের ঘোরানো লাঠির গতিপথ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। সামনে পেছনে চারপাশে ঘুরে ঘুরে বলরাম ঘোরাচ্ছে তার লাঠি। দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে— 'সত্যি, এইভাবে লাঠি ঘোরালে বন্দুকের গুলিও আটকে যাবে।'

খানিকক্ষণ লাঠির কসরত দেখিয়ে বলরাম থামে। তারপর দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে — 'আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো লাঠি খেলেন। তেমন কেউ থাকলে আমার সাথে একহাত খেলতে পারেন।' বলরামের কথা শুনে দর্শকরা সবাই এ ওর মুখের দিকে চাইছে। কিন্তু নিশিকান্তের শরীরে এই দ্বন্দযুদ্ধের আহ্বান শিহরণ তুলেছে। একহাত লড়াইয়ের অদম্য বাসনা জেগে উঠেছে তার মনে। সে সমরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে— 'যাব কত্তা?' সমরবাবু রীতিমতো চেনেন নিশিকান্তকে। তার কাঁধে হাত রেখে বলেন— 'যাও। আমাদের গাঁয়ের আর জমিদার মশায়ের নাম রেখো।'

ওদিকে বলরাম পাইন হেঁকে বলছে— 'কই, কেউ কি নেই নাকি? নাকি লাঠি খেলা জানলেও ভয় পাচ্ছেন খেলতে?'

এই বিদ্রূপ আর সহ্য হয় না নিশিকান্তর। সে ততক্ষণে তার ফতুয়া খুলে ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলেছে। ধুতিটা মালকোঁচা মারতে মারতে আখড়ার আঙিনায় ঢুকে পড়ে সে। সোজা গিয়ে দাঁড়ায় বলরামের মুখোমুখি।

তারপর হেঁকে বলে— 'আমি আড়ংঘাটার জমিদার রণবিজয় বর্মণের এক সামান্য লেটেল। নাম নিশিকান্ত রায়। যদি আজ্ঞা দ্যান আর একগাচা লাটি দ্যান তো আমি বলরামবাবুর সঙ্গে একহাত খেলতে পারি।'

মঞ্চ থেকে অম্বিকাচরণ চোঙা ফুঁকে বললেন— 'অনুমতি দিলাম। এই কেউ একখানা লাঠি দাও তো ওকে।'

এদিকে বলরামের চোখে আগুন জ্বলছে। কোথাকার কোন এক গেঁয়ো লেঠেল তার মতো ঝানু লাঠিয়ালের সঙ্গে লড়ার স্পর্ধা দেখায়। আজ উচিত শিক্ষা দিতে হবে একে।

শুরু হল লড়াই। দুই লাঠিয়ালের লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছে না। বলরাম রেগে যাচ্ছে ক্রমশ। ভাবছে— 'কোথাকার এক অনামা লেঠেল তার দশ-বারো বছরের সাধনাকে এত লোকের সামনে হেয় করে দিচ্ছে।' নিশিকান্ত এটাই চাইছিল। সে জানে যে রেগে গেলে মাথা ঠিকঠাক চলে না; তাই সে এতক্ষণ তাতিয়ে যাচ্ছিল বলরামকে। সুযোগ খুঁজছিল তার সামান্যতম ভুলচুকের। আর রেগে গিয়ে নিশিকান্তকে সেই সুযোগটাই দিয়ে ফেলল বলরাম। চকিতে নিশিকান্তের লাঠির আঘাতে তার হাতের লাঠি ছিটকে গেল। এইসময় ইচ্ছে করলেই সে বলরামের মাথা ফাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু খেলা খেলাই। এখানে শরীরে আঘাত করতে নেই। তাই একহাতে লাঠিটা ধরে আর একহাত কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে রইলো সে। এদিকে হতভম্ব বলরামকে দেখে নিশিকান্তর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল জনতা। নিশিকান্ত দু-হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথার ওপরে তুলে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে বললে— 'আমার একটা নতুন অস্তর আচে। এই দেড়হাত মতো লম্বা। শুনলাম বলরামবাবুর লাটি নাকি বন্দুকের গুলিও আটকে দিতে পারে। আমার এই অস্তর কিন্তু গুলির চে অনেক বড়ো। তা আপনাদের অনুমতি পেলে বলরামবাবু তেনার লাটি দে আমার এই অস্তরকে আটকে দেকান দিকি।'

মঞ্চে তখন ফিসফিসানি। এদিকে জনতার মধ্যে থেকে কলরব উঠল— 'হয়ে যাক, হয়ে যাক।' এই মোকাবিলার ডাকে সাড়া না দিলে আখড়ার মান থাকে না। তাই অম্বিকাচরণবাবু মহারাজ আফতাব চাঁদের সঙ্গে খানিক শলা করে চোঙা ফুঁকে হুকুম দিলেন— 'নিশিকান্ত রায়, তোমায় অনুমতি দেওয়া হল। বলরাম দেখাক সে কেমনভাবে তোমার অস্ত্রকে আটকে দিতে পারে। তা তোমার তো খালিহাত বাপু। অস্ত্র কোথায়? দেখাও দেখি সেখানা।'

নিশিকান্ত তার হাতের লাঠি দূরে ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে যায় সমররঞ্জনের কাছে। তাঁর কাছে রাখা নিজের ব্যাগ থেকে বের করে তার বুমেরাং। আঙিনায় ঢুকতে ঢুকতে সে বুমেরাংটা মাথার ওপর তুলে বলে— 'এই আমার অস্তর। আপনাদের মদ্দে কেউ কি জানেন এই অস্তরটার নাম কী?'

এই অস্ত্র শুধু দর্শক কেন, মঞ্চে বসা ভদ্রমণ্ডলীও কখনো দেখেননি। তারা চুপ করে থাকে। প্রায় ইংরাজি ভি এর মতো দেখতে কাঠের তৈরি এটা আবার কী অস্ত্র?

হঠাৎই ভিড়ের সামনে থেকে একজন চৌকোমুখের সুঠাম যুবক চেঁচিয়ে বলে— 'এটা রিটার্নিং বুমেরাং। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা শিকার করতে বা ফল পাড়তে এটার ব্যবহার করে। লক্ষ্যবস্তুতে না লাগলে এটা ঘুরে এসে পড়ে যে ছুঁড়েছিল তারই কাছাকাছি।'

—'বাঃ, একটা নতুন অস্ত্রের নাম জানলাম। তা এবারে নিশিকান্ত রায়, দেখাও তো তোমার অস্ত্রের কেরামতি।' মঞ্চ থেকে চোঙা ফুঁকে কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্য মিশিয়ে কথাটা ছুঁড়ে দেন অম্বিকাচরণ।

লাঠি হাতে তুলে নিলো বলরাম। প্রায় ত্রিশহাত দূরে বুমেরাং হাতে স্থির দাঁড়িয়ে নিশিকান্ত। প্রথমবারের মতো এবারেও শরীরের চারিদিকে বনবন করে লাঠি ঘোরাতে লাগল বলরাম পাইন। তবে এবারে লক্ষ্য শুধু সামনের দিকে। নিশিকান্তর দিকে।

বুমেরাং এর একপ্রান্ত ধরে হাতে ঝুলিয়ে নিশিকান্ত লক্ষ্য রাখছে বলরামের ওপরে। অল্প অল্প দোল খাচ্ছে তার ঝুলিয়ে রাখা বুমেরাং ধরা হাত। খানিক ঠাহর করতেই সে বুঝতে পারে বলরামের লাঠি ঘুরলেও তার হাঁটুর ঠিক নীচে থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ফাঁকা থেকে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে একটা হাঁটু গেড়ে বসে সাঁ করে আড়াআড়ি ছুঁড়ে দেয় হাতের বুমেরাং। শেষ মুহূর্তে বলরাম লাফিয়ে সেটা এড়াতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু না, সে নড়ার আগেই বুমেরাং সজোরে আঘাত করেছে তার বাঁ-পায়ে। সেই আঘাতের অভিঘাত এতটাই যে বলরাম লাঠি ছেড়ে পা ধরে পড়ে যায় মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় নিশিকান্ত। একহাতে বুমেরাং তুলে, অন্যহাতে বলরামকে চাগিয়ে দাঁড় করাতে করাতে বলে— 'লেগে থাকলে মাপ করবেন কত্তা। আমি কিন্তু জোরে ছুঁড়িনি।'

ততক্ষণে ছুটে এসেছে আখড়ার লোকজন। তারা ধরে নিয়েছে বলরামকে। আর থতমত খেয়ে যাওয়া দর্শকদের মধ্যে থেকে ছুটে এসেছে চুলের মাঝখানে সিঁথিকাটা চৌকোমুখের সেই সৌম্যদর্শন সুঠাম চেহারার যুবক। কোলে চাগিয়ে তুলে নিয়েছে নিশিকান্তকে।

সে যুবক আর কেউ নয়— সিমলেপাড়ার প্রয়াত উকিল বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

এই আনন্দোৎসবের সোরগোলের মাঝেই সমররঞ্জন ছুটে এসে বললেন— 'এই নিশিকান্ত, বর্ধমানের মহারাজা তোমায় ডাকছেন। ওই যে একজন মঞ্চ থেকে চোঙা ফুঁকে তোমাকে তাঁর কাছে যেতে বলছে। শুনতে পাচ্ছ না?'

নরেন্দ্রনাথের কোল থেকে নেমে নিশিকান্ত এগিয়ে যায় মঞ্চের দিকে।

দিন পনেরো পরে রণবিজয় বর্মণের কাছারিতে ডাক পড়ে নিশিকান্তর। তাঁর আদেশ মতো তার সঙ্গে রয়েছে বাবা, মা আর দাদু রতন কত্তাও। সবাই উৎকণ্ঠায়। না জানি কী জন্যে তাদের সক্কলকে ডেকে পাঠিয়েছেন জমিদারবাবু। ভয়ে ভয়ে তারা প্রণাম করে দাঁড়াতেই হিসেবের খাতা থেকে মুখ তুলে জমিদারবাবু বললেন— 'তোমাদের মঙ্গল হোক। তা যে জন্যে তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম সেটাকে তোমরা সুসংবাদও বলতে পার আবার দুঃসংবাদও বলতে পার।'

জমিদারবাবুর এইকথা শুনে কেঁপে ওঠে সবার বুক। তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে।

রণবিজয় বলতে থাকেন— 'নিশিকান্ত, বর্ধমানের রাজা পত্র পাঠিয়েছেন। তিনি কলকাতায় তোমার খেলা দেখে খুবই প্রীত হয়েছেন আর তাই বর্ধমানে ডেকে পাঠিয়েছেন তোমাকে। সেখানে তিনি তাঁর লেঠেল দলকে আরও শক্তিশালী করার ভার দিতে চান তোমার ওপরে। কী করব বল; রাজার হুকুম; তিনি তো আমার মাথার ওপরে। তাঁর ''ইচ্ছে'' আমার কাছে ''আদেশ''। আমি তা অমান্য করি, এমন সাধ্য আমার নেই। তাই নিশিকান্ত, তোমাকে কালই বর্ধমানে রওয়ানা দিতে হবে। আফতাব চাঁদ মেহতাব যে তোমাকে এতবড়ো একটা দায়িত্ব দিয়েছেন, তার জন্যে শুধু তুমি বা আমি কেন, তোমাদের গ্রামের আর আমার তালুকের সবার গর্বিত হওয়া উচিত। এটাকে তাই সুসংবাদ বলা যেতেই পারে। তোমার পরিবারের সবাইকে ডেকেছি এইজন্যেই। তোমার এই সম্মানের ব্যাপারটা তাদেরও জানা দরকার।' একটু থামেন রণবিজয় বর্মণ। হিসেবের খাতাটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলেন— 'আর এটাকেই আমি দুঃসংবাদ বলছি এই

কারণে যে, তোমার মতো একজন দক্ষ লাঠিয়ালকে আমায় হারাতে হবে আর তোমার গ্রামের মানুষ তোমার সঙ্গ হারাবে।'

জমিদারের মুখে এই কথা শুনে তারা স্তম্ভিত। এর উত্তরে কি বলবে ভেবে পায় না। তবু একটু পরে মুখ খুললে বৃদ্ধ রতন কত্তা। বললে— 'এজ্ঞে হুজুর, পুরুষমানুষকে তার ভাগ্যি নিজেকেই গড়ে নিতে হয়। নিশিকান্ত আজ সেই সুযোগ পেয়েচে। ভাগ্যলক্ষী তার সহায়। আমি চাই যে সে বদ্ধোমানে গে আপনার, আমাদের আর এই তালুকের সব্বার মুকুজ্জল করুক।'

জমিদার রণবিজয় পাশে রাখা একটা পত্রের নীচে দস্তখত করে সেটা নিশিকান্তর হাতে দিয়ে বললেন— 'কাল সকাল সকাল রওয়ানা দিলে সন্ধের মধ্যেই পৌঁছে যাবে বর্ধমানে। আর তার পরের দিন দরবারে গিয়ে রাজামশায়ের হাতে তুলে দেবে এই পত্র।'

পত্রখানা নিয়ে জমিদারকে প্রণাম করে কাছারি ছাড়তে যায় নিশিকান্ত ও তার পরিবার।

—'দাঁড়াও, একটু কথা আছে।' জমিদার রণবিজয় বর্মণের গলা শুনে ঘুরে দাঁড়ায় সবাই। না জানি এরপরে আরও কি বলবেন জমিদারবাবু।

—'আচ্ছা নিশিকান্ত, শোনো। আমি তোমায় একটা পুরস্কার দেব ভেবেছিলাম। এখন বল, তুমি কী চাও।'

অপ্রত্যাশিত এই অনুগ্রহে বিহ্বল হয়ে যায় সে। কি চাইবে তা ভেবে ঠিক করে উঠতে পারে না।

—'কী হল? বল।' জমিদারমশায় আবারও বলেন। সবাই সাগ্রহে চেয়ে আছে নিশিকান্তর মুখের দিকে— কী চাইবে সে। একটু অপেক্ষা।...হঠাৎই নিশিকান্তর মনে পড়ে যায় তার অনেকদিনের একটা ইচ্ছের কথা। বলি বলি করেও সে এতদিন জমিদারমশায়কে বলে উঠতে পারেনি সেটা। সে ঠিক করে ফেলে এটাই সুবর্ণ সুযোগ। এখনই কথাটা বলা যাক, যদি পূরণ হয়। তাই সে সাহসে ভর করে হাতজোড় করে বলেই ফেলে— 'এজ্ঞে হুজুর, আপনি যদি চুন্নি নদী থেকে এই রাজসায়র পজ্জন্ত একটা খাল কাটার অনুমতি দ্যান, তাইলে শুকা মরসুমে গাঁয়ের জমি থেকে আরও একটা ফসল তোলা যায়।'

জমিদার রণবিজয় বর্মণ ভেবেছিলেন যে নিশিকান্ত আর সবার মতো নিজের জন্যে কিছু চাইবে। কিন্তু তা না করে...

এইসময় রতন কত্তা বলে ওঠে— 'এজ্ঞে হুজুর, আপনি অনুমতি দিলে আমাদের গাঁয়ের সব্বাই মাগনায় জন খেটে দেব। আমি আপনাকে কতা দিলাম।'

রণবিজয় একটু ভাবলেন। তারপরে মৃদু হেসে বললেন— 'বেশ, তাইই হবে। তোমরা একদিন সমরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবে। আর নিশিকান্ত, তুমি যাবার আগে আমার আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে যেও। ওটাই হবে আমার তরফে তোমার পুরস্কার; অবশ্য আমার সাদা ঘোড়াটা বাদ দিয়ে কিন্তু।'

নিশিকান্তরা সবাই প্রণাম করে জমিদার রণবিজয় বর্মণকে। তিনি আশীর্বাদ করেন— 'তোমাদের মঙ্গল হোক।'

১৮৮৪, অক্টোবর

বর্ধমানের নদীচরের আলেয়া ভূত আর নিশিকান্ত

বর্ধমানের রাজবাড়িতে ঢোকার কিছুদিন পরে নিশিকান্ত বুঝতে পারল যে তখনকার লেঠেল সর্দার রঘুনাথ চৌবে তাকে ঠিক মেনে নিতে পারছে না। তবে নিশিকান্তর লাঠির ওপরে দখল আর তার নতুন অস্ত্রের ঝাঁঝ দেখে তাকে নিজের জায়গাটা মানে মানে ছেড়ে দিয়েছিল সে ; যদিও তার এতদিনের আধিপত্য হারানোর জন্যে মনে মনে একটা হিংসা পোষণ করত। কিন্তু নিশিকান্ত যে স্বয়ং মহারাজা, এমনকী মহারানিরও পেয়ারের লোক। তাই মনের হিংসা মনেই চেপে রাখত চৌবে।

রোজ সকালে আর বিকেলে লেঠেলদের মহড়া চলে। তবে কোথাও কাজ পড়ে গেলে অন্যকথা। এদিকে মহারাজের অনুমতি নিয়ে গোমস্তা আদ্যাপ্রসাদের সাহায্যে বাইশটা বুমেরাং বানিয়েছে সে। কিছু বাছাই করা লেঠেলদের সেগুলো চালানো শেখায়। সেইসঙ্গে চলে সড়কি, বল্লম, তরোয়াল আর ছোরা নিয়ে নকল যুদ্ধ। এই তো ক-দিন আগেই, তার এখানে আসার ছ-মাস পরে দুর্গাপুজোর দশমীর পরের দিন কলকাতা থেকে আসা সায়েবসুবো আর আরও অনেক গণ্যমাণ্য অতিথিদের সামনে তার দলবলের মহড়া দেখাতে হয়েছিল। মহারাজ আফতাব চাঁদও তাদের মহড়া দেখে খুশি হয়ে তাকে একটা সোনার আংটি বখশিশ দিয়েছিলেন। চিকের আড়াল থেকে রানিমা আর রাজবাড়ির মহিলারাও তাদের খেলা দেখেছিলেন। ক-দিন পরে রানিমা আদ্যাপ্রসাদকে দিয়ে তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন অষ্টধাতুর তৈরি একটা শিবমূর্তি। সেইসঙ্গে রানিমা এটাও বলে দিয়েছিলেন যে তার যেকোনো দরকারে সে যেন দ্বিধা না করে তা আদ্যাপ্রসাদের মাধ্যমে সরাসরি তাঁকে জানায়। মহারাজা আর মহারানির এই দাক্ষিণ্যে খুবই খুশি হয়েছিল নিশিকান্ত।

কিন্তু তার কিছুদিন পর থেকেই মহারাজের শরীরটা খারাপ হতে থাকে। রক্তে শর্করা বৃদ্ধির কারণে মহারাজ ধীরে ধীরে কমজোরী হতে থাকেন। কলকাতা থেকে সায়েব ডাক্তার আসেন, দেখে যান, ওষুধও দিয়ে যান। মহারাজ তাইই সেবন করেন নিয়মমাফিক। কিন্তু তবুও তাঁর শরীর পড়তে থাকে।

এদিকে মহারাজ নিঃসন্তান। রাজবাড়ির আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করে একটা কথা যে— মহারাজ আফতাবের মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধীকারী কে হবে? তবে এসবে নিশিকান্তর কিছু যায় আসে না। সে একটা কথা সাফ বোঝে যে— যতদিন শরীর দেবে, ততদিন তাকে কাজ করে যেতে হবে। মহারাজ গত হলে তাঁর উত্তরাধীকারী যদি তাকে বহাল না রাখে তবে সে আবার ফিরে যাবে জমিদার রণবিজয়ের কাছে, তাদের গ্রামে। সত্যি বলতে কী এখানে সম্মান পেলেও রাজবাড়ির ঠাটবাট, হালচাল তার ভালো লাগে না। তার সঙ্গে সে যেন মানিয়ে নিতে পারে না নিজেকে। আর রঘুনাথ চৌবে যে নানান ফিকিরে তাকে বিব্রত করার চেষ্টা করে তাতেও সে তিতিবিরক্ত।

নিশিকান্ত আরও বুঝেছে যে— ঠগিরা মানুষ মারত অভাবের তাড়নায়, নিজেদের অন্নসংস্থান করতে। যাদেরকে তারা মারত, তাদের কোনোভাবেই ঠগিদের শত্রু বলা যায় না। কিন্তু বর্ধমানে এসে এই ছ-মাসেই সে দেখেছে প্রভূত সম্পদ থাকলেও আরও সম্পদের লালসা মানুষের শত্রু তৈরি করে। এই যে মহারাজের লেঠেল দল, তাদেরও তো

মহারাজ পুষছেন তাঁর নিজের শত্রুদের থেকে বাঁচতে, সম্পত্তির অধিকার কায়েম রাখতে আর নিজের সম্পদ, বৈভব আর ক্ষমতা আরও বাড়াতে।

তাই এসব মানসিক চাপ থেকে নিজেকে হালকা করতে প্রায় রোজই জমিদার রণবিজয়ের কাছ থেকে নেওয়া কালো ঘোড়াটায় চেপে চলে যায় রাজবাড়ি থেকে মাইল দুয়েক দূর দিয়ে বয়ে চলা দামোদরের পাড়ে। সঙ্গে নেয় সে একটা সড়কি আর তার বুমেরাং।

সেদিনটা ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন। আকাশে জ্বলজ্বল করছে শুক্লাচতুর্দশীর চাঁদ। দামোদরের পাড়ে বালির ওপরে বসেছিল নিশিকান্ত। পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তার ঘোড়াটা। হালকা হালকা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে আসছে নদীর দিক থেকে। ভারি আরাম লাগছে। তাই বালিতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে সে। মাথার ওপরে খোলা আকাশ যদিও চাঁদের আলোয় বেশ উজ্জ্বল, তবুও একটু ঠাহর করলেই বোঝা যায় মাথার ওপরে 'কালপুরুষ' নক্ষত্রমণ্ডলী জ্বলজ্বল করছে। তার কোমরে কোমরবন্ধ আর সেটা থেকে ঝুলছে তার তরোয়াল। এই কালপুরুষকে ভালোভাবেই চেনে নিশিকান্ত। সে জানে যে ওই তরোয়ালের মুখ সর্বদা দক্ষিণদিক নির্দেশ করে। আর কালপুরুষের পা থেকে খানিকটা দূরে ওই যে তারাটা তার নাম 'লুব্ধক'। কালপুরুষকে যদি এক শিকারি হিসেবে ধরা যায়, তবে লুব্ধককে তার কুকুর হিসেবে ভাবতে দোষ কোথায়? ওই কালপুরুষের সঙ্গে নিজেকে বেশ খানিকটা যেন মেলাতে পারে নিশিকান্ত। শিকারির সব গুণগুলো যে তার চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছে রতন কত্তা, তার বাবা নীলকান্ত আর তার গ্রামের লোকজন। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার পুরোনো গাঁয়ের কথা মনে পড়তেই। আনমনে হাতের আঙুল দিয়ে নিজের চুলে বিলি কাটে সে।

হঠাৎই তার নজরে পড়ে দামোদরের এইপাড়ে বেশ খানিক দূরে দপ্ করে জ্বলে উঠছে একটা আলো। একটু জ্বলেই নিভে যাচ্ছে। আবার খানিকটা পরেই দপ্ করে জ্বলে উঠছে। খানিকটা জ্বলেই নিভে যাচ্ছে আবার।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। ঠাহর করে দেখে সে বুঝতে পারে যে আলোটা এখনও দূরে থাকলেও ক্রমশ এগিয়ে আসছে তারই দিকে। একেই কি বলে 'আলেয়া-ভূত?'

অন্য কেউ হলে এতক্ষণে পড়ি কি মরি করে ছুটে পালাত। কিন্তু নিশিকান্ত যে অন্য ধাতুতে গড়া। সে বুমেরাংটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। অপেক্ষা করতে থাকে আলোটা তার আরও কাছে এগিয়ে আসার জন্যে। একটু পরে আলোটা জ্বলা-নেভা করতে করতে আরও কাছে এগিয়ে আসতে সেও এগিয়ে যায় আলোটার দিকে। একসময় হঠাৎ আলোটা দপ্ করে জ্বলে উঠতেই সে বুঝতে পারে যে ওটা কোনো ভূত-টুত নয়, লালপাড় সাদা শাড়ি পরা একজন সাধারণ সধবা মহিলা। নদীর জনমানবহীন চর ধরে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে। সেদিকে দৌড়ে যায় নিশিকান্ত। হাঁক পাড়ে— 'এ্যাই, কে তুমি?' তার হাঁক শুনে মহিলা দৌড়ে পালাতে যায়। কিন্তু নিশিকান্ত ততক্ষণে দু-হাত ছড়িয়ে তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে এ কোনো ভদ্রঘরের মহিলা। কিন্তু এতরাতে এইভাবে সে কোথায় যাচ্ছে? মহিলাও খুব ভয় পেয়ে গেছে। তাকে ডাকাত-টাকাত ঠাউরেছে বোধ হয়।

নিশিকান্ত তাকে আশ্বস্ত করে বলে— 'ভয় নেই তোমার। আমি মহারাজ আফতাব চাঁদের পেধান লেটেল নিশিকান্ত রায়। আমি থাকতে তোমার কোনো খেতি হবেনি। একন বল তো, কে তুমি আর কোতায়ই বা যাচ্চ?'

মহিলার বোধ হয় নিশিকান্তর কথায় একটু ভয় কমেছে। সে দাঁড়িয়ে গেছে; কিন্তু মানুষটাকে দেখতে না পেলে তার ভয় পুরোপুরি কাটছে না। তাই সে তার কোঁচড় থেকে একমুঠো গুঁড়ো কিছু নিয়ে ফেলে দিল তার মাথায় গামছা দিয়ে তৈরি বিড়ের ওপরে বসানো সরার আগুনে। দপ্ করে জ্বলে উঠল এক ঝলক আগুনের শিখা। হাওয়ায় ভেসে আসা গন্ধ নাকে লাগতেই নিশিকান্ত বুঝতে পারল যে ওই গুঁড়োটা হোলো ধুনো আর গন্ধকের মিশেল। সেই আলোতে তাকে দেখে মহিলা মনে হয় কিছুটা আশ্বস্ত হল। নিশিকান্ত তাকে আবার জিজ্ঞেস করল— 'কী হল? নাম কী তোমার? বল।'

—'হরিমতী দাসী।'

—'ভদ্দরঘরের ইস্তিরি বলেই তো মনে হচ্চে। তা তোমার শোউরবাড়ি কোতায়?'

মহিলা পেছনদিকে হাত দেখিয়ে বললে— 'একান থেকে দু-কোশ দূরে কেশবপুর গেরামে।' তারপর হঠাৎ বসে পড়ে নিশিকান্তর পা ধরে বললে— 'আমাকে সেকানে ফিরিয়ে দিওনি গো। সেকানে ফিরে গেলে ওরা আরও অত্যেচার করবে। টিকতোতে দেবেনে।'

—'সে কী? কেন? অত্যেচার করে কেন?'

—'আমার বাপ পণের ট্যাকা একোনো দে উটতি পারেনি। তাই মাতাল সোয়ামী রোজ রেতের বেলা ঘরে ফিরে মারে। শউরঠাউর আর দ্যাওররাও গায়ে হাত তোলে। একবচ্চর অনেক সয়েচি। আর পারিনি। সারা গায়ে কালশিটে ফেলে দেচে।'

নিশিকান্ত বলে— 'ঠিক আচে, ঠিক আচে। এবার পা-টা ছাড়ো দিকিনি।' হরিমতী এবার উঠে দাঁড়ায়।

—'ও, তাই তুমি বুজি পাইলে বাপের ঘরে যাচ্চিলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা সেকানে গে তুমি রেহাই পাবে ভেবেচো? তোমার শোউরবাড়ির লোক সেকানে গে ঠিক তোমায় ধরে নে আসবে।' মহিলা চুপ করে থাকে। তা দেখে একটু পরে নিশিকান্ত বললে— 'আমায় যদি তোমার বিশ্বেস হয়, তাইলে রাজবাড়িতে তোমায় একটা কাজ জোগাড় করে দিতি পারি। সেকানে কত্তো মানুষ থাকে; একজন বেশি হলে তাদের কিচ্চু যাবে আসবেনি।'

মহিলা একটু দোটানায় ভুগছে। সামনে দাঁড়ানো মানুষটাকে বিশ্বাস করা যায় কি না। তারপর ভেবে দেখলে— তার তো প্রাণ আর ইজ্জত ছাড়া হারাবার আর কিছুই নেই। যদি তার ইজ্জত নেবারই থাকত, তাহলে এই নির্জন জায়গায় এই মানুষটা তা অনায়াসেই করতে পারত। কিন্তু তা করার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও সে করেনি। তাহলে এই মানুষটাকে একবার বিশ্বাস করে দেখতে ক্ষতি কি। তাই সে নিশিকান্তকে বললে—'আপনি যা বলচেন তাইই হবে। মান-ইজ্জতের সঙ্গে দু-বেলা দুটি ভাত আর পরণের কাপড় পেলে আর কিচ্চু লাগবে না আমার।'

নিশিকান্ত বললে— 'রানিমা আমাকে স্নেহ করেন। তাঁকে গে বললে একটা ব্যবস্তা নিশ্চই হয়ে যাবে।' মহিলা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

—'তাইলে চল। আমার ঘোড়া ওই যে দাঁইড়ে আচে। আর তোমার ওইসব বিদঘুটে জিনিসপত্তরগুলো ফেল দিকি।' মহিলা তার কোঁচড় থেকে ধুনো আর গন্ধকের গুঁড়ো

ফেলে দিল। মাথা থেকে খুলে ফেলল গামছার বিড়েটা। বেঁধে নিলো কোমরে। তারপর এগিয়ে চলল নিশিকান্তর পিছুপিছু।

ঘোড়ার কাছে গিয়ে নিশিকান্ত হরিমতীর কোমর দু-হাতে ধরে তাকে আড়াআড়ি বসিয়ে দিয়ে নিজেও উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়ার পেটের কাছে গোড়ালি ঠুকতেই সেটা টগবগিয়ে উঠল। হরিমতী আগে কখনো ঘোড়ায় চড়েনি। তাই ঘোড়া ছুটতেই সে ভয়ে দু-হাতে আঁকড়ে ধরল নিশিকান্তকে। নিশিকান্ত বুঝতে পারল তার ভুল হয়ে গেছে। তাই সে ঘোড়াকে ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। হরিমতীর ভয় তবু যায় না। সে আঁকড়ে ধরেই থাকে নিশিকান্তকে। সে যে পরপুরুষ, ভয়ে তা খেয়ালই থাকে না তার। তবুও তার মাতাল সোয়ামীর হাতের, শোউরবাড়ির লোকেদের হাতে মার খাওয়ার ভয়ের চেয়ে অচেনা এক পুরুষের সাথে এই ঘোড়ায় চড়ার ভয়টা কম। লোকটা শক্তহাতে যেভাবে লাগাম ধরে আছে তাতে মনে হয় যেন তার ওপরে নির্ভর করা যায়। আর কি জানি কেন এই মানুষটাকে ভালোও লাগছে। ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার ভয়ে নিশিকান্তর দরাজ বুকে রাখা তার মাথা। কখনো তো সে এইভাবে তার স্বামীর বুকে মাথাও রাখতে পারেনি। জ্যোৎস্নামাখা নদীর হাওয়ায় উড়ছে তার চুল। সেই চুল কখনো কখনো গিয়ে পড়ছে নিশিকান্তর মুখে।

হঠাৎই তার মনে পড়ে যায় এসব কি যা তা ভাবছে সে। সে তো সধবা আর এই মানুষটার ঘরে তো তার বউও থাকতে পারে। কোনো এয়োস্ত্রীকে তার নিজের মনে এইরকম ভাবনার প্রশ্রয় দিতে নেই। তা ছাড়া এই মাত্র কয়েক দণ্ড আগেই তাদের দেখা হয়েছে। তারা কেউ কাউকেই জানে না, ভালো করে চেনে না। অথচ এখনই...। না। এটা ঠিক নয়। নিজেই নিজেকে ধমক দেয় হরিমতী। আর তাই নিশিকান্তকে ছেড়ে সোজা হয়ে বসতে যায়। কিন্তু আবার টাল সামলাতে না পেরে আঁকড়ে ধরে নিশিকান্তকেই।

আর নিশিকান্ত? আজ পর্যন্ত কোনো মহিলার সান্নিধ্যে আসেনি সে। অস্বস্তি হওয়ারই কথা। কিন্তু আজ তার একী হয়েছে? একজন অচেনা, অজানা বিবাহিতা মহিলা এই চাঁদনী রাতে তাকে চেপে ধরে জড়িয়ে আছে বুকের সঙ্গে। তার এলোচুলের নারকোল তেলের সুবাস, তার গরম নিঃশ্বাস, বুকের সঙ্গে ঠেকে থাকা তার গাল, আজ কেমন যেন একটা নতুন রকম ভালোলাগার অনুভূতি দিচ্ছে তাকে। তাই বুঝি আজ বড়ো গান পাচ্ছে নিশিকান্তর। কিন্তু রতন কত্তার কাছে শেখা গান ছাড়া আর কোনো গান তো সে জানে না। হাঁতড়ে বেড়ায় সে। অবশেষে গেয়ে ওঠে— '...সে যে মুক্তকেশী শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁষে না। মনরে কৃষিকাজ জানো না...।'

কিন্তু একটু পরেই সম্বিৎ ফিরে পায়। গান যায় থেমে। আচ্ছা, এই মহিলা তো কারোর বাড়ির বউ। এযাবৎ সব মহিলাদেরই সম্মান দিয়ে এসেছে সে। কারোর সম্বন্ধে কোনো কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দেয়নি। কিন্তু আজ সে হরিমতী সম্বন্ধে এ কীসব ভাবছে। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ। নিজেকে ধিক্কার দেয় সে। সে ঠিকই করে যে রাজবাড়িতে হরিমতীর একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে সে নিজের জগতেই আবার ফিরে যাবে।

রাজবাড়িতে পৌঁছে নিশিকান্ত হরিমতীকে একটু অপেক্ষা করতে বলে সোজা গিয়ে কাছারিবাড়িতে দেখা করে আদ্যাপ্রসাদের সঙ্গে। আদ্যাপ্রসাদ তখন হিসেবের খাতাপত্র গুছিয়ে তৈরি হচ্ছিলেন বাড়ি যাবেন বলে। কিন্তু নিশিকান্ত গিয়ে তাঁকে প্রণাম জানাতেই তিনি থমকে গেলেন।
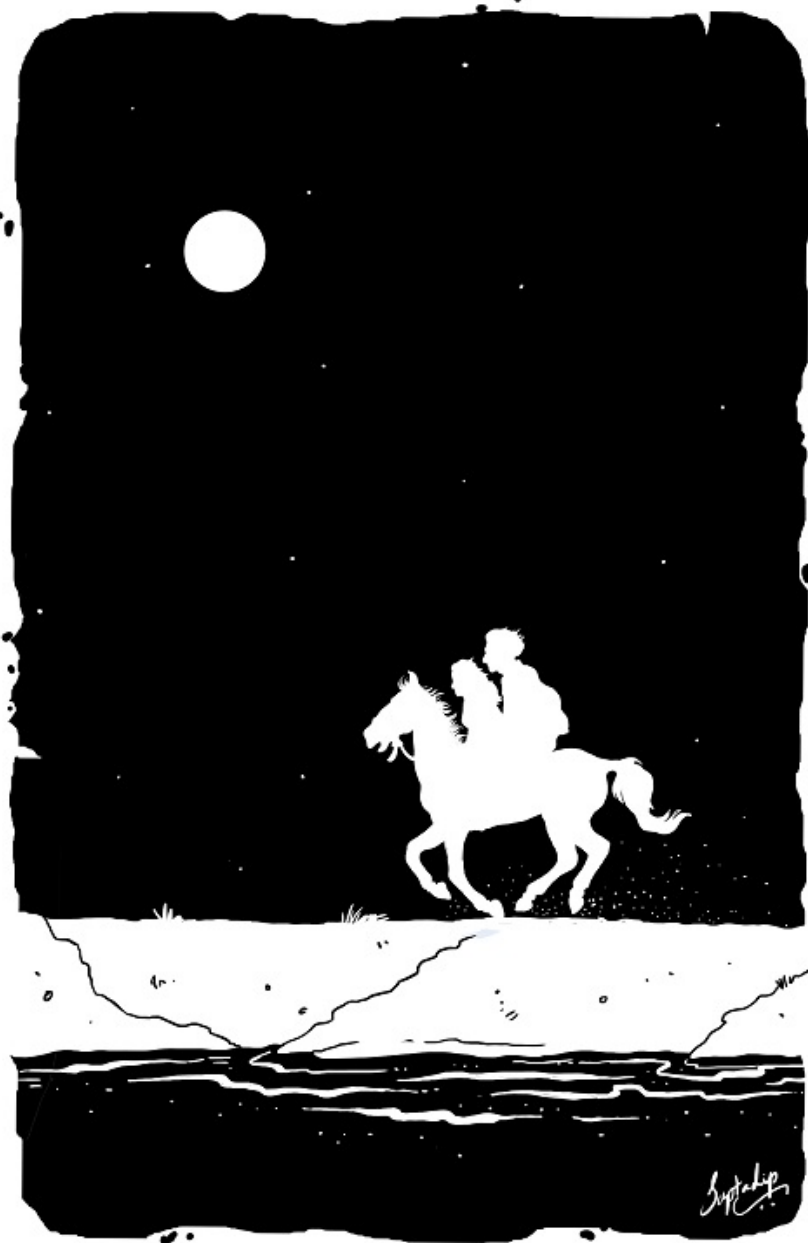
—'কী ব্যাপার নিশিকান্ত, এত রাতে? কোনো জরুরি খবর কি?'

—'আজ্ঞে, একটা বিশেষ কতা কইবার ছিল। যদি একটু সময় দেন তো একান্তে কই।'

আদ্যাপ্রসাদ জানেন যে নিশিকান্তকে রানিমা স্নেহ করেন। তা ছাড়া বিশেষ কোনো প্রয়োজন না থাকলে সে তো এই সময়ে আসার লোক নয়। তাই সহকারী ছেলেদুটিকে আসতে বলে উনি আবার ফরাসে বসে পড়ে বললেন— 'বল, কী বলবে।'

নিশিকান্ত সংক্ষেপে তাঁকে সব কথা বলে। সব শুনে প্রাজ্ঞ আদ্যাপ্রসাদ বললেন—'ঠিক আছে। আজ সে দাসীমহলেই থাকুক। আমি খাসদাসীকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আর আমি কাল সকালে রানিমাকে সব জানাব। দেখি, উনি কী বলেন। তুমি বরং কাল দুপুরের একটু আগে আমার সঙ্গে দেখা করে সব জেনে যেও।'

—'যে আজ্ঞে।' বলে নিশিকান্ত কাছারিবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। দেখা হয় হরিমতীর সঙ্গে। তাকে বলে— 'একটু অপেক্ষা কর। নোক আসচে। ততক্ষণ না হয় আমি আচি সঙ্গে।'

খানিক পরেই একজন দাসী এসে হরিমতীকে সঙ্গে নিয়ে দাসীমহলের দিকে এগিয়ে চলে। দাসীমহলে ঢোকার ঠিক আগেই হরিমতী একবার পেছন ফিরে দেখলে। নিশিকান্ত তখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। রাজবাড়ির সহবত এতদিনে বেশ শিখে গেছে নিশিকান্ত। কখন কি করতে হয়, আজ আর অজানা নয় তার। তাই পরেরদিন মহড়ার শেষে নিশিকান্ত দেখা করলে আদ্যাপ্রসাদের সঙ্গে। আদ্যাপ্রসাদ জানালেন যে দাসীমহলে ঠাঁই হয়েছে হরিমতীর। নিশিকান্ত নিশ্চিন্ত হল।

ক্রমে দিন কেটে যায়। কিন্তু নিশিকান্ত আর হরিমতী চেষ্টা করলে কী হবে, দামোদরের চরের সেই রাতের স্মৃতি থেকে যায় দুজনের বুকেই। তাই বুঝি রোজ সন্ধেবেলা দাসীমহলে হরিমতীর খবর নিয়ে যায় নিশিকান্ত আর সকালে বিকেলে কাজের মাঝে সুযোগ পেলেই চিকের ফাঁক দিয়ে দূরের মাঠে নিশিকান্তদের মহড়া দেখে হরিমতী। দামোদরের সেই শুক্লাচতুর্দশীর রাতের সুখস্মৃতি ক্রমে ক্রমে শিকড় ছড়াতে থাকে তাদের অন্তরমহলে। এদিকে দাসীমহলে গুঞ্জন শোনা যায় যে দীপাবলী উপলক্ষ্যে নিশিকান্ত কোনো এক দাসীর মাধ্যমে হরিমতীর জন্যে একখানা শাড়ি পাঠিয়েছে। আর সেই কথাটা একসময়ে পৌঁছেও যায় রানিমার কানে।

দীপাবলীর পরে একদিন রানিমা আদ্যাপ্রসাদের মাধ্যমে ডেকে পাঠান নিশিকান্তকে। ভয়ে ভয়ে নিশিকান্ত একজন দাসীর সাথে যায় অন্দরমহলের দ্বারে। দাসী সেখান থেকেই ফিরে যায়।

নিশিকান্ত এর আগে কখনো রাজবাড়ির অন্দরমহলে আসেনি। সে দেখতে থাকে দূরের দরাজ বারান্দায় হাতির দাঁতের তৈরি সাদা টেবিল আর চেয়ার রাখা। টেবিলের ওপরে রাখা পানের বাটা, শ্বেতপাথরের গেলাস, জর্দার কৌটো আর একটা পিকদানী। চেয়ারে সাদা খোল আর সোনালি জরীপাড়ের শাড়ি পরে বসে জাফরী চুঁইয়ে আসা সদ্য হেমন্তের সোনালি রোদ মেখে রানিমা তালপাতায় লেখা একখানা পুঁথি পড়ছেন সুরেলা গলায়—

সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্নু   চিত্তে না পড়এ আন

তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে।

আইল চৈত মাস কি মোর বসতী আশ

নিফল যৌবন ভারে॥

কী সুন্দর রানিমার গলা। তবু নিশিকান্তর ভয় কাটছে না। কি জানি, হরিমতীকে শাড়ি পাঠিয়েছে বলেই কি রেগে গেছেন রানিমা? তাইই হবে বোধ হয়। ভয়ে চুপ করে অন্দরমহলের দ্বারেই দাঁড়িয়ে থাকে সে। এই প্রথম বোধ হয় সে বুঝতে পারছে ভয় বস্তুটা কী। কই, আগে তো তার বুক এমন দুরুদুরু করেনি? তাহলে এখন কেন করছে?

আসলে সে জানে না যে ভালোবাসার গোপন অনুভূতি মানুষকে ভেতরে ভেতরে ভীতু করে দেয়।

…সাগরসঙ্গম গিআঁ গাএর মাঁস কাটিআঁ

আপণা মগর ভোজ দিআঁ।

এ জন্মে বা না কয়িলোঁ ভাগ হারায়িলোঁ কাহ্নের লাগ

আর তার না পায়িবোঁ লাগ॥

রানিমা যে ভাষায় পুঁথিটা পড়ছেন তার ভাষা নিশিকান্তর অজানা। তবে বাংলা ভাষার সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পাচ্ছে সে। দুর্বোধ্য, তবু যেন কোথায় একটা স্বর্গীয় সুর লুকিয়ে আছে ওই লেখায়। রানিমা পড়েই যাচ্ছেন। কোনোদিকে তাঁর হুঁশ নেই।

…তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কৌলে বসী

নেহানিলোঁ তাহার বদনে।

ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী

বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে॥

চউঠ পহরে কাহ্নু করিল আধর পান

মোর ভৈল রতিরস আশে।

দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

পড়া শেষ হলে পুঁথিটা বন্ধ করে রাখলেন রানিমা। তারপরে গেলাস থেকে জল খেয়ে পানের বাটা থেকে একখিলি পান মুখে পুরলেন। রুপোর কৌটো খুলে এক চিমটে জর্দা নিয়ে মুখে দিতে যেতেই তাঁর নজরে পড়ল নিশিকান্তকে। দরজার কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে।

—'এদিকে এসো নিশিকান্ত। কথা আছে।' জর্দা মুখে দিয়ে বলেন রানিমা।

তাই পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে সে রানিমাকে প্রণাম করে। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—'কতক্ষণ এসেছ?'

—'আজ্ঞে, খানিক আগে। আপনি পুঁথি পড়চিলেন বলে ডাকিনি। শুনচিলাম।'

—'তা শুনে কী বুঝলে?'

—'আজ্ঞে মা, আমি মুকখু মানুষ। আমি এর কি বুইবো।' নিশিকান্তর অকপট স্বীকারোক্তি। 'তবে ভাষাটা ক্যামন যেন বাংলা বাংলা লাগচিলো।'

—'ঠিকই ধরেছ। ওটা বাংলাই। আমি বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা-বিরহ অংশটা পড়ছিলাম। তা এখানে শ্রীকৃষ্ণের জন্যে রাধার বিরহের কথা লেখা আছে, বুঝলে?' মনে হচ্ছে রানিমার মেজাজ এখন ভালোই আছে। হয়তো বকাঝকা করবেন না। তবু বলা তো যায় না। আশা আর শঙ্কা একইসঙ্গে জুড়ে থাকে নিশিকান্তের মনে।

—'অ, তা আমি কি আর এসব বুজি রানিমা।'

—'কেন বুঝবে না। এতে তো তোমার জন্যেই শ্রীরাধার বিরহের কথা লেখা আছে।' নিশিকান্ত রানিমার এই রহস্য বুঝতে পারে না। তাই সে বলে— 'আমি ঠিক বুজলুম নি, মা।'

ঈষৎ ভারী গলায় রানিমা বলেন— 'তুমি কি তোমার নামের মানেও জানো না?'

—'আজ্ঞে, না মা।'

—'তোমার নামের মানে হল শ্রীকৃষ্ণ। আমি তাই তোমার সাথে একটু রহস্য করছিলাম।' তার নামের অর্থ শুনে নিশিকান্তও অবাক। এসব কথা বড়োমানুষেরা ছাড়া আর কে জানবে? তবে হ্যাঁ, রতন কত্তা থাকলে বলতে পারত। সেইই তো দিয়েছিল নামটা।

—'তা হ্যাঁ, যে জন্যে তোমায় ডেকেছিলাম।... শোনো নিশিকান্ত, দাসীমহলে তোমাকে আর হরিমতীকে নিয়ে নানান কথা উড়ছে। আমি চাই এইসব বন্ধ হোক। তাই আমি একটা ব্যবস্থা নিতে চাইছি।'

ভয় ক্রমশ বাড়ছে নিশিকান্তর। কি জানি রানিমা কি ব্যবস্থা নিতে চাইছেন। তাকে অথবা হরিমতীকে, কিংবা হয়তো তাদের দুজনকেই দূর করে দেবেন। তাকে বের করে দিলে সে তার গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষ-আবাদ শুরু করবে। কিন্তু হরিমতী? তার তো আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। তার কী হবে? তাই কাঁচুমাচু মুখে সে বলে— 'কী ব্যবস্থা মা?'

—'তোমায় হরিমতীকে বিয়ে করতে হবে।'

—'কিন্তু...কিন্তু তার যে সোয়ামী বত্তমান মা। আর সমাজই বা কী কইবে? তা চাড়া একানে আমারও তো বাপ-মা নেই। তারাই বা কি কইবেন এই কতা শুনলে।'

—'সে দায়িত্ব আমার। এখন বল, তুমি কি রাজি? হরিমতীর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। সে মত দিয়েছে, যদিও সে তোমার মতোই সমাজের ভয় করছিল। তবে আমি তাকে বুঝিয়ে বলেছি।'

—'কিন্তু মা, একানে থাকলে পরে যে নোকে কতা শোনাবে। তা চাড়া তার শোউরবাড়ির নোকজনও আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে নি।'

—'তার ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি নিশিকান্ত। তবে তোমাদের শুধু এই শহরে থাকা চলবে না। জানোই তো যে তোমাদের মহারাজ শয্যাশায়ী। সেইকারণে আমাকেই সব দেখতে হচ্ছে। তা ক-দিন আগেই আদ্যাপ্রসাদ বলছিল যে আমাদের চাঁপাডাঙা তালুকের লেঠেলদের শক্তিশালী করার দরকার। কারণ মহারাজের অসুস্থতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করার লোকের অভাব নেই সেখানে। কাছাকাছি চন্দননগরেও তো ফরাসিদের আড্ডা। তাই আমার ইচ্ছে এক মাসের মধ্যেই তোমরা সেখানে যাও। আমি কাল আদ্যাপ্রসাদকে বলে রেখেছি। সে যেন সেখানে তোমার পছন্দমতো জায়গায় কিছু নিষ্কর জমির ব্যবস্থা করে দেয়। আর বিয়ের দিনে তোমার পরিবারের লোকজনও হাজির থাকবে সেখানে। সে বন্দোবস্তোও আমি করে দেব। তাঁরা রাজি হবেনই। আর সমাজের কথা বলছ? রাধারও

তো স্বামী ছিল। তবু তাঁর আর শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ককে আজও শ্রদ্ধার চোখে দেখি আমরা। তাহলে তোমাদেরই বা দোষটা কোথায়?'

রানিমার কাছ থেকে এতটা আশা করেনি নিশিকান্ত। উনি তাঁর সময়ের চেয়ে এতটা এগিয়ে ভাবতে পারেন? সে আর কি বলবে? রানিমা যে মানুষের ভালোবাসার সম্পর্ককে এতটা দামি মনে করেন তা সে জানত না আগে। সে ভাবতে থাকে— ভাগ্য তার জীবনটাকে এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? এমনটাতো সে কস্মিনকালেও ভাবেনি।

—'আমার কথা তো শুনলে। এবারে সেইমতো কাজ হোক। একটা সময়ে জীবনে থিতু হতে হয়।' রানিমা উঠে দাঁড়ালেন।

—'তাহলে তুমি এখন এসো নিশিকান্ত।'

এরপরে অঘ্রাণ মাসের এক শুভদিনে চাঁপাডাঙার দামোদরের পাড়ের এক দু-কামরার বাড়িতে তারা সংসার পাতে। আর আজ রজনীকান্ত থাকে সেই বাড়িতেই।

১৯৪৩, এপ্রিল

সেনেদের পোড়োবাড়ি, হিংয়ের চা আর স্বদেশি সাবান

আজ যেতে হবে জলার ধারে সেনেদের পোড়োভিটেয় শ্যামাদাসদার সঙ্গে দেখা করতে। তাই সাড়ে নটা নাগাদ রজনীকান্ত রাতের খাবার খেয়ে নিলো। দাদুর ছবির নীচে বাসনকোসনের ট্রাঙ্কের ওপরে রাখা দাদুর তোরঙ্গ। তাতে নতুন তালা লাগিয়েছে সে যাতে কেউ সেটা খুলতে না পারে। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খোলে রজনী। তারপর তোরঙ্গের ভেতর থেকে বের করে আনে মাথায় ভারী সীসের বল লাগানো সরু লম্বা কাছি। পুরোনো হয়েছে। তবে এখনও শক্তপোক্ত আছে। একবার সময় সুযোগ করে পালটাতে হবে কাছিটা। তোরঙ্গের তালা লাগিয়ে আবার বন্ধ করে দিল। তারপরে একের পর এক পাক মেরে পাজামার কোমরের কাছে জড়িয়ে নিলো কাছি। তার ওপরে পরে নিলো মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি। হয়তো এসবের কোনো দরকারই পড়বে না; তবু সাবধানের মার নেই। স্বদেশি যারা করে, তারা তো আর খুনে গুন্ডা নয়। তবু...। ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে হাতে নিলো একটা টর্চ। এই টর্চ জ্বালানোর প্রয়োজন তার পড়বে না। সে অন্ধকারেও দিব্যি দেখতে পায়। কিন্তু তার এই বিশেষ ক্ষমতাগুলোর আঁচ সে কাউকে জানান দিতে চায় না। শুধু স্বদেশিদের কেন, সাধারণ মানুষদের চোখেও সে একজন চাকুরিজীবি আর তাইকোন্ডো শিক্ষক হয়েই থাকতে চায়।

ঘরে তালা লাগিয়ে আঙিনায় নামল রজনী। এখান থেকে মাইল দুয়েক গেলে কচুরিপানা ভরতি জলা আর তার পাশেই সেনমশাইদের পোড়ো ভিটে। গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে হওয়ার জন্যে আর সাপখোপের ভয়ে এদিকটায় কেউ বড়ো একটা আসে না। গোপন স্বদেশি কাজকর্ম করার জন্যে বেশ ভালো জায়গাই বেছেছে শ্যামাদাসদা।

বাড়ির কাছে পৌঁছে আশপাশটা ভালো করে দেখে নিলো রজনী। জলার পাশ দিয়ে একটা মেঠোপথ চলে গেছে বাড়িটার দিকে। বড়োজোর একটা গোরুরগাড়ি যেতে পারে

সেইপথে। পথের মাঝামাঝি এসে উবু হয়ে বসে রাস্তার মাটির দিকে নজর চালায় সে। কয়েকটা সাইকেলের চাকার দাগ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে ভালো করে দেখে। ওপরের তলার জানলার খড়খড়ি অনেক ভেঙে পড়েছে, নাকি কেউ খুলে নিয়ে গেছে। একই অবস্থা নীচের তলারও।

তারপরে আস্তে আস্তে বাড়ির সদর দরজায় এসে দাঁড়ায়। দরজাটা একটু ফাঁক করে সন্তর্পণে মাথাটা গলিয়ে ভালো করে দেখে নেয়। মাঝে মস্ত উঠোন আর তার চারপাশে মোটা মোটা থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দোতলাটা। সেই থামের গায়ে হেলান দিয়ে ইতিউতি রাখা তিনটে সাইকেল। সেইসঙ্গে নজরে পড়ে বাঁ-দিকের একটা দরজার দিকে। বন্ধ। তবু তার ফাঁক দিয়ে একটা সরু আলোর রেখা এসে পড়েছে উঠোনে।

এবারে সদর দরজা খুলে ইচ্ছে করেই টর্চটা জ্বালায়। সামান্য আওয়াজ করে দরজাটাও ভেজিয়ে দেয় ঘরের ভেতরের লোকেদের তার আগমন জানান দেওয়ার জন্যে। আর তারপরেই খানিক চাপা গলায় কে যেন বলে ওঠে— 'টর্চটা নেভান। ভেতরে আসুন।' রজনী ঘুরে দেখে, যে ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে সে আলোর রেখা দেখেছিল সেই দরজাটা খানিক ফাঁক হয়ে গেছে আর তার সামনে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ। সে যে শ্যামাদাসের চ্যালা দিনেশ, তা আর বুঝতে বাকি থাকে না। যেন অন্ধকারে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না, এমন ভাণ করে ঘরের সামনে গিয়ে পৌঁছায় রজনী। দিনেশই দরজা খুলে তাকে ভেতরে যাওয়ার পথ করে দেয় আর তারপরে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দেয় সে।

ঘরের একধারে একটা টেবিল-চেয়ার আর এদিকে ওদিকে ছড়ানো চারটে কাঠের পেটি, একটা মোড়া, হাতল ভাঙা দুটো চেয়ার। ঘরের একদিকের তাকে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি আর টেবিলের পেছনে রাখা চেয়ারটায় বসে শ্যামাদাসদা। একটা পেটিতে বসে বিষ্টুচরণ। অবশ্যই সাধারণ বেশে।

—'এসো, রজনী এসো। খানিক আগেই এসে পড়েছ দেখছি। তা পথে আসতে কোনো অসুবিধে হয়নি তো? যা অন্ধকার।'

—'আজ্ঞে না শ্যামাদা। সঙ্গে তো টর্চ আছে।'

—'পথে কারোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি?'

—'আজ্ঞে না।'

—'তা আর কেউ কি জানে যে তুমি এখানে আসছ? তোমার সুরেশ কাকা জানে?'

—'না না, কেউ জানে না শ্যামাদা।'

শ্যামাদাসদা মুচকি হেসে ঘাড়টা দোলায়। একটা সিগারেট ধরায়।

তারপর বলে— 'বাঃ, বেশ বুদ্ধিমান ছেলে তুমি। কলকাতার অফিসে চাকরি কর। স্মার্ট। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তোমার মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে কেন আমি তোমাকে এইভাবে গোপনে ডেকে নিয়ে এলাম এখানে। সেটাই স্বাভাবিক।... কিন্তু কেন তোমাকে এখানে ডাকলাম বল তো?' সিগারেটে একটা লম্বা টান দেয় শ্যামাদাস।

একটু বোকা সাজার ভাণ করে রজনী বলে— 'আজ্ঞে, আপনারা তো স্বদেশি করেন। আর পুলিশ তো স্বদেশিদের পেছনে পড়ে আছে। তাই গোপন কোনো শলা-পরামর্শের জন্যেই হয়তো পুলিশের অজানা এই আড্ডায় আমায় ডেকে এনেছেন।'

একমুখ ধোঁয়া বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে শ্যামাদাস বললে— 'তোমার এই ধারণা আধা-সত্যি রজনীকান্ত। আমরা যে স্বদেশি করি, তা এখানকার পুলিশ জানে; তবে আমাদের এই গোপন আড্ডার কথা শুধু পুলিশ কেন, গাঁয়ের কেউই জানে না। তা ছাড়া কোনো গোপন শলা-পরামর্শ করার জন্যে তোমাকে এখানে ডাকিনি; এমনকী আমাদের দলের সদস্যপদ নেওয়ার কথাও তোমাকে বলব না।'

—'তাহলে কী জন্যে শ্যামাদা?'

—'বলছি, বলছি। এত উতলা হবার কিছু নেই।' সিগারেটে আবার একটা টান দিয়ে শ্যামাদাস বলতে থাকে— 'তুমি তো কলকাতায় যাও। সেখানে আমাদের অন্যান্য বড়ো বড়ো স্বদেশি দলের তৈরি স্বদেশি সাবানের জোগান আসে। আমাদেরই কেউ গিয়ে সেই সাবান নিয়ে আসে। আমরা সেগুলো বিক্রি করে দলের খরচ-খরচা চালাই। এখানকার পুলিশ আমাদের দলের লোকেদের চেনে; তবে তাদের কিছু বলত না। কিন্তু ক-দিন আগে স্বদেশি সাবান আনতে গিয়ে দু-জন ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। অবশ্য তারা ভিন গাঁয়ের ছেলে। আমিই সদ্য সদ্য কাজে লাগিয়েছিলাম তাদের। তবে অনেক চেষ্টা করেছিলাম তাদের ছাড়িয়ে আনার। কিন্তু উলটে পুলিশ আমাকে ধমকাল। বলল যে, কলকাতা থেকে নাকি কড়া অর্ডার এসেছে কেউ স্বদেশি ভাবনা নিয়ে কিছু কাজ করছে দেখলেই তাকে অ্যারেস্ট করতে। তাই সেদিনের ওই অনুষ্ঠানটার আয়োজন আমি স্কুলের প্রেসিডেন্ট হেদায়েত মোল্লার নামে করিয়েছিলাম। জানো নিশ্চয়ই যে দারোগা জয়ন্ত রাহা একসময় এখানকার স্কুলেরই ছাত্র ছিল। তাই সেদিন আর পুলিশ আসেনি। তবে আমাদের এখানকার দলের সবার ওপরেই এখন পুলিশের নজর আছে। তার ফলে আমরা কেউ যে কলকাতায় গিয়ে সাবান আনবো তারও উপায় নেই। এদিকে সেদিনের স্বদেশি গানের আসরের আয়োজন করতে গিয়ে বেশ কিছু টাকাও খরচ হয়ে গেছে। হাতে পয়সাকড়ি বিশেষ কিছু নেই। তাই সাবানের জোগান না এলে দলের খরচ-খরচা চলে কী করে বল তো? বড্ড টানাটানি চলছে। তাই আমরা এমন কাউকে চাইছি, যে পুলিশের খাতায় আমাদের দলের লোক নয় অথচ এই গ্রামেরই লোক।'

—'তা আমাকে কলকাতা থেকে স্বদেশি সাবান এনে দিতে হবে। তাইতো শ্যামাদা?' ব্যাপারটা বুঝে রজনী সন্তুষ্ট হয়। তার মন থেকে এতক্ষণের সব দ্বিধা দূর হয়ে যায়। দেশের জন্যে এই সামান্য কাজটুকু করতে পারবে ভেবে তার ভালো লাগে।

শেষ একটা টান মেরে সিগারেটের বাকি অংশটা বিষ্টুকে বাড়িয়ে দিয়ে শ্যামাদাস দিনেশকে বললে— 'দেখেছিস, কেমন বুদ্ধিমান ছেলে। ওরে, আমার জহুরির চোখ। দ্যাখ, কেমন আমার মুখের কথা খসাবার আগেই ব্যাপারটা ধরে নিয়েছে রজনী।'

—'কিন্তু কলকাতার কোথায় ওই সাবান পাওয়া যায় তা তো জানি না শ্যামাদা?'

—'জানবে, জানবে, সব জানবে। এত তাড়া কীসের? তোমাকে যখন একটা কাজের ভার দিতে যাচ্ছি, তখন তো তোমাকে সব বলতেই হবে। নইলে তুমি কাজটা করবে কী করে? তা তুমি বিয়ে-থা করবে না?'

রজনী বুঝতে পারে কলকাতার ঠেকের কথা বলার আগে এটাসেটা কথা বলে শ্যামাদাস তাকে মেপে নিতে চাইছে। এসব লাইনে বাইরের লোককে ঢোকানোর আগে বুঝে নিতে হয় যে সে কতখানি নির্ভরযোগ্য। তাই সে বিনয়ীর হাসি হেসে বলে— 'কত লোকেই তো বিয়ে-থা করে না। এই আপনিও তো দেশের কাজ করবেন বলে বিয়ে করেননি। হয়তো কিছু কিছু মানুষের ভাগ্যটাই এমন হয় দাদা।'

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে সেটাতে দুটো টান মেরে টেবিলে দুই কনুইয়ের ভর রেখে চশমার ওপর দিয়ে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে শ্যামাদাস। রজনী বুঝতে পারে যে কলকাতার কাজকর্ম বিশদে বলার আগে তাকে শেষবারের মতো গভীরভাবে জরিপ করে নিতে চাইছে শ্যামাদাস।

—'শোনো রজনী, কলকাতার বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে পান্ডের চায়ের দোকান। দোকানটা লালবাজারের খুব কাছেই, বুঝলে। মাঝারি রকমের কাস্টমার হয়। তা তোমার অফিসের কাজ শেষ হলে তুমি ওই পান্ডের দোকানে গিয়ে কপালে চন্দনের তিলক কাটা, হাফহাতা গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা পান্ডেকে বলবে একটা "হিংয়ের চা" দিতে। হ্যাঁ, এই কথাটা তখনই তাকে বলবে যখন তার কাছাকাছি কেউ থাকবে না। ওটাই কোড-ওয়ার্ড। পান্ডে তোমাকে দোকানের ভেতরে টেবিলে বসতে বলবে। তুমি দোকানের ভেতরে একটু একান্তে বসবে। খানিক পরেই ও তোমার টেবিলে ব্রাউন কাগজে মোড়া কতকগুলো গুঁড়ো চায়ের প্যাকেট রেখে যাবে। তার মধ্যে একটা প্যাকেটের গায়ে ক্রশ চিহ্ন দেওয়া থাকবে। তুমি সুযোগ বুঝে সাবধানে সেই মার্কা দেওয়া প্যাকেটটা নিয়ে তোমার ব্যাগে রাখবে। ওটাতেই থাকবে সাবান।'

একটানা কথা বলে একটু থামে শ্যামাদাস। সিগারেটে ধীরে সুস্থে আবার দুটো টান দেয়। তারপরে আবার শুরু করে— 'তোমার কাজ শেষ হলে পান্ডের লোক তোমায় চা দিয়ে যাবে। তুমি চা খেয়ে পয়সা দেবে। পান্ডেও তোমায় তার ক্যাশবাক্স থেকে তোমাকে সেই পয়সাটাই ফেরত দেবে। দেখলে মনে হবে যেন তোমার চায়ের দাম কেটে বাকি পয়সা তোমায় ফেরত দিচ্ছে সে। দোকানের বাইরে পুলিশের সাদা পোশাকের "ওয়াচ-ডগ" থাকলেও সে কিছু বুঝতেই পারবে না। ব্যাস, তোমার কাজ শেষ। এরপরে তুমি বেরিয়ে সোজা হাওড়া থেকে ট্রেন ধরবে।... কি রজনী? বুঝতে পারলে? করতে পারবে তো কাজটা?' আবার সিগারেটে টান দেয় শ্যামাদাস। এবারে একটু গা ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে।

একটু ভেবে নিয়ে রজনীকান্ত বলে— 'কাজটা তো হয়ে যাবে। কিন্তু আপনাকে আমি প্যাকেটটা দেব কী করে? তা ছাড়া কাজটা রোজই করতে হবে নাকি?'

শ্যামাদাস বললে— 'পাগল হয়েছ? এসব কাজ রোজ কেউ করে নাকি? পুলিশের নজরে পড়ে যাবে যে সে। তাই শুধু প্রতি বুধবার তুমি পান্ডের দোকানে যাবে। আর সেদিন রাত দশটার সময় বিষ্টুচরণ গিয়ে তোমার বাড়ি থেকে প্যাকেটটা কালেক্ট করে নেবে। ব্যাস, তোমার কাজ শেষ। তা সবকিছু তো জানলে। এবার বল, কাজটা তুমি করবে কি?'

শ্যামাদাসের শেষ কথাটায় অন্য সুর। সেটা বুঝতে রজনীর অসুবিধে হয় না। আর শ্যামাদাসের শাসানির ভয়?...

—'তাহলে সামনের বুধবার পৌঁছে যাব পান্ডের দোকানে।'

শামাদাস বললে— 'এখন এসো তাহলে।' তারপরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে চেপে নিভিয়ে দেয়।

সেনেদের ভিটে থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ির পথে হাঁটতে থাকে রজনী। এবারে ইচ্ছে করেই একটু পরে পরেই টর্চ জ্বালতে থাকে। তার অনুমান মিলে যায় যখন খানিক সময়ের তফাতে তফাতে তার পাশ দিয়ে একে একে সাইকেল চেপে বেরিয়ে যায় দিনেশ,

বিষ্টুচরণ আর শ্যামাদাস। রজনীকান্ত শুধু মুচকি মুচকি হাসে আর সাইকেলে যেতে যেতে একান্তে হাসছিল শ্যামাদাসও।

বুধবারে ফ্রেডরিক সায়েবের অফিসে কাজের চাপ একটু কমই। যুদ্ধের বাজারে এমনিতেই জিনিসের দাম বেশ চড়া। তাই ব্যবসা বাণিজ্যেও একটা মন্দার ধাক্কা। তার মধ্যে রয়েছে মন্বন্তরের জ্বালা। তবে এরই মধ্যে লুটেপুটে খাচ্ছে কিছু ব্যবসায়ী। ফ্রেডরিক সায়েব ইলেকট্রিক সরঞ্জামের ডিস্ট্রিবিউটর। এই অফিস থেকে শুধু টাকাপয়সার হিসেব, অর্ডার নেওয়া আর অর্ডার ডেলিভারি সংক্রান্ত কাগজপত্রের কাজ হয়। গোডাউন অন্য জায়গায়। সেখান থেকেই মাল লোড-আনলোড করা হয়। ফ্রেডরিক সায়েব গেছেন সেখানেই তদারকি করতে।

আমিনদা একটা হিসেব দেখে নিয়ে দু-হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। আর্দালি ডি-ক্রুজ খানিক দূরে একটা চেয়ারে বসে ঢুলছে। সেদিকে একবার দেখে নিয়ে আমিনদা তাঁর সাধের নেশার বস্তুর ডিবেটা বের করে সবে একখিলি জর্দাপান মুখে পুরতে যাবেন, এমনসময় রজনীকান্ত বললে— 'আমিনদা, একটু চা খেলে হত না?'

মুখের সামনে পানের খিলিটা ধরে রেখেই আমিনদা বলেন— 'হ্যাঁ, সে তো ভালোই হত। কিন্তু রাডু বেটা তো ঝিমোচ্ছে। ডাকলেই তো খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠবে।'

—'একটু ভালোভাবে ডেকে বলুন না। ঠিক এনে দেবে। তবে এবারে দামটা আমার। ওকে বলুন, ভালো হিংয়ের চা আনতে।'

শেষটুকু শুনেই বিষম খেলেন আমিনদা। আরেকটু হলেই হাত থেকে পানটা মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল আর কী। সেটা সামলে নিয়ে রজনীকে বললেন— 'কী বললে? কীসের চা?'

—'হিংয়ের চা।'

—'সেটা আবার কী? হিং দিয়ে কেউ চা খায় নাকি?'

—'আরে খায় খায়। কাবলেরা খায়। হিং, আদা, পাতিলেবু আর বিটনুন দিয়ে।'

—'তাই নাকি?'

—'হুম। হিং-চা রেগুলার খেলে গ্যাস, অম্বল কিচ্ছু থাকে না। কাবলেদের কখনো ঢেঁকুর তুলতে দেখেছেন?'

'হেউউ' করে একটা বিশাল ঢেঁকুর তুলে ডি-ক্রুজের ঝিমুনি ছুটিয়ে দিয়ে আমিনদা বললেন— 'না, কাবলেদের কখনো ঢেঁকুর তুলতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

—'তাহলেই বুঝে দেখুন, হিং-চায়ের কত গুণ। অথচ আপনি দিনে কতবার ঢেঁকুর তোলেন গুনে দেখেছেন কি? আজ অফিসে আসা থেকে এই নিয়ে তেইশটা হল।'

—'তা, তুমি কি সকাল থেকে আমার ঢেঁকুর গুনছ নাকি?'

—'তা কেন? কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখনই ঢেঁকুরের আওয়াজ পাচ্ছি, তক্ষুনি এই কাগজটাতে একটা করে ঢ্যাঁড়া দিয়ে রাখছি। আগেই বাইশটা হয়ে গিয়েছিল। তাই হিং-চায়ের কথাটা বললাম।'

এবারে আমিনদা বোধ হয় একটু অপরাধবোধে আক্রান্ত হলেন। পানটা ডিবেতে ঢুকিয়ে রেখে বললেন— 'সত্যি? তাহলে তো এইটা নিয়ে তেইশটা হয়ে গেছে। কিন্তু ঢেঁকুর কমাবার জন্যে হিং-চা ছাড়া আর কি কোনো উপায় নেই রজনী?'

—'থাকবে না কেন? খুব সহজ একটা উপায় আছে; আর সেটা হল ওই জর্দাপান ছেড়ে দেওয়া।'

আঁতকে উঠলেন আমিনদা। —'সে কী গো রজনী, সেই সতেরো বছর বয়েস থেকে ঠাকুমার ডিবে থেকে পান চুরি করে খাচ্ছি...। এতদিনের অভ্যেস। ছাড়ি কী করে বল তো? না, না, অন্য কোনো উপায় জানা থাকে তো বল।'

—'তাহলে ওই হিং-চা। মাসখানেকের মধ্যেই অফিসটাইমে ঢেঁকুরের সংখ্যাটা দশে নেমে আসতে পারে। তবে দিনে অন্তত বার তিনেক খেতে হবে।'

—'তাহলে রাড়ুকে বলি হিং-চা আনতে? দামটা না হয় আমিই দেব।' আমিনদা মনে হয় একটু প্রসন্ন হলেন এবারে।

—'বলে দেখুন।'

আমিনদা ডি-ক্রুজকে ডেকে বললেন— 'বাবা রাড়ু। সায়েব তো এখন ঘরে নেই। তাই বলি কী কেটলিটা নিয়ে গিয়ে সামনের দোকান থেকে তিন কাপ হিং-চা এনে দাও না বাবা।'

রডরিক্স উঠে এসে বলে— 'ক্যা চায়?'

—'আরে বাপু, হিং-চা, হিং-চা। কাবলেরা খায়। গ্যাস, অম্বল কমে।'

রজনীকান্ত মুচকি মুচকি হাসছে আমিনদাকে আড়াল করে।

রডরিক্স খেঁকিয়ে ওঠে— 'হিং মিলাকে চায় কভি বনতা হ্যায় ক্যা? ইউ ফুল। আরে, হামার জ্যায়সা ইংলিশ দারু পিয়ো। গ্যাস দূর ভাগেগা। পিনা হ্যায় তো বোলো। পৈসা দো, লা দেতে হ্যায়। হাঁ, লেকিন অফিস মে পিনা মত।'

—'ছিঃ ছিঃ ছিঃ। সে কী কথা। দেখেছ রজনী, শেষে কিনা মদ খেতে বলছে।'

—'তবে আপনার রাড়ুর কথাটাও ফ্যালনা নয়। মদ খেলেও ঢেঁকুরের সংখ্যা কমবে কিন্তু। এখন ভেবে দেখুন কী করবেন।'

—'না না বাপু, দরকার নেই মদ খেয়ে। শেষে বাড়ির রোয়াকে বসে কাটাতে হবে সারারাত। ছেলেপিলেরাও ভাববে কি। না বাবা রাড়ু, তোমায় হিং-চাও আনতে হবে না আর মদও আনতে হবে না। তুমি তোমার কাজ করোগে যাও।'

রডরিক্স গজগজ করতে থাকে— 'এইসা বুরবক আদমি ম্যায়নে জিন্দগি মে নেহি দেখা।' বলতে বলতে সে আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ে।

—'ওঃ বাব্বাঃ, যেন ঝড় বয়ে গেল।' বলে আমিনদা খানিকটা জল খেয়ে আবার একটা ঢেঁকুর তুলে নিজেই বললেন— 'এটা নিয়ে চব্বিশটা। ঢ্যাঁড়া কাটো রজনী।'

রজনী কিন্তু এবারে সত্যিই হো-হো করে হেসে ফেলল।

বুধবার সন্ধে ছ-টা নাগাদ রজনী গিয়ে পৌঁছল বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের পান্ডের চায়ের দোকানে। শ্যামাদাসের দেওয়া চেহারার বর্ণনা দেখে বুঝে নিলো যে চা বানাচ্ছে, সেইই পান্ডে।

একটা বেয়ারা রেকাবে করে পান্ডের কাছ থেকে চার ভাঁড় চা নিয়ে ভেতরে যেতেই রজনী তার কাছে গিয়ে একটু নীচু স্বরেই বলল— 'এক হিং-চায় দিজিয়ে।' পান্ডে তাকে একবার আপাদমস্তক মেপে নিয়ে বললে— 'অন্দরমে দারোয়াজাকে পাস এক টেবল খালি হ্যায়। উধার যা কে বৈঠিয়ে।' সেই টেবিলে গিয়ে বেঞ্চে বসে রজনী তার কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা রাখলে টেবিলের ওপরে, যাতে তার কাজের সুবিধে হয়। মিনিট চারেক পরেই পান্ডে তার চা বানানো বন্ধ রেখে রজনীর টেবিলের পাশেই ভেজানো দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। সেখান থেকে ছ-টা ব্রাউন কাগজের চায়ের প্যাকেট বের করে কাছেই রজনীর টেবিলের ওপরে রেখে হাঁক পাড়লে— 'জয়লাল, আজ বিনোদবাবু নে কিতনা পাকিট সিটিসি ভেজা?' ভাবখানা এমন যেন সে বিনোদবাবুর পাঠানো প্যাকেটের হিসেব মেলাচ্ছে।

ওদিক থেকে জয়লাল জবাব দিল— 'পাঁচ'।

পান্ডে প্যাকেটগুলো রজনীর টেবিলে রেখেই একটা একটা করে গুনতে লাগল। সেই ফাঁকে একটা প্যাকেটের গায়ে এমনভাবে টোকা মারল, যেন রজনী সেটা দেখতে পায়। পান্ডে টোকা মারতেই সে দেখল যে সেই প্যাকেটের গায়ে একটা ক্রশ চিহ্ন দেওয়া আছে। সে চটপট নিজের ব্যাগটা টেনে নিয়ে অন্য প্যাকেটের আড়ালে সেই বিশেষ প্যাকেটটা টুক করে নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল। ব্যাগটা নামিয়ে পাশেই বেঞ্চের ওপরে রাখল।

পান্ডেও গলা তুলে বললে— 'হাঁ, সহি ভেজা হ্যায়।... আরে, এ বুরবক, ইয়ে সাব কবসে বৈঠা হ্যায়। ইনকো চায় দেগা কব?'

—'হাঁ, দেতা হুঁ' বলেই জয়লাল চটপট একটা গরম চায়ের ভাঁড় এনে নামিয়ে রাখল রজনীর টেবিলে। ধীরে সুস্থে চায়ে চুমুক দিতে লাগল রজনী। পান্ডে কিন্তু চা টা ভালোই বানায়।

চা শেষ করে মিনিট পাঁচেক বসে থেকে পয়সা দেওয়া নেওয়ার চালবাজি খেলে রজনী নেমে পড়ল রাস্তায়। উলটোদিকের ফুটপাথে একটা ভাতের হোটেলের সামনে একটা ধুতি আর বাংলা শার্ট পরা লোক দাঁড়িয়ে খৈনি ডলছে। তার পাশে একটু দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে সে লক্ষ্য করলে যে তার নজর রয়েছে পান্ডের দোকানের দিকে। তারপরে রুমালটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে সে লালবাজারের দিক দিয়ে হাঁটা মারল হাওড়ার দিকে।

সুরেশ কাকা বললে— 'কিগো দা-বাবু, আজ এত দেরি হল যে।'

—'আর বলো না। যখন তখন সাইরেন বাজে আর কাজকম্ম সব ফেলে রেখে গিয়ে ঢুকতে হয় সেই বালির বস্তার আড়ালে। তা তখনকার ফেলে রাখা কাজগুলো শেষ করতে হবে তো।'

রজনীকান্তর মুখে কলকাতার গল্প শুনে শুনে সুরেশ কাকাও জানে যে সাইরেন কখন বাজে। তাই রজনীর কথাটা তার কাছে বিশ্বাসযোগ্যই মনে হয়। ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা নিজের ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে সে বলে— 'আজ আর তাইলে জলখাবার খে কাজ নেই। হাত মুখ ধুয়ে এক্কেরে ভাত খেয়ে নিও। ঢাকা দেওয়া আচে বুইলে?'

—'ঠিক আছে। তুমি এসো।'

সুরেশ কাকা দাওয়া থেকে নেমে নিজের বাড়ির পথ ধরে।

ঘরে ঢুকে একদমই সময় নষ্ট করতে চায় না রজনী। নিশ্চয়ই তাকে ফিরতে দেখেছে শ্যামাদাসের দলের লোকেরা। যেকোনো সময়ে হাজির হতে পারে বিষ্টুচরণ; যদিও সময় দিয়েছে দশটা। কিন্তু কী আছে প্যাকেটটাতে? সত্যিই কি সাবান? আর উলটোদিকের ফুটপাথে দাঁড়ানো লোকটাই বা কে? কেনই বা একটা প্যাকেটের জন্যে কোড-ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয়? এইরকম অনেক প্রশ্নে খচখচ করছে তার মন। একটা অস্বস্তি। তাকে তার সন্দেহ মেটাতেই হবে। তবে যা করার তা তাড়াতাড়ি করতে হবে। তাই চটপট জামাকাপড় পালটে নিয়ে সে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপরে একটা বাটিতে সামান্য একটু জল নিয়ে প্যাকেটটার আঠা দিয়ে জোড়া অংশে লাগায় সে। একটু ভিজে নরম হলে প্যাকেট খুলতে সুবিধে হবে। আঠা লাগানো জায়গাগুলো একটু ভিজলে পরে সে সাবধানে প্যাকেটের ভাঁজ খোলে। ভেতরে সাবানের প্যাকেট থাক থাক করে রাখা। সেগুলো কিন্তু সিল করা। দু-চারটে প্যাকেট খুলে হাতে ধরে শুঁকে দেখে। লণ্ঠনের আলোয় ভালো করে পরীক্ষা করে। নাঃ, এগুলো সত্যিই সাবান। পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত হয় সে। যাক, তাহলে শ্যামাদাসদা মোটেই মিথ্যে বলেনি। তাই তড়িঘড়ি আবার সাবধানে সব প্যাকেট ঠিকমতো সাজিয়ে ব্রাউন কাগজটা আগের মতোই নিঁখুত ভাঁজ করে দেয়। তাক থেকে আঠার শিশিটা নামিয়ে জুড়ে দেয় ঠিক আগের মতো। তারপর কাঁচা আঠা লাগানো জায়গাগুলো লণ্ঠনের কাঁচের গায়ে চেপে ধরে ঝটপট শুকিয়ে ফেলে সে।

যাক, এবার নিশ্চিন্ত। প্যাকেটটা তার ঝোলাব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে জামাকাপড় পালটে টিউবওয়েল থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আসে।

একটু পরেই টর্চের আলো। এগিয়ে আসছে। রজনীকান্ত হাঁক মারে— 'কে? বিষ্টু নাকি?'

—'হ্যাঁ। সাবান এনেচ?'

—'হুঁ। শ্যামাদাকে দিয়ে দিও।'

—'সে আর বলতে। দাও।' দাওয়ায় উঠে আসে বিষ্টুচরণ।

রজনী ব্যাগ থেকে প্যাকেটটা বের করে বিষ্টুকে দেয়। টর্চের আলোয় সেটা একবার দেখে নেয় বিষ্টুচরণ। তারপর দাওয়া থেকে নামতে নামতে বলে— 'তাইলে সামনের বুধবার আবার দেকা হবে। এই সময়ে।' রজনী ঘরে ঢুকে হাতঘড়িটা দেখে। দশটা বেজে বারো।

১৯৪৩, সেপ্টেম্বর

ব্রাগানজার লাঠিচার্জ, শ্যামাদাসের টার্গেট আর ছদ্মবেশী

মন্বন্তর লাগার সাথে সাথে বেশ থিতিয়ে গেছে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। গান্ধীজি এখন পুনার আগা খান প্যালেসে বন্দি। তবে তাঁর শরীর খুবই খারাপ। তাঁর অনশনেও কোনো টনক নড়েনি সরকারের। সেইসঙ্গে কংগ্রেসের শীর্ষনেতারাও বন্দি। এ ছাড়া গত একবছরে

সারা দেশে প্রায় চারশো প্রতিবাদী স্বেচ্ছাসেবক মারা গেছে পুলিশের হাতে। প্রায় একলাখ মানুষকে জেলে পুরেছে ব্রিটিশ রাজশক্তি। চাষিদের ওপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নতুন 'যুদ্ধ-কর' ; আর দেশে উৎপন্ন শস্য পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাইরে। যেটুকুও বা অবশিষ্ট খাদ্যশস্য থাকে, তারও সুষম বন্টন হয় না। বেশিরভাগটাই চলে যায় কালোবাজারে। তারই ফলে গ্রামগঞ্জ থেকে শহরে আসছে হাজার হাজার ভুখা মানুষ। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে এখনও চলছে প্রতিবাদী আন্দোলন। তবে সেগুলোকে জোর করে দমিয়ে দিচ্ছে ব্রিটিশের পুলিশ। দেশের সাধারণ মানুষও এইসব দেখে ক্ষুব্ধ। তাদের অন্তরে জ্বলছে চাপা আগুন। কলকাতাও তার ব্যতিক্রম নয়।

রজনীকান্ত সব শোনে, সব দেখে। তারও ইচ্ছে করে প্রতিবাদী মিছিলে সামিল হতে। কিন্তু তার ছেলেদের কথা ভেবে সে বিরত থাকে।

এই তো যেমন ক-দিন আগেই ধর্মতলায় একটা প্রতিবাদীদের মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে এক উচ্চপদস্থ ইংরেজ পুলিশ অফিসার শুধু নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করাই নয়, কাঁদানে গ্যাসও ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়। সেদিনটাও ছিল বুধবার। খানিক আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে রজনীকান্ত যাচ্ছিল বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের পান্ডের দোকানে। ধর্মতলার কাছাকাছি আসতেই তার চোখ জ্বলতে শুরু করে। কোনোরকমে রাস্তার ধারের ঘোড়ার জলখাওয়ার জায়গা থেকে পকেটের রুমালটা ভিজিয়ে নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে যাচ্ছিল সে। প্রায় আধা-দৌড় আর কী। এমনসময় তার গায়ে এসে পড়ে প্রতিবাদীদের একজন। অল্পবয়েস। তাকে এক নাকেচোখে ঠুলি পরা ইংরেজ পুলিশ অফিসার নির্মমভাবে হাতের ব্যাটন দিয়ে পেটাচ্ছে। মাটিতে পড়ে গেছে ছেলেটা। দু-হাতে মাথা চেপে ধরে আছে। সেখান থেকে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত। যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে সে, তবু পুলিশ অফিসারের ব্যাটন থামার নাম নেই। সায়েবের ওই নৃশংসতা দেখে শেষপর্যন্ত রজনী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। সে এগিয়ে যায় কোনোরকমে ওই অফিসারের আক্রোশ থেকে ছেলেটাকে সরিয়ে নিতে। তার পিঠে ততক্ষণে আছড়ে পড়তে শুরু করেছে ব্যাটন। পাছায় লাগছে সায়েবের শক্ত বুটের ডগার গুঁতো। কিন্তু এসব মার অবলীলায় সহ্য করার মতো শরীর তৈরি করেছে সে। তাই রজনীকান্ত ওই আছড়ে পড়া ব্যাটন থেকে ছেলেটাকে আড়াল করে তাকে চাগিয়ে তুলে নেয় কাঁধে। ছেলেটার ওজন পঞ্চাশ-বাহান্ন সেরের কাছাকাছি হবে। কিন্তু যে রাতের অন্ধকারে নুড়ি-বালির বস্তা পিঠে নিয়ে নদীর চরে দৌড়োয়, তার কাছে এই ওজনটা কিছুই নয়। তাই দৌড়...দৌড়...দৌড়। যে করেই হোক ছেলেটাকে কাঁদানে গ্যাসের আওতার বাইরে নিয়ে যেতেই হবে। প্রায় আধমাইল দৌড়ে একসময়ে সে পৌঁছেও যায় গ্যাসের চৌহদ্দির বাইরে। সেখানে একটা টিউবওয়েলের কাছে ছেলেটাকে নামিয়ে জল দিয়ে ধুইয়ে দেয় তার মুখ চোখের রক্তের ধারা। ততক্ষণে জমা হয়ে গেছে স্থানীয় কিছু লোক। তারাও হাত লাগায়। ছেলেটাকে ধরাধরি করে তারাই নিয়ে যায় কাছেরই এক ডাক্তারখানায়।

খানিকপরেই বেরিয়ে আসে রজনী। তাকে এবার তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে পান্ডের দোকানে। কিন্তু ছেলেটার মাথা থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্তের ফোঁটা ভিজিয়ে দিয়েছে তার জামার কিছুটা অংশ। এই অবস্থায় তো আর ঘোরাফেরা করা যায় না। তাই সে কাছেরই একটা কাপড়ের দোকান থেকে একটা সস্তা দামের গাঢ় খয়েরি রঙের গায়ের চাদর কিনে জড়িয়ে নেয় গায়ে। তারপর সে সটান হাজির হয়ে যায় পান্ডের দোকানে।

আজকাল আর পান্ডেকে দেখিয়ে দিতে হয় না কোন প্যাকেটটা নিতে হবে। যে বেঞ্চে রজনী বসবে সেই বেঞ্চে আগে থাকতেই সাজিয়ে রেখে দেয় প্যাকেটগুলো যাতে অন্য

কেউ যেন সেই বেঞ্চে বসতেই না পারে। আর সুযোগ বুঝে বিশেষ প্যাকেটটা টুক করে নিজের ব্যাগে চালান করে দেয় রজনী। তবে আজ দোকানের কাজ সেরে বাইরে বেরিয়ে সে দেখল উলটোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা আর নেই। স্রেফ ভ্যানিশ।

এবারে সে হাঁটতে থাকে ফুটপাথ দিয়ে। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকে। তবু শুনতে পেয়েও সাড়া না দিয়ে সে দু-পা পাশে সরে গিয়ে হাঁটতে থাকে। সারা শরীর সজাগ হয়ে ওঠে তার।

কিন্তু আবার ডাক আসে পেছন থেকে— 'কী রে রজনী। চললি কোথায়?'

গলাটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগল এবার। পেছন ফিরে দেখে, তার কলেজের বন্ধু সুবিমল। কলেজ জীবনে রীতিমতো বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু এখন তাদের চলার পথ আলাদা। তবু পুরোনো বন্ধুর দেখা পেলে কার না ভালো লাগে। তাই দাঁড়িয়ে যায় সে।

—'আরে সুবিমল যে, কী খবর বল?'

—'সেই কখন থেকে তোকে ডাকছি, সাড়াই দিচ্ছিস না। তা এখন চললি কোথায় বল তো?'

—'এই বাড়ি ফিরছিলাম। তা তুই এখন কী করছিস?'

—'দেখ, সব জবাব পাবি, কিন্তু এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে...তা তোর হাতে একটু সময় আছে তো? তাহলে চল না, কোথাও একটু বসে গ্যাঁজাই। হাতে ঘণ্টাখানেক সময় আছে তো?'

রজনী হাতের ঘড়িটা দেখে। এতক্ষণ খেয়াল করেনি যে ঘড়ির কাঁচটা ভেঙে গেছে। যদিও ঘড়িটা চলছে। সাড়ে ছ-টা বাজে। সেপ্টেম্বরের সন্ধে আস্তে আস্তে শহরের ওপর বিছিয়ে দিচ্ছে তার ধূসর চাদর। তবু ঘণ্টাখানেক সময় তো দেওয়াই যেতে পারে পুরোনো বন্ধুকে। আর মাঝেমাঝে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একটু আড্ডাও তো মারতে ইচ্ছে করে। তাতে মনটা বেশ ফ্রেশ লাগে।

তার জবাব দিতে দেরি হচ্ছে বলে সুবিমল বলে— 'কী রে, চুপ করে রইলি কেন?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সময় আছে। তা কোথায় গিয়ে বসবি বল তো?'

—'যেতে যেতেই না হয় কথা হবে।' বলেই পাশ দিয়ে যাওয়া একটা ছ্যাকরা গাড়িকে থামিয়ে উঠে বসে রজনীকে বলে— 'উঠে আয়।' তারপরে কোচোয়ানকে বলে— 'পার্ক স্ট্রিট।' গাড়ি চলতে থাকে। যেতে যেতে সুবিমল বলে— 'তা গায়ে চাদর জড়িয়েছিস কেন? শরীর খারাপ নাকি?'

—'এই একটু জ্বর জ্বর হয়েছে। তেমন কিছু নয়। ভাদ্রমাসের ঘাম বসে বসে যা হয় আর কী।'

—'তা তুই এখন কী করছিস?'

—'আমি একটা প্রাইভেট অফিসে কাজ করি। ডালহৌসি পাড়ায়। তা তুই কী করছিস?'

—'আমি তো মিউজিয়মে আছি। এই পাশেই।'

সুবিমল একটা সিগারেট ধরায়। গাড়ি ততক্ষণে পার্ক স্ট্রিটে ঢুকছে। জাপানি বোমার আতঙ্কে পার্ক স্ট্রিটও আজ ম্যাড়মেড়ে অন্ধকারে ডুবে। বার আর রেস্টুরেন্টের বাইরে ম্লান

আলোর একটা করে কম ওয়াটের বাল্ব ঝোলানো। তারও ওপর দিকটা কালো রং করা। যুদ্ধ যেন কেড়ে নিতে চাইছে কলকাতার উচ্ছল উদ্দাম জীবনের প্রতীক পার্ক স্ট্রিটের প্রাণশক্তির নির্যাসটুকুও।

একটা বারে ঢুকতে ঢুকতে সুবিমল বলে— 'কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা। তাই আজ একটু সেলিব্রেশন করব। আয়, ভেতরে আয়।' রজনী বুঝতে পারে যে সুবিমল ভালোই রোজকার করে।

—'কিন্তু...মানে এইভাবে চাদর গায়ে...।'

—'আরে ধুর। ছাড়তো। ওসব পাত্তা দিস না। কলকাতায় পকেটে পাত্তি থাকলে ভিখিরিও বাদশাহী কেতা মারে।'

একটা টেবিলে মুখোমুখি বসে তারা। রজনী একটু জড়োসড়ো। তার একটু অস্বস্তি হচ্ছে। সে তো কখনো ঢোকেনি এইসব জায়গায়। তবু সুবিমলকে সে তা বুঝতে দেয় না। বারটা মোটামুটি ফাঁকা। বড়ো পিপাসা পেয়েছে তার। অনেক দৌড়ঝাঁপ আর টেনশন গেছে। তাই টেবিলে রাখা দু-গ্লাস জলই সে খেয়ে নেয়। আর তখনই ওয়েটার টেবিলে এসে হাজির।

সুবিমল জিজ্ঞেস করে— 'তা তোর জন্যে কী নেব? বিয়ার, হুইস্কি না রাম।'

—'আমি তো ওসব খাই না রে।'

—'যাকগে, তোকে জোর করব না। তুই সেই আগের মতোই আছিস। তা আইসক্রিম সোডা খেতে আপত্তি নেই তো তোর?'

—'না, সেটা চলতে পারে।'

রজনীর জবাব শুনে নিয়ে সুবিমল ওয়েটারকে বললে— 'একটা চিলড লায়ন আর একটা আইসক্রিম সোডা।' অর্ডার নিয়ে চলে যায় বেয়ারা।

সুবিমলের মুখে জাদুঘরের নামটা শুনেই রজনীর মনে পড়ে গিয়েছিল কথাটা। আরে, সে তো ওখানেই চাকরির দরখাস্ত করেছিল। আজ তাহলে সময় সুযোগ করে সুবিমলকে বলতে হবে কথাটা। তবে দুম করে তো আর কথাটা পাড়া যায় না। তাই আড্ডাটা একটু জমে উঠলে কথাটা সে পাড়বে।

—'তা হ্যাঁরে সুবিমল, তুই কি এখনও বিরাটিতেই থাকিস? আর বিয়ে-থা করেছিস নাকি?'

—'হ্যাঁরে ওখানেই থাকি। আর বিয়ে? তা করেছি বটে একটা। আর একটাই কন্যে। বয়স সাড়ে তিন হবে সামনের মাসে। তা তুই কি বিয়ে করেছিস?'

বেয়ারা ততক্ষণে বিয়ার নিয়ে এসে ঢেলে দিল কাঁচের মগে। তারপরে পপকর্নের বাটিটা রেখে সোডাটা খুলে রেখে দিল টেবিলে। বিয়ারে একটা লম্বা চুমুক মেরে সুবিমল বললে— 'কী রে বললি না তো, বিয়ে করেছিস কি না।'

—'না, তবে কুড়িটা ছেলে আছে আমার।' মৃদু মৃদু হাসতে থাকে রজনী।

সুবিমল বুঝতে পারে হেঁয়ালি করছে রজনী। তাই সেও হেসে বলে— 'সে কী রে, বিয়ে না করেও কুড়িটা ছেলে? এটা কি তোর পরকীয়ার দায়ভার নাকি? তা দোস্ত, হেঁয়ালি না করে ব্যাপারটা একটু ঝেড়ে কাশো তো। পরকীয়া করার মতো মাল তো তুমি নও।'

সোডায় একটা সিপ দিয়ে রজনী বলে— 'তাহলে শোন। আমি আমাদের গ্রামে জনা কুড়ি ছেলেকে তাইকোন্ডো শেখাই। তাদের খেলার গাউন কিনে দিতে হয়। প্র্যাকটিসের আগে তাদের ছোলা-গুড় দিতে হয় আর প্রতি রবিবার দুপুরে তাদের জন্যে খিচুড়ির ব্যবস্থা করতে হয়। এইসব করতেই যা মাইনে পাই তার মোটামুটি বেশিরভাগটাই খরচ হয়ে যায়। তাই আর বিয়ে...।'

তাকে আর বলতে না দিয়ে সুবিমল সিরিয়াসলি বলে— 'বুঝেছি। দেশসেবা করিস।' বিয়ারে আবার চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরায় সে।

—'না, মানে ঠিক তা নয়। আসলে ওই আধপেটা খেয়ে থাকা ছেলেগুলোকে একটু খাবারের জোগান না দিলে ওরা আমার কাছে আসবে কেন, বল? তা ছাড়া ওরা আমাকে খুব ভালোওবাসে। আর আমিও ওদের ছাড়া থাকতে পারি না।'

—'হুম, বুঝলাম। তাহলে তো তোর এখন একটা ভালো মাইনের চাকরির দরকার। নইলে বিয়ে-শাদি করতে পারবি না। তা ভালো কোনো চাকরির খোঁজখবর করছিস? নাকি শুধু দেশসেবাই করছিস?'

রজনী দেখল এটাই সুবর্ণ সুযোগ। তাই সে কথাটা পাড়লে— 'হ্যাঁরে সুবিমল, তুই মিউজিয়মে কোন ডিপার্টমেন্টে আছিস বল তো?'

—'ডিরেক্টরের অফিসে। কেন?'

—'শোন না, আমি মাস ছয়েক আগে মিউজিয়মের একটা টাইপিস্ট কাম ক্লার্কের জন্যে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম। এখনও পর্যন্ত কোনো জবাব আসেনি। তা ওই পোস্টটায় কি লোক নিয়ে নিয়েছে? জানিস কিছু?' রজনী উদগ্রীব হয়ে থাকে উত্তরের জন্যে।

সিগারেটের ছাইটা অ্যাশট্রেতে ঝেড়ে সুবিমল বলে— 'যতদূর জানি, বোধ হয় নেয়নি। বুঝতেই পারছিস, সরকারি দপ্তরের কাজ। দিল্লি থেকে স্যাংকশন এলে তবেই না প্রসেসিং শুরু হবে। ঠিক আছে, আমি খোঁজ নিয়ে তোকে জানাব ব্যাপারটা কতদূর প্রোগ্রেস করেছে। এইনে, আমার কার্ডটা রাখ তোর কাছে। এতে আমার অফিসের আর বাড়ির, দু-জায়গারই ফোন নম্বর দেওয়া আছে।' বলে পকেট থেকে নিজের কার্ডটা বের করে দেয় সুবিমল। রজনীও তার অফিসের নম্বর দেয় সুবিমলকে। সে টিস্যু পেপারে লিখে নেয়।

—'শোন না, যদি ওই ভ্যাকেন্সিটা থাকে তাহলে তুই আমার হয়ে একটু রেকমেন্ড করতে পারবি? অবশ্য তোর যদি কোনো অব্লিগেশন না থাকে।'

সুবিমল একটু চেয়ে থাকে পুরোনো বন্ধুর দিকে। সে বুঝতে পারে রজনীর কত প্রয়োজন চাকরিটার। তাই সে রজনীকে আশ্বস্ত করে বলে— 'তোর জন্যে করব না? এটা তুই ভাবলি কী করে? আলবাৎ করব। আর সেটা না করলে তুই দিল্লি কা লাড্ডু পাবি কী করে?' ভুরু নাচিয়ে মুচকি হাসে সে।

রজনী সোডায় আবার একটা সিপ করে চাদরটা খানিকটা তুলে সুবিমলের দেওয়া কার্ডটা বুক পকেটে ঢোকাতে যায় আর তখনই সুবিমলের নজরে পড়ে রজনীর জামার কাঁধের কাছটায় রক্তের দাগটা। সে রজনীকে জিজ্ঞেস করে— 'একটা সোজা কথা বল তো ইয়ার, তুই কি আজ প্রতিবাদীদের মিছিলে গিয়েছিলিস?'

—'কই। না তো।'

—'তাহলে তোর কাঁধে চোট লাগল কী করে?'

—'আরে না না, ওটা কোনো ইনজুরি নয়। আজ ধর্মতলা দিয়ে যখন আসছিলাম, তখন দেখলাম এক লালমুখো বড়ো পোস্টের পুলিশ অফিসার একটা অল্পবয়সি ছেলেকে ব্যাটন দিয়ে নির্মমভাবে মারছিল। ছেলেটার মাথা ফেটে গিয়েছিল, রক্ত বেরোচ্ছিল, কিন্তু তবুও তাকে নির্দয়ভাবে পিটিয়ে যাচ্ছিল ওই অফিসার।'

—'তা, তুই তখন কী করছিলিস?'

—'আমি ছেলেটাকে ওই অফিসারের হাত থেকে রেসকিউ করে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

—'তা তোর কাঁধে ক-টা ব্যাটনের বাড়ি পড়েছিল যে তোর কাঁধে চোট লাগল?'

—'আমার গায়েও গোটা সাতেক ব্যাটনের বাড়ি আর বুটের গুঁতো পড়েছিল। তবে আমার ওসবে কিছু যায় আসে না। ওতে লাগে না আমার। আর কাঁধের এই দাগটা ছেলেটার রক্তের।'

—'হ্যাঁ, অফিসে বসেই শুনেছিলাম যে নারকোটিক্সের পিটার ব্রাগানজা আজ স্পেশাল ডিউটিতে গিয়ে ধর্মতলায় টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে আর লাঠিচার্জও করিয়েছে। তা তোর সঙ্গেই যে তার মোলাকাত হয়েছিল এখন বুঝলাম। আর এও বুঝলাম যে তোর জ্বরটর কিছু হয়নি। রক্তের দাগটা লোকের চোখের আড়াল করতেই চাদর জড়িয়েছিস।' বলেই হেসে সুবিমল বিয়ারের তলানিটুকু শেষ করে আবার বলতে থাকে— 'তবে কী জানিস রজনী, ওই লোকটা, ইন জেনারেল, প্রতিবাদীদের ওপরে তেমন নির্দয় নয়। ও আমাদের অফিসেও এসেছিল বার তিনেক। ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে। ডিরেক্টর সায়েব ওর বন্ধু। একটু আড্ডাবাজ আর মুডি আছে লোকটা। বারে মদ খেতে গিয়ে মাঝেমাঝে মুড হলে হাতে গিটার তুলে নেয়, আবার কখনো বা পিয়ানো বাজাতে বসে পড়ে। পুলিশের উঁচু পদের লোক বলে বারের লোকেরাও কিছু বলে না। তোয়াজ করে চলে আর কী। তবে আমি কখনো দেখিনি। কিন্তু শুনেছি যে লোকটা নাকি বেশ ভালোই পিয়ানো আর গিটার বাজায়। আমাদের সায়েব ওর বাড়িতে ক্রিসমাসের সময়ে গিয়ে ওর বাজনা শুনে এসেছে।'

—'আচ্ছা, তাই নাকি।'

—'তবে দেখিস রজনী। এসব প্রতিবাদ-টতিবাদের মধ্যে জড়িয়ে পুলিশের খাতায় তোর নাম যেন না ওঠে। জানিস তো, কোনো সরকারি চাকরির আগে পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়।'

—'আরে না না। আমি ওসবের মধ্যে থাকি না। তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।'

ততক্ষণে কথার মাঝেই বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে সুবিমলের ইশায়ার। তাকে ড্রিঙ্কসের দাম আর টিপস দিয়ে বিদেয় করে সুবিমল। বাইরে বেরিয়ে এসে রজনীকে বলে— 'তাহলে শোন রজনী, তুই বরং সামনের সপ্তায় শনিবারে আমার সঙ্গে এই বারের সামনেই দেখা করিস। দু-চার মিনিট এদিক ওদিক হলেও কেটে পড়িস না যেন আবার। বেস্ট হয়, তুই যদি সেদিন বিকেল চারটে নাগাদ আমার অফিসে একবার ফোন করে নিস। দেখা যাক না, কত দূর কী করতে পারি। তবে যাইই হোক না কেন, শনিবার সব জানতে পেরে যাবি। অফিস থেকে ফোনে তো আর সব কথা বলা যায় না। তাইই এখানে আসতে বলছি। তা ছাড়া একটু আড্ডাও হবে। সেটাই বা কম কী? আচ্ছা, আজ আসি তাহলে? মেয়েটা আবার বাপের ন্যাওটা, বুঝলি। অপেক্ষা করে বসে থাকবে।'

—'হ্যাঁ, আয়। আমি শনিবারে ফোন করে তবেই আসব। সাবধানে যাস।'

একটা ছ্যাকরা গাড়ি থামিয়ে উঠে পড়ে সুবিমল। কোচোয়ানকে বলে— 'শিয়ালদা স্টেশন।' টংয়ের পাদানীর ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যায় গাড়ি। আর রজনী একা দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে পিটার ব্রাগানজার কথা। অদ্ভুত এই লোকটা। যে হাতে সে সুর ধরে, সেই হাতে সে আবার লাঠিও ধরে? এরকম দ্বৈতসত্বা কি সব মানুষেরই থাকে?

একটু পরেই সে চৌরঙ্গির দিকে এগিয়ে যায় হাওড়ার বাস ধরার জন্যে।

বাড়িতে পৌঁছে দেখে বিষ্টুচরণ অপেক্ষা করছে তার দাওয়ায়। বিষ্টুর টর্চের আলোয় প্যাকেটটা ব্যাগ থেকে বের করতে গিয়ে রজনীর সামান্য অসাবধানতায় তার জামার রক্তের দাগটা চোখে পড়ে যায় বিষ্টুর।

সে বলে— 'কী হয়েচে গো। জামায় এত রক্ত কেন? বলি কোতায় চোট পেলে?'

—'ও কিছু নয়। রাস্তায় পড়ে গিয়ে কাঁধটা ছড়ে গেছে।'

আর কথা না বাড়িয়ে রজনী ব্যস্ত হয়ে পড়ে চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলতে। তাকে একটুখানি দেখে বিষ্টু দাওয়া থেকে নেমে নিজের পথ ধরে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রজনী বুঝতেই পারে যে এই কথাগুলো শ্যামাদাসদার কানে পৌঁছবেই, আর সে ঠিক দুয়ে দুয়ে চার করে নেবে। যাকগে, যা হবার তা হবেই। অত ভেবে লাভ কী? বরং এইসব ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়াই ভালো।

কলতলায় গিয়ে, জামা ধুয়ে, চান করে ঘরে আসে রজনী। সোডাটা খাওয়ার জন্যে আজ তার খুব খিদে পেয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয় সে। এরপরেই বুঝতে পারে আজ তার বড্ডো ঘুম পাচ্ছে। তাই মিনিট পনেরো পরেই সে চলে যায় বিছানায়।

সেদিন ঘুমের মাঝে স্বপ্নে দেখতে থাকে— সে জাদুঘরের অশোকস্তম্ভের সামনে বসে একমনে টাইপ করে চলেছে আর স্তম্ভের একটা সিংহ তাকে ডিকটেশন দিচ্ছে। সিংহটার কথামতোই সে টাইপ করতে চাইছে, কিন্তু তার কাগজে বারবার টাইপ হয়ে যাচ্ছে 'বন্দেমাতরম'। হঠাৎ তার কাঁধে কে যেন সজোরে আঘাত করে। চমকে সে ফিরে দেখে যে তার পেছনে উদ্যত ব্যাটন হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিশ অফিসার। সে আর কেউ নয়— চোখে নাকে ঠুলি পরা পিটার ব্রাগানজা।

ঘুমটা ভেঙে গেল তার। তখন সবে সকাল হচ্ছে। পুবদিকের জানলা দিয়ে একফালি রোদ মশারি ভেদ করে ছুঁয়ে যাচ্ছে তার শরীর। বিছানা থেকে নেমে মুখ-হাত ধুয়ে আয়নায় নিজের পিঠটা দেখে সে। চার-পাঁচটা কালশিটে পড়ার দাগ। তাই দেখে হেসে ফেলে রজনী; কারণ এই প্রথম কেউ তাকে প্রতিরোধহীন আঘাত করতে পারল।

সেদিন অফিস থেকে ফেরার পরে রাত দশটা নাগাদ বিষ্টুচরণ এল। দূর থেকেই তার পায়ের আওয়াজ আর টর্চের আলো ধরা পড়েছিল রজনীর কাছে। সে জানতই যে আজ না হয় কাল বিষ্টু আসবেই।

—'কী খবর এনেছ বিষ্টু? বলে ফেল।'

—'শোনো, শ্যামাদা বলে পাঠিয়েচে হপ্তা দুয়েক চুপচাপ থাকতে। একোন পান্ডের দোকানেও তোমার যাবার দরকার নেই। পুলিশের লোক হয়তো চিন্নত করে ফেলেচে

তোমায়। তাই কলকেতার জায়গাও পালটাতে হবে। সব ঠিকঠাক হলে তবেই আবার কাজ শুরু হবে। বুইলে?'

—'হ্যাঁ, বুঝলাম।'

—'আর হ্যাঁ, শনিবার একবার সেনেদের ভিটেয় যেও দিকিনি।'

—'আচ্ছা, ঠিক আছে। যাব।'

বিষ্টুচরণ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে।

—'আরে, এসো রজনী। বসো।' দরজা খুলতেই বলে ওঠে শ্যামাদাস। দিনেশ আর বিষ্টু ছাড়াও আরও কয়েকজন আধাচেনা, অচেনা লোক সেখানে হাজির। সব্বাই চুপ। রজনীকান্ত একটা ফাঁকা চেয়ারে বসতেই একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে শ্যামাদাস বললে —'অবস্থাটা তুমি আশাকরি বুঝতে পেরেছ রজনী। পুলিশের চোখে তুমি মার্কড হয়ে গেছ। সেদিন ধর্মতলায় অ্যাকশনের সময় তুমি পিটার ব্রাগানজার সামনে পড়ে গিয়েছিলে। তবে তোমার কপাল ভালো যে ওর বডিগার্ড তখন ওর সঙ্গে ছিল না। থাকলে হয়তো সে তোমায় জাস্ট শুট করে দিত; আর তাহলে সেটা হত আমার কাছে অতীব দুঃখজনক।' সিগারেটের ছাইটা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে শ্যামাদাসের হাতে। সে আবার শুরু করে— 'তাই এখন তোমার পক্ষে কাজ করাটা রিস্কি হয়ে যাবে। এখন কিছুদিন চুপ করে থাকতে হবে। কলকাতার জায়গাটা দু-চার দিনের মধ্যেই পালটানো হয়ে যাবে আর আমাদের লোকও পালটাতে হবে। আর সেজন্যেই তোমাকে এখানে ডেকেছি।' একটানা বলে এবার সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে তাতে একটা লম্বা টান দেয় শ্যামাদাস। আর রজনী ভাবতে থাকে— পিটার ব্রাগানজার বডিগার্ড কেন তাকে বিনা কারণে দিনের আলোয় শুট করত? সে তো সায়েবকে মারতে যায়নি। এটা কী তাহলে...?

—'তা আমাকে এখন কী জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন শ্যামাদা? বিশেষ কোনো কাজ আছে কি?'

—'হ্যাঁ আছে।...রজনী, তুমি এমন একজনকে রেফার কর যে তোমার জায়গায় কাজটা করে দেবে। বলছিলাম কী, তোমার ওখানে তো অনেক ছেলেই তাইকোন্ডো শিখতে আসে। তা তাদের মধ্যে কাউকে যদি...বা তোমার অন্য কেউ চেনা জানা বিশ্বাসী লোক থাকলে তুমি তারও নাম আমায় বলতে পার।'

শ্যামাদাস সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে থাকে উত্তরের প্রত্যাশায় আর রজনীর মনে ভাবনার ঢেউ ওঠে। এমন কেউ তার জানা নেই যাকে সে এইকাজ করতে বলতে পারে। আর তার দলের পুলিনই যা একটু বড়োসড়ো। এইমাসেই আঠারো পূর্ণ হবে তার। কিন্তু তাদেরকে যে সে সন্তানের মতো ভালোবাসে। কী করে সে তাদের এই রিস্কি কাজের মধ্যে ঠেলে দেবে? না, সে তা পারবে না।

—'কী রজনী? কী এত আকাশপাতাল ভাবছ? তোমার দলেই তো একজন আছে যে এই কাজটা করতে পারে।'

—'আপনি কার কথা বলছেন?'

—'কেন, পুলিন। সে তো বেশ চৌখস ছেলে বলেই আমার মনে হয়েছে।'

বিস্মিত রজনী বলে— 'কী বলছেন শ্যামাদা? ও এখনও সাবালক হয়নি। তা ছাড়া কলকাতা ও চেনে না ভালো করে। প্লিজ শ্যামাদা, আপনি অন্য কাউকে দেখুন। ওকে বাদ দিন। ও এখনও বাচ্চা।'

—'কিন্তু তুমি তো জানো ওই বয়সের কত ছেলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছে। আর তারা যদি পারে, তাহলে পুলিনই বা কেন পারবে না এই সামান্য কাজটা করতে? তুমি নিজেই তো কাজটা করে দেখেছ। কোনো রিস্ক আছে কি, বল? আর আমি আমার লোকজনের নিরাপত্তার কথাটা মাথায় রাখি বলেই তো তোমাকে সরিয়ে নিতে চাইছি। একইভাবে পুলিনকেও আমি নিরাপত্তা দেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। পুলিনের সব দায়িত্ব আমার।'

রজনী বুঝতে পারে যে শ্যামাদাস পুলিনকে টার্গেট করে ফেলেছে। অতএব যেমন করেই হোক তাকে দলে টানবেই। তবু সে একবার শেষ চেষ্টা করে— 'শ্যামাদা, আমাকে না হয় অফিসের কাজে কলকাতায় যেতে হত। তাই খরচ-খরচা কিছুই লাগত না। কিন্তু ও তো গরিব ঘরের ছেলে...।'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে শ্যামাদাস বলে— 'তুমি কি ভেবেছ যে আমি সে কথাটা ভেবে দেখিনি? ওকে প্রতিবার যাওয়া-আসার গাড়িভাড়া ছাড়াও দুটো করে টাকা দেব। আশা করি তাতে ওর অসুবিধে হবে না। আর আমার লোক তাকে ওই নতুন জায়গাটা চিনিয়েও দেবে।' সিগারেটে আবার টান দেয় শ্যামাদাস।

রজনী চুপ করে থাকে। অবস্থাটা এখন তার হাতের বাইরেই চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে। এই গ্রামে শ্যামাদাসের বেশ প্রতিপত্তি আছে আর সেইসঙ্গে আছে গরিব ছেলেটাকে দেওয়া টাকার টোপ। এই দুটোকে সে কী করে সামলাবে। সে না চাইলেও শ্যামাদাস পুলিনকে ঠিক ম্যানেজ করে ফেলবে।

—'শোনো রজনী, তুমি বরং কাল এই সময়ে এখানে পুলিনকে পাঠিয়ে দিও তাহলে।'

মন তার মানছে না। তবু মনের কষ্ট মনেই চেপে রেখে রজনী বলে— 'আচ্ছা, পাঠিয়ে দেব। তবু আর একবার ভেবে দেখুন শ্যামাদা। আপনার তো গ্রামের অনেকের সঙ্গে জানাশোনা। দেখুন না, তাদের কেউ যদি রাজি হয়। আসলে পুলিনটা যে বড্ডো ছোটো।' বড়ো অসহায় বোধ করে সে।

কিন্তু তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে হাতের সিগারেটটায় শেষ সুখটান দিয়ে মাটিতে সেটা ফেলে পা দিয়ে পিষে নিভিয়ে দেয় শ্যামাদাস।

মাঝে রবিবারের প্র্যাকটিসের সময় একফাঁকে রজনী পুলিনকে একান্তে জিজ্ঞেস করলে — 'কলকাতার জায়গাটা কোথায়?' পুলিন মাথা নীচু করে নিলো। রজনী বুঝতে পারল, কলকাতার ঠিকানা কাউকে না বলতে শ্যামাদাসই পুলিনকে বারণ করে দিয়েছে। তবু একবার সে শেষ চেষ্টা করলে— 'দ্যাখ পুলিন, আমি রোজ কলকাতায় যাই, সেখানকার পথঘাট ভালো করে চিনি। তাই সেখানে তোর কোনো আপদ-বিপদ হলে আমিই তোকে বাঁচাতে পারব। তুই শুধু ডেলিভারি নেবার দিন, সময় আর ঠিকানাটা আমায় বলে রাখ। তাহলেই হবে। কেউ কিচ্ছুটি জানবে না।'

গুরুর এই কথায় বুঝি ভরসা পেল পুলিন। বললে— 'বৃহস্পতিবার সন্ধে ছ-টা। সতেরো বাই দুই মার্কুইস স্ট্রিট।'

দু-দিনের মধ্যেই অফিস শেষে রজনী ঘুরে দেখে এল জায়গাটা। সেটা একটা চীনা জুতোর দোকান। দেখে তো মনে হয় না খুব একটা বিক্রিবাটা চলে। আচ্ছা, তাহলে পুলিনকে আসতে হবে এখানেই। তার ওপরে রাস্তার বাল্বগুলোর ওপর দিকটা কালো রং করে রাখার জন্যে সন্ধেবেলা রাস্তার অনেক জায়গাতেই বেশ আলো-আঁধারীর খেলা। এরপরে সে সেখান থেকে সোজা চলে গেল নিউমার্কেটে। কিনল একটা সস্তার গান্ধীটুপি আর পাশের একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে কিনল একটা ছানী অপারেশনের পরে পরার সানগ্লাস, একটা সরু ব্যান্ডেজ আর খানিকটা তুলো। তারপরে বাড়িতে ফিরে মাথায় টুপিটা দিয়ে চোখে পরল সানগ্লাস আর একটা চোখের নীচে ঢুকিয়ে দিল খানিকটা ব্যান্ডেজে মোড়া তুলোর প্যাড। আয়নায় ভালো করে দেখে সে নিশ্চিন্ত হল যে তাকে আর চট করে চেনা যাচ্ছে না। পুলিনই হোক, পিটার ব্রাগানজার লোকই হোক বা অন্য কেউ হোক, তারা দূর থেকে তাকে আর সহজে চিনে উঠতে পারবে না। এরপর সব খুলে সেগুলোর সঙ্গে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামাও ঢুকিয়ে রাখল ব্যাগে।

বৃহস্পতিবার এসে গেছে। রজনী অফিস থেকে বেরিয়ে গড়ের মাঠে একটা ফাঁকা জায়গায় বসে ব্যাগ থেকে বের করে তার সরঞ্জাম। মিনিট পাঁচেক পরে তাকে দেখলে যে কেউ ভাববে যে তার চোখে একটা অপারেশন হয়েছে। তারপর মাঠ থেকে উঠে, চৌরঙ্গি রোড ক্রস করে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে সে। একচোখে হাঁটতে সামান্য অসুবিধে হচ্ছে বটে, তবে ঘড়িতে দেখল এখনও প্রায় কুড়ি মিনিট আছে হাতে। ধীরে সুস্থে হেঁটে সে যখন মার্কুইস স্ট্রিট আর ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছল তখনও হাতে সময় আছে মিনিট তিনেক। এখান থেকে চীনে জুতোর দোকানটা স্পষ্ট দেখা যায়। আশেপাশে চোখ বুলিয়ে নেয় সে। এখানে সবাই চলতি-ফিরতি মানুষ। পান্ডের দোকানের মতো এখানে সন্দেহজনক তো তেমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবু নিজের ছদ্মবেশ নিখুঁত করতে সে মোড়ের মাথার দোকান থেকে একটা মিষ্টি পান আর একটা সিগারেট কিনল। পান চিবোতে চিবোতে সিগারেট ধরিয়ে ফুটপাথের একধারে দাঁড়াল। তবে তার ধোঁওয়া ছাড়া দেখলেই যেকোনো অভিজ্ঞ চোখ বুঝতেই পারত যে সে এসবে অভ্যস্ত নয়।

আরে ওই তো, ওই তো পুলিন আসছে। তারও কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে সে সোজা দোকানে ঢুকে গেল। এখন আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না রজনী। দোকানের ভেতরে কি হচ্ছে কে জানে। ভারি চিন্তা হচ্ছে তার পুলিনের জন্যে। সে কি একবার এগিয়ে গিয়ে দেখবে? নাঃ, সেটা ঠিক হবে না। দূর থেকে নজর রাখাই উচিত হবে। এদিকে তার হাতের সিগারেট হাতেই পুড়ছে। হঠাৎ ছ্যাঁকা লাগতেই সিগারেটটা ফেলে দিল সে। আর তারপরেই তাকে স্বস্তি দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল পুলিন। তার কাঁধের ব্যাগটা তখন বেশ খানিকটা ফুলে আছে। তাহলে আজ ওর কাছে কি একটার বেশি প্যাকেট আছে? সে যাইহোক, একটু দেখা যাক, পুলিন এখন কোথায় যাচ্ছে। প্রায় বিশ হাতের দূরত্ব রেখে রজনী তাকে অনুসরণ করে চলল। তারপর পুলিন যখন চৌরঙ্গি রোড পার হয়ে হাওড়ার বাস ধরলে, তখন সে নেমে গেল অন্ধকার গড়ের মাঠে। যেন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছে এমনভাবে দাঁড়িয়ে একমিনিটে খুলে ফেলল তার টুপি, সানগ্লাস আর চোখের ব্যান্ডেজে মোড়া তুলোর প্যাড। ঢুকিয়ে রাখল তার ব্যাগে। পাঞ্জাবি আর পাজামা রইল তার পরনে। তারপর রাস্তায় উঠে এসে সে একটু এদিক-ওদিক ঘুরল যাতে পুলিনের সাথে এক ট্রেনে যেতে না হয়।

শনিবারে সুবিমলকে ফোন করেছিল রজনী। সে আসবে বলেছে। তাই রজনী দাঁড়িয়ে আছে সেদিনের সেই বারটার সামনেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পার্ক স্ট্রিটের রঙ্গ দেখছে সে।

—'কী রে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছিস।' একগাল হেসে হাজির হয়েছে সুবিমল।

—'এই মিনিট দশেক।'

—'সরি, চ ভেতরে চ।'

দু-জনে একটা টেবিলে গিয়ে বসল। সুবিমল বললে— 'শোন রজনী, স্যারকে আমি তোর কথা বললাম। তা একটু রিকোয়েস্ট করতে স্যার কাকে যেন ফোন করে তোর নামটা বলল। এই দিন তিনেক আগে। তারপরে আমাকে বলল— তোমার ফ্রেন্ডের ব্যাপারটা আশাকরি হয়ে যাবে। আমিও স্যারকে বললাম যে, তুই আমার কলেজের ফ্রেন্ড। ভদ্র আর অনুগত। তখন স্যার আমাকে বলল যে, মাস তিনেক পরে তুই যেন আমার সাথে দেখা করিস।'

আবেগে রজনী সুবিমলের হাত ধরে বললে—'থ্যাংকস ব্রাদার। তোর এই অবদানের কথা আমি কখনো ভুলবো না রে। যা করলি আমার জন্যে।'

সুবিমলও বুঝতে পারে যে রজনীর কাছে চাকরিটা কত জরুরি। তাই হঠাৎই এই গুমোট হয়ে যাওয়া পরিবেশটা হালকা করার জন্যে সে বলে—'দূর,আমি কোন্ হরিদাস রে, যে তোর চাকরির ব্যবস্থা করে দেব। সবে তো পাত্র দেখা শুরু হয়েছে। আগে নেমন্তন্নো খেয়ে আঁচা, তারপরে তো। আরে, আমি তো শুধু আমার ক্ষমতা মতো ঘটকালি করিয়েছি মাত্র। আর সেটা করালাম কেন জানিস?'

—'কেন?'

—'আমার ডিয়ার ফ্রেন্ড যাতে দেশসেবার সাথে সাথে তার ঘরে শিগগিরই দিল্লি কা লাড্ডু আনতে পারে, তাই।' হো হো করে হেসে ওঠে দু-জনেই।

রজনী বলে— 'তোর কিন্তু একটা ট্রিট পাওনা রইল।'

—'সে তো নিশ্চয়ই। তবে হাতে প্রথম মাইনে পাবার পরে। আর হ্যাঁ, সেদিন কিন্তু বিয়ার নয়, দুটো পেগ চাই আর সঙ্গে যেন কাবাব থাকে।'

—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সেদিন যা খেতে চাইবি খাওয়াব।'

বেয়ারা ততক্ষণে অর্ডার নিতে টেবিলে হাজির।

পরের বৃহস্পতিবারও পুলিনের ওপরে নজর রাখার জন্যে রজনী দাঁড়িয়ে থাকে মার্কুইস স্ট্রিট আর ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মোড়ে, সেই একই জায়গায়, একই ছদ্মবেশে, একই ভাবে মুখে পান আর হাতে সিগারেট নিয়ে। আজও পথচলতি মানুষজন তাকে দেখেও দেখছে না। তার মানে সে সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে যেতে পেরেছে। একটু পরেই পুলিন এল সেই জুতোর দোকানে। কিন্তু আজ সরাসরি ভেতরে না ঢুকে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখল খানিকক্ষণ। তারপর সে ঢুকে গেল দোকানে। আবার খানিকক্ষণ পরে বেরিয়েও এল ব্যাগে প্যাকেট নিয়ে। কিন্তু এবারেই ঘটল বিপত্তি। চৌরঙ্গির দিকে না গিয়ে পুলিন আসতে লাগল রজনীরই দিকে। রজনী উলটোদিকে মুখ ঘুরিয়ে সিগারেটে টান দিতে দিতে দোকানপাট দেখতে লাগল— যেন সে একজন উদ্দেশ্যহীন মানুষ, একটু রিল্যাক্স করছে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎই— 'স্যার, আপনি? এখানে কী করছেন?' রজনী বুঝতেই পেরেছিল যে এরকম একটা কিছু ঘটবে। তাই সে বাধ্য হয়েই ঘুরে দাঁড়ায় পুলিনের দিকে।

—'না, মানে কিছু না। এই একটু রিল্যাক্স করছিলাম আর কী।'

—'ও তাই? তা আপনি পান, সিগারেট খাচ্ছেন?'

—'এই ইচ্ছে হল, তাই। শহরের হাওয়াও বলতে পারিস।' অপ্রস্তুত রজনী একটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিন কি তা বিশ্বাস করবে?

—'তা হঠাৎ আপনার চোখে কী হল? কাল যখন হাটতলার কাছে বাস থেকে নামলেন তখন তো কিছু ছিল না?'

—'মনে হয় চোখে কিছু একটা ইনফেকশন হয়েছে। তাই ডাক্তার বলল...।' হাতের সিগারেটটা ফেলে দেয় রজনী।

—'তবে স্যার, গত বৃহস্পতিবারও আপনাকে একই ড্রেস পরে বাস থেকে নামতে দেখেছি। কিন্তু আপনি তো পাঞ্জাবি-পাজামা, গান্ধীটুপি পরে অফিসে আসেন না।' এবারে পুলিনের গলার সুরটা যেন অন্যরকম লাগল।

রজনী বুঝতে পারল যে সেদিন গ্রামের বাস থেকে নামার সময়ে হয় শ্যামাদাসের লোক কিংবা হয়তো পুলিন নিজেই তাকে দেখে থাকতে পারে। তাই সে চুপ করে থাকে। সে ধরা পড়ে গেছে পুলিনের কাছে।

—'না, মানে, মাঝেমাঝে একটু অন্যরকম জামাকাপড়ও তো পরতে ইচ্ছে করে, তাই না?'

—'ও আচ্ছা। তা স্যার একটা কথা বলব?'

—'কী? বল।' রজনী স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে কিন্তু সেইসঙ্গে অপ্রত্যাশিত কিছু শোনার জন্যেও নিজেকে তৈরি করে ফেলে।

—'আমি বলি কী স্যার, এখন আমি কিন্তু যথেষ্টই বড়ো হয়ে গিয়েছি। আর আপনিও জানেন যে ক-দিন আগেই আমার আঠারো পূর্ণ হয়েছে। আমি এখন সাবালক। তাই এখন নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মতো চলার অধিকার আমার আছে। জানেনেই তো কত বিপ্লবী আমারই বয়সে হাতে বোমা তুলে নিয়েছিল; আর আমি তো নিয়েছি সামান্য সাবানের প্যাকেট।'

রজনী বুঝতে পারে যে এই কথাগুলো পুলিনকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। পুলিন তো এইভাবে কথা বলে না। সে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পুলিনের মুখের দিকে।

পুলিন বলতে থাকে— 'তাই বলছিলাম কী স্যার, আপনার কাছ থেকে যা শিখেছি, তা দিয়েই আমি আমার আত্মরক্ষা নিজেই করতে পারব। আপনি আপনার সময় নষ্ট করে এভাবে আর আমাকে পাহারা দেবেন না, প্লিজ।'

রজনী কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পুলিন— 'আচ্ছা, আসি স্যার' বলে চৌরঙ্গির দিকে হাঁটা দিল।

রজনী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। খুবই আঘাত পেয়েছে সে পুলিনের ব্যবহারে। পুলিন এমনভাবে তাকে কথাগুলো বলবে তা আদৌ আশা করেনি সে। আসলে এই বয়েসটা বড়ো খারাপ। রক্ত গরম থাকে আর তারই জোশে এই ছেলেগুলো আগুপিছু না ভেবেই দুমদাম অনেক কাজ করে ফেলে, অনেক কিছু বলে ফেলে।

তার আজ বড়ো মনে পড়ছে পুলিনের অনেক পুরোনো কথা। ছোট্টো থেকে দেখছে সে এই ছেলেটাকে। বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াত, ঘুরে বেড়াত নদীর চরে। একবারের একটা ঘটনা তো তার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ছে। সেটা ছিল শীতকাল। গ্রামের অন্য ছেলেদের সাথে মিলে পুলিনও খেলছিল দামোদরের ছিপছিপে জলে। গামছা কাঁধে রজনীও পাড়ে বসে দেখছিল তাদের খেলা। হঠাৎই একটা চিৎকার শুনে সে দেখে দলছুট পুলিন চেঁচাচ্ছে। নদীর চরে গজিয়ে ওঠা হোগলা ঝোপের পাশের বালিতে ডুবে গেছে পুলিনের কোমর পর্যন্ত। রজনী চকিতে বুঝতে পারে যে পুলিন চোরাবালিতে পড়েছে। রজনী জানে দু-পাশের এক মাইলের মধ্যে কোথায় কোথায় চোরাবালি আছে। কিন্তু এই বাচ্চাগুলো তো সেটা জানে না। তাই দলছুট পুলিন গিয়ে পড়েছে সেই চোরাবালির মধ্যেই। হাঁচোড় পাঁচোড় করে যতোই উঠতে চেষ্টা করছে সে, ততোই সে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে বালিতে। ওই চোরাবালি থেকে কীভাবে বেরোতে হয় তা জানে না পুলিন। কিন্তু রজনী জানে। তাই সে দৌড়ে যায়। পুলিনের থেকে হাত পাঁচেক দূরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বালিতে তার গামছাটার একপ্রান্ত ছুঁড়ে দেয় পুলিনের দিকে। পুলিন ততক্ষণে ভয়ে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। তার বুকের পাঁজর পর্যন্ত ডুবে গেছে বালিতে। রজনী চেঁচিয়ে বলে— 'ছটফট করিস না পুলিন। ভয় নেই। গামছাটা দু-হাতে চেপে ধর।' বাকি ছেলেরা ততক্ষণে হাজির হয়ে গেছে সেখানে। পুলিন গামছাটা ধরতেই রজনী অন্য বাচ্চাদের বলে তার দুটো পা ধরে টানতে। বাচ্চারা সবাই মিলে রজনীর দু-পা ধরে পেছনের দিকে টানতে থাকে। সেই টানে বালির ওপর দিয়ে রজনীর শরীর পেছোতে থাকে আর ধীরে ধীরে চোরাবালি থেকে উঠে আসতে থাকে পুলিনের শরীর। একসময় সে নিষ্কৃতি পায় চোরাবালি থেকে। ভাগ্যিস, সেদিন রজনী বসে ছিল পাড়ে। নইলে...।

আরও মনে পড়ছে যে গতবছরে পুলিনের জন্মদিনে পুলিনের নাম খোদাই করা মেহগনি কাঠের একটা বুমেরাং উপহার দিয়েছিল সে। ছুতোর বাড়িতে বিশেষভাবে তদারকি করে নিজের অন্যতম প্রিয় ছাত্রের জন্যে বানিয়েছিল সেটা। তাতে খুব খুশি হয়েছিল পুলিন; আর পুলিনের খুশিতে খুশি হয়েছিল রজনীও। অথচ আজ সেই ছেলেটাই...।

হয়তো এটাই পৃথিবীর নিয়ম। তবে পুলিন আজ তাকে অবজ্ঞা করলেও সে চিরকাল তাকে ভালোবাসবে নিজের সন্তানেরই মতো। তাই কষ্ট হলেও সে নিজেই নিজেকে বলে — 'ওহে রজনী! স্নেহ অতি বিষম বস্তু।'

১৯৪৪, এপ্রিল

প্যালিএন্টোলজিস্ট ড্যানীবাবু, মিশরীয় মমি আর জাদুঘরের নিশি

এভাবেই কখন যে বছর ঘুরে যায় কে জানে। এর মাঝে প্রায় প্রতিমাসেই রজনী দেখা করেছে সুবিমলের সঙ্গে। শেষমেশ একদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। ফ্রেডরিক সায়েবের অফিসে সুবিমলের ফোন এল রজনীর নামে। পরেরদিন যেন সে অবশ্যই দেখা করে তার সাথে। তাই পরেরদিন ফ্রেডরিক সায়েবের অফিস থেকে হাফ-ছুটি নিয়ে সে সোজা গিয়ে দেখা

করল সুবিমলের সঙ্গে। সুবিমল তাকে নিজের টেবিলে নিয়ে গিয়ে সামনের চেয়ারে বসিয়ে একগাল হেসে বললে— 'তোর দিল্লি কা লাড্ডুর ব্যবস্থা হয়ে গেছে রে। ডেসপ্যাচের খাতায় অফিসিয়ালি লেখা হয়ে গেছে কিন্তু আমিই ডাকে পাঠাতে দিইনি পাছে তোর লাড্ডু রাস্তায় হারিয়ে যায় বা দেরি হয়ে যায়।' তারপর নিজের ড্রয়ার থেকে একটা ব্রাউন রঙের লম্বা খাম বের করে রজনীর হাতে দেয়। রজনী খামটা খুলতেই বেরিয়ে আসে জাদুঘরের লেটারহেডে লেখা একটা চিঠি। তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। প্রথমে যেন তার বিশ্বাসই হতে চাইছিল না। সুবিমলের দিকে তাকাতেই সে হেসে বললে— 'ভালো করে পড়ে দেখ, মাস গেলে যা পাবি তাতে তোর ছেলেপুলেদের আর তোর লাড্ডুকে ভালোভাবে রাখতে পারবি কি না।'

ভালো করে চিঠিটা পড়ে দেখে রজনী। ফ্রেডরিক সায়েবের অফিসে সে এখন যা পায় তার প্রায় ডবল তার স্টার্টিং স্যালারি। এ ছাড়া প্রতিবছর ইনক্রিমেন্টও আছে। সাতদিনের মধ্যে জয়েন করতে হবে। খুব খুশি হয় সে।

মুখ দেখে তার মনের ভাব ভালোই বুঝতে পারে সুবিমল। বলে— 'প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে আমায় ট্রিট না দিলে দেখবি মজা। তবে প্রথম ছ-মাস কিন্তু কামাই করা চলবে না ব্রাদার, ওটা প্রোবেশন পিরিয়ড। তাই বলি কী তুই বরং কলকাতায় একটা ঘরভাড়া নিয়ে থাক। রাস্তাঘাটে যা গণ্ডগোল হয় মাঝে মাঝে, কোনোদিন হয়তো দেখলি তুই চাঁপাডাঙা থেকে আসতেই পারলি না। তখন কিন্তু অ্যাটেনডেন্স খাতায় লাল ঢ্যাঁড়া পড়ে যাবে।'

—'কিন্তু এই কলকাতার কোনো ভদ্রপাড়ায় একটু সস্তায় ঘর ভাড়া পাওয়া যায় কি না তা তো ঠিক জানি না।'

—'সে তুই বললে আমি লোক লাগিয়ে কাছাকাছি অঞ্চলেই তোর থাকার একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারব বলে মনে হয়। বড়োজোর হপ্তাখানেক সময় লাগবে।' তারপর একটুখানি কী যেন ভেবে সুবিমল বললে— 'আচ্ছা, বউবাজার এলাকায় আমার এক আপন মেসোমশাই আর মাসিমা থাকে। দুই বুড়ো-বুড়ির সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয় বলে একতলাতেই থাকে। ওপরে খান চারেক ঘর আর বাথরুম আছে জানি। সব তালাবন্ধ পড়ে থাকে। দুই মেয়েই বিয়ে হয়ে চলে গেছে বিদেশে। তারা কখনো সখনো এদেশে এলে থাকে সেইসব ঘরে।... এই, এই, এই যে বাবা মুক্তো, বলি দু-কাপ চা দিয়ে যাও না এখানে।' শেষ কথাটা ক্যান্টিন-বয় মুক্তোরামকে বলা।

তারপরে রজনীকে বলে— 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম... ও হ্যাঁ, মেসোমশাইয়ের বাড়ি। তা মেসোকে বলে ওই দোতলায় তোকে যদি একটা ঘর আর বাথরুমের ব্যবস্থা করে দিই, তাহলে তোর কি খুব অসুবিধে হবে? ওখান থেকে তুই কিন্তু হেঁটেও অফিসে চলে আসতে পারবি।'

—'হ্যাঁ, কিন্তু কলকাতা শহরের বাড়িভাড়ার আন্দাজ তো নেই আমার।'

—'আরে মেসো একসময়ে কাস্টমসে কাজ করত। ভালোই কামিয়েছে এককালে। নাম পরিতোষ মিত্তির। তবে এমনিতে মানুষ ভালো। পয়সার খাঁই নেই। বাড়িতে একজন মাঝবয়সি চাকর আছে। কিন্তু তাকে দিয়ে কি আর সব কাজ হয়। সেজন্যেই ক-দিন আগে আমার কাছে দুঃখ করছিল যে মেয়েরা বিদেশে সেটেলড। তাই বাড়িতে একজন বিশ্বাসী, সমর্থ পুরুষমানুষ থাকলে ভালো হত। সে আপদে বিপদে ডাক্তার ডাকতে কিংবা হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারত। তাই মনে হয়, আমি বললে তোর সেখানে একটা ঠাঁই

হয়ে গেলেও হতে পারে। এখন তুই রাজি থাকিস তো বল। আমি তাহলে কথা বলে দেখি।'

রজনী একটু চুপ করে ছিল। আসলে সে ভাবছিল যে কলকাতায় থাকলে এখন থেকে শনিবারেই শুধু গ্রামে যেতে পারবে আর রবিবারেই শুধু ছেলেদের ট্রেনিং দিতে পারবে। কিন্তু কী আর করা যাবে। ছেলেদের ভালো রাখতে গেলে পয়সাটাও তো দরকার। তাই সুরেশ কাকাকে দিয়েই শনিবারটা ম্যানেজ করাতে হবে।

মুক্তোরাম টেবিলে দু-কাপ চা দিয়ে গেল। তাকে সুবিমল বললে— 'এই যে বাবা মুক্তো, দেখে রাখো এই বাবুকে। নতুন জয়েন করছে। সোমবার থেকে ড্যানী সায়েবের অফিসে বসবে।'

মুক্তোরাম হাতজোড় করে রজনীকে বললে— 'নোমোস্কার স্যার। আমি একানকার ক্যান্টিনে কাজ করি। নাম মুক্তোরাম বণিক।'

—'নমস্কার।'

সুবিমল বললে— 'আচ্ছা মুক্তো, এখন এসো। আমরা একটু কাজের কথা বলছিলাম।'

—'আজ্ঞে স্যার।' বলে মুক্তো চলে গেল।

—'মুক্তো ভারি মজার মানুষ। পরে আলাপ হলে বুঝতে পারবি। তা হ্যাঁ, এবারে বল, বউবাজারে থাকতে তুই কি রাজি?'

—'সেটা হলে তো ভালোই হয়।'

—'তাহলে চল। চা টা খেয়ে নিয়ে সায়েবকে বলে বেরিয়ে পড়ি। বেলা থাকতে থাকতে কাজ শেষ করে নেওয়াই ভালো।'

একটা ট্যাক্সি ধরে বউবাজারের দিকে যেতে যেতে রজনী সুবিমলকে বললে—'হ্যাঁরে, ড্যানী সায়েবের পুরো নাম কী? উনি বাংলা ভাষা জানেন?'

সুবিমল একটু আশ্চর্য হয়ে বললে— 'বাংলা জানেন মানে? আরে উনি পুরোদস্তুর বাঙালি। নাম দীনেন্দ্রনাথ সোম। অবশ্য তুইই বা জানবি কী করে? তা আমাদের ডিরেক্টর সায়েবের উচ্চারণে উনি বনে গেছেন ড্যানী সায়েব। তবে ব্রাহ্ম। আর ওনাদের সোসাইটির ওপরমহলেও ভালোই যোগাযোগ আছে।'

—'তা ওনার কাজটা কী?'

—'উনি মিউজিয়মের প্যালিএন্টোলজিস্ট।'

এই শব্দটা রজনী আগে শোনেনি। তাই সে বললে— 'প্যালিএন্টোলজিস্ট? তা সেটা আবার কী পোস্ট?'

—'আরে, যারা ফসিল নিয়ে গবেষণা করে, তার সালতামামির হিসেব করে রেকর্ডে লিখে রাখে তাদের বলা হয় প্যালিএন্টোলজিস্ট।'

—'তা সেখানে আমার কাজটা কী?'

—'দেখ, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার অনুযায়ী তোর ডেজিগনেশন টাইপিস্ট কাম ক্লার্ক হলেও সেখানে তোর কাজ হবে ড্যানীবাবুকে ল্যাবে তাঁর কাজে সাহায্য করা। আর উনি

ফসিল স্টাডি করে যা যা লিখে দেবেন সেগুলোকে টাইপ করে ওনাকে আর ডিরেক্টর সায়েবকে দিয়ে সই করিয়ে রেকর্ডবুকে ঠিকঠাক রাখা।'

—'বাঃ, মনে হচ্ছে বেশ ইন্টারেস্টিং কাজ।'

—'হ্যাঁ, তা বলতে পারিস। তবে খাটুনি নেই তেমন আর ড্যানীবাবু হলেন এক কাজপাগল ভালোমানুষ। আর ওনাকে একটু তোয়াজ করে চলতে পারলে হয়তো ভারতের অনেক জায়গাই তোর ঘোরা হয়ে যাবে সরকারের পয়সায়।'

—'তাহলে তো ওনাকে মাঝে মধ্যেই বাইরে যেতে হয়, না?'

—'হ্যাঁ, তা মাঝে মধ্যে যেতে হয়। উনি অন্য শহরের কোনো সেমিনারে গেলে তখন এখানে তোর কোনো কাজ নেই। অফিসে আসবি-যাবি, চা খাবি, এর ওর টেবিলে গিয়ে গ্যাঁজাবি আর মওকা বুঝে টুক করে কেটে পড়বি। ওনার ডিপার্টমেন্টে স্বয়ং ডিরেক্টর সায়েবও খুব একটা মাথা গলান না। তবে অন্য কোথাও নতুন কোনো ফসিল পাওয়া গেলে তখন ওনার দলবলের সাথে তোকেও যেতে হবে। তখন কিন্তু দিন-রাত্তিরের তফাৎ থাকবে না। খালি কাজ আর কাজ।'

—'বাঃ, বেশ ভালোই তো।'

ততক্ষণে গাড়ি বউবাজারে পৌঁছে গেছে।

সুবিমলের মেসো পরিতোষ মিত্র আর মাসিমা সুনয়না দেবী ভালোই মানুষ। হাবভাব দেখে মনে হল যে রজনীকে তঁদের ভালোই লেগেছে। ওঁদের কাজের লোক কেষ্টদা তালা খুলে দেখিয়ে দিল ঘর আর বাথরুম। ছাদের সিঁড়ির ঠিক পাশেই ঘরটা। রজনীর বেশ ভালোই লাগল ঘর আর পাড়ার পরিবেশও। বাড়ির সামনে দিয়েই চলে গেছে চওড়া রাস্তা আর ভাড়াও ন্যায্য। মাসিক পাঁচ টাকা। নতুন চাকরির দৌলতে সেটা দিতে রজনীর অসুবিধে হওয়ারই কথা নয়। তবু, অগ্রিম ভাড়া হিসেবে রজনী টাকাটা দিয়েই দিল। পরিতোষ বাবুও একটা নোটবুকে রজনীর নামে তা টুকে রাখলেন। ঘরের চাবিটাও ভদ্রলোক তুলে দিলেন রজনীর হাতে। সে ইচ্ছে হলে কাল থেকেই এসে থাকতে পারবে। তাকে ভাড়াটে হিসেবে পেয়ে কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত মনে হল তাঁদের।

বাইরে বেরিয়ে সুবিমল বললে— 'তাহলে দ্যাখ, সব ব্যবস্থাই হয়ে গেল একদিনেই। একেই বলে কপাল। আর তোর কপালটা বেশ ভালোই বলতে হবে।'

—'হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছিস। একই দিনে চাকরি আর মাথা গোঁজার ঠাঁই, দুটোই হয়ে গেল।'

—'ওরে, কার কখন ভালো সময় আসবে তা কি কেউ আগেভাগে বলতে পারে? সময় আমাদের চালায় আর আমরাও তার সাথে তাল মিলিয়ে চলি। যাকগে, অনেক জ্ঞান দিয়ে ফেললাম তোকে। এখন বাড়ি যাই।' একটা সিগারেট ধরায় সুবিমল।

—'হ্যাঁরে, গাড়ি নিবি না?'

—'ধ্যুস। সামনেই তো শিয়ালদা। এইটুকু রাস্তা হেঁটেই মেরে দেব। আচ্ছা চলি। এবার থেকে রোজই তো দেখা হবে। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।'

—'সেম টু ইউ, ব্রাদার।'

সুবিমল এগিয়ে গেল শিয়ালদার দিকে। আর রজনী পা বাড়াল ওয়েলিংটন স্ট্রিটের দিকে। সেখানে পুরোনো জিনিস বিক্রির অনেক কটা দোকান আছে। ওখানে একবার ঢুঁ

মারা দরকার।

জাদুঘরের কাজটা ভালোই লাগছে রজনীর। ড্যানীবাবু মানে দীনেন্দ্রনাথ সোম সত্যিই একজন সুভদ্র, কাজপাগল মানুষ। প্রথমদিনে উনি রজনীকান্তকে বললেন—'আগে কোনোদিন মিউজিয়মে এসেছেন?'

—'আজ্ঞে না স্যার। ডালহৌসি পাড়ায় কাজ করেছি অথচ এখানে আসার সময় হয়নি। তবে বাইরে থেকে দেখেছি।'

—'তা আগে যখন এখানে আসতেই পারেননি, তখন বরং আজ ভালো করে ঘুরে দেখে নিন সব। কিছু গ্যালারি যদি বাকি থেকে যায়, তাহলে অন্যদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে দেখে নেবেন। আর হ্যাঁ, দুটোর সময় ক্যান্টিনে লাঞ্চ করে এসে দু-চারটে চিঠি একটু টাইপ করে দেবেন।'

—'স্যার, আপনাকে একটা কথা বলার ছিল।'

—'হ্যাঁ, বলুন না।'

—'স্যার, আপনি আমাকে "আপনি" "আজ্ঞে" না করে যদি নাম ধরে ডাকেন...'

—'ও, এই কথা? আচ্ছা ঠিক আছে যান...ইয়ে, মানে যাও। ঘুরে এসো।'

বিশাল বিশাল বারান্দা। ইয়া মোটা দেওয়াল। উঁচু কড়ি বরগার ছাদ। এখানে কেমন যেন নিজেকে খুব ছোট্টো লাগে। মনে হয় যেন কোনো রাজপ্রাসাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক নগণ্য মানুষ। চারিদিকে এক এক তলায় এক একটা বিষয়ের ওপরে গ্যালারি আর তার একদম নীচে, মাঝখানে ঘাসে ঢাকা সবুজ লন। তার রূপ খুলেছে বোগেনভেলিয়া, লাল মুসন্ডা আর ফারকেরিয়ার পাতায়। আজ দর্শক বেশ কমই বোধ হয়। আর হবে নাই বা কেন? একে আজ ছুটি ছাটার দিন নয়। তার ওপরে আছে মন্বন্তর, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস আর জাপানি বোমার ভয়। লোকে নিতান্তই প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বেরোচ্ছেই না।

একের পর এক গ্যালারি ঘুরে দেখছে রজনী। আর যত দেখছে ততোই অবাক হয়ে যাচ্ছে। এত সম্পদ বোধ হয় কোনো রাজাধিরাজের কাছেও থাকা সম্ভব নয়। না না, সোনাদানা বা মণিমাণিক্যের চাকচিক্য নয়, এখানে আছে পৃথিবীর ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ, যার দাম টাকায় মাপা সম্ভব নয়। হাজার হাজার, এমনকী লক্ষ লক্ষ বছরের পুরোনো জিনিস।

নাঃ, একদিনে সব দেখা কোনোমতেই সম্ভব নয়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় সুযোগ বের করে ধীরে ধীরে খুঁটিয়ে দেখতে হবে সব। সময় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তাকে তো এখানে চাকরি করতে আসতেই হবে। তবে আজ তার ইচ্ছে হচ্ছে জাদুঘরের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ মমি দেখার। খুঁজে পেতে দেখল যে একটা ঘরের মাথায় লেখা 'ইজিপ্সিয়ান গ্যালারি'। মমি তো মিশর দেশের জিনিস। তাহলে এখানেই হবে সেটা। কাঁচের দরজা খুলে ঢুকতেই সে বুঝল যে এটা অন্য কোনো গ্যালারির মতো বিশাল নয়, বরং এটাকে একটা বড়োসড়ো ঘরই বলা যেতে পারে।

মাঝখানে একটা টেবিল সমান উঁচু জায়গায় রাখা একটা কাঁচের বাক্স। তার ঠিক ওপরেই ঝুলছে একটা বাল্ব আর দেওয়ালের তাকে তাকে সাজিয়ে রাখা মিশরের নানান ছোটো ছোটো মূর্তি। একটা দেওয়ালের গায়ে একটা পিরামিডের ছবি সাঁটানো। তার নীচে

অনেক কিছু ইংরাজিতে লেখা। পড়তে হবে সেটা। আজ এই ঘরটাই খুঁটিয়ে দেখবে ভালো করে। তবে সবচেয়ে আগে দেখবে মিশরীয় মমি।

কাঁচের বাক্সের ওপরে ঝুঁকে পড়ে সে। বাক্সের ভেতরে একটা কফিনের মধ্যে সারা গায়ে মরচে রঙা কাপড় জড়ানো একটা শুকনো মানুষের শরীর। মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে। তাই ওই মানুষটার মুখের আদলে তৈরি একটা মুখোশ মমির বুকের ওপরে রাখা। সত্যি, কী আশ্চর্য জিনিস। কী করে মিশরীয়রা এইভাবে মমি তৈরি করত? মমির পাশে একটা দেওয়ালে মমি-বৃত্তান্ত লেখা। যত পড়ে ততোই অবাক হয় রজনী। এই মমিটা নাকি চার হাজার বছরের পুরোনো। আঠারোশো বিরাশি সালে এটা জাহাজে করে আনা হয় কলকাতায়। তারপরে বোম্বে থেকে এর সংস্কার করে আনিয়ে রাখা হয় এই মিউজিয়মে।

সেকালে যারা কোনো শবদেহকে মমি বানাত, তারা ওই শবের নাক বা মুখ দিয়ে শরীরের ভেতরের পচনশীল অংশগুলোকে বের করে আনত। তারপরে নানান রাসায়নিকের প্রয়োগ করে পরতে পরতে কাপড় জড়িয়ে তৈরি করত মমি। সত্যি কী বিচিত্র!

এরপরে রজনী এগিয়ে গেল দেওয়ালের তাকে রাখা একটা পাথরের মূর্তির দিকে; যার শরীরটা সিংহের আর মাথাটা মানুষের মতো। সে জানে এর নাম স্ফিংক্স। পাশের লেখা থেকে সে জানতে পারে যে গ্রিক পুরাণকথা বা নাটকে স্ফিংক্সের উল্লেখ থাকলেও তার রূপ ছিল অন্যরকম। আর মিশরীয় পুরাণকথায় যে স্ফিংক্সের উল্লেখ পাওয়া যায় তার চেহারা এইরকম।

সত্যি, পৃথিবীতে যে কত অদেখা, অজানা বিস্ময়কর জিনিস আছে তার ইয়ত্তা নেই। এখানে চাকরি পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতে থাকে সে। সেইসঙ্গে তার মনে হয়— একদিন তার গ্রামের ছেলেদের এনে দেখাতে হবে এই মিউজিয়ম। পুলিনকে সে আনতে পারবে কি না সন্দেহ আছে, তবে কানাইকে আর বাকিদের এটা দেখাতেই হবে। তবে তার আগে প্রথম মাসের মাইনেটা হোক।

বেশ একটা বিস্ময় আর ভালোলাগার ঘোরের মধ্যে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে সে। আপনমনে হাঁটতে থাকে বারান্দা ধরে।

হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে বলে ওঠে— 'আরে স্যার, আপনি একানে? সেই ককোন থেকে চা দেব বলে ঘুরচি। জিজ্ঞেস করতে ড্যানীবাবু বললেন যে আপনি নাকি গ্যালারি দেকতে বেরিয়েচেন। তা ভালোই করেচেন। কিন্তু আমি তো আপনাকে এদিক-ওদিক খুঁজে বেড়াচ্চি। তা স্যার, আপনি আপনার টেবিলে গিয়ে বসুন, আমি চা নিয়ে আসচি।'

ওঃ সত্যি, মুক্তোরাম একটা মুক্তোই বটে। চায়ের জন্যে তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে মিউজিয়মে। সে তাই ঘরে গিয়ে বসে তার টেবিলে। কিন্তু ঘরে তো কেউ নেই? ড্যানীবাবু গেলেন কোথায়?

একটু পরেই ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে আসে মুক্তোরাম। সে মুক্তোকে জিজ্ঞেস করে —'স্যার গেলেন কোথায় জানো?' মুক্তো বলে— 'কোথায় আর, হয় ফোসিল গ্যালারি নয়তো ল্যাবেটরিতে হবে।' তারপরে এদিক ওদিক দেখে ফ্লাস্ক থেকে কাঁচের কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলে— 'পোথোম দিন। তাই আপনাকে ভয় দেকাতে চাই না স্যার। তবে এই বাড়িতে অনেক রহস্য গল্প আচে।... নিন স্যার, চা খান।'

প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও কৌতূহলী হয় রজনী। সত্যিই বাড়িটাকে দেখলে, তার গ্যালারি দেখলে বেশ রহস্যময় লাগে এই বাড়িটাকে। সে বলে— 'রহস্য? কীসের

রহস্য?'

—না স্যার, পোথোম দিনেই রহস্যের কতা শোনালে হয়তো আপনি ভয়ে চাকরিটাই ছেড়ে দেবেন। তাই আগে ক-দিন ধাতস্ত হয়ে নিন, তারপরে না হয় শোনাব একদিন।'

কৌতূহলী হয় রজনী। শুনতে ইচ্ছে হয় মুক্তোরামের রহস্য গল্প। আবার সেইসঙ্গে মনে হয়, রেকমেন্ডেশনের জোরে সে চাকরিতে ঢুকেছে বলেই হয়তো মুক্তোরাম তাকে ভয় দেখিয়ে চাকরিটা ছাড়াতে চায়। হয়তো তার কোনো ক্যান্ডিডেট ছিল এই পোস্টটার জন্যে যে বঞ্চিত হয়েছে। যাইহোক, সে মুক্তোকে বলে— 'আহা, বলোই না শুনি। অত সহজে ভয় পাই না আমি। নাও বল।'

মুক্তো এবার গলা নামিয়ে বলে— 'এ বাড়িতে ভূত আচে স্যার। রাত্তির বেলা বেরোয়।'

—'তাই নাকি? তা তুমি দেখেছ?'

—'না স্যার, আমি দেকিনি। তবে আমার ভাগ্নে দেকেচে।'

—'তা সে কোথায়? ডাকোই না তাকে। সেইই তো ভালো করে বলতে পারবে ভূতের কথা।'

—'ভাগ্নে স্যার একানের ক্যান্টিনের ক্যাজুয়াল ছিল। এখন একানকার চাকরি ছেড়ে অন্য কম্পানিতে পার্মেন্ট চাকরি পেয়ে চলে গ্যাচে। নইলে সেইই আপনাকে সব বলতো।'

—'তা মুক্তো, তুমি তো ভূতের কথা শুনেছ তার কাছ থেকে। কেমন দেখতে সেটা? আর কী করে সে রাত্তিরে?'

ঘরের চারপাশ আরেকবার দেখে নিয়ে মুক্তোরাম বলে— 'তাইলে বলি শুনুন।'

জমিয়ে গল্প শোনার জন্যে রজনী ইশারায় মুক্তোরামকে তার টেবিলের মুখোমুখি চেয়ারটা দেখিয়ে দেয়। ফ্লাস্কটা একপাশে সরিয়ে রেখে চেয়ারে বসে মুক্তোরাম টেবিলের ওপরে বেশ খানিকটা ঝুঁকে আসে।

রজনী চায়ে চুমুক দিলে পরে সে বলতে শুরু করে— 'আমি আর ভাগ্নে তকোন একতলার ক্যান্টিনের মেজেতে পাশাপাশি দুটো ঘরে বিচানা পেতে শুতুম। তা একদিন নাকি সে হটাৎ বাতরুমে যেতে গিয়ে একতলার বারান্দা ধরে আমারই মতো এইরকম খাঁকি ডেরেস পরা একজনকে চ্যালাকাট হাতে হেঁটে যেতে দেকে। তাই দেখে ভাগ্নে তকোন 'এ্যাই কে রে' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু ভূতটা নাকি তার কতায় পাত্তা না দিয়ে ডিরেক্টর সায়েবের চেম্বারের সামনে গিয়ে তার দরজায় চ্যালাকাট দিয়ে দমাদ্দম পেটাতে শুরু করে। কিন্তু দরজা তো তালাবন্দ। খুলবে কী করে? আর কার এমন সাহস আচে যে তাকে আটকাবে? তবু ভূত ওই সায়েবের দরজায় দমাদ্দম করে কাটের বাড়ি আর লাথি মেরেই চলেচে আর গোঁ গোঁ করে অদ্ভুত একটা শব্দ করে চলেচে মুক থেকে।' রজনী তারিয়ে তারিয়ে চায়ে চুমুক মারতে থাকে।

—'তাই না দেখে আমার ভাগ্নে দৌড়ে বাতরুমে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্দ করে দেয়। ও নাকি ওখানে আদঘণ্টার মতো নিজেকে আটকে রেখেচিল ভূতের হাত থেকে বাঁচতে। তারপর ভূতের দাপাদাপি থামলে সে কোনোরকমে বেইরে ঘরে এসে দেকে যে ভূতটার চ্যালাকাটটা তার বিচানার মশারির পাশে পড়ে আচে। ও যদি বিচানায় থাকত স্যার, তাইলে হয়তো সেদিন চ্যালাকাটের বাড়ি খেয়ে ভূতের হাতে ওর বেঘোরে পরানটা

যেত। তাই বাকি রাত্তিরটা সে বিচানাপত্তর তুলে নিয়ে এসে আমার ঘরে শোয়। আমি এসবের কিচুই জানতুম না। ভাগ্নেই পরেরদিন সকালে এইসব কতা আমাকে বলে।'

—'তারপর?'

—'তারপরে আর কী। পরের দিনই ও ঠাঁই বদল করে। সারাদিন এখানে কাজকম্ম করত আর রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া সেরেই পাশের আট কলেজে ওর বন্দুর কাচে শুতে চলে যেত।'

মুক্তোরাম একটু থামলে রজনী আবার চায়ে চুমুক দিয়ে বললে— 'তা এটা কি রোজই ঘটে?'

—'রোজ না হলেও, মাসে দু-একবার ঘটে বলেই তো মনে হয়।'

—'কী করে বুঝলে?'

—'আজ্ঞে স্যার। সকালে উটে কোনো কোনো দিন দেকতে পাই, কোনো কোনো দরজায় চ্যালাকাটের নতুন নতুন বাড়ির দাগ। দরজার বার্নিশ চটে গেচে। সেই নিয়ে ডিরেক্টর সায়েব চটে গিয়ে তো একবার সব দরজায় নতুন করে পালিশ করালে। কিন্তু আবার যে কে সেই। আবার সব দরজায় চ্যালাকাটের বাড়ির দাগ।'

—'তা ডিরেক্টর সায়েব আর কিছু করেননি?'

—'কি আর করবে বলুন। সিকিউরিটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করেচিলেন। তা ওই মিশিরজি বলেচিল যে সে নাকি মাজে মোদ্দে দু-একদিন ডাণ্ডা পেটানোর শব্দ শুনেচে। কিন্তু ভেতরে টওল দেবার সময় সে কোনোদিন কিচ্চু দেখতে পায়নি। সে ভেবেচে যে বাইরে তো একটা পাগল রোজই শুয়ে থাকে। সেইই হয়তো শব্দ করেচে।'

—'কিন্তু ঘটনাটা তো ভেতরে ঘটে। মিশিরজি কি তাহলে ডিরেক্টর সায়েবকে মিথ্যে বলেছিল?'

—'তা আর বলতে। ও ব্যাটা ভাংখোর। রাত্তিরে সব গ্যালারিতে তালা লাগানোর পরে বেটা ভাং চড়ায়। তারপরে ক্যান্টিনে খাওয়া সেরেই মেন গেটের একপাশে একটা আড়ালে খাটিয়া পেতে তার চারপায়ে রড গুঁজে তাতে মশারি খাটিয়ে নাক ডেকে ঘুম লাগায়। এদিকে সব চাবি থাকে তার বালিশের তলায়। তখন, কী বলব স্যার, ওর গায়ের ওপর দিয়ে মোষ দৌড়লেও ঘুম ভাঙবে না। এমনই কাল ঘুম তার।'

—'আচ্ছা মুক্তোরাম, ভূত তোমায় কখনো চ্যালাকাঠ দিয়ে মারতে আসেনি?'

মুক্তোরাম চোখ বড়ো বড়ো করে বললে— 'আসেনি আবার। বেশ কয়েকবার সে আমার বিচানার কাছে এসেচিল তা বুঝতে পেরেচি। তবে মশারি খাটানো চিল বলে বোধ হয় পরাণে মাত্তে পারেনি।'

—'তা সে যে তোমায় মারতে এসেছিল, সেটা কী করে বুঝলে? তুমি কি জেগে ছিলে নাকি?'

—'না স্যার। ঘুমোলে তো আমি একেবারে মড়া। তবে মাজে মোদ্দে সকালবেলা ঘুম ভাঙলে দেকি যে আমার বিচানার পাশে উনুন ধরানোর চ্যালাকাট পড়ে আচে।'

—'তা সেটা কি এখনও হয়?'

—'হয় স্যার। এইই তো হপ্তা তিনেক আগেই হয়েচিল। সেইজন্যেই তো বলচি যে এই বাড়িতে ভূত আচে স্যার।'

মুক্তোরামের গল্প শুনতে গিয়ে বাকি চা টাই ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। তাই প্লেটটাকে দূরে ঠেলে রেখে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে রজনী বললে— 'দিনের বেলা সে ভূত নিশ্চয়ই বেরোয় না। আর যা বুঝলাম, তাতে মনে হল ওই ভূত থেকে তোমার কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। থাকলে এতদিনে তোমার বেঁচে থাকাই দায় হত। তাই না মুক্তোরাম?'

—'তা আপনি বোদয় ঠিকই বলেচেন। যদি আমাকে মারারই হত, তবে কবেই ওই চ্যালাকাটের বাড়িতে আমার মাথা চৌচির করে দিত। মশারি টশারি কিচ্চুটি মানত না। তবে ওই ব্যাটা মিশিরজি কোনদিন না মরে ভূতের হাতে।'

—'সেটা তার কপালে থাকলে হবে। কি আর করা যাবে। তা এবারে তাহলে এসো তুমি। আমার কিছু কাজ আছে।' বলে সকালে কেনা খবরের কাগজটা ব্যাগ থেকে বের করে রজনী।

—'হ্যাঁ স্যার' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে বেসিনে কাপ-প্লেট ধুয়ে কাবার্ডে রেখে ফ্লাস্কটা নিয়ে বেরিয়ে যায় মুক্তোরাম আর রজনীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে একটা শব্দ 'সমন্যামবুলিজম্'(অর্থাৎ স্লিপ-ওয়াকিং)। তারপর নিজেকেই সে প্রশ্ন করে— আচ্ছা, একেই কি সাদা বাংলায় বলে 'নিশির ডাক'? নাকি সেটা অন্য কিছু?

১৯৪৪, মে

পিটার ব্রাগানজা, সাবান রহস্য আর নিশির ছোবল

বউবাজারে সুবিমলের মেসোর বাড়িতে প্রায় একমাস হল এসেছে রজনী। রাতের খাওয়া সেরে বিছানায় শুয়েছিল সে।

কিন্তু গ্রামের মায়া এখনও তার বুকজোড়া। সেই ঘর, সেই নদীচর, সেই তাইকোন্ডোর আখড়া, সেই ছেলেদের 'কী ইহ্যাপ' চিৎকার এখনও তার কাছে জীবন্ত।

আসার আগে সুরেশ কাকাকে সব বুঝিয়ে দেবার সময়ে তার চোখে জল দেখেছিল সে। অনেক কষ্টে নিজের চোখের জল চোখেই আটকে রেখে বলেছিল— 'শনিবার করে তো আমি আসব। রবিবারেও থাকব, ছেলেদের শেখাব, একসঙ্গে খাব। শুধু সপ্তার মাঝের ক-টা দিন তুমি ছেলেদের একটু দেখাশোনা কর।'

সঙ্গে নিয়েছিল কিছু জামাকাপড়, কম্বল, চাদর, বুমেরাং আর দাদুর প্যাঁটরার ধনসম্পদ। এই প্যাঁটরাটা শুধুমাত্র দাদুর স্মৃতি নয়, এটা কাছে থাকলে তার মনে হয় যে দাদু সর্বদাই তার কাছে আছে। একটা অন্যরকম সাহস পায় সে। এখন খাটে চোখ বুজে শুয়ে সে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে— কানাইয়ের ছুঁড়ে দেওয়া বুমেরাংটা বাতাস কেটে ঘুরতে ঘুরতে নদী পেরিয়ে চলে গেল অন্ধকারে ডুবে থাকা জঙ্গলের দিকে। তারপরেই শোনা গেল একটা শিয়ালের চিৎকার। অনেকক্ষণ ধরেই ডাকছিল সেটা। কানাইয়ের বুমেরাং শব্দভেদী

হয়ে আঘাত করেছে শিয়ালটাকে। নাঃ, কানাইকে তার দরকার। কানাইই পারবে তার যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে উঠতে। তবে আগে তাকে ভালো করে লেখাপড়া শেখাতে হবে।

মনে আসছে পুলিনের কথাও। এই পুলিনকে সে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তুলেছে। তার গরিব বাবা-মাকে যতটা সম্ভব সুরেশ কাকার মাধ্যমে সাহায্য করেছে সে শুধু একটা আশা নিয়ে যে পুলিন একদিন তার মান রাখবে।

পুলিন আজ তার হাতের বাইরে চলে গেছে। না, পুলিনের ওপরে তার রাগ হয়নি। সদ্য সাবালক হওয়া একটা ছেলে অন্যের শেখানো বুলি আউড়েছে মাত্র। তার এখন রাগ হচ্ছে তার নিজেরই ওপরে। কেন সে পিটার ব্রাগানজার হাত থেকে ওই প্রতিবাদী ছেলেটাকে বাঁচাতে গেল? সেটা কি তার ভুল ছিল? আবার শ্যামাদাসদার কথামতো এমনও তো হতে পারে যে সে হয়তো আগেই মার্কড হয়ে গিয়েছিল পিটারের চরের চোখে? তাই বাধ্য হয়েই তাকে সরে আসতে হল আর পুলিনকে সঁপে দিতে হল শ্যামাদাসের কাছে। সে তো বুঝতেই পেরেছিল যে একটা গরিব ঘরের ছেলে সহজেই টাকার টোপে ধরা পড়ে যাবে শ্যামাদাসের হাতে। সে নিজেও তো সপ্তায় দুটো করে টাকা দিয়ে পুলিনকে নিজের কাছে ধরে রাখতে পারত? হ্যাঁ, তার পক্ষে হয়তো কঠিন হত কাজটা, কারণ তার তখন মাইনে বেশি ছিল না। তবু...তবু আজ তার মনে হচ্ছে বড়ো ভুল করেছে সে, যার জন্যে সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না। কিন্তু তার সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার উপায়ই বা কী?

হঠাৎই তার ভাবনায় ছেদ পড়ে। আরে, পরশুই তো পুলিন আসবে মার্কুইস স্ট্রিটে। তবে সে ঠিকই করে রেখেছে যে পুলিন না চাইলেও তাকে নজরে রাখবে এমনভাবে যাতে পুলিনের নজরে ধরা না পড়ে। কিন্তু কীভাবে? উপায় খুঁজে ফেরে সে। কিন্তু তার মস্তিষ্ক বড়ো ক্লান্ত এখন।

ঘরের দেওয়ালে সুবিমলের মেসোমশাইয়ের টাঙিয়ে রাখা এক কালীমূর্তির পটের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। তার মনে ভেসে আসছে বিষ্টুচরণের কালী সেজে সেই তাণ্ডব নাচের কথা। সে আবার ভাবতে চেষ্টা করে পুলিনকে আগলে রাখার উপায়। কিন্তু ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে যায় তার মন। চোখ বুজে আসে তার। ঘুম নেমে আসছে ধীরে ধীরে।... গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবার আগে দেখে যে বিষ্টুচরণ আর কালীমূর্তি একাকার হয়ে যাচ্ছে। তন্দ্রায় মিশে যাচ্ছে শরীরী আর অশরীরী...।

ক্রমে রজনী তলিয়ে যায় আরও গভীর ঘুমে। শুধু ঘরের বাল্বটা জেগে থাকে সারারাত — এক নির্বাক, বিনিদ্র প্রহরীর মতো।

আজ বৃহস্পতিবার। কিন্তু বিকেলবেলায় সাড়ে চারটে নাগাদ কালবোশেখী ঘনিয়ে আসার জন্যে সন্ধে নেমে গেছে তাড়াতাড়ি। রাস্তার বাতিও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন প্রায় ছ-টা বাজতে যায়। আবছা আলোয় আজ বৃষ্টিভেজা মার্কুইস স্ট্রিট যেন আরও রহস্যময়। লোকচলাচল প্রায় নেই বললেই চলে। তবে খোলা আছে চীনে জুতোর দোকানটা।

এমনসময় টাইট কালো হাফপ্যান্ট আর ফতুয়া পরা একজন লোক পথে যেতে যেতে হঠাৎই ঢুকে পড়ল ওই রাস্তার পাশের একটা গলিতে। এখানে বাড়িগুলো সব গায়ে গায়ে লাগানো। লোকটা একটু দাঁড়াল একটা বাড়ির পেছনের অন্ধকার জায়গায়। তার কোমরে ঝোলানো কালো চামড়ার তৈরি একটু বড়ো পাউচ ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল তার গায়ের ফতুয়া।

তারপর জাগুয়ারের মতো ক্ষিপ্রতায় ড্রেন পাইপ বেয়ে উঠে গেল বাড়ির অন্ধকার ছাদে। পাউচ ব্যাগ থেকে বের করে আনল একটা টিনের ডিবে আর একটা বাইক আরোহীদের চশমা। তারপর ডিবে থেকে কালো কালি নিয়ে মেখে নিল মুখে, গায়ে, সর্বাঙ্গে। আর চোখে পরে নিল চশমা। এই চশমাটার দু-পাশ ঢাকা, কারণ যাতে ঘামে বা বৃষ্টিতে গায়ে মাখা রং গলে গিয়ে তার চোখে না ঢুকে যায়। এবার ডিবেটা ব্যাগে রেখে ব্যাগ থেকে ব্যান্ডেজের মতো কাপড় বের করে চটপট জড়িয়ে নিল তার হাতের চেটো থেকে কনুই আর পায়ের পাতা থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত— যাতে ভালো গ্রিপ পাওয়া যায়। বেরিয়ে রইল শুধু হাতের আর পায়ের আঙুলগুলো। সব রেডি হয়ে গেলে ছাদের পর ছাদ টপকে পৌঁছে গেল সেই বাড়ির ছাদে যেখান থেকে রাস্তার দু-দিক আর জুতোর দোকানের ভেতরটাও স্পষ্ট দেখা যায়। এখন বৃষ্টি থেমে গেছে। তবু বাজের আলো ঝলকাচ্ছে মাঝেমাঝে। সেই আলোতে চকচক করে উঠছে লোকটার চশমার কাঁচ।

ওই তো, ওই তো ছেলেটা আসছে। আসতে আসতে সামনে পেছনে চোখ চালিয়ে সে দেখে নিচ্ছে কেউ আসছে কি না। চীনে জুতোর দোকানটা ছাড়িয়ে সে এগিয়ে গেল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত। দেখে নিতে চাইল কেউ তাকে নজরে রাখছে কি না। কিন্তু না। খানিক সেখানে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে ভালো করে দেখেও সন্দেহজনক কাউকে দেখতে পেল না। সে ছেলেটা আর কেউ নয়— সে হল পুলিন।

নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এসে পুলিন ঢুকে পড়ল চীনে জুতোর দোকানটায়। নিজের ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করে দিল লোকটাকে। বিনিময়ে লোকটাও তাকে দিল দুটো প্যাকেট।

এদিকে নিঃশব্দে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মোড়ে জিপ দাঁড় করিয়ে তার থেকে নেমে এলেন লোকাল থানার ওসি দূর্গাদাস সাহারায়। তার পেছনে একজন পুলিশ। গাড়ি থেকে নেমে দূর্গাদাস দেখেন চীনে জুতোর দোকান থেকে বেরিয়ে পুলিন মার্কুইস স্ট্রিট ধরে এগিয়ে যাচ্ছে চৌরঙ্গির দিকে। খানিকটা এগিয়েই গেছে সে। দূর্গাদাস তাই রিভলভার বের করে হাঁক পাড়লেন— 'এইই হল্ট, থামো, নইলে গুলি করে দেব।'

সেই আওয়াজ শুনেই দৌড়তে শুরু করেছে পুলিন। তার পেছনে খানিকটা তফাতে দৌড়চ্ছেন দারোগা দূর্গাদাস আর তার পেছনে দৌড়চ্ছে পুলিশটা। এদিকে এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে তাদের নিঃশব্দে ফলো করে যাচ্ছে অন্ধকারে মিশে থাকা এক কালো মূর্তি।

সামনেই রাস্তার একটা বাঁক। সে বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায় পুলিন। দারোগা তখন বাঁকটা পেরিয়েছেন সবে। তাঁর থেকে হাতকয়েক দূরে পুলিশটা তখনও বাঁকের মুখে। আর ঠিক তখনই ছাদ থেকে লাফিয়ে পুলিশটার পেছনে নামে ছাদ দিয়ে ছুটে চলা মানুষটা। কিছু বোঝার আগেই তার একটা রদ্দায় অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে পুলিশটা। হঠাৎই শোনা যায় একটা ফায়ারিং এর শব্দ আর 'উঃ মাগো...' বলে একটা আর্ত চিৎকার।

কালো মূর্তি বাঁক পেরোতেই দেখে রাস্তার পাশের ময়লা ফেলার জায়গার পাশে বুক চেপে বসে পড়েছে পুলিন আর সেই অবস্থাতেই তার ব্যাগ থেকে একটা রিভলভার বের করে ফায়ার করল সে। বুলেটের ধাক্কায় দূর্গাদাস কাতরে উঠে মাটিতে ছিটকে পড়েন চিত হয়ে।

কালো মূর্তি এবার এগিয়ে আসে। দুজনেরই নিশানা একেবারে অব্যর্থ। পুলিন আর দূর্গাদাস এখন শুধু শবদেহ মাত্র।

হঠাৎ সে লক্ষ্য করে দূর্গাদাসের লাশের হাতচারেক দূরে পড়ে থাকা পুলিশটা উঠে বসেছে। চকিতে কাজ সারে কালো মূর্তি। রিভলভার ধরে থাকা মৃত দারোগার হাতটা তুলে দারোগারই আঙুলের চাপে একটা বুলেট ছুঁড়ে দেয় পুলিশটাকে তাক করে। গলা ভেদ করে বেরিয়ে যায় বুলেটটা। পুলিশটা লুটিয়ে পড়তেই পুলিনের ব্যাগ হাতড়ায় কালি মাখা লোকটা। কিন্তু তার ব্যাগের প্যাকেটদুটো গেল কোথায়? নিশ্চয়ই ওই ময়লা ফেলার ভ্যাটে। ঠিক এমন সময়েই চৌরঙ্গির দিক থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা যায়। হাতে আর একদমই সময় নেই। তাই সে চটপট উঠে যায় সামনের একটা বাড়ির ছাদে। সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কারা যেন হেঁটে আসছে আধো অন্ধকার রাস্তা ধরে জলে ভেজা রাস্তায় পড়ে থাকা তিনটে লাশের দিকে।

ওই লোকদুটো হল পিটার ব্রাগানজা আর তার বডিগার্ড করিম শেখ। এই করিম শেখই নজর রাখত পান্ডের চায়ের দোকানের ওপরে। তারা চারপাশে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে থাকলো কিছু। পিটার খুঁজে দেখল পুলিনের ব্যাগটা। তার মানে তারা এসেছে পুলিনের প্যাকেটেরই সন্ধানে। কী আছে ওই প্যাকেট গুলোতে? শেষমেশ করিম শেখ ওই ময়লার ভ্যাটেই খুঁজে পেল প্যাকেট দুটো। করিম সেটা পিটারের হাতে দিতেই তারা হনহনিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বাঁকের মুখে আর ছাদ থেকে ছাদে কালো মূর্তিও তাদের অনুসরণ করে চলল। খানিক দূর গিয়ে পিটার উঠে পড়ল তার ছোটো ফিয়াট ৫০০ গাড়িতে আর করিম তাকে সেলাম করে এগিয়ে গেল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে।

সরু রাস্তা; তাই বেশি জোরে ছুটছে না গাড়ি। ওমা, এ কী? পাশেই বাঁ-দিকে কলিন স্ট্রিট আর সেদিকেই বাঁক নিয়েছে গাড়ি। কালো মূর্তিও ছাদ থেকে ছাদে ফলো করতে থাকে গাড়িকে। কলকাতার এই এক সুবিধে যে বাড়িগুলোর অধিকাংশই গায়ে গায়ে লাগানো। তবে সর্বত্রই তো তা নয়। তাই কখনো রাস্তায় নামতে হচ্ছে তাকে আবার মওকা বুঝে উঠে পড়তে হচ্ছে কোনো বাড়ির ছাদে। কিন্তু এভাবে কতদূর যাওয়া যায়? বড়ো রাস্তায় পড়লে কী করবে সে? হঠাৎই তাকে বিস্মিত করে কাছেই একটা দোতলা বাড়ির কাছে থামল গাড়িটা। পিটার গাড়ি থেকে নেমে লোহার গেটটা খুলে আবার গাড়িতে উঠে সেটাকে ঢুকিয়ে দিল বাড়ির সামনে দু-পাশের সবুজ লন চিরে যাওয়া মোরাম বেছানো পথে। তারপর গেট বন্ধ করে গাড়ি থেকে প্যাকট দুটো নিয়ে সিটি বাজাতে বাজাতে গিয়ে পকেট থেকে চাবি বের করে খুলল বাড়ির দরজা। এর মানে একটাই হয়— পিটার একাই আছে বাড়িতে। অন্য কেউ নেই।

কালো মূর্তি ততক্ষণে সন্তর্পণে পৌঁছে গেছে লনে। পিটার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সামনেই কাঁচের জানলা দেওয়া ড্রয়িংরুম। সেই জানলা দিয়েই দেখা যাচ্ছে ভেতরটা। কোমরে গোঁজা রিভলভার আর মানিব্যাগ কাবার্ডের ড্রয়ারে রেখে চাবি দিয়ে সেই চাবির গোছা বড়ো ডাইনিং টেবিলে রেখে ছোটো সেলার থেকে একটা গ্লাসে বেশ খানিকটা মদ ঢেলে নিয়ে এসে বসল চেয়ারে। মদে খানিকটা জল মিশিয়ে তাতে দুটো লম্বা চুমুক মেরে একটা সিগারেট ধরাল সে। তারপরে প্যাকেট দুটোর ব্রাউন কাগজটা খুলল। প্রতিটার ভেতরে আরও বেশ কয়েকটা করে প্যাকেট। পিটার সেগুলো থেকে একটা করে প্যাকেট নিয়ে শুঁকে দেখল একবার। আরে এ তো সব স্বদেশি সাবানের প্যাকেট। সব প্যাকেটের ভেতরেই তাহলে সাবান আছে। তৃপ্তিতে সাবানটা নামিয়ে রেখে আবার গ্লাসে একটা চুমুক দিল। বাইরে থেকে তার হালচাল দেখে কালো মূর্তির কেমন যেন সন্দেহ হয়। প্যাকেটের ভেতরে সাবান নাকি অন্যকিছু আছে; নইলে নারকোটিক্সের অফিসার পিটারের কেন এত তৃপ্তি? কিন্তু কী আছে? জানতে হবে সেটা। আর জানতে গেলে বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই হবে।

পিটার নিশ্চিন্তে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর হাওয়ায় ধোঁয়ার রিং ছাড়ছে। এমন সময় দরজায় টোকা। 'হু ইজ দেয়ার?' হেঁকে উঠল পিটার। বাইরে অন্ধকার। তাই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। আবার দরজায় টোকা। মনে হচ্ছে করিম শেখ তাকে কোনো গোপন কথা বলতে এসেছে। তাই সাড়া দিচ্ছে না। নাঃ, এবারে উঠতেই হয়। টেবিল ছেড়ে উঠে পিটার এগিয়ে এল দরজার দিকে।

আর দরজা খুলতেই দড়াম করে একটা ঘুঁষি আছড়ে পড়ল ঠিক তার নাকের ওপরে। 'ওঃ মাই গড' বলে পিটার দু-হাতে নাক ধরে বসে পড়ে মাটিতে। কালো মূর্তি ততক্ষণে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ওই সাবান তার চাই। সাবানের মোড়কের ভেতরে কি কোনো নিষিদ্ধ বস্তু আছে? নাকি স্বদেশিদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণের জন্যে এনেছে? আসল সত্যিটা জানতে হবে তাকে। তবে পিটারের জ্ঞান থাকা অবস্থায় ওটা নিতে পারা যাবে না। হয়তো সে গুলিই চালিয়ে দেবে।

পিটার তখনও মাটিতে বসে। নাক ফেটে গিয়ে তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে টপটপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে মাটিতে। তখন কালো মূর্তি পিটারের জামার কলার ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে তেড়ে একটা ঘুঁষি মারে তার পেটে। 'ওঁক' করে একটা আওয়াজ বেরোয়। ঘুঁষির ধাক্কায় পিটার ধপ করে গিয়ে পড়ে সোফাতে। কিন্তু পিটারকে চেঁচাতে দেওয়া চলবে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে কালো মূর্তি পিটারের পকেট থেকে রুমাল বের করে দলা পাকিয়ে

ঠেসে দেয় তার মুখে। পিটার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। ‘গোঁ গোঁ’ করে আওয়াজ বেরোয় তার মুখ দিয়ে, কিন্তু পরমুহূর্তেই কালো মূর্তির বাঁ-হাতের আরেকটা পাঞ্চ গিয়ে পড়ে তার চোয়ালে। সোফায় কাত হয়ে যায় সে। আবার তাকে টেনে তুলে ঝড়ের গতিতে পাঁচ-ছটা পাঞ্চ ছুঁড়ে দেয় পিটারের পেটে আর চোয়ালে। ভক করে খানিকটা মদ বেরিয়ে আসে পিটারের মুখে গোঁজা রুমালের পাশ দিয়ে। নাক থেকে বেরোনো রক্তের সাথে মদ মিশে দরদর করে গড়িয়ে পড়ছে। ভিজে লাল হয়ে যাচ্ছে পিটারের জামা আর ট্রাউজারস। তবু মারমুখি সেই কালো মূর্তি। তার গোল গোল চশমার কাঁচে ঠিকরে পড়ছে ঘরের বাতির আলো। দেখা যাচ্ছে তার তীব্র আক্রোশ মাখা মুখের সাদা দাঁতের সারি। বড়ো ভয়ংকর সেই রূপ। তাকিয়ে থাকা যায় না। ভয় পাচ্ছে পিটার। রিভলভারটাও যে রাখা তার ড্রয়ারে। তাই এখন তার আর কিচ্ছু করার নেই। হঠাৎই সেই কালো মূর্তি পিটারের একটা হাত ধরে সাঁ করে ঘুরে গিয়ে তাকে দড়াম করে আছড়ে ফেলে মেঝেতে। তার শরীরের কালি লেগে যায় পিটারের জামায়। তবু এখনও পিটার গোঁঙাচ্ছে। কী সাংঘাতিক প্রাণশক্তি রে বাবা লোকটার। তাই শেষবারের মতো তাকে তুলে আবার আগের মতোই নির্মমভাবে আছাড় মারে মেঝেতে।

নাঃ, এইবার অজ্ঞান হয়েছে লোকটা। এখন তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। প্রথমেই একটা টোকায় টেবিলের গ্লাসটাকে ছিটকে ফেলে মাটিতে। গ্লাস ভেঙে বাকি মদটুকু ছড়িয়ে যায় মাটিতে। পিটারের মুখে গোঁজা রুমালটা বের করে নিয়ে সেটা হাতে জড়িয়ে টেবিলে রাখা পিটারের চাবির গোছা নিয়ে খুলতে থাকে একের পর এক ড্রয়ার। একটায় মেলে পিটারের রিভলভার। লোডেড। সেটা নিয়ে পাউচ ব্যাগে রাখে। আরেকটায় রাখা মানিব্যাগ। সেটাও নেয়। তারপরে পিটারের একতলার একটা ঘরে গিয়ে খুলতে থাকে আলমারি। জামাকাপড় ঠাসা। টেনে কিছু জামাকাপড় মেঝেতে ফেলে দেয় সে। এবারে দৌড়োয় দোতলায়। দেখে মনে হয় এটাই পিটারের শোবার ঘর। সেখানের আলমারিটা খুলে হাঁতড়াতে গিয়ে একটা কাগজ ছিটকে পড়ে মাটিতে। দিসপুর থেকে পাঠানো একটা টেলিগ্রাম। সেন্ডার লিন আঙ। টেলিগ্রামটা একবার ভালো করে দেখে, সেটাকে ফেলে রেখেই আগন্তুক আলুথালু করে দেয় ভেতরের জিনিসপত্র। হ্যাঁ, মোটামুটি বাড়িতে চুরি হওয়ার মতোই দেখাচ্ছে এবার।

আবার সে নীচে নেমে আসে। তারপরে পিটারের চোয়ালে একটা লাথি মেরে দেখে তার জ্ঞান ফিরেছে কি না। নাঃ, সাড়াশব্দ নেই। নাকের সামনে হাত দিয়ে দেখে নিঃশ্বাস পড়ছে কি না। হ্যাঁ, পড়ছে। তার মানে পিটার মরেনি। তারপরে দুটো সাবান রুমালে মুড়ে নিয়ে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়। জ্ঞান ফিরলে পিটার বুঝতেই পারবে যে এত সাবানের মধ্যে থেকে দুটো সাবান চুরি হয়ে গেছে। তবে বুঝলেও কালো মূর্তির তাতে কিছু যায় আসে না। কোথাও তো সে তার আঙুলের ছাপ ছেড়ে আসেনি। তার মন জুড়ে এখন শুধুই স্নেহাস্পদকে হারানোর তীব্র যন্ত্রণাজাত ক্রোধ আর জীবনে প্রথমবার নরহত্যা করার জন্যে শঙ্কা আর অনুশোচনার মিশ্র অনুভূতি।

রজনীর জ্বর, কোল্ট পয়েন্ট থ্রি টু আর সত্য-সংবাদ

বৃহস্পতিবার বাড়ি ফিরে ধুম জ্বর এসেছিল রজনীর। তাই চুপচাপ দরজা ভেজিয়ে অঘোরে বিছানায় পড়েছিল সে। কেষ্টদা চা দিতে এসে বন্ধ দরজায় টোকা মেরে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা ঠেলে ঢোকে। দু-চার বার ডাকাডাকি করে গোঙানির শব্দ শুনে সে রজনীর গায়ে হাত দিয়ে বুঝতে পারে যে তার গায়ে ধুম জ্বর। তাই তার গায়ে কম্বলটা চাপা দিয়ে সে গিয়ে খবর দেয় বাড়িওয়ালা পরিতোষ মিত্তিরকে। পরিতোষবাবুই কেষ্টকে দিয়ে ওষুধের দোকান থেকে অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট এনে খাইয়ে দেন রজনীকে। ঘণ্টাদুয়েক পরে আবার আসেন পরিতোষবাবু। ততক্ষণে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়তে শুরু করেছে।

পরিতোষবাবু বলেন— 'জ্বরটা কমেছে মনে হচ্ছে।'

—'হ্যাঁ।'

—'শোনো, কালও যদি একইসময়ে জ্বর আসে তবে ডাক্তার দেখাতে হবে। কলকাতায় ম্যালেরিয়ার খুব উপদ্রব। ম্যালেরিয়া হলে ডাক্তার তখন হয়তো কুইনাইন প্রেসক্রাইব করবে। তা সেসব পরের কথা। এখন বল তো, জ্বরটা কি খুব কাঁপুনি দিয়ে এসেছিল?'

—'না।'

—'ঠিক আছে। আমি দুটো অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট রেখে যাচ্ছি। রাতে দরকার পড়লে খেয়ে নিও। আর হ্যাঁ, আজ রাতে আর ভাত খেওনা। আমি বরং কেষ্টকে দিয়ে দুধ-সাবু পাঠিয়ে দেব।'

রজনী ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

পরিতোষবাবু যেতে যেতে বলেন— 'এই কেষ্ট, দাদাবাবুর মশারীটা খাটিয়ে দিয়ে যা।'

শুক্রবার অফিসে বসে খবরের কাগজটা খুলতেই বোবা হয়ে যায় রজনী। প্রথম পাতাতেই তিনটে লাশের ছবি। ওপরে হেডলাইন—

বিপ্লবীর হাতে ওসি খুন

লালবাজারের পুলিশ কমিশনার R.E.A RAY তড়িঘড়ি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন যে চাঁপাডাঙা নিবাসী পুলিন বিশ্বাস নামের এক বিপ্লবী কলকাতার মার্কুইস স্ট্রিটের এক চীনে জুতোর দোকান থেকে রিভলভার পাচার করছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নারকোটিক্স ডিপার্টমেন্টের ডি.সি পিটার ব্রাগানজা নিউমার্কেট থানার ও.সি দূর্গাদাস সাহারায়কে ব্যাপারটা জানান। দূর্গাদাস তাঁর সহকারীকে নিয়ে মার্কুইস স্ট্রিটে গতকাল সন্ধে ছ-টা নাগাদ হানা দেন। কিন্তু ওই বিপ্লবী পুলিন বিশ্বাস ও.সি দূর্গাদাস আর তার সহকারীর দিকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। জবাবে পুলিশও গুলি ছোঁড়ে। গুলি বিনিময়ের ফলে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কমিশনার আরও জানিয়েছেন যে, ঘটনাস্থলের পাশ থেকে পুলিশ ওই বিপ্লবী যে প্যাকেট পাচার করছিল সেটা খুঁজে পায়। তাতে পাওয়া যায় একটা কোল্ট পয়েন্ট থ্রি টু রিভলভার। কাগজে তার একটা ছবিও দেওয়া আছে। পুলিশ সেটা বাজেয়াপ্ত করেছে আর বডিগুলো পোস্ট মর্টেমের জন্যে পাঠানো হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ক্যালকাটা পুলিশের এটা একটা সাফল্য। পুলিশ এখন ওই অস্ত্রপাচার চক্রের সন্ধান করছে।

খবরটা কোনোরকমে পড়ে ভাঁজ করে ঢুকিয়ে রাখে ব্যাগে। আর কোনো খবর তার পড়তে ইচ্ছে করছে না। মনটা বড্ডো ভারী হয়ে আছে। হয়তো এটাই ছিল পুলিনের নিয়তি।

মুক্তোরাম ডাকল— 'স্যার চা।'

তার ডাকে হুঁশ ফিরল রজনীর। তাকে বিমর্ষ দেখে মুক্তোরাম জিজ্ঞেস করলে—'কিচু হয়েচে স্যার?'

চায়ে চুমুক দিয়ে রজনী বুঝল— এটা তার কাজের জায়গা। মনে যতোই কষ্ট থাকুক এখানে বিষণ্ণ হয়ে থাকলে চলবে না। তাই নিজেকে খানিকটা সহজ করে নেবার জন্যেই বলল— 'কাল রাতে ভূতে ধরেছিল আমায়।'

—'সে কি স্যার। বলেন কি? আপনার বাড়িতেও ভূত? না না স্যার, আপনি নিশ্চই ভুল দেকেছেন।'

—'হয়তো হবে।' নির্লিপ্ত জবাব রজনীর। আসলে কথা বলতেই ইচ্ছে করছিল না তার।

—'না স্যার। এসব ভালো জিনিস নয়। আপনি পারলে বাড়িটা বদল করে নিন।'

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন ড্যানীবাবু। তারা দুজনেই তাঁকে 'গুড মর্নিং' জানাল। জবাবে উনিও তাদের 'গুড মর্নিং' জানিয়ে নিজের ঢাউস টেবিলটায় গিয়ে বসলেন। মুক্তোরাম ওনার কাপে চা ঢেলে দিয়ে ঘর ছাড়ল।

চায়ে দুটো চুমুক দিয়ে ড্যানীবাবু বললেন— 'আজকের কাগজটা পড়েছ?'

—'হুঁ।' ছোট্টো জবাব রজনীর।

—'অনেকদিন পরে এই দেখলাম একটা বাচ্চা ছেলেকে শহীদ হতে। কীসের অমোঘ টানে যে এরা ছোটে...। জানো রজনী তোমাকে একটা কথা পার্সোন্যালি বলছি। কাউকে বলবে না কিন্তু।' এই কয়েকটা দিনেই ড্যানীবাবু বেশ আপন করে নিয়েছেন তাকে।

—'না স্যার, বলব না।'

একটা গভীর শ্বাস ফেলে ড্যানীবাবু বলতে লাগলেন— 'আমি এই যে সায়েবদের অধীনে কাজ করে অর্থ পাই, সম্মান পাই; এক এক সময়ে মনে হয় এসবই ফাঁকা কলসির মতো। ভেতরটায় কিচ্ছু নেই। মানে ওরা আমাকে যে অর্থ আর সম্মান দেয় তা স্রেফ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্যে। নইলে ওদের মনের ভেতরে গেলে দেখবে, ওরা আমাদের স্লেভ ভাবে, ঘেণ্ণা করে।'

একটু থেমে চায়ে চুমুক দিয়ে ড্যানীবাবু আবার বলতে থাকেন— 'সত্যি বলছি, বয়সটা কম থাকলে আমিও নির্ঘাত ওই বিপ্লবীদের দলে নাম লেখাতাম। লেখাপড়া ভালোবাসতাম বলে যখন সময় ছিল তখন এসব নিয়ে ভাবিনি। তবে ইংরেজ যদি ভারত ছাড়ে; অবশ্য হয়তো ছাড়তেও বাধ্য হবে, তবু কিন্তু ওদের এই আড়াইশো বছরের শাসনের ছাপ রেখে যাবে সমাজের সর্বত্র। হয়তো স্বাধীন হওয়ার পরে আরও দু-শো বছর লাগবে ওদের ছড়িয়ে দেওয়া ঘুণপোকাগুলোকে শেষ করতে। অবশ্য আমরা যদি সৎপথে চলতে পারি তবেই।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। রজনীর মনে হয় ড্যানীবাবুর কথাগুলো হয়তো সত্যি। জ্ঞানী মানুষদের একটা অন্তর্দৃষ্টি থাকে। তাই উনি দেখতে পেয়েছেন দেশের ভবিষ্যৎ।

একটু পরে পকেট থেকে একটা রুপোর টাকা বের করে রজনীকে বললেন— 'কবে যে এই টাকায় জর্জ দ্য সিক্সথ এর বদলে সুভাষ বোসের ছবি দেখব কে জানে।' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোয় তাঁর বুক থেকে।

তারপরে চা টা শেষ করে বললেন— 'চল ল্যাবে যাই। গুজরাটের কচ্ছ থেকে দুটো সি-হর্সের ফসিল এসেছে। আমি কাল দুটোকে ডিসটিলড ওয়াটারে ভিজিয়ে রেখে গেছি। চল, দু-জনে মিলে ও দুটোকে সাফ-সুতরো করে ফেলি। খুব সাবধানে এই কাজটা করতে হবে বুঝলে। আমি তো তোমাকে দেখিয়েই দিয়েছি সব। আগে অন্য কাজও তুমি করেছ। তবে আজকের নতুন এই কাজটাতে ইন্টারেস্ট পাবে এটুকু বলতে পারি।'

ল্যাবের দিকে যেতে যেতে রজনী বলল— 'স্যার একটা কথা বলব?'

—'বল।'

—'কলকাতার কোনো স্কুলে কী আপনার জানাশোনা আছে?'

একটু ভেবে নিয়ে ড্যানীবাবু বললেন— 'হ্যাঁ, হিন্দু স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। কিন্তু কেন বল তো? তুমি তো এখনও বিয়ে-থা করোনি? তবে কীসের জন্যে?'

—'আমাদের গ্রামে আমার পরিচিত একটা বছর বারোর ছেলে আছে। খুবই ইনটেলিজেন্ট, তবে গরিব। আমার ইচ্ছে ওকে ভালো করে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলা। যখন গ্রামে ছিলাম তখন কোনো সাবজেক্টের কিছু বুঝতে না পারলে আমি ওকে দেখিয়ে দিতাম। তা এখন তো আমি প্রায় সারা সপ্তাই কলকাতায় থাকি। তাই চাইছিলাম যদি কলকাতায় ওর একটা ব্যবস্থা করে লেখাপড়াটা শেখানো যায়...'

—'বাঃ, বাঃ। বেশ ভালো ভাবনা। তারিফ করার মতো। আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখবোখন একবার ফোন করে। তা ফ্রি-শিপ চাই নাকি? আর হস্টেল?'

—'হলে তো ভালোই হয় স্যার।'

—'তা কোন ক্লাসে ভরতি করাতে চাও?'

—'আজ্ঞে, ফিফথ ক্লাসে।'

—'ঠিক আছে ফোন করব। ব্যাপারটা মাথায় রইল। তবে তুমিও পরে আমায় খেয়াল করিয়ে দিও।'

ল্যাবরেটরিতে ঢুকে ইস্তক ড্যানীবাবু লক্ষ্য করেন যে আজ রজনীকান্ত যেন বেশ বিমর্ষ। এমনিতে ছেলেটা একটু ইন্ট্রোভার্ট, তবুও আজ কেমন যেন আনমনা লাগছে তাকে। নইলে বলে দেওয়া সত্বেও ভিনিগার মেশানো জলে ফসিলটা ডুবিয়ে হালকা হাতে ম্যাট্রিক্সগুলো ব্রাশ-ওয়াশ করার বদলে নিডল-ওয়াশ করতে শুরু করে? এতে ফসিলের মূল অংশের ক্ষতি হতে পারে। উনি হাঁ হাঁ করে উঠতেই অবশ্য সামলে নেয় রজনী।

তবে ড্যানীবাবু এও খেয়াল করেন যে ছেলেটাকে আজ যেন একটু ক্লান্তও মনে হচ্ছে। এমনকী লাঞ্চ টাইমে নীচে লাঞ্চও করতে গেল না। অফিসার্স ক্যান্টিন থেকে লাঞ্চ সেরে এসে দেখেন টেবিলে দু-হাত আড়াআড়ি রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে রজনী। পিঠে হাত রাখতে মুখ তোলে সে। চোখদুটো তার লাল।

—'শরীর খারাপ লাগছে?'

—'না স্যার।'

—উঁহু, তা বললে তো হবে না। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে তোমার কিছু একটা হয়েছে।'

কপালে হাত ঠেকিয়ে ড্যানীবাবু বললেন— 'গা তো একটু গরম গরম লাগছে।'

—'না স্যার। ও কিছু না।'

—'ও কথা বলে পার পাবে না রজনী। মনে হচ্ছে তোমার জ্বর আসতে পারে। তাই বলি কী, তুমি এখন বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নাও। আর জ্বর এলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাবে। দরকারে ছুটি নিও। তারপর সেরে গেলে ফিট সার্টিফিকেট নিয়ে জয়েন কর। আমি ডিরেক্টরকে দিয়ে স্পেশাল মেডিক্যাল লিভ স্যাংকশন করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। নাও, এবার ওঠো দেখি।'

টেবিলের জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে নিজের ঝোলা ব্যাগটা নিয়ে রজনী বললে—'তাহলে আসি স্যার।'

—'হ্যাঁ এসো। সাবধানে যেও। আর মশারি খাটিয়ে শোও তো? জানবে কলকাতা হচ্ছে ম্যালেরিয়ার বসত বাড়ি।'

অসময়ে তাকে ফিরতে দেখে সুবিমলের মেসো বলে উঠলেন— 'কী হল? আবার জ্বর আসছে নাকি?'

—'না।'

—'তাহলে কেষ্ট গিয়ে চা দিয়ে আসুক? আজ কিন্তু বেশ ক্লান্ত লাগছে তোমায়।'

—'হ্যাঁ মেসোমশাই' বলে রজনী দোতলায় উঠে বিছানায় এলিয়ে দেয় শরীরটাকে। সত্যিই ভেতরে ভেতরে চূড়ান্ত বিধ্বস্ত সে। অ্যাসপিরিন বা কুইনাইনের সাধ্য নয় তা সারানো।

দৈনিক সত্যসংবাদের অফিসে বসে একটা খবর লিখছিল নিখিলেশ মিত্র। মানিকতলার একটা সোনার দোকানে চুরির কেসের খবর। নিতান্তই মামুলি। তবুও আটটার মধ্যে সাব-এডিটরের টেবিলে ফেলতে হবে এটা। লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর মোটামুটি সত্তর-আশিটা শব্দ লিখলেই রিপোর্টটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এখনও আধঘণ্টা সময় আছে। তার মধ্যে হয়ে যাবে। নইলে কালকের কাগজে বেরোবে না খবরটা। চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাবির খবর খুব খায় লোকে। আর তার সঙ্গে ইদানীং যোগ হয়েছে মন্বন্তর আর যুদ্ধের খবরও। এবারে খবরটা লেখা শেষ হলেই একবার ফোন করতে হবে তার স্কুল আর কলেজের বন্ধু লালবাজারের ডি. সি. ডি. ডি. নির্মল সেনকে— যদি কোনো স্কুপ পাওয়া যায়।

লেখা শেষ করে সে নির্মল সেনকে ফোন লাগায়। কাছের বন্ধু বলে তাকে আর অপারেটরের মাধ্যমে যেতে হয় না। নির্মলের ডাইরেক্ট নম্বর তার কাছে আছে আর তার নম্বরও আছে নির্মলের কাছে।

—'হ্যালো, সেন স্পিকিং।'

—'হ্যাঁ, আমি নিখিলেশ বলছি।'

—'ও, বল কী খবর? তা কোনো জিলিপির দরকার পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

দুই বন্ধুই জানে ‘জিলিপি’ শব্দের মানে। তাদের কাছে ‘জিলিপি’ মানে স্কুপ।

—‘হ্যাঁ, তা ওই পুলিনের কেসটার ভেতরের কথা।...কিছু আছে কি?’

—‘হ্যাঁ আছে। তুই সোওয়া ন-টা নাগাদ নিজামের সামনে থাকিস।’

—‘আচ্ছা। এখন রাখছি।’

এই বাজারে যে কাগজ যত স্কুপ দিতে পারবে ততোই তার কদর। বিশেষ বিশেষ স্কুপ তাই সন্ধের মুখেই বের করতে হয়। মোড়ে মোড়ে কাগজের হকাররা সংক্ষেপে বিষয়বস্তু বলে হাঁক পাড়ে— ‘টেলিগ্রাম’ ‘টেলিগ্রাম’। ইদানীং তো প্রায় রোজই বের করতে হচ্ছে; যুদ্ধের বাজার যে। অফিস ফেরত লোকজন হামলে পড়ে কেনে। এটাও কাগজের অফিসগুলোর একটা বিজনেস পলিসি। হু হু করে ‘টেলিগ্রাম’ বিকিয়ে যায় সন্ধে সাড়ে সাতটার মধ্যেই। বেশ ভালোই লাভ থাকে। তাই যে রিপোর্টার যত বেশি স্কুপ আনতে পারে, এডিটরের কাছে তার কদরও তত বেশি। আর এই ব্যাপারে নিখিলেশের বেশ নামডাকও আছে।

নিজের টেবিলে আধঘণ্টার মতো অপেক্ষা করে সে উঠে পড়ে। কপিটা জমা দিয়ে সাব-এডিটরকে বলে শুধু— ‘একটু জিলিপি খেতে যাচ্ছি।’ তারা দুই বন্ধু ছাড়া এই সাব-এডিটরই জানেন শুধু ‘জিলিপি’ শব্দের মানে। সে জানে, সুলুক সন্ধানী নিখিলেশ প্রায়ই দারুণ সব স্কুপ নিয়ে আসে। তবে ‘সোর্স’ সে কখনোই বলে না। সাব-এডিটর জানেন নিখিলেশের এই এথিক্স। আর তাঁর ‘সোর্স’ জেনেই বা লাভ কী? নিখিলেশের দেওয়া খবরের জেনুইনিটি সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। তাই উনি চোখ তুলে বলেন— ‘ঠিক আছে। এসো।’

ন-টা পাঁচ নাগাদ নির্মল সেন সাদা পোশাকে বেরিয়ে তার গাড়ির ড্রাইভারকে বলে— ‘নিজাম চল। তারপর বউদিকে নিউমার্কেট থেকে তুলে বাড়িতে নামিয়ে আবার আমার কাছে এসো। বাড়ি ফিরব। আর বউদি যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করে তো বলবে আমি অফিসে আছি।’

পুলিশের দুনিয়াটা যে কীরকম তা ড্রাইভার ভালো করেই জানে। এখানে চোখ যা দেখে, কান যা শোনে, তা মাথাতেই আটকে রাখতে হয়। নইলে...

ঠিক ন-টা বেজে দশে নির্মল গাড়ি থেকে নামে। নিখিলেশ তখন বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। নির্মলকে নামতে দেখে হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে সোজা ঢুকে যায় ভেতরে। নির্মলও তার পেছন পেছন ঢুকে পড়ে। একটা কেবিনে মুখোমুখি বসে নিখিলেশ লাচ্ছা পরোটা আর কাবাবের অর্ডার দেয়। বেয়ারা খাবার দিয়ে যাওয়ার ফাঁকে নিখিলেশ তার ব্যাগ থেকে একটা রাইটিং প্যাড আর পেন্সিল বের করে রাখে। এতে শর্টহ্যান্ডে নোট নেবে সে তারপর বাড়িতে ফিরে তার থেকে একটা রিপোর্ট খাড়া করে সাব-এডিটরের টেবিলে সকালে জমা করবে।

বেয়ারা খাবার দিয়ে গেলে তারা তাকে বলে পর্দাটা টেনে দিতে যাতে বাইরে থেকে কেউ নির্মল আর নিখিলেশকে একসঙ্গে না দেখে।

একটুকরো পরোটার সাথে কাবাব মুখে পুরে নির্মল সেন বলে— ‘এই, খাবার মুখে দিয়ে নোটস নে না।’

—‘নারে, হাতে তেল লেগে গেলে অসুবিধে হবে। তার চেয়ে আগে নোটস নিয়ে নিই, তারপর খাওয়া যাবে। তুই খেতে খেতেই বলে যা না।’

নির্মল সেন খেতে খেতেই বলে— 'কাটাছেঁড়া হয়ে গেছে। দুর্গার মেশিনে ছটা দানা ছিল। ফোন পেয়ে ফুল লোড করেই সে বেরিয়েছিল থানা থেকে।'

নিখিলেশ লিখতে থাকে।

—'কে ফোন করেছিল?'

—'সেটা তো আমারও অজানা। দুর্গা বেঁচে থাকলে বলতে পারত।'

নিখিলেশ মুখ তুলে বলে— 'আচ্ছা। তারপর।'

—'দুর্গার দুটো দানার একটা দিয়েছিল পুলিনকে আর একটা দিয়েছিল নিজের সঙ্গীকে।' দ্রুত হাত চলছে নিখিলেশের।

—'কিন্তু নিজের লোককেই সে দানা দিতে যাবে কেন?'

—'সেটাই তো রহস্য। যাহোক, সেই দুটো দানাই ছিল কোল্ট পয়েন্ট থ্রি টু-র। আর দুর্গার বাঁ-পকেটে ছিল ওই ছেলেটার দেওয়া দানা। এক্কেবারে ফ্যাটাল শুট সবকটাই। কিন্তু...।' আবার খাবার মুখে তোলে নির্মল।

—'কিন্তু, কী?'

—'ছেলেটার দেওয়া দানাটা কোল্টের নয়। অন্য রিভলভারের। কীভাবে পেয়েছিল সেটা এখনও জানতে পারিনি। তবে খোঁজ করছি। কিন্তু সেটা যে মুঙ্গেরের মাল নয় এটা নিশ্চিত। অনেক সফিস্টিকেটেড। আমেরিকান মাল।'

—'তাহলে কাগজে যে পয়েন্ট থ্রি টু রিভলভারের ছবি, পুলিনের প্যাকেটে রিভলভার পাওয়ার কথা আর কমিশনারের বিবৃতি বেরিয়েছিল, সেগুলো?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিখিলেশের।

—'সাজানো। সব সাজানো। তদন্তের স্বার্থে অনেক সময় মিডিয়াকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়। ওটা আমারই প্ল্যান। আমি শুধু কমিশনারকে রিকোয়েস্ট করে তাকে দিয়ে বলিয়েছি মাত্র। আর সাজানো রিভলভারের ছবিও তুলতে দিয়েছি মিডিয়াকে। তবে হ্যাঁ, আমার এই কথাগুলো ইনফর্মাটেটিভ ফর্মে লিখবি না কিন্তু। তোর নিউজ ফর্ম্যাট সেইরকম করবি, যাতে তার সোর্স বোঝা না যায়।' হাসতে হাসতে বলে নির্মল সেন। নিখিলেশও ব্যাপারটা বুঝে যায়।

বলে— 'তোরা পারিসও বটে। অবশ্য এইগুলো না করলেও তো...।'

সে এবারে খাবারের দিকে হাত বাড়তে যাবে এমন সময় নির্মল বলে উঠল— 'আরও কিছু খবর আছে। তবে তার জন্যে তোর পরোটা ঠান্ডা করার দরকার নেই। ছোটো খবর, তবে এখনও কেউ জানে না। তুই শুধু শুনে রাখ, কিন্তু পাবলিশ করবি না।'

এবার একটুকরো পরোটা আর কাবাব মুখে পুরে নিখিলেশ বলে— 'তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। নে এবার বল।'

—'তুই তো গিটারওয়ালাকে জানিস।'

—'হ্যাঁ। তা সে আবার কী করল?'

—'সে কিছু করেনি। তবে তার বাড়িতে চুরি হয়েছে। যে চোর ঢুকেছিল সে গিটারওয়ালার নাক ফাটিয়ে তার রিভলভার আর মানিব্যাগ নিয়ে পালিয়েছে।'

—'সে কী রে? বলিস কী? তা তার জন্যে কোনো ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে না?'

—'হচ্ছে তো বটেই। রিভলভার হারানোর জন্যে গিটারওয়ালাকে শো-কস করা হয়েছে। এক হপ্তার মধ্যে উত্তর দিতে হবে। তবে এটা জাস্ট অফিসিয়াল ফর্মালিটি। আর চুরি হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই তো ও এফ আই আর করেছিল। তা সেদিন ও নাকি ঘুমোচ্ছিল। আর চোর ঢুকেছে বুঝতে পেরে যেই না ও ঘরের বাইরে বেরিয়েছে, তখনই চোরটা ওকে পিটিয়ে নাকটাক ভেঙে ওর সার্ভিস রিভলভার আর মানিব্যাগ নিয়ে পালিয়েছে। ইনভেস্টিগেটিং অফিসারও ওর ফেভারেই রিপোর্ট দিয়েছে।'

—'কিন্তু সার্ভিস রিভলভার তো বাইরে ফেলে রাখার কথা নয়। ইনফ্যাক্ট কেউই তা রাখে না। তাহলে?'

—'অ্যাজ পার ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের রিপোর্ট, চোর নাকি ওকে পিটিয়ে ওকে দিয়েই চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলিয়ে ওর মানিব্যাগ আর উইপনটা নিয়ে পালিয়েছে।'

খেতে খেতেই নিখিলেশ মজা করে বলে— 'বাঘের ঘরেও তাহলে ঘোঘ ঢোকে, বল।'

—'তা যা বলেছিস।' হো হো করে হেসে ওঠে দু-জনেই।

পুলিনের সৎকার, সেনবাড়ির মশলাপাতি আর ড্যানীবাবুর সি-হর্স

বাস থেকে যখন নামল রজনী ততক্ষণে পুলিনের দেহ সৎকার হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে সুরেশ কাকার মুখে শুনল— নদীর চরে সন্ধ্যের একটু আগেই পুলিনের শেষ কাজ হয়ে গেছে। গ্রামের লোক নাকি ভেঙে পড়েছিল। সৎকারের সময়ে হাজির ছিল শ্যামাদাস, দিনেশ, বিষ্টুচরণ আর তাদের দলের আরও অনেকে। শ্যামাদাসের তদারকিতেই ভালোভাবে মিটে গেছে সব কাজ। পুলিশের তরফেও হাজির ছিল দু-জন।

শ্যামাদাস খানিকটা আগেই পুলিনের বাড়িতে গিয়ে কিছু টাকা দিয়ে এসেছে পুলিনের বাবার হাতে। কিন্তু টাকা দিয়েই কি মাপা যায় জীবনের দাম?

আজ সুরেশ কাকাও যেন খানিকটা নিজের বশে নেই। রজনীর অবস্থাও তাই। সেই ছোটোবেলা থেকেই ছেলেটাকে দেখছে তারা। কখনো সঙ্গীসাথীদের সাথে পুকুরে ঝাঁপাচ্ছে, কখনো গোরুর ল্যাজ মুচড়ে তাকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় করাচ্ছে আবার কখনো বা গ্রীষ্মের শুরুতে আমগাছের ডালে সদলবলে চড়ে কাঁচা আম খাচ্ছে। একবার তো রজনী দেখেছিল পুলিন একটা দাঁড়াশ সাপকে ল্যাজ ধরে ঘোরাচ্ছে। ওইভাবে ঘোরালে শিরদাঁড়া ভেঙে সাপটা মরে যেতে পারে। রজনী হাঁ হাঁ করে উঠতেই সাপটাকে ছেড়ে দিয়েছিল পুলিন। তখন কতই বা বয়স হবে তার। বড়জোর বছর দশ কী এগারো। তবে তখনই তার নজরে পড়ে গিয়েছিল ছেলেটা। রজনী মুগ্ধ হয়েছিল তার সাহস দেখে।

—'তোমার জন্যে আজ ডাল, ভাত আর আলুসেদ্দ করেচি ছোড়দাবাবু। পুলিনের ওখানে গেসলাম তো। তাই আজ আর তেমন কিছু করে উটতে পারিনি।' চা এগিয়ে দিতে দিতে বললে সুরেশ কাকা।

—'ঠিক আছে ওতেই হবে।' চায়ে চুমুক দেয় রজনী। ভাবতে থাকে এরপরে তার করণীয় কী? আজ তো শনিবার। একবার শ্যামাদাসদার ওখানে গেলে হত। সে হয়তো

বিশদে জানলেও জানতে পারে পুলিনের মৃত্যুর পেছনের কারণটা কী।

চায়ের কাপ ধুয়ে রেখে সুরেশ কাকা বলে— ‘কষ্ট পেওনি গো ছোরদাবাবু। যার যা নেয়তি তা হবেই। কিন্তু তুমি যদি এইভাবে থম মেরে থাকো, তবে অন্য বাচ্চাগুলোর কী হবে? তাদের তো আগু বাড়িয়ে নে যেতে হবে তোমাকেই। যাও, একোন মুখ হাত ধুয়ে খানিক বেশ্রাম করে রাতের খাবারটা খেয়ে নিও তাড়াতাড়ি। আমি ছেলেদের বলে দিইচি কাল সকালে আসতে।’

—‘ঠিক আছে। খেয়ে নেবো।’

—‘আচ্ছা, আমি আসি তাইলে?’

—‘হ্যাঁ, এসো।’

সুরেশ কাকা চলে গেলে হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম নেয় রজনী। শরীর তার ক্লান্ত নয়, কিন্তু মনটা তার বিবশ। হাজার পুলিন একটা কষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার বুকে। নাঃ, কাটিয়ে উঠতেই হবে এটা। হাজার ঝড়-ঝাপটা সয়েও বটগাছ যেমন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি তাকেও থাকতে হবে।

খেতে ইচ্ছে করছে না। তবু দুটো ভাত কোনোরকমে খেয়ে বাসনপত্র ধুয়ে রেখে সে রওয়ানা হল সেনেদের পোড়ো ভিটের দিকে। আজ শ্যামাদাস কী বলে তা জানতে হবে।

উঠোনের অন্ধকার পেরিয়ে শ্যামাদাসের ঘরে ঢোকার আগে নিঃশব্দে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ভেতরে ওরা কী বলাবলি করছে তা কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে রজনী। এত নীচু স্বরে কথা বলছে ওরা যে বাইরে থেকে কিছু তেমন ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। তবু শ্যামাদাসের দু-একটা কথা আবছা বুঝতে পারল— ‘হ্যাঁরে, পেছনের ঘরে মশলাপাতি আর দানাদার ঠিকঠাক আছে তো?... ঝ্যান ইওং দোকান ফেলে কোথায় পালাল কে জানে।’

পুলিন মারা গেছে আর ওরা কি ভোজের আয়োজন করছে? আর ঝ্যান ইওং-ই বা কে? ও আচ্ছা, মনে হয় এটা মার্কুইস স্ট্রিটের সেই চীনে জুতোওয়ালাটার নাম। কিন্তু এদের ভোজের সঙ্গে ওই জুতোওয়ালার কী সম্পর্ক?

দরজায় মৃদু টোকা দিতেই ভেতর থেকে ভেসে এল দিনেশের গলা— ‘কে?’

—‘আমি রজনীকান্ত।’

—‘এই, ওকে ভেতরে আসতে দে।’ শ্যামাদাসদার গলা।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে রজনী দেখে ওরা অন্যদিন যেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকে আজ তেমন নয়। বেশ কাছাকাছি বসেছে। নিশ্চয়ই কোনো গোপন কথা আলোচনা করছিল।

—‘এসো, রজনী বোসো।’ নরম সুরেই বলে শ্যামাদাস।

রজনীকান্ত একটা পেটির ওপরে বসে।

শ্যামাদাসই শুরু করে— ‘তোমার মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি রজনী। আমাদেরও একই অবস্থা। আমি তোমায় কথা দিয়েছিলাম যে পুলিনকে আমরা যথাসাধ্য নজরে নজরে রাখব। তবে সবদিন তো আর তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর কাজটাতেও তো তেমন কোনো রিস্ক ছিল না। কিন্তু কি আর করা যাবে? তবে রজনী, ছেলেটা কিন্তু বড়ো বেশি রিস্ক নিয়ে ফেলেছিল।’

রজনী তার ব্যাগ থেকে সত্যসংবাদের টেলিগ্রামটা বের করে দেয়। একটা সিগারেট ধরিয়ে মোমবাতির আলোয় সেটা ভালো করে পড়ে দেখে শ্যামাদাস।

তারপরে বলে— 'আরে বাবা, আমরা শুধু সাবান আনাই আর বেচি। তাতেই আমরা কোনোরকমে দল চালাই। আর পুলিশের নজরও আছে আমাদের ওপরে। আমরা শুধু শুধু কেন রিভলভার পাচারের রিস্ক নিতে যাব? এদিকে পুলিশ কমিশনার তো বলেই দিয়েছে যে প্যাকেটে নাকি রিভলভার পাচার হচ্ছিল।' শ্যামাদাস সিগারেটে ঘনঘন তিন চারটে টান মেরে আবার বলতে শুরু করে— 'তা বেশ। তর্কের খাতিরে না হয় ধরেই নিলাম যে রিভলভার পাচার হচ্ছিল। তা পুলিনের সৎকারের সময় তো পুলিশ উপস্থিত ছিল গ্রামে। তাহলে আমাদের তো এতক্ষণে অ্যারেস্ট হয়ে যাওয়ারই কথা। তাই না?' শ্যামাদাস বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

আবার সিগারেটে টান মেরে ধোঁয়া উড়িয়ে বলে— 'আসলে পুলিশ আর সাংবাদিক এরা দু-জনেই মিথ্যে মিথ্যে খবর সাজায়। এদের কাউকেই বিশ্বাস করতে নেই। সবাই ইংরেজদের চাটুকার। এসব মনগড়া খবর পাবলিককে না খাওয়ালে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে কাগজগুলোর। শোনোনি ''যুগান্তর''-এর কথা?'

—'তা শুনেছি।'

—'তাহলেই বোঝ।' আবার সিগারেটে টান মারে শ্যামাদাসদা। 'মাঝখান থেকে হল কি? আমরা সাবানের প্যাকেটই পেলাম না। তবে আমার কী মনে হয় জানো রজনী, ওই ব্যাটা চীনেটা, আরে কি যেন নাম...ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ওয়াং লি, ওই ব্যাটাই মনে হয় অন্য কোনো কাজের সঙ্গে পুলিনকে জড়িয়েছিল। আর তার জন্যেই অকালে প্রাণটা দিতে হল ছেলেটাকে। ইস্স্,.. বেচারা বুদ্ধিমান, সাহসী ছেলে। জানো রজনী, ও আস্তে আস্তে আমার ডানহাত হয়ে উঠছিল। আর ঠিক সেই সময়েই কি না...।' তার গলায় এবার বিষাদের সুর।

শ্যামাদাস খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তার উত্তেজনা যে একটু কমেছে তা তার সিগারাটে টান মারা দেখলেই বোঝা যায়।

একটু পরে রজনী বলে— 'আচ্ছা শ্যামাদা, পুলিন রিভলভার পেল কোথা থেকে? ওর তো এসব জিনিস জোগাড় করার মতো পয়সা নেই। আর পুলিশ আপনাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি?'

শ্যামাদাস আবার উত্তেজিত— 'আমরা? রিভলভার? কোথা থেকে পাব? আমার তো মনে হয় যে ওই চীনেটাই হয়তো নিজের ধান্দার জন্যে ওকে রিভলভার দিয়ে থাকবে। আর আমাদের ছেলেটাও বোকা, বুঝলে। রক্ত গরম তো, তাই পয়সার জন্যে যে অন্য ধান্দায় জড়িয়েছে তা আমাকে টেরই পেতে দেয়নি। তাতে লাভটা কী হল? বোকার মতো নিজের প্রাণটাই দিলি। ওরে, কেন ভুলে গেলি যে আমরা সশস্ত্র বিপ্লব করি না। ওটা আমাদের লাইন নয়। আর পুলিশ? তারা কি আর আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ না করেই ছাড়বে? যদি সেরকম কিছু ক্লু পেত, তাহলে এতক্ষণে আমরা তো থাকতাম পুলিশ হেফাজতে। তাই নয় কি? আচ্ছা, নাও, কাগজটা ধরো।' শ্যামাদাস সত্যসংবাদের টেলিগ্রামটা ফেরত দিয়ে দেয় রজনীকে।

শ্যামাদাসের ঘনঘন টানে সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটা মাটিতে ফেলে মাড়িয়ে হাতের ঘড়ি দেখল। বললে— 'নাঃ, এবারে উঠতে হয়।' তারপর রজনীর কাঁধে হাত রেখে শান্তভাবে বললে— 'তা তোমার মিউজিয়মের কাজকর্ম ভালো লাগছে তো?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় রজনী।

শ্যামাদাস বলে— 'কাজ করা ভালো। তাতে মন ভালো থাকে। তবে একটা কথা মনে রেখো রজনী— যে তুমি ইংরেজদের অধীনে কাজ করছ। যাইহোক, চলি এবার। এই নে নে তোরাও ওঠ। অনেক রাত হয়েছে।'

শ্যামাদাস সাইকেল চেপে বেরিয়ে যায়। তার পিছু পিছু দিনেশ আর বিষ্টুও। রজনী হাঁটা পথ ধরে।

বাড়ির পথে যেতে যেতে রজনী ভাবতে থাকে— ঝ্যান ইওং হয়ে গেল ওয়াং লি। কিন্তু কেন? সেনেদের বাড়ির পেছনে মশলাপাতি আর দানাদার রাখা হয়েছে ভোজের জন্যে। কিন্তু কীসের জন্যে ভোজ? আর পুলিনকে রিভলভারই বা দিল কে? আর যদিবা অন্য কেউ তাকে অস্ত্রটা দিয়েই থাকে, তাহলে সে কে? ঝ্যান ইওং, নাকি অন্য কেউ? ঝ্যান ইওং-ই যদি অস্ত্রটা দিয়ে থাকে, তাহলে স্বদেশি সাবানের আড়ালে অন্য কীসের ধান্দা করত সে?

সেইদিন রাতে বিছানায় শুয়ে রজনীর মনে হল— এবারে তার অতি বিশেষ কিছু কাজ আছে। কিন্তু সেই কাজগুলো করতে গেলে আগে পুলিশি তদন্ত থেকে নিজেকে আড়াল করার বিশেষ কিছু উপায় তাকে জানতে হবে। সেগুলো কীভাবে করতে হয় তা সে জানে না। আর তার জন্যে কিছু পড়াশোনা করার দরকার। কিন্তু সেই বিশেষ বই সে পাবে কোথা থেকে? হঠাৎ তার মনে হল যে সুবিমল হয়তো তাকে সাহায্য করতে পারে। বলে দেখতে হবে তাকে। তবে ঘুরিয়ে বলতে হবে। পড়াশোনার আসল বিষয়টা তাকে জানতে দেওয়া চলবে না।

রবিবার যথারীতি ছেলের দল হাজির। ছোলা-গুড় খেয়ে তারা বলল— 'স্যার, আজ আর দৌড়তে ইচ্ছে করছে না।' রজনী বুঝতে পারে ছেলেদের মনের অবস্থা। তাই বলে — 'ঠিক আছে। কুড়িটা পাক দে অন্তত।' ছেলেরাও তাই করলে।

ট্রেনিং শুরু হল যথারীতি। কিন্তু রজনীর আজ কেমন যেন মন বসছে না। তবুও একটা নতুন আত্মরক্ষা পদ্ধতি শেখাল সে। যদি কোনো লোক সামনাসামনি এসে দু-হাতে কারোর গলা টিপে ধরে, তখন কীভাবে তার হাত ছাড়িয়ে তার মুখে আঘাত করতে হবে। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেরা সেটা প্র্যাকটিস করতে লাগল। আখড়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে রজনী লক্ষ্য করেতে লাগল সব।

হঠাৎ বুনো চেঁচিয়ে উঠল— 'এই তুই নাকে মারলি কেন?'

জবাব এল— 'লেগে গ্যাছে। ইচ্ছে করে তো মারিনি।' কথাটা বলেছে কানাই।

রজনী হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল। না, বুনোর লাগেনি তেমন। তবে সে বুঝে গেছে যে এই কানাইকে একটু লেখাপড়ার পালিশ দিতে পারলে...।

তাই সন্ধ্যেবেলা বাস ধরার আগে সে কানাইদের বাড়িতে গেল। তার মা চা দিতে দিতে বললে— 'গেরামে অবিসম্পেত নেগেচে গো দা-বাবু। একে তো জিনিসপত্তরের দামে হাতে ছ্যাঁকা নাগে, আবার ওদিকে অমন সোমোত্ত ছেলেটা বাপ-মায়ের বুক খালি করে দে চলে গ্যাল।'

চা খেতে খেতে রজনী বললে— 'আমি কিন্তু একটা বিশেষ কথা বলার জন্যে এখানে এসেছি।'

—'বলেন না, কী বলবেন।'

—'বলছিলাম কী, আমি যদি কানাইকে কলকাতায় আমার কাছে নিয়ে গিয়ে রেখে ওকে লেখাপড়া শেখাই, তাহলে আপনাদের আপত্তি আছে কি?'

পুলিনের ঘটানাটা ঘটার পর থেকেই 'কলকাতা' নামটাই এখন এই গ্রামের মানুষের কাছে একটা আতঙ্ক হয়ে গেছে। কানাইয়ের মা বাবাও তার ব্যতিক্রম নয়। তাদের ধারণা, কলকাতায় গেলে তাদের ছেলেরও একটা কিছু অমঙ্গল ঘটে যাবে। অথচ তারা রজনীর মুখের ওপরে সরাসরি নাও বলতে পারছে না। তাই কানাইয়ের মা বললে— 'দা-বাবু, কানাইয়ের বাপ তো একোনো ঘরে ফেরেনি। সে ফিরলে তার সাতে কতা বলে আপনাকে না হয় জানাব। আপনি তো শনিবার শনিবার আসচেনই। তকোন না হয় ওর বাপের সাতে কতা বলে নেবেন।'

রজনী চা শেষ করে বললে— 'ঠিক আছে। তাইই হবে। আপনারা না হয় আলোচনা করে, ভেবেচিন্তে আমাকে জানাবেন। হাতে সময় আছে।'

এদিকে কলকাতার নাম শুনে কানাই নেচে উঠল— 'আমি কলকাতায় যাব স্যার। জাদুঘর দেখব, মনুমেন্ট দেখব, ভিক্টোরিয়া দেখব। আমায় সব দেখাবে তো স্যার?'

—'দেখাব, সব দেখাব। কিন্তু সেখানে গিয়ে তো টইটই করে বেড়ালে চলবে না। আমি স্কুলে ভরতি করে দেব। আমার কাছে থেকে লেখাপড়া করতে হবে, তবেই। আর আমার মতোই প্রতি সপ্তায় বাড়ি ফিরতে পারবি। এবারে আমি চাইলেই তো হবে না। তোর মা বাবারও তো মতামত দরকার, বুঝলি?'

দু-দিন পরে আবার ল্যাবে সি-হর্সের ফসিল নিয়ে কাজ করতে করতে ড্যানীবাবু বলতে লাগলেন— 'বুঝলে রজনী, অদ্ভুত প্রাণী এই সি-হর্স। শিরদাঁড়া আছে। একধরণের মাছ। উষ্ণ অগভীর জলে থাকে। কিন্তু আবার পুরুষ সি-হর্স তার পেটের থলিতে বাচ্চা পালন করে।'

রজনী এসব কথা জানত না আগে। সে বিস্মিত হয়ে বলে— 'সত্যি?'

—'আর সায়েন্টিফিক নেম কি জিনিস জানো তো?'

—'আজ্ঞে না।' সে তো আর সুবিমলের মতো বিজ্ঞানের ছাত্র নয়। সে এইসব বিজ্ঞানের ভাষা বুঝবে কী করে?

—'তাহলে শোনো, বুঝিয়ে দিচ্ছি। সায়েন্টিফিক নেম হল ল্যাটিন বা গ্রিক ভাষা থেকে শব্দ বেছে নিয়ে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের নাম দেওয়া। অবশ্য তাতে ইংরেজি শব্দ বা যেখান থেকে এটা পাওয়া গেছে সেটাও ওই নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে।'

রজনীর কাছে ব্যাপারটা অর্ধবোধ্য থেকে যায়। তাই সে চুপ করে থাকে।

তার এই অবস্থা দেখে ড্যানীবাবু বলতে থাকেন— 'আচ্ছা ধরো, আমরা জলকে বলি ''জল'', অবাঙালিরা বলে ''পানি'' আবার ইংরেজরা বলে ''ওয়াটার''। এ ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতেও জলের ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকতে পারে। কিন্তু যে শুধু জলকে ''ওয়াটার'' বলেই জানে, তাকে তুমি ''জল'' বা ''পানি'' বললে সে কি বুঝতে পারবে তুমি কোন জিনিসটা বোঝাতে চাইছ?'

—'আজ্ঞে না।'

—'আর ঠিক সেজন্যেই ওই সায়েন্টিফিক নেমের দরকার। ওই নামটা বললেই পৃথিবীর যেকোনো জীব-বিজ্ঞানী ওই বিশেষ প্রাণী বা উদ্ভিদটাকে সহজেই চিনতে পারবে। এবার বুঝলে?'

—'বুঝলাম স্যার। তা এই সি-হর্সের সায়েন্টিফিক নেম কি সি-হর্সই?'

—'আরে না না। গ্রিক ভাষা থেকে নেওয়া ওই চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা মাছটার সায়েন্টিফিক নেম শুনলে তুমি হাসবে।'

—'কী নাম স্যার?'

—'হিপ্পোক্যামপাস স্লোভেনিকাস। জানো, গ্রিক শব্দ অনুযায়ী ''হিপ্পো'' মানে হল ''ঘোড়া'' আর ''ক্যাম্পাস'' শব্দটা এসেছে ''ক্যাম্পোস'' শব্দ থেকে যার মানে হল ''সমুদ্র দানব''।' বলে হো হো করে হেসে ওঠেন ড্যানীবাবু।

—'বলেন কি স্যার। এই চার-পাঁচ ইঞ্চি প্রাণীটার নাম এত ভয় জাগানো?'

—'আসলে এর মুখের দিকটা হল ঘোড়ার মতো আর শরীরের গড়নটা অদ্ভুত রকমের বলেই হয়তো এই নিরীহ প্রাণীটার এইরকম নাম দেওয়া হয়েছে।'

—'আর ওই বাচ্চা পালন ব্যাপারটা কী?'

—'তাহলে শোনো, পুরুষ সি-হর্সের ল্যাজের ঠিক ওপরে পেটের সামনের দিকে ক্যাঙ্গারুর মতো একটা থলি থাকে। মাদী সি-হর্স ওই থলিতে প্রায় পনেরোশো ডিম পেড়ে দেয়। তারপরে ওই পুরুষ সি-হর্সের থলিতে ডিম ফুটে বেরোনো বাচ্চাগুলো বড়ো হতে থাকে। এরপরে ওই বাচ্চাগুলো যখন বড়ো হয়, এই সরু সুতোর মতো আর কী, তখন পুরুষ সি-হর্স তাদের জলে ছেড়ে দেয়। আরও জেনে রাখো যে প্রজাতি ভেদে এই লালন পালনের সময়টা ন-দিন থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন পর্যন্ত হতে পারে।'

রজনী তো শুনেই অবাক। শুধু বললে— 'বুঝলাম স্যার।'

—'গুড। তা তোমার ওই ছেলেটার জন্যে হিন্দু স্কুলে ফোন করতে হবে তো?'

—'হ্যাঁ স্যার, তবে মাস দুয়েক পরে করবেন।'

—'কেন? মাস দুই পরে কেন?'

—'আসলে ওই ছেলেটার মা একটু গাঁইগুঁই করছে। এর মাঝে আমি সময় সুযোগ করে ওর বাবাকে বুঝিয়ে বলব।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো ঠিকই। তবে তোমার এই ভালো কাজটার জন্যে তোমাকে একটা ''সাবাশ'' বলতেই হয়। জানবে আমি তোমার পাশে আছি। সময় এলেই বল, আমি হিন্দু স্কুলে ভরতির আগেই ফোন করব। আর হাতে তো এখনও অনেক সময় আছে। জানুয়ারি মাস না পড়লে তো ভরতি নেবে না।'

—'ঠিক আছে স্যার। আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।'

১৯৪৪, জুলাই

মান্দালয়ের ব্যবসায়ী, জাপানি সেনা আর দিসপুরের টেলিগ্রাম

সাতসকালেই লিন আঙ আর জিং থ্যান দশটা খচ্চরের পিঠে বাঁধছে বস্তাগুলো। প্রতিটা খচ্চরের পিঠে চারটে করে বস্তা। তার কোনোটায় পোস্তদানা, কোনোটায় পথের রসদ, কোনোটায় কাঠের তৈরি সুন্দর কারুকাজ করা কাঠের মূর্তি আবার কোনোটায় বা সাবান। সঙ্গে জ্বালানি কাঠও আছে। বস্তাগুলো সব ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ের তৈরি, কেন না এই পাহাড়ি পথে প্রায়ই বৃষ্টি হয়।

তারা ব্যবসায়ী। মালপত্র নিয়ে যাবে সেই সুদূর আসামের দিসপুরে। পাহাড়ের চড়াই-উতরাইয়ের শর্টকাট পথে গেলে হাতে অন্তত দুটো দিন বাঁচবে আর তাই গাড়ির ব্যবস্থা না করে এই খচ্চরের ব্যবস্থা। এই প্রাণীগুলো পাহাড়ি পথে দারুণ চলতে পারে। তা ছাড়া বৃষ্টি বা ঠান্ডাও এদের কাবু করতে পারে না।

এখান থেকে মানেওয়া দু-দিন আর সেখান থেকে তড়িঘড়ি চললেও কালেওয়া পৌঁছতে আরও দু-দিন। পথে পড়বে ইরাবতী নদী। সেখানে গাদা-বোটে তুলতে হবে খচ্চর সমেত মালপত্র। এইভাবে পাঁচ-ছটা বোট ভরতি হলে তবেই যাত্রীবাহী স্টিমারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে বোটগুলো। নদী পারাপার, মালপত্র নামানো, এসব করতে মোটামুটি সাত-আট ঘণ্টা লাগে।

সকালের স্টিমারে জুতে দিতে পারলে তারা দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাবে ওপারে। কিন্তু সময়ের অঙ্ক সবসময় নাও মিলতে পারে। নদীর ধারে জাপানি সেনা আর তারপরে ব্রিটিশ সেনার দল তাদের আটকাতে পারে। মালপত্র খুলে দেখতে পারে যে কোনো অস্ত্রশস্ত্র পাচার হচ্ছে কি না। যুদ্ধের বাজার যে। তাই সেনারা সদাসতর্ক। তার ওপরে আছে বোমারু বিমানের ভয়। তারা কখন কোথায় যে ভীমরুলের ঝাঁকের মতো উড়ে এসে বোমা ফেলে যাবে কে জানে।

তা এত বিপত্তি পেরিয়েও প্রথমে পৌঁছতে হবে ইম্ফলে। তারপরে আবার দীর্ঘ পথচলা, যতক্ষণ না তারা দিসপুরের বড়ো বাজারে পৌঁছোয়। নির্বিঘ্নে সেখানে পৌঁছতে পারলে তবেই দুটো পয়সার মুখ দেখবে। তাই ভোররাতে উঠে খচ্চরগুলোকে দানাপানি খাইয়ে দিয়েছে। এবার খানিকটা মোহিঙ্গা, শুয়োরের মাংস আর চা খেয়ে নিয়ে রওয়ানা দিলেই হয়।

জিং থ্যান তার লাল রেশমি দড়িতে বাঁধা ওহবোটা ঝুলিয়ে নিয়েছে কাঁধে। এই বাঁশিটা ভালোই বাজায় সে। রাখালরা যেমন গোরুর পালের পেছনে বাঁশি বাজাতে বাজাতে যায়, তেমনি জিং থ্যানও চলে খচ্চরের সারির পেছনে ওহবো বাজাতে বাজাতে। এই বাঁশির সুরে যেমন পথচলার কষ্ট লাঘব হয়, তেমনি দু-পাশের বনের মাংসাশি প্রাণীরাও পথ ছেড়ে দেয় তাদের চেয়েও বহুগুণে হিংস্র এক প্রাণীকে।

মানেওয়া থেকে কালেওয়া পৌঁছবার ঠিক মাইলখানেক আগে সন্ধের মুখোমুখি নামল বৃষ্টি। দুই ব্যবসায়ী চটপট দা দিয়ে বাঁশ কেটে একটা একদিকে ঢালু মাচার মতো বানাল। তার ওপরে আর ছাউনির নীচের মেঝেতে বিছিয়ে দিল বুনো গাছের ডাল। তারপর ওই ছাউনির নীচে আগুন জ্বালিয়ে সঙ্গে আনা শুকনো শুয়োরের মাংস পুড়িয়ে নিল তাতে। মগে করে বানাল চা।

খানিকপরে খাওয়া দাওয়া সেরে আগুনের তাতে জামাকাপড় শুকিয়ে পাতার বিছানায় শুয়ে পড়ল লিন আঙ আর পাশে বসে জিং থ্যান বাজাতে শুরু করল তার ওহবো। আজ একটা নতুন সুর এসেছে তার মনে। সেটাই সে বাজাচ্ছে অপূর্ব দক্ষতায় আর সেই সুর বৃষ্টিজলের সুরের সাথে মিশে ছড়িয়ে যাচ্ছে বনে আর পাহাড়ে। তারপর হারিয়ে যাচ্ছে দূরের ওই অন্ধকারে।

এইভাবেই পথ চলেছে দুই ব্যবসায়ী। মোটামুটি নির্বিঘ্নেই। কিন্তু বিপত্তিটা এল ইরাবতীর ঘাটে পৌঁছে। তাদের মালপত্র যে স্টিমারের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে তাতে জাপানি সেনা ভরতি। তারাও ওপারে যাবে। আঙ আর থ্যানের মনে ভয়— এই বুঝি ওপারে নেমে তাদের মালপত্রের তল্লাশি শুরু করে দেবে জাপানি সেনারা। আর ওরা তল্লাশির নামে যা করে, তাকে অত্যাচারই বলা যায়। লণ্ডভণ্ড করে দেয় মালপত্র, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় সব। কোনো পলকা জিনিস থাকলে তা ভেঙে যায়। তখন লোকসান। কিন্তু সেসব থোড়াই কেয়ার করে তারা।

ওপারে পৌঁছে নামতে শুরু করল সেনারা। ততক্ষণে আঙ আর থ্যানের খচ্চর ভরতি গাদা-বোটটাও ভিড়েছে পাড়ে। সেনারা নেমে সারি বেঁধে চলতে শুরু করতেই তাদের সঙ্গে খানিকটা তফাৎ রেখে চলতে শুরু করল আঙ আর থ্যান তাদের খচ্চরবাহিনী নিয়ে। তবে এর ফলে তাদের সুবিধেই হল। নদীর ঘাটে তল্লাশি চালায় যে সেনারা তারা বন্দুক তুলে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত এই নতুন আসা সেনার দলটাকে। ফলে আঙ আর থ্যান বিনা বাধায় পেরিয়ে গেল ইরাবতীর চেকপোস্টটা।

সেনার দলটা হনহনিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাদের চেয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে এই দুই বর্মী ব্যবসায়ীর খচ্চরবাহিনী। বেশ কয়েকঘণ্টা চলার পরে একটা জায়গা এল। নাম উখরুল। তার উত্তরমুখী রাস্তাটা চলে গেছে কোহিমার দিকে আর দক্ষিণমুখী পথটা ইম্ফলের দিকে। সেনারা উত্তরমুখী পথটা ধরলে আর আঙ ও থ্যান ধরল ইম্ফলের রাস্তা। কোহিমা দিয়ে গেলে একটু তাড়াতাড়িই পৌঁছোনো যেত বটে; তবে সেখানে বড্ডো সেনাদের জ্বালাতন। তা ছাড়া দক্ষিণমুখী পথে আর একদিন একটু পা চালিয়ে হাঁটলেই তারা ঢুকে পড়বে আসাম প্রদেশে। দিসপুরে পৌঁছোনোর জন্যে এটা একটু ঘুরপথ হলেও এইপথে চেকপোস্টের সংখ্যা কম। আর যেগুলোও বা আছে, তাদের রামের পাঁইট কিংবা সিগারেটের প্যাকেট দিলেই ছেড়ে দেয় তারা।

এইভাবে খানিকটা চলার পরেই থামল তারা। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। তাই খচ্চরদের বেঁধে রেখে তাদের দানাপানি দিল। তারপরে পথের পাশে একটা পাথরের ছোটো গুহামতো দেখে সেখানেই আশ্রয় নিল রাতের মতো। সামনে জ্বালিয়ে রাখল আগুন, একটু ওমের জন্যে।

চলতে চলতে অবশেষে একদিন দিসপুর এল। বড়ো এলাকা। অনেক লোকজন আর দোকানপাট। এখানে লিন আঙ আর জিং থ্যানের বাঁধা খদ্দেররা আছে। তাই তারা আশ্রয় নিল একটা সরাইখানায়। তার সামনে খোলা জমি আছে খানিকটা। সেখানেই খচ্চরদের বেঁধে রেখে, তাদের দানাপানি দিয়ে লিন আঙ বেরল খদ্দেরদের সঙ্গে দেখা করে তাদের উপস্থিতির কথা জানান দিতে। সে অল্পসল্প হিন্দি আর ইংরাজি জানে, তাই খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধে হয় না তার। দেখা সাক্ষাৎ সেরে সে টেলিগ্রাফ অফিস থেকে দুটো টেলিগ্রাম করল। একটা রেঙ্গুনে আর একটা কলকাতায়।

১৯৪৪, নভেম্বরের শেষদিক

ওহ বাই জিঙ্গো, ফিয়াট ৫০০ আর বিষ্টুচরণের লাশ

কলকাতা এক আশ্চর্য সর্বংসহ শহর। যুদ্ধের হুমকি, মন্বন্তরের খিদে, স্বাধীনতার জন্যে রাজনীতির দোলাচল, সব নিয়েও সে বেঁচে থাকে অম্লানবদনে।

১৯৪৩ কেটে গেছে। তবুও রয়ে গেছে তার ধাক্কা। শহর জুড়ে এখনও কঙ্কালসার ভুখা মানুষের মিছিল। কলকাতার আশেপাশের জেলাগুলো আর পূর্ববাংলা থেকে না খেতে পাওয়া মানুষগুলো এসে জুটেছে এখানে— যদি একটু খাবার মেলে। পেটের জ্বালা যে সবচেয়ে বড়ো জ্বালা। এই হেমন্ত-রাতের ঠান্ডাতেও তাদের গায়ে শুধুমাত্র সামান্য কাপড়। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এরা কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। বাসি ভাত, বাসি রুটি, ছাতাপড়া পাঁউরুটি এমনকী খানিকটা ভাতের ফ্যান পেলেও বর্তে যায় তারা। রাতে খোলা আকাশের নীচে ফুটপাথে শুয়ে থাকে গায়ে গা লাগিয়ে একটু ওমের আশায়।

বাঁচার আশায় কলকাতায় আসা, কিন্তু তবু এরা মরে। 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ' বা 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর মতো সংস্থাগুলো এদের জন্যে যে খাবার, জামাকাপড়, কম্বল আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তা যেন 'সিন্ধুতে বিন্দু'। রোজ শয়ে শয়ে মানুষ ঢুকছে কলকাতায়। কোনো প্রতিষ্ঠানের, তা সে যত বড়োই হোক না কেন, সাধ্য নেই এই লাখো মানুষের ভুখা পেটে খাবার দেবার, তাদের চিকিৎসা করার। তাই দেখা যায় কুকুরের পাশাপাশি মানুষও আঁস্তাকুড় থেকে খাবার খুঁটে খাচ্ছে। কঙ্কালসার মায়ের ন্যাতানো বুকেও নেই একফোঁটা দুধ যা সে তার কোলের বাচ্চাটাকে দেবে।

সকালে, দুপুরে বা সন্ধেয় গেরস্তের বন্ধ বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে ভুখা মানুষেরা। তারা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মরে আর হেমন্তের রাতের শিশিরভেজা ফুটপাথে বা রাস্তায় পড়ে থাকে তাদের লাশ। দিনের বেলা খবরের কাগজের লোক এসে সেই ছবি তুলে নিয়ে যায়। নিদারুণ খিদে আর করুণ মৃত্যুও পণ্য হয়ে যায় কলকাতা শহরে। কাগজের লোক ছবি তুলে নিয়ে চলে গেলে অনেক বেলায় আসে মুদ্দফরাস। ততক্ষণে কুকুরগুলোও লাশ শুঁকে শুঁকে লোকের তাড়া খেয়ে ফিরে গেছে। মুদ্দফরাসেরা চাটাইয়ে মৃতদেহ জড়িয়ে দড়ি বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়। কখনো কখনো কোনো শবের মুণ্ডু বা হাত বেরিয়ে ঝুলতে থাকে। পথচলতি মানুষ সরে যায় একপাশে। দোতলা বাড়ির বারান্দা থেকে মুখের সারি তাকিয়ে দেখে সেই লটপটানো হাত। কেউ কেউ হয়তো সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে সরে যায়। কিন্তু বেশিরভাগেরই কোনো বিকার নেই। থাকবেই বা কী করে? এখনও তো মন্বন্তরের রেশ চলছে দেশে। এমন তো প্রায়ই চোখে পড়ে। গায়ে সয়ে গেছে সব।

অফিস থেকে রজনী আর সুবিমল একসাথে বেরিয়েছে আজ। আগে হওয়া কথামতো ট্রিট দেওয়া হয়নি সুবিমলকে। আসলে পুলিনের মৃত্যুর শোকে সে এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে ট্রিটের কথাটা সে প্রায় ভুলতেই বসেছিল। তাই আজ সুবিমল পাকড়াও করেছে তাকে।

কলেজ জীবন আর আগের চাকরির মাহাত্ম্যে কলকাতার হালচালে আগেই কিছুটা সড়গড় ছিল রজনী। তবে এখন জাদুঘরে চাকরি পাবার পরে আর সুবিমলের সান্নিধ্যে থেকে কলকাতায় আরও অনেক বেশি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। দুজনে বারে ঢোকে। আজ কোনো জড়তা ছাড়াই সে দুজনের জন্যে খাবার, সুবিমলের জন্যে ভালো হুইস্কি আর নিজের জন্যে সোডা অর্ডার করে। অর্ডার নিয়ে বেয়ারা চলে গেল।

বারে গানবাজনা হচ্ছে। সন্ধের দিকে প্রায়ই হয়। তবে আজ জমিয়ে গান হচ্ছে। এটা আসন্ন ডিসেম্বরের প্রস্তুতি। এক মহিলা গাইছেন— 'ওহ বাই জিঙ্গো'।* সঙ্গে বাজছে গিটার, পিয়ানো, ড্রাম, ট্রাম্পেট, অ্যাকোর্ডিয়ান। গানের সুরটা এমনই যে লোকে শরীর দোলাতে বাধ্য।

সুবিমল দু-হাতের আঙুলে তুড়ি বাজাতে বাজাতে বলল— 'আসল গানটা কার গাওয়া জানিস?'

ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ব্যাপারে রজনী নিতান্তই অজ্ঞ। তাই সে বললে— 'না।' এদিকে সুবিমল অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। তাই ওর কালচারও রজনীর সঙ্গে অনেকাংশেই মেলে না। যদিও তার প্রভাব তাদের বন্ধুত্বে কখনো পড়েনি।

বেশ খুশি খুশি মনেই সুবিমল বলল— 'এটা বিলি মারের গাওয়া গান। ১৯৪২ সালের টপ টেনের একটা। বুঝলি?'

—'ও আচ্ছা। তা এই গানটা আমাদের কোনো সিনেমায় ঢোকালে কেমন হয়?'

—'জমে যাবে রে। হল কেঁপে যাবে, বলে দিলাম। তা এবার থেকে একটু বিদেশি গান-বাজনা শোনো বস।'

গ্লাসের জলে একটা চুমুক মেরে রজনী বলে— 'আচ্ছা, সে না-হয় বুঝলাম ব্রাদার যে ওয়েস্টার্ন গানও আমার শোনা উচিত। কিন্তু তুই আগে বল, সেগুলো শুনলেই কি সায়েব সুবোদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে সসম্মানে খাওয়া যাবে? ইংরেজি গান জানলেই কি ইংরেজরা তোকে আদর করে কোলে টেনে নেবে? আরও একটা কথা বল, আমাদের ভাষায় আজকাল যেসব গান হচ্ছে, ইয়ে, মানে যেমন ধর এই রবিঠাকুরের গান, তুই কি তা শুনিস?'

বেয়ারা খাবার আর ড্রিঙ্কস দিয়ে যায় টেবিলে। দু-জনে খাওয়া শুরু করতে যাবে এমন সময় রজনীর নজর যায় ডায়াসের দিকে যেখানে গান হচ্ছে। চোখ চালাতেই নজর পড়ে যায় গিটারবাদকের দিকে। চমকে ওঠে সে। সুবিমলকে ডেকে দেখায়। সুবিমল বলে— 'দেখেছিস, তোকে বলেছিলাম না যে পিটার ভালো গিটার বাজায়। আজ প্রমাণ পেলি তো?'

পিটার সুর তুলেছে গিটারে। বাজাচ্ছে 'জিঙ্গল জিঙ্গল জিঙ্গল'। গাইছে গানও। সত্যিই অপূর্ব হাত পিটারের আর গলাও বেশ ভালো। সঙ্গে বাজছে ড্রাম। সে তন্ময় হয়ে গাইছে আর বাজাচ্ছে। গানের তালে তালে দুলছে তার শরীর। দুলছে দর্শকদের শরীরও।

এদিকে দুই বন্ধুর খাওয়া চলছে। চলছে গান শোনা আর চলছে কথাও। দু-জনেরই বেশ ভালো লাগছে। এও কলকাতার আরেক জীবন। রোমান্সে ভরপুর। এই জীবনে যুদ্ধের শঙ্কা নেই, মন্বন্তরের খিদে নেই। নেই স্বাধীনতার জন্যে একদিকে প্রাণের আহুতি আর অন্যদিকে স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কূটকাচালি।

একসময়ে পিটারের গানটাও শেষ হল। সুবিমলও তার দ্বিতীয় পেগটা নিয়েছে।

এবারে পিটার গিয়ে বসল পিয়ানোয়। হাতে একটা পেগ নিয়ে দুটো চুমুক মেরে সেটা রাখল পিয়ানোর ওপরে। বাকি শিল্পীরা নেমে গেল স্টেজ থেকে। এখন ডায়াসে দর্শকদের দিকে মুখ করে বসে পিটার। পিয়ানোর রিডে দু-হাত রাখতেই গমগম করে বেজে উঠল সেটা। তার মানে এখন শুধু পিয়ানোয় বাজবে সুর। পিটার একবার চোখ বুজে ওপরের দিকে মুখ তুলে শুরু করলে বাজাতে।

গানটার মুখড়া শুরু হতেই সুবিমল একটুকরো কাবাব মুখে তুলে তার পেগে একটা চুমুক দিয়ে বলল— 'আচ্ছা বেশ, এবার বল তো এটা কার গান বাজানো হচ্ছে?'

গানটার সুর রজনীর চেনা। একান্তই চেনা। তাই মিটিমিটি হেসে সে বলল— 'রবীন্দ্রনাথের গানের সুর।'

হাঃ হাঃ করে হেসে সুবিমল বলল— 'কী যে বলিস। ওরে বাবা এটা হল বেন জনসনের লেখা একটা কবিতা যেটাতে পরে সুর বসানো হয়। অবশ্য সুরে নাকি মোজার্টের প্রভাব আছে বলেও অনেকের কাছে শুনেছি।'

—'তা সেই কবিতার লাইনগুলো কী শুনি? মনে আছে? নাকি ভুলে মেরে দিয়েছিস?'

একটু হেসে সুবিমল সামনে ঝুঁকে আসে। তারপর পিয়ানোর সুরে সুর মিলিয়ে নীচুস্বরে গাইতে শুরু করে—

Drink to me only with thine eyes, and I will pledge with mine.

Or leave a kiss within the cup and I'll not ask for wine.

বলেই আবার একটা চুমুক দিয়ে বলল— 'কী রে? কেমন? হল তো?'

রজনীও উত্তরে হেসে পিয়ানোর সাথে সুর মিলিয়ে নীচু গলায় ধরে—

ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি

চিরজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী—

কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়,

কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারিচয়।

আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি,

কেমনে প্রকাশি কব কত ভালোবাসি।

কতবার ভেবেছিনু আপন ভুলিয়া ...

সুবিমল হাঁ হয়ে শুনছে। ন্যাপকিনে হাতটা মুছে রজনী হেসে বলল— 'কী রে এবারে হল তো?'

—'এটা রবিঠাকুরের লেখা?'

—'ইয়েস মেরে দোস্ত। বেন জনসনের ওই গানটা অনেকেই গেয়েছে। তা এই সুরটা রবীন্দ্রনাথের বড়ো ভালো লাগে। তাই উনি ওই গানের সুরটাতে নিজের মতো করে কথা বসান, বুঝলি?'

টেবিলে কনুই রেখে দু-হাতের চেটোতে মাথা রেখে বেশ খানিকক্ষণ সুরটা শোনে সুবিমল। তারপরে বলে— 'হ্যাঁরে, এইরকম ওয়েস্টার্ন সুরে আরও কি গান আছে ওনার লেখা?'

—'থাকবে না কেন? পাশ্চাত্য গানের সুরে, আমাদের দেশের লোকসংগীতের সুরে, এমনকী শুনলে আশ্চর্য হবি যে মহীশূরের রাজদরবারের অ্যান্থেমের সুরেও উনি কথা বসিয়েছেন। তুই বরং এক কাজ কর। ওনার পাশ্চাত্য সংগীতের সুরে লেখা গানগুলো দিয়েই প্রথমে শুরু কর। তুই যেখান থেকে রেকর্ড কিনিস, সেখানে গিয়ে খোঁজ করলেই পাবি। সেই গানগুলো আগে তুই শোন। আর তেমন হলে পরে আমিই না হয় তোকে একটা লিস্ট বানিয়ে দেব।'

—'ঠিক আছে। দেখতে হবে খুঁজে।' টেবিলে টোকা মারতে থাকে সুবিমল গানের তালে তালে।

—'ওরে, মোহিত হয়ে যাবি রে শুনে। সিমপ্লি স্পেলবাউন্ড হয়ে যাবি।'

ক্রমে পিয়ানোর সুর শেষ হল। সুরের মূর্চ্ছনায় মোহিত হয়ে টেবিলে বসা মানুষেরা হাততালি দিচ্ছে। সুবিমলও তালি দিয়ে উঠল। সত্যি, কী ভালো বাজায় লোকটা।

পিটার পিয়ানো ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার পেগ একটা লম্বা চুমুকে শেষ করে এক একটা টেবিলের উদ্দেশ্যে 'বাও' করতে লাগল। কিন্তু সুবিমলদের টেবিলের দিকে নজর পড়তেই থমকে যায় সে। রজনীর দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর ডায়াস থেকে নেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে তাদের টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে। টেবিলে এক হাতের ভর রেখে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে রজনীর মুখ লক্ষ্য করে। বাঁ-হাতের ঝাপটায় রজনী সরিয়ে দেয় সেই ধোঁয়া। পিটারের চোখে ক্রুর চাউনি। সামনে ঝুঁকে পড়ে সে রজনীকে বলতে থাকে — 'I suppose you are that pal who snatched my prey that day.'

সত্যি, পিটারের স্মৃতিশক্তি সাংঘাতিক। ধর্মতলায় লাঠি চালোনার ঘটনার সময়ে কয়েক লহমায় দেখা রজনীর মুখটা সে মনে রেখেছে।

রজনী কোনো উত্তর দেয় না। সুবিমল তো জানে ধর্মতলার কথা। রজনীই তাকে বলেছিল। সে চায় না একটা বিচ্ছিরি কিছু হোক। তাই সে পিটারকে বলে— 'Behave yourself Peter. Don't create a scene here.'

পিটার হিসহিসিয়ে ওঠে— 'What scene? This fellow had snatched my prey that day and I won't say anything? What do you expect? Am I to behave like a gentleman with this black nigger?'

সুবিমল ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বন্ধুর এই অপমান তার গায়ে লেগেছে। সে ঠিক করে, পিটার কিছু করলেই সে তার উপযুক্ত জবাব দেবে। যা হবে তারপর দেখা যাবে। এদিকে পিটারও টানটান হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা কিছু ঘটে যেতে পারে সেই আশঙ্কায় রজনীও উঠে দাঁড়ায়। বারসুদ্ধু লোক তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে।

সুবিমল কিন্তু ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সে কঠিন গলায় বলে— 'I again remind you Pit. Behave yourself.' রজনী দেখে সুবিমলের হাত মুষ্টিবদ্ধ। পিটার আরও কিছু বললে হয়তো সে মেরেই দেবে। বারের মধ্যে একটা সিন ক্রিয়েট হলে সেটা যাচ্ছেতাই হবে। তা ছাড়া পিটার পুলিশের লোক। তাই সে সুবিমলের কাঁধে হাত দিয়ে চাপ দেয়। কিন্তু পিটার বেশ উত্তেজিত। তার লালমুখ আরও লাল হয়ে গেছে।

—'You bastard, gonna teach me a lesson?' বলে ঘুঁষি মারতে যায় সুবিমলকে। সুবিমলও ঘুঁষি তোলে 'বেজম্মা' শব্দটা শুনে।

চকিতে রজনী দু-জনের দুটো উদ্যত হাত তার দুহাত দিয়ে খপ করে ধরে ফেলে। সুবিমল আর পিটার দুজনেই রাগে থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু রজনীর হাত থামিয়ে রাখে দু-জনকেই। এদিকে টেবিলে গণ্ডগোল হচ্ছে দেখে ছুটে আসে বারের লোকজন। তারা পিটারকে সরিয়ে নিতে চায়। তাকে অনুরোধ করতে থাকে।

সরে যেতে যেতেও পিটার রজনীকে থ্রেট করে— 'This time I spared you, but remember whenever I'll get the chance I will just kill you… kill you bloody nigger.'

বারের লোকজন পিটার ব্রাগানজাকে ভেতরে নিয়ে যায়। সে রজনীর চেপে ধরা ডানহাতটা চেপে ধরে চলেছে।

সেলিব্রেশনের আনন্দটাই মাঠে মারা গেল। তাই বিল মিটিয়ে রজনী বন্ধুকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সুবিমল বললে— 'ওঃ আমার হাতটা মাইরি আরেকটু হলেই গিয়েছিল। বাপরে, কী গায়ের জোর তোর। দেখলে তো বোঝা যায় না। মুঠিটা আপনা থেকেই আলগা হয়ে গেল।'

রজনী হেসে বললে— 'তুই কি ভুলে গেলি যে আমি তাইকোন্ডো জানি? তাই কোথায় কোন ভেন বা নার্ভে চাপ দিলে কী হতে পারে সেটা আমার জানা আছে। যাকগে, নে চল তোকে আমি পান সিগারেট খাওয়াচ্ছি; দেখবি ব্যথাটা মরে যাবে একটু পরেই।'

পানটা মুখে পুরে সিগারেট ধরায় সুবিমল। আজ রজনীও একটা মিঠা পান খাচ্ছে।

দুই বন্ধু গল্প করতে করতে এগিয়ে চলে পার্ক স্ট্রিট আর ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ক্রসিংয়ের দিকে।

রজনী হঠাৎই সুবিমলকে বলে— 'হ্যাঁরে, তোর কাছে ন্যাশনাল লাইব্রেরির কার্ড আছে?'

সুবিমল আচমকা এই প্রশ্নে থতমত খেয়ে যায়। তারপর বলে— 'না রে, আমার নিজের তো ওখানে কার্ড নেই। কিন্তু হঠাৎ তোর বই পড়ার দরকার পড়ল কেন? তা বই পড়ার ইচ্ছে হলে পাড়ার লাইব্রেরিতে খোঁজ কর।'

—'আসলে দ্যাখ, ফসিল নিয়ে কাজকর্ম করতে হয়তো, কিন্তু ফসিলের ব্যাপারে তো আমি যাকে বলে এক্কেবারে আনাড়ি। আর পাড়ার লাইব্রেরিতে কি আর এইসব বই রাখে? তাই ভাবছিলাম, তুই কোনোভাবে যদি একটা কার্ড ম্যানেজ করে দিতে পারিস দু-একদিনের জন্যে…মানে অফিস থেকে বেরিয়ে আমি ওখানের রিডিং রুমে বসেই পড়ে নেব। দ্যাখ না, তোর তো অনেক জানাশোনা লোক আছে। তাদের কারোর কাছ থেকে যদি…।'

—'ও আচ্ছা, দাঁড়া দাঁড়া।… মনে পড়েছে। একটা কার্ড মনে হয় ম্যানেজ হয়ে যেতে পারে। আমাদের বাড়িতেই তো একজন আছে। তবে তাকে পটাতে হবে।'

—'কে সে?'

—'আরে আমার মেজ কাকা। তোরই মতো বিয়ে-থা করেনি। অফিসে যায় আর বাড়ি ফিরে লাইব্রেরি থেকে আনা বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকে। বলে কী জানিস—'বউয়ের থেকে বই ভালো'। তা মেজকাকে এককৌটো ভালো সিগারেট দিয়ে ফিট করে দিন তিনেকের জন্যে কার্ডটা বাগাতে হবে, বুঝলি।'

—‘উনি কি দিতে রাজি হবেন?’

—‘নয়কে হয় করাতে হবে। বলব— ‘আমার দরকার। কার্ডটা দু-তিনদিনের জন্যে দাও।’ আমি শিয়োর, ভালো সিগারেট ঘুষ পেলে মেজকা আমার কথা ফেলতে পারবে না। তা, তুই না-হয় পরশু অফিসে কার্ডটা নিয়ে নিস আমার কাছ থেকে। ঠিক আছে?’

—‘ওক্কে দোস্ত। নো প্রবলেম।’

রাস্তার ওপারে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে প্যাসেঞ্জারের অপেক্ষায়। মোড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা শেষ করে ওটাই ধরবে সুবিমল।

কিন্তু রাস্তায় নামতেই একটা গাড়ির হেডলাইটে চোখ ধাঁধিয়ে যায় তাদের। গাড়িটা যেভাবে স্পিডে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে বাঁক নিচ্ছে তাতে তারা দু-জনেই গাড়িচাপা পড়তে পারে। চকিতে রজনীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে। এক ঝটকায় সুবিমলের কোমর ধরে পাক খেয়ে চকিতে উঠে পড়ে ফুটপাথে। সাঁ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় গাড়িটা। আর সামান্য দেরি হলেই মারা পড়ত তারা। উফ, খুব বাঁচা বেঁচে গেছে এ যাত্রায়। সুবিমল এই আচমকা ঝটকায় পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। সে অতটা খেয়াল করেনি। কিন্তু রজনীর চোখ এড়ায় না গাড়িটা। ওটা পিটারের ফিয়াট ৫০০।

কয়েকদিন পরে ফসিল দুটো পর্যবেক্ষণ করে তার একটা রিপোর্ট তৈরি করেছেন ড্যানীবাবু। রজনী একমনে সেটাই টাইপ করে যাচ্ছিল।

—‘বুঝলে রজনী, বড়োকত্তা কাল থেকে ক্রিসমাসের ছুটিতে যাচ্ছেন। ফিরবেন জানুয়ারির দশ-বারো তারিখ নাগাদ। তাই এই রিপোর্টটা আজই ওনাকে দিয়ে সই করিয়ে রেকর্ডে রাখতে হবে। যদিও ফসিল দুটোয় সিগনিফিক্যান্ট কিছু পাওয়া যায়নি, তবু রেকর্ড তো রাখতেই হবে। পারলে একটু তাড়াতাড়ি করে দিও।’

আর দু-পাতা করলেই হয়ে যাবে স্যার। বেশিক্ষণ লাগবে না।’ রজনী আরেকটু দ্রুত হাতে টাইপ করতে থাকে।

—‘গুড। তা এবার তোমার ওই বাচ্চাটাকে তো কলকাতায় আনতে হবে। আমি প্রিন্সিপালকে ফোন করেছিলাম। উনি বলেছেন যে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ফ্রি-শিপ পাবে আর হস্টেলও হয়ে যাবে। তবে একজন নামকরা লোকের রেফার লেটার লাগবে। তা ওর বাবা কি রাজি হয়েছেন?’

টাইপ করা একটু থামিয়ে রজনী বলল— ‘প্রথমটায় হচ্ছিল না। কিন্তু গ্রামেও তো দুর্ভিক্ষের ব্যাপক প্রভাব। তাই বলতে পারেন যে একরকম বাধ্য হয়েই ভদ্রলোক রাজি হয়েছে। তা ছাড়া প্রতি সপ্তায় তো বাড়ি আসতে পারবে ছেলে।’ আবার টাইপ শুরু করে রজনী।

একটু পরেই আবার ড্যানীবাবু বলে ওঠেন— ‘আচ্ছা রজনী, তুমি সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল দেখেছ?’

কাজ করতে করতেই রজনী বলে— ‘বাইরে থেকে স্যার।’

—‘তাহলে তুমি এক কাজ কর। সামনের ডিসেম্বরের চব্বিশ তারিখ রাতটা তুমি ক্যাথিড্রালের ভেতরেই কাটাও। মিড নাইট মাসে। যদিও ওটা শুধুমাত্র খ্রিস্টানদের জন্যেই, তবু তুমি একবার ভেতরে যেও। পেছনের দিকে বসবে। কে আর দেখতে যাচ্ছে।

চারিদিকে ক্যান্ডেলের আলো, ক্রিসমাস ক্যারল— সে এক দারুণ সিকোয়েন্স। চলবে সেই ভোর পর্যন্ত। আমিও একবার গিয়েছিলাম। বিউটিফুল এক্সপিরিয়েন্স। মন ভরে যায়। তাই বলি ওটা মিস কর না। তারপর না-হয় দিন-দশেকের জন্যে চলে যেও গ্রামে। একেবারে ছেলেটাকে নিয়েই ফির।'

—'কিন্তু স্যার অ্যাটেনড্যান্স?'

—'বড়োকত্তা যখন থাকছে না তখন আমি ছাড়া আর কাউকে তো তোমায় জবাবদিহি করতে হবে না। তাই অ্যাটেনড্যান্সের ভাবনাটা না হয় আমার ওপরেই ছেড়ে দিলে।'

অভিভূত রজনী ড্যানীবাবুর দিকে ফিরে বলল— 'থ্যাংক ইউ স্যার।'

—'নো মেনশন মিস্টার রজনীকান্ত রায়।' বলে ঘর কাঁপিয়ে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেলেন অমায়িক ড্যানীবাবু।

আজ হাটতলাতেই বাস থেকে নেমে পড়ল রজনী। এখানে রঘুর চায়ের দোকানে আড্ডা মারে শ্যামাদাস, দিনেশ আর বিষ্টুচরণ। আগে এখানে একটু ঢুঁ মেরে দেখতে হবে। গ্রামের সাম্প্রতিক হালচালের হদিশ পাওয়াও যেতে পারে। তারপরে কাল-পরশু করে না-হয় কানাইদের বাড়িতে যাওয়া যাবে।

'Time is the best healer'— কথাটায় আজ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না রজনীর। রোজই কখনো না কখনো তার পুলিনের কথা মনে পড়ে; বিশেষ করে সন্ধে ঘনিয়ে এলে। তখন একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আর তা মিলিয়ে যায় সন্ধের ঠান্ডা বাতাসে।

আজও যেমন রঘুর চায়ের দোকানে ঢুকতে ঢুকতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার। তবে সেটাকে একটু হালকাভাবে নিয়ে সে একটা চায়ের অর্ডার করলে। ভেতরে বসে আছে দিনেশ আর বিষ্টু। সিগারেট ফুঁকছে।

তাকে দেখেই রঘু বলে ওঠে— 'আরে রজনীদা যে, এসো এসো। বোসো। তা বল দিকি, কলকাতার খপর কী?'

—'আর কলকাতা! সেখানের যা অবস্থা। মানুষ ফ্যান চেয়েও পাচ্ছে না। ম্যালেরিয়া আর কলেরায় রোজই মানুষ মরছে। অবশ্য সেসব তোমরা খবরের কাগজেই দেখতে পাও।'

—'হ্যাঁ শ্যামাদার কাচ থেকে খপর পাই বটে। তবে আমরাও গেরামে ভালো নেই গো। জিনিস পত্তরের দাম এমনই আক্রা যে...'

—'হাত দিলে ছ্যাঁকা লাগে গো।' সিগারেটে টান দিয়ে ফোড়ন কাটে বিষ্টু।

চায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে রজনী ভাবে— জিনিসপত্রের দাম আক্রা। তবু এরা দামি সিগারেট ফোঁকে কী করে? পয়সা পায় কোথায়?

একটুপরেই রঘু চা দিয়ে যায়। তাতে একটা চুমুক দিয়ে টেবিলে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে সে বলে— 'তা শ্যামাদাকে দেখছি না যে।'

দিনেশ বলে— 'শ্যামাদা সকালে কলকাতায় গেছে। কী একটা কাজ আছে। ফিরতে দিন তিনেক হবে।'

বিষ্টুচরণ বলে ওঠে— 'অন্যসময়ে তো দু-একদিনের জন্যে যায়। এবারেই দেকচি তিনদিন।'

দিনেশ তার দিকে তাকাতেই চুপ করে যায় সে। কিন্তু রজনীর চোখ এড়ায় না ব্যাপারটা।

—'তা শ্যামাদার সঙ্গে তোমার কোনো বিশেষ দরকার আছে নাকি? তেমন ব্যক্তিগত কথা না হলে আমায় তুমি বলতে পার। শ্যামাদা এলে আমি তাকে বলে দেব। অবশ্য অন্য কোনো কথা থাকলে...।'

দিনেশের কথা কেটে দিয়ে নিশ্চিন্তে চায়ে চুমুক দিয়ে রজনী বলে— 'আরে না না। তেমন কোনো বিশেষ কথা নেই। এমনই জিজ্ঞেস করছিলাম আর কী।'

খানিকপরে সবার চায়ের দাম মিটিয়ে পেছন ফিরে তাদের দিকে হাত নেড়ে রজনী এগিয়ে গেল বাড়ির পথে। সুরেশ কাকা সেখানে অপেক্ষা করে আছে।

বিষ্টুচরণের গাঁজা খাওয়ার অভ্যেস অনেকদিনের। অবশ্য খায় সে লুকিয়ে চুরিয়ে। হাটতলার চালকলের পেছনের আবডালে জমা হয় তারই মতো আরও তিন-চারজন গ্যাঁজাখোর। একটা ছোটো ছাতিমগাছের নীচে বসে তারা। টাউন থেকে ভালো মণিপুরী গাঁজা জোগাড় করে আনে বিষ্টু। টাউনের পুলিশ তাকে চেনে। তা ছাড়া ঠেকের মালিকও পুলিশের হাতে গুঁজে দেয় কিছু। তাই বিষ্টুকে তারা কিছু বলে না।

গাঁজার এমনই টান যে গ্রীষ্মকালের ঠা ঠা দুপুরেও পান্তা খেয়ে এই চালকলের পেছনের ঠেকে চলে আসে তারা। হাতে হাতে ফেরে লাল ভেজা কাপড়ের টুকরোয় মোড়া কল্কে। তবে শেষ টানটা বিষ্টুচরণের জন্যে বরাদ্দ। শিবনেত্র হয়ে টান মেরে কল্কে ঝেড়ে সাফ করে তার ভেতরে ছোটো ইঁটের টুকরোটা রেখে ওই কাপড়টা দিয়ে ভালো করে মোড়ে সেটা। তারপর নিজের কোমরে বাঁধা গামছায় এমনভাবে যত্ন করে গুঁজে রাখে, যে দেখলে মনে হয় সে যেন যখের ধন আগলাচ্ছে। এত গেল দুপুরের কারবার। তবে আরেকবার স্যাঙাতরা জমা হয় ঠেকে। রাত্তিরে বাড়ি ফেরার আগে। আর এমনই গাঁজার মাহাত্ম্য যে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাতেও কল্কে ঠিক জ্বলবেই।

এদিকে আবার যখন মাঠের কাজ থাকে না, তখন বহুরূপীর ভেক ধরে বিষ্টু। যেদিন সকালের দিকে বেরোয়, সেদিন দুপুরে হাটতলা ঘুরে বাড়ি ফেরে সে। আবার যেদিন বিকেলের দিকে বেরোয়, সেদিন ফেরার পথে রাতে হাটতলা ঘুরে যেতেই হয় একবার।

বিষ্টু খেয়াল করে দেখেছে যে রাম, হনুমান বা কৃষ্ণ সাজলে দক্ষিনা মেলে কম। কিন্তু শীতলা বা কালী সাজলে গাঁয়ের মানুষ ভালোই হাত উপুড় করে। এখন বহুরূপী সাজতে গেলে রং মাখতে হয় গায়ে। কিন্তু সেই রং তো টাউনে পাওয়া যায় না। কলকাতার চিৎপুরের যাত্রাপাড়ায় একটা দোকানে মেলে তা। তার বাড়ির তিনটে বাড়ি পরে থাকে ভুবন মন্ডল। সে যাত্রাপাড়ার কাছাকাছি একটা ছাপাখানায় কাজ করে। তাকে পয়সা দিলে সেইই এনে দেয় গায়ে মাখার নীল, সাদা, হলুদ বা কালো রং। এই রংগুলোর সুবিধে এই যে, এগুলো রোদে গলে যায়না আর সাবান মেখে চান করলে বা রগড়ে জলে ধুলেই উঠে যায়।

যাইহোক, বাচ্চাকাচ্চা হয়নি বলে একটাই ঘরে তারা স্বামী-স্ত্রী থাকে। জমি-জিরেতও তেমন নেই। তাই বিষ্টুকে গরিবই বলা চলে। অন্যের জমিতে মুনিষ খেটে বা বহুরূপী

সেজে দুটো পয়সা কামাতে হয় তাকে। আগে রাতে জল-মুড়ি খেয়ে শুতে হত, তবে ইদানীং শ্যামাদাসের দলে ভিড়ে, তার দেওয়া কাজকর্ম করে দুটো পয়সা আসছে হাতে। তাই এখন রাতেও দুটো ভাত জুটছে তাদের কপালে। সামনের উঠোনের একপাশে পালং, মূলো আর বেগুন চারা বসিয়েছে তার বউ। সকালবেলা উঠে পাশেরই কুয়োতলা থেকে ওই একটুকরো সবজিবাগানে জল দিয়ে খিড়কি পুকুরে নাইতে যায় সে। কুয়োর জলে চান করা তার পোষায় না। তারপর চান সেরে জল-মুড়ি খেয়ে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ফেরে আবার সেই দুপুরে ভাত খেতে।

তবে আজকাল রাতে বাড়ি ফিরতে একটু বেশিই দেরি হয়ে যাচ্ছে তার। বাড়ি ঢোকার আগে হাটতলায় চার-ইয়ারে মিলে গাঁজায় দম মেরে তবেই বাড়ি ফেরে। তাই তার বউ বিষ্টুর খাবারটা ঢাকা দিয়ে রেখেই শুয়ে পড়ে।

বিষ্টু বাড়ি ঢুকে সাইকেল রেখে, গাঁজার সরঞ্জাম চালের বাতায় গুঁজে রেখে খিড়কি পুকুরে নাইতে যাবার জন্যে তৈরি হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, এমনকী কনকনে শীতেও রাতে তার চান করা চাইই। সম্ভবত গাঁজার মহিমায় ঠান্ডা লাগে না তার; কিংবা হয়তো তার বছরভরের অভ্যেস এটা। তাইই...।

আজও বিষ্টুচরণ লুঙ্গি আর গামছা নিয়ে লণ্ঠন হাতে দাওয়া থেকে নামতে যাবে, এমন সময় খিড়কি পুকুরের ধার থেকে দিনেশ তাকে ডাকল— 'এই বিষ্টুদা, এদিকে এসো।'

বিষ্টুচরণ ভাবে, দিনেশ তো সাইকেল চেপে তার বাড়িতে ঢোকার সরু পথটা দিয়ে আসে। কিন্তু আজ কেন খিড়কি পুকুরের দিকে? পুলিশ কি তবে সেনবাড়িতে তল্লাশি চালাল, নাকি প্যাকেট নিয়ে এসেছে সে? এদিকে শ্যামাদাসের তো কলকাতা থেকে ফেরার কথা তিনদিন পরে। তাহলে দিনেশ তাকে কীজন্যে ডাকে? নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে।

পুকুরধার থেকে আবার ডাক শোনা যায়— 'কী গো বিষ্টুদা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? পুকুরধারে এসো।'

বিষ্টুচরণের বউও ঘুমের ঘোরে ডাকটা শুনেছিল। শেষ হেমন্তের এই নিঃঝুম রাতে দূর থেকে শিয়াল কুকুরের ডাকেও অনেকসময় ঘুমটা পাতলা হয়ে যায়, আর এ তো ঘরের কাছেই দিনেশের গলা। সে জানে যে অনেক সময়েই দিনেশ রাত বিরেতে বিষ্টুর সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাই আর সে কোনো গুরুত্ব দেয় না। নাছোড়বান্দা ঘুমের টানে সে পাশ ফিরে শোয় মোটা কাঁথার তলায়। কাঁথাটা টেনে কান পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে দেয়। নদীপাড়ের গ্রামের দিকে এখনই ঠান্ডাটা যে বেশ।

বিষ্টুচরণ নাবাল পথে এগিয়ে যায় খিড়কি পুকুরের দিকে। কিন্তু ঘাটের কাছে পৌঁছোনোর আগেই ঘাড়ে একটা শক্ত কিছুর জোর আঘাত লাগে তার। লণ্ঠনটা পড়ে যায় মাটিতে। কাঁচের একটা পাল্লা খুলে যায়। খানিকটা কেরোসিন গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। 'ওঃ' বলে বিষ্টু বসে পড়ে মাটিতে। দেখে মাটিতে গড়িয়ে পড়া লণ্ঠনটাকে পা দিয়ে সোজা করে দিল এক কালো মূর্তি। হাওয়া লেগে কাঁপতে থাকা লণ্ঠনের আলো ঠিকরে পড়ছে তার চোখে পরা কালো ঠুলি চশমার কাঁচ থেকে। যেন অন্ধকারে একজোড়া কালো বাঘের চোখ জ্বলছে। খুবই ভয় পেয়ে যায় সে। গাঁজার নেশার ঘোর ছুটে যায় তার।

চকিতে সেই কালো মূর্তি একলাফে তার পেছনে এসে বসে তার মুখ চেপে ধরে। তারপর একটা সাবান তুলে ধরে তার চোখের সামনে। হিসহিসিয়ে তাকে বলে— 'এটা কী বল?'

বিষ্টু চেনে জিনিসটা। কালো মূর্তি এবার সামান্য একটু মুখ ঢিলে দিয়ে আবার বলে—'কী রে, বল এটা কী?' বিষ্টু বুঝতে পারে, এই গলাটা তো দিনেশের নয়, তবে তার খুব যেন চেনা। তাহলে এ কে?

—'সাবান।'

—'সাবান? তাই না? তা কী সাবান? বল।'

বিষ্টু কোনোরকমে বলে—'আমাদের স্বদেশি সাবান।'

দড়াম করে তার ডান পাঁজরে আছড়ে পড়ে একটা ঘুঁষি। সেই আঘাতে বেঁকে ওঠে বিষ্টুচরণের শরীর।

—'এটাই তোরা পুলিনকে দিয়ে আনাতিস। তাই তো?' এবারে গলাটা চিনতে পেরেছে বিষ্টু।

—'হুঁ।'

—'কে আনাত? শ্যামাদাস নিশ্চয়ই? আর এইকটা সাবান বেচেই কি তোদের এত্তো খরচ-খরচা চলে?'

বিষ্টু বুঝতে পারে যে সে যা কিছু জানে তা এখন বলতেই হবে। আর এই কথা শ্যামা জানলে তার আর...। সে এখন সাঁড়াশি চাপে পড়েছে। তাই চুপ করে থাকে। কিন্তু আবার একটা ঘুঁষি আছড়ে পড়ে তার পেটে। আবার ককিয়ে ওঠে সে।

—'না। অন্য জিনিসও আনাতে হয়।' দম নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তার।

—'কী আনাতে হয়? বল।'

—'পি...পি...পিস্তল।'

—'তা শ্যামা কলকাতায় গেছে কেন? পিস্তল আনতে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আর সেই পিস্তলই সে তুলে দিয়েছিল পুলিনের হাতে? তাই তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'শ্যামা কোথায় পাচার করে সেগুলো?'

—'জানি না। স...সত্যি বলচি জানি না। দিনেশ জানলেও জানতে পারে।'

সত্যি বলতে কি শ্যামাদাস কোথায়, পিস্তল পাচার করে তা জানে না বিষ্টু। কালো মূর্তিও বুঝতে পারে সে কথা। আর যাইহোক, অস্ত্রপাচারের গুপ্তকথা শ্যামাদাস কাউকে জানতেও দেবে না। তবে সে যে পুলিনকে দিয়ে সাবান আর রিভলভার দুটোই আনাত, এটা নিশ্চিত। কিন্তু সাবান কোথায় পাঠাত সেটা বিষ্টু নিশ্চয়ই জানবে। আর দিনেশই বা করত কী? সেও কি জানে কোথায় রিভলভার পাচার হয়?

—'এবার বল, দিনেশ কী করে?'

—'উঃ...উঃ...দিনেশও সাবান পাঠায়...।'

—'কোথায় পাঠায়?'

—'আ...আ...আশেপাশের জেলায়।'

—'আর পিস্তল কে পাচার করে?'

—'শ্যামা নিজে।'

—'আচ্ছা। তাহলে তোরা সাবান, পিস্তল পাচার করিস আর মরে একটা নিরীহ বাচ্চা ছেলে।' এবার ঘুঁষিটা আছড়ে পরে বিষ্টুর ডান চোয়ালে।

প্রচণ্ড ব্যথায় সে কাতরে ওঠে— 'উঃ মা গো।'

—'তোদের জন্যেই পুলিনও গুলি খেয়ে এইভাবেই ককিয়ে উঠেছিল রে 'উঃ মা গো' বলে। আর এখন যদি আমি তোকে মেরে ফেলি তাহলে তুইও কি কাতরে উঠবি 'উঃ মাগো' বলে? বল হতভাগা কুত্তা।' একটা কষ্টমাখা ক্রুরতা ফুটে উঠেছে এবার কালো মূর্তির গলায়। বিষ্টুও বুঝেছে সেটা। তাই আসন্ন মৃত্যুভয়ে সে বলে ওঠে— 'আ, আ, আমাকে মেরোনি...ছেড়ে...।'

কিন্তু বিষ্টুকে ছেড়ে দেওয়ার আর কোনো উপায় নেই। ছেড়ে দিলে শ্যামাদাস সব জেনে যাবে। তাই তার কথা শেষ হবার আগেই কালো মূর্তি তার চুল ধরে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দেয়। তারপরেই একটা চপ এসে পড়ে বিষ্টুর কণ্ঠনালীতে। ভেঙে যায় ক্রিকয়েড কার্টিলেজ আর হাইওয়েড বোন। থরথর করে খানিকক্ষণ কাঁপে তার শরীরটা আর তারপর টানটান হয়ে নেতিয়ে পড়ে।

চোখের সামনে বিষ্টুর নিথর দেহটা দেখে দ্বিতীয়বার নরহত্যা করার ভয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে কালো মূর্তির শরীর। প্রথমবারেরটায় ছিল হিট অফ দ্য মোমেন্টে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদ। কিন্তু এবারে একী করল সে? সে তো এমনটা করতেই চায়নি; কিন্তু পরিস্থিতির চাপ আর প্রচণ্ড রাগে সাময়িকভাবে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। অনেকদিনের জমা কষ্টটা আজ রাগ হয়ে তার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কেড়ে নিল একটা মানুষের প্রাণ? খুব কষ্ট হচ্ছে তার। খুব কষ্ট... আর সেইসঙ্গে গ্রাস করছে ভয়ও। এখন পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে হবে। তাই শরীরী কালো মূর্তি বিষ্টুর লাশটা তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে পুকুরের জলে। ধীরে ধীরে জলের গভীরে তলিয়ে যায় সেটা।

ঘাটের কাছে পড়ে থাকে শুধু বিষ্টুচরণের লুঙ্গি আর গামছা। আর তখনই একটা দমকা হিমেল হাওয়া এসে দপ করে নিভিয়ে দেয় কাঁচখোলা লণ্ঠনের আলো।

সেই রাত্তিরে বিষ্টুর বউয়ের একবার মনে হয়েছিল যে বিষ্টু তার পাশে নেই। ভেবেছিল হয়তো সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে। তাই সে আর আমল দেয়নি। কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সে দেখে বিষ্টু পাশে নেই। দরজাটাও খোলা। দরজা খুলে রেখেই সে কি গেল মুখ হাত ধুতে? এমনিতেই সকাল সকাল ওঠা বিষ্টুর অভ্যেস। তবে বাইরে গেলেও ঘরে কুকুর ঢোকার ভয়ে দরজাটা তো সে খুলে রাখে না। এদিকে তার গতরাতের খাবারের থালা ঢাকা দেওয়াই পড়ে আছে। লণ্ঠনটাও নেই। এরকম তো হয় না। কী মানুষ রে বাবা।

ঘটি হাতে নিয়ে সে দাওয়া থেকেই হাঁক মারে— 'কী গো, গ্যালে কোতায়?'

কোনো আওয়াজ মেলে না। তাহলে সে কি প্রাতঃকৃত্য সারতে গেল? পুকুরপাড়ের ঘন ঝোপেই কাজটা সারে সে। তারপর পুকুরে শৌচ সেরে ঘরে ফেরে। বিষ্টুর বউ তাই আবার হাঁক দিলে— 'হ্যাঁ গা, বলি তুমি কি ঘাটে আচো?' তবু জবাব আসে না কিছু। বিষ্টুর বউ আর আমল না দিয়ে পুকুরের দিকে যেতে যেতে গজগজ করতে থাকে—

'গ্যাঁজাই মানুষটাকে খেলে। কবে যে গ্যাঁজার ভূত ঘাড় থেকে নামবে...।' মুখের কথা শেষ হবার আগেই দেখে ঘাটের কাছেই তার পায়ের কাছে পড়ে আছে বিষ্টুর লুঙ্গি, গামছা আর লণ্ঠনটা। কাল রাতে তো নাইতে এসেছিল লোকটা। তাহলে গেল কোথায়?

ও মা গো, ওটা কী ভাসছে পুকুরে? চিৎকার করে ওঠে বিষ্টুর বউ— 'ও ভুবন দাদা গো, কোতায় তুমি? ওগো দেকবে এসো গো কী কাণ্ডিটাই না ঘটেচে। ওগো, আমার যে সব্বোনাশ হয়ি গ্যালো গো।'

ভুবন মন্ডল সবে দাওয়ায় বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল। এমন সময় ভেসে এল বিষ্টুর বউয়ের আর্ত চিৎকার। কী এমন হল যে তার সব্বোনাশ হয়ে গেল? চায়ে চটপট আরও দুটো চুমুক মেরে চা টা শেষ করে সে দৌড়োল বিষ্টুদের খিড়কি পুকুরের ধারে।

পুকুরপাড়ে গিয়ে দৃশ্যটা দেখেই সে থতমত খেয়ে যায়। সেইসঙ্গে ভয়ও লাগে। পুকুরের ঘাটের থেকে একটু দূরে উপুড় হয়ে ভাসছে একটা লাশ। দেখেই চিনতে পারে ভুবন। সেটা বিষ্টুচরণের। সে চিৎকার করে লোকজন ডেকে পাড়ে তোলায় লাশটাকে। তারপর গাঁয়েরই একজন সাইকেল নিয়ে ছোটে টাউনের পুলিশ থানার দিকে।

খানিক পরে পুলিশের দারোগা জয়ন্ত রাহা ভিড় হটিয়ে কনস্টেবলদের দিয়ে লাশটা তোলায় পুলিশ ভ্যানের পেছনে। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তার অভিজ্ঞতায় সে জানে যে গত রাতে জলে না ডুবলে সকালে লাশ ভেসে উঠত না।

বিষ্টুর বউ বলে যে গতকাল বেশি রাতে দিনেশ বিষ্টুকে ডাকতে এসেছিল। 'হুম' বলে মাথা নেড়ে জয়ন্ত দারোগা দিনেশের খোঁজ করে। দিনেশ কাছেই ছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দারোগা জানতে পারে যে দিনেশ সে রাতে বাড়িতেই ছিল। তবলা বাজাচ্ছিল। তার দুটো বাড়ির পাশের একজন সমর্থনও করেছে দিনেশের কথা। তবুও কী কারণে বিষ্টুর মৃত্যু হয়েছে তা তো পোস্ট মর্টেম না করলে জানা যাবে না। তাই দিনেশকে গাঁ ছেড়ে যেতে মানা করে দারোগা নিজের জিপে ওঠে। দিনেশ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে শুধু। এ কী মহা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল সে। এই সময়ে শ্যামাদাও গ্রামে নেই। লোক পাঠিয়ে যে তাকে খবর দেবে, সে উপায়ও নেই। সে জানে যে পুলিশ হয়তো এতক্ষণে ফেউ লাগিয়ে দিয়েছে তার পেছনে। এখন ভগবানই তার ভরসা।

সেদিন বিকেলে গাঁয়ের বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে টাউনের থানায়। মাতব্বর গোছের দু-একজন ছিল সেখানে। বিষ্টুর বউকে দিয়ে এফ আই আর করানো হয়েছে। এদিকে পোস্ট মর্টেমও হয়ে গেছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে যে গলার নলী আর ঘাড়ের হাড় ভেঙে বিষ্টুকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু কী দিয়ে বা কীভাবে খুন করা হয়েছে? পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট এলে সেটা জানা যাবে। এদিকে বিষ্টুর লুঙ্গি, গামছা আর লণ্ঠন পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে যদি তাতে খুনির হাতের ছাপ পাওয়া যায়।

সন্ধেবেলা গাঁয়ের লোক বিষ্টুর মৃতদেহ গাড়িতে চাপিয়ে ফিরতে ফিরতে আলোচনা করতে থাকে বিষ্টুচরণের সম্ভাব্য খুনিকে নিয়ে। দিনেশকে থানায় আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে যদি কিছু জানা যায়। কিন্তু কিছুই জানা যায়নি। একটু পরেই হয়তো তাকে ছেড়ে দেবে। তাই এই ফাঁকে উঠে আসে দিনেশের নামও।

একজন বললে— 'আমার তো মনে হয় দিনেশই খুনি। বিষ্টুর জিনিসপত্তরে ওর হাতের ছাপ পাওয়া যাবে দেকো।'

অন্যজন বলে— 'তাইলে সে তো গাঁ ছেড়ে পালাত। আমার মনে হয় ওরা যে স্বদেশি দল করে, তাদেরই কেউ খুন করেছে বিষ্টুকে।'

তৃতীয় একজন বলে— 'আরে, নিজের দলের লোকেরাই খুন করবে নিজেদের লোকেদের? সেটা কি যুক্তিযুক্ত? আমার মনে হয় তা নয়। ব্যাপারটায় অন্য কিচু আচে।'

শেষমেশ সুখরঞ্জন নামের একজন বলে— 'ওগো, তোমরা খেয়াল করচোনি একটা কতা। মনে করে দেকো তো, কাল রেতে দিনেশ কিন্তু তবলা বাজাচ্চিল। সে তাইলে কী করে বিষ্টুকে খুন করবে? তাইলে দিনেশ তো দোষি নয়।'

প্রথমজন বলে— 'ঠিকই তো। এ কতাটা তো ভেবে দেকিনি।'

সুখরঞ্জন বলে— 'আমার কী মনে হয় জানো?'

সমস্বরে প্রশ্ন ওঠে— 'কী? কী?'

—'আমার মনে হয় বিষ্টুকে নিশিতে ডেকেচিল। শুনলে না ওর ঘাড় মটকে দিয়েচে।'

এই কথাটা কিন্তু সবার মনে ধরে। তারপর গ্রামে ফিরে দাহ করার সময় লোকমুখে ছড়িয়ে যায়— 'বিষ্টুকে নিশিতে ডেকেছিল'।

দিনেশ, চোরাবালি আর শ্যামাদাসের ধন্দ

এই সমস্ত ঘটনার সময়ে রজনীকান্ত সর্বদাই ছিল গাঁয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে। বিষ্টুর সৎকার মিটে যেতে সে যখন ঘরে ফিরল তখন সুরেশ কাকা তাকে জিজ্ঞেস করলে— 'হ্যাঁ গো ছোরদাবাবু, শুনচি নাকি বিষ্টুকে নিশিতে ডেকে নে গেসল?'

রজনী নির্লিপ্তভাবে বলল— 'হবে হয়তো। তা খাবার কি তৈরি হয়ে গেছে? সারাদিন ঠিকমতো খাওয়া হয়নি। ক্লান্ত লাগছে। আচ্ছা সুরেশকাকা, তোমাকে তো কোথাও দেখলাম না।'

—'কী আর বলবো ছোরদাবাবু, হুগলিতে যেতে হয়েচিল আজ। বউয়ের বাতের ওষুধ আনতে। ছেলেপিলেরা তো সব লায়েক হয়ে গেচে। তারা কি আর মায়ের জন্যে করবে? তাই এই বুড়োটাকেই যেতে হয়েচিল।'

—'তা ওষুধ পেলে?'

—'সে তো পেলামই, তবে আরও একটা জিনিস দেকলাম।'

—'কী?'

—'দেকলাম শ্যামাদাস একটা পানের দোকান থেকে পান কিনচে। আমি তো পেথমটায় খেয়াল করিনি। পান কিনতে গে এক্কেরে মুকোমুকি পড়ে গেলাম। আমরা তো জানি শ্যামা ক-দিনের জন্যে কলকাতায় গেচে। কিন্তু হুগলিতে সে কী কচ্চে? আজও তো সে গেরামে ফিরল নেকো। কী ব্যাপার বল তো?'

—'হয়তো কোনো বিশেষ কাজ আছে হুগলিতে। আর হয়তো বিষ্টুর মারা যাওয়ার খবর ও পায়নি। খবর পেলে নিশ্চয়ই ফিরে আসত।'

—‘আর জানো, রঘুর চায়ের দোকানে দেকলাম শশ্মান ফেরত দিনেশ আর তোমার নরেশ কাকা চা খাচ্চে।’

—‘তা চা খাওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক সুরেশ কাকা?’

—‘না, তা নয় বটে। তবে ওই দিনেশটা তো শ্যামার ল্যাজে ল্যাজে ঘোরে। শ্যামা রয়ে গেল হুগলিতে। সক্কাল থেকে নরেশের টিকিও দেকা যায়নি গেরামে। আর একোন দেকি দিনেশের সঙ্গে গুজগুজ করচে। তাই বলচিলাম...।’

—‘সে ওদের দলের ব্যাপার-স্যাপার। তোমার আমার এসবে মাথা ঘামানোর দরকার কী?’

—‘তাইলে আমি আসি ছোরদাবাবু?’

—‘হ্যাঁ, এসো। সাবধানে যেও।’

সুরেশ কাকা চলে গেলে চোখ বুজে ঘটনাগুলো সাজানোর চেষ্টা করে রজনী। অদৃশ্য যোগসূত্রের সন্ধান করতে থাকে সে।

জিনিসপত্রের দাম বেশ চড়া হলেও দিনেশের পরিবারের তাতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না। কারণ দিনেশরা সেই অর্থে মোটামুটি অবস্থাপন্নই। তাদের উঠোনে ধানের গোলা, গোয়ালে দুটো দুধেল গাই। উঠোনের পুবদিকে রান্নাঘর আর দক্ষিণে খানিকটা তফাৎ রেখে দুটো ঘর। তারই একটায় দিনেশের বাবা-মা শোয় আর অন্যটাতে দিনেশ। দিনেশের ঘরের পাশেই কলাগাছের ঝোপ আর তারপরেই বাঁশ বাগান।

রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে রোজকার অভ্যেস মতোই দিনেশ কলাঝোপের পাশে পায়চারি করতে করতে সিগারেট খাচ্ছিল। খানিক আগেই মা ঘরকন্নার কাজ সেরে শুতে গেছে। মা জেগে ছিল বলেই এতক্ষণ সিগারেট খেতে পারছিল না। তাই এখন সে সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করছে উঠোনে আর মনে মনে ভাবছে— বিষ্টুর ঘাড় ভেঙেছে। জলে ডুবলে তো ঘাড় ভাঙার কথা নয়। তার মানে কেউ অবশ্যই খুন করেছে তাকে। কিন্তু কে করেছে? আর কেনই বা করেছে? শ্যামাদাসদাই কি এটা কাউকে দিয়ে করাল? লোক তো সে সুবিধের নয়। কিন্তু কেন খুন করাল? বিষ্টু কি শ্যামাদার কোনো গোপন কথা জেনে গিয়েছিল যা সে নিজে কিংবা নরেশকাকা জানে না? আবার শ্যামাদার তো এখন কলকাতায় থাকার কথা। কিন্তু চায়ের দোকানে নরেশ কাকা বলল যে শ্যামাদা এখন হুগলিতে। তার তো কলকাতা থেকে মাল আনার কথা ছিল। তাহলে সে হুগলিতে কী করছে? কলকাতা থেকে ফিরে এল নাকি? আর ফিরে এলেও সে গ্রামে এল না কেন? নাঃ! অনেক প্রশ্নে গুলিয়ে যাচ্ছে তার মাথা। এবার একটু না শুলেই নয়। ঘুমোলে মাথাটা পরিষ্কার হবে। তা ছাড়া সারাদিন অনেক ধকল গেছে। হঠাৎ তার মনে হল শুকনো বাঁশপাতার ওপর দিয়ে কিছু একটা দৌড়ে গেল। হয়তো শিয়াল কুকুর হবে। বিশেষ আমল দিল না সে। প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে চেপে নিভিয়ে দিয়ে ঘরের দাওয়ায় উঠে যায়। ভেজানো দরজা খুলতে যাবে এমন সময় হঠাৎই তার কোমরে জড়িয়ে গেল একটা দড়ি। তারপরেই একটা হ্যাঁচকা টানে সে পড়ে যায় দাওয়া থেকে নীচে। ধপ করে একটা আওয়াজ। চোখের মোটা মাইনাস পাওয়ারের চশমাটা ঠিকরে পড়ে দাওয়াতেই। চোখে চশমা না থাকলেও সে আবছা বুঝতে পারে যে চোখে ঠুলির মতো চশমা পরা কালো মতো কেউ একজন দাঁড়িয়ে তার পাশে। সে ভয়ে

চেঁচিয়ে উঠতে যাবে, কিন্তু মুহূর্তেই সেই কালো মূর্তি দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে তার গলা। স্বর বেরোচ্ছে না তার। শুধু কোনোরকমে শ্বাস নিতে পারছে মাত্র।

এদিকে কিছু একটা আওয়াজ শুনে পাশের ঘর থেকে দিনেশের মা তন্দ্রাজড়ানো গলায় বলে ওঠেন— 'কী হল রে দিনু?'

কালো মূর্তি দিনেশের গলায় জবাব দেয়— 'শ্যামাদা এসেছে দরকারি কথা বলতে। তুমি শুয়ে পড়ো মা। আমরা ঘরেই আছি।'

কিন্তু মায়ের মন। বিশেষ করে বিষ্টুর ঘটনাটা ঘটার পর থেকেই মনটা কেমন যেন খচখচ করে। তাই লেপ সরিয়ে হ্যারিকেনের আলো বাড়িয়ে বাইরে এসে দাওয়া থেকেই দিনেশের ঘরের দিকে উঁকি দেন তার মা। হ্যাঁ, দরজা তো বন্ধই আছে। তাই আবার ঘরে ঢুকে যান তিনি।

কালো মূর্তি ততক্ষণে দিনেশের শরীরটাকে তুলে নিয়েছে কাঁধে। অবলীলায় দৌড়ে চলেছে বাঁশবাগান ভেদ করে। এখান থেকে খানিকটা রাস্তার ওপর দিয়ে গিয়ে বাঁ-দিকে ঘুরলে তবেই দামোদরের চর। কিন্তু প্রথম শীতের রাস্তায় কয়েকটা কুকুর ছাড়া জনমনিষ্যির দেখা নেই। তবে তারাও কেউ ঘেউ-ঘেউ করে উঠল না। কেন? এদিকে কালো মূর্তিও রাস্তা দিয়ে গিয়ে বাঁ-দিকের সরুপথ ধরে পৌঁছে গেল দামোদরের চরে। এ ছাড়া আর উপায় ছিল না তার।

সেখানে দিনেশকে নামিয়ে রেখে তার গলায় পেঁচানো দড়িটা ঢিলে করে দেয় সে। না, দিনেশ এখনও অজ্ঞান হয়নি; খালি এতটা পথ গলায় দড়িটা পেঁচিয়ে রাখার জন্যে তার কথা বলতে আর শ্বাস নিতে খানিক অসুবিধে হচ্ছে। তবে উঠে বসেছে সে।

কালো মূর্তি তাকে জিজ্ঞেস করল— 'কী রে? ঠিক আছিস?'

গলাটা চেনা দিনেশের। এতক্ষণে সে বুঝে গেছে বিষ্টুকে কে মেরেছে। তার মনে পড়ে যায় বিষ্টুর নিশির ডাকের কথা আর একটু আগেই কালো মূর্তির তার গলা নকল করার কথা। তাই সে হাঁফ ধরা গলায় আগেভাগেই বলে— 'আমাকে মে...মে...মের না প্লিজ।'

—'তাহলে আমাকে বল, কলকাতার নাম করে হুগলিতে শ্যামা আছে কেন?'

—'ও..ও..ওখানে ওর নিজের বাড়ি আছে।' গলায় হাত বোলাচ্ছে দিনেশ।

—'বাড়িটা কোথায়?'

—'শুনেছি কুমোর গলিতে।' প্রাণের ভয়ে সত্যি কথাই বলে দিনেশ।

—'তুই সেখানে কখনো গিয়েছিলিস? সত্যি করে বল।'

—'না।...আমাদের সবকিছু জানা বারণ।' তারপরে ঢোঁক গিলে বলে— 'যার যেটা কাজ, সে শুধু সেটাই করে।'

কালো মূর্তি বলে— 'শ্যামার ওই পৈতৃক বাড়িটাই কি চোরাচালানের ঠেক? হুগলির বাড়ি থেকেই কি শ্যামা পিস্তলও পাচার করে?'

—'আমি ঠিক জানি না। হতেও পারে। আবার নাও হতে পারে। তবে কলকাতায় একটা ঠেক আছে জানি।'

—'তা তুই ছাড়া হুগলির ওই বাড়ির কথা আর কে কে জানে?'

—'নরেশ কাকা আর ওর ভাইপো জানে।' দিনেশ তখনও নিজের গলায় হাত বোলাচ্ছে।

—'ভাইপোর নাম কী? সে কোথায় থাকে?'

—'তার নাম ভবেশ বাগদি। হুগলিতে মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে কাজ করে। শুনেছি ওই এখন কলকাতায় মাল লেনদেন করছে।'

—'তাহলে শ্যামা কলকাতায় যায় কেন?'

—'মনে হয় রিভলভার আর সাবান আনানোর ব্যবস্থা করতে। তবে সেখানে আর কি করে তা আমরা কেউই জানি না।' প্রাণে বাঁচার তাগিদে না চাইতেই অনেক কথা উগরে দিচ্ছে দিনেশ।

—'তা ভবেশ কখন কলকাতায় যায়?'

—'নরেশ কাকা দূরের গ্রামের মাল নিয়ে চলে যাবার পরে ও রাতে শ্যামাদার কাছ থেকে কলকাতায় বিলির জন্যে মাল আর টাকাটা নেয় আর সেদিন রাতেই ট্রেন ধরে সেটা কলকাতায় ডেলিভারি করে।'

—'ও আচ্ছা। তাই শ্যামা আজ গ্রামে ফিরল না। তা এবার বল তো মাণিক, বিষ্টুর মরার খবর কি শ্যামা পেয়েছে?'

—'হ্যাঁ। নরেশ কাকা সকালেই বেরিয়ে গিয়েছিল। সেইই শ্যামাদাকে সব বলেছে।'

—'তাহলেই দেখেছিস, শ্যামা তোদের কত্তো ভালোবাসে যে বিষ্টু মরতেও সে ফিরল না।' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে কালো মূর্তির কথায়।

—'মাল ঠিকঠাক বিলি না হলে তো শ্যামাদা ফিরতে পারবে না। তাইই...।'

—'বাঃ। এখনও ওর হয়ে সাফাই গাইছিস? ও আচ্ছা, আচ্ছা। আমিই ভুল করেছি। তোদের কাছে তো মানুষের চেয়ে চোরাই মালেরই কদর বেশি।'

দিনেশ বুঝতে পারে যে শ্যামাদার হয়ে বলে সে বড্ডো ভুল করে ফেলেছে। পরে শ্যামাদাকে এসব কথা বলতেই হবে। তাই সে চুপ করে থাকে। এ ছাড়া এখন আর উপায়ই বা কি?

তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটে কালো মূর্তির কথায়। ক্যাঁৎ করে দিনেশের পাছায় একটা হালকা লাথি মেরে সে বলে— 'কী রে? সারারাত বসে থাকবি নাকি এই নদীর চরে? যা বাড়ি যা। ভাগ এখান থেকে শালা শ্যামার পা চাটা নেড়িকুত্তা। যা ভাগ।' আবার একটা লাথি পড়ে তার কাঁধে।

দিনেশ তাড়াতাড়ি উঠে পালাতে যায় আর ভাবে— ওঃ, এ যাত্রায় খুব বেঁচে গেছে সে...। কিন্তু হঠাৎই তার ভাবনা থেমে যায়। একটা দড়ি জড়িয়ে যায় তার গলায় আর মাথার ঠিক পেছনেই সপাটে আঘাত করে ভারী একটা কিছু। তার গলা থেকে 'উঃ' করে একটা হালকা শব্দ বেরোয়। তারপরই বালিতে লুটিয়ে পড়ে দিনেশ।

দিনেশের গলার দড়িটাকে ধরেই কালো মূর্তি তাকে টেনে নিয়ে যায় খানিক দূরের একটা শুকনো কাশঝোপের কাছে। গলা থেকে দড়িটা খুলে নেয়। তারপরে দিনেশের শরীরটা দু-হাতে তুলে ছুঁড়ে দেয় হাত আটেক দূরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে কেমন করে দিনেশের শরীরটা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে বালির নীচে— গভীর থেকে আরও গভীরে।

নাঃ, এবারে আর কালো মূর্তির ভয় করছে না। সব প্রমাণ লোপাট করে দিয়েছে সে আর সেইসঙ্গে নিজের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে হয়ে উঠেছে ঠান্ডা মাথার একজন সিরিয়াল কিলার।

পরেরদিন সকাল হতে না হতেই হই চই। পাড়াসুদ্ধু লোক এসে জমেছে দিনেশদের বাড়িতে। দিনেশকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকজন খুঁজতেও বেরিয়েছে তাকে।

সুরেশ কাকার মুখে খবরটা শুনে রজনীও যায় দিনেশদের বাড়ি। ততক্ষণে খোঁজ তল্লাশি সেরে সবাই ফিরে এসেছে। নানান লোকে নানান কথা বলছে। দিনেশের নিরুদ্দেশ হবার নানা সম্ভাবনার কথা বলছে। এরই মধ্যে দিনেশের বাবা একজনকে সঙ্গে নিয়ে টাউনের থানায় ছুটল।

থানা-পুলিশ হবে এইবার। তাই ভিড়টা আস্তে আস্তে হালকা হতে শুরু করে। রজনী আর সুরেশ কাকাও নিজেদের বাড়ি ফিরতে যাবে, এমন সময় সুখরঞ্জনের গলা কানে এল — 'বলেচিলুম না, এ হল নিশির ডাক। তা তকোন তোমরা গেরাজ্জি করলে নে। সাবধানেও থাকলে নে। একোন বুইলে তো? ওগো, এই সুকরঞ্জনের কতা বাসি হলে তবে মিষ্টি হয়, হ্যাঁ।'

পরেরদিন সকাল দশটার বাসে শ্যামাদাস নামে হাটতলায়। রঘুর চায়ের দোকানে গিয়ে বসে। দোকান একন ফাঁকা। কোনো খদ্দের নেই। তাই শ্যামাদাস একটু বসতেই রঘু চা এগিয়ে দিয়ে বলে— 'শ্যামাদা, তুমি তো ক-দিন ছিলে না। ইদিকে অনেক সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গ্যাচে গেরামে।'

বিস্মিত শ্যামাদাস বলে— 'কাণ্ড? কী এমন সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল এই ক-দিনে?'

—'আর বোলোনি শ্যামাদা। সাংঘাতিক ব্যাপার সব।'

রঘু ততক্ষণে চায়ের গ্লাস বাড়িয়ে দিয়েছে। সেটা হাতে নিয়ে শ্যামাদাস বলল—'আরে, বলবি তো কী হয়েছে? খালি ধানাইপানাই।'

—'বিষ্টুচরণ খুন হয়েচে গো।'

শ্যামাদাস চায়ে একটা চুমুক দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কথাটা শুনে চমকে ওঠে সে। খানিকটা চা ছলকে পড়ে গ্লাস থেকে। বলে— 'কি বললি? বিষ্টু খুন হয়েছে? কবে? কোথায়? কী করে?' নিখুঁত অভিনয় শ্যামাদাসের।

একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নে থতমত খেয়ে রঘু বলতে থাকে— 'শনিবার রেতে বিষ্টু ওর খিড়কি পুকুরে নাইতে যাবার সময় দিনেশ পুকুরপাড় থেকে তাকে ডাকে। দিনেশের গলা নাকি ওর বউ ঘুমের ঘোরে শুনেচে। তারপর সক্কালবেলা বিষ্টুর বউ ঘাটে গে দেকে যে পুকুরের জলে বিষ্টুর লাশ ভাসচে। ইদিকে ঘাটের কাচে পড়েচিল তার শুকনো লুঙ্গি আর গামচা। তাপ্পরে টাউনের থানা থেকে পুলিশ আসে। তারা বিষ্টুর লাশ নে যায়। সেইসঙ্গে তার জিনিসপত্তর আর দিনেশকেও নে যায়।'

শ্যামাদাস অবাক হবার ভান করে। রঘুর সরল চোখে তা ধরা পড়ে না। —'শেষে দিনেশ খুন করল বিষ্টুকে? ওকে কি জলে ফেলে দিয়েছিল? কিন্তু বিষ্টু তো সাঁতার জানত।'

—'আরে না গো দাদা, তা নয়। দিনেশ সেদিন রেতে তার ঘরেই ছেলো। সে নাকি তবলা বাজাচ্ছিল। আশপাশের লোকেরাও তা জানে। কিন্তু নিশির ডাকে সাড়া দিয়েই ভুলটা করে বিষ্টু। ওই নিশিই তার ঘাড় মটকে জলে ফেলে দেচে।'

—'ঘাড় মটকানোর কথা কে বললে? পুলিশ?'

—'তা ছাড়া আর কে বলবে? সব্বাই তো ভেবেচিল জলে ডুবে মরেচে বিষ্টু।'

নরেশ যখন হুগলিতে তাকে খবরটা দিয়েছিল তখন তো পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট বেরোয়নি। তাই শ্যামাদাসকে সে সেটা বলতে পারেনি। তবে এখন রঘুর মুখে শুনে শ্যামাদাস বোধ হয় আন্দাজ করে পারছে বিষ্টুর খুনি কে হতে পারে। এবারে রঘুর কাছ থেকে আরও কিছু জানতে হবে।

তাই সে বলে— 'তা দিনেশ এখন কি বাড়িতে? একবার ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

—'আর দেকা? পুলিশ দিনেশকে গাঁ ছাড়তে বারণ করেচিল। কিন্তু কাল থেকে দিনেশও নিপাত্তা।'

শ্যামাদাস নরেশকে আর হুগলিতে আসতে বারণ করেছিল বলে এই খবরটা সে পায়নি। এটা তো এখন জানতে হবে বিশদে। তার জন্যে রঘুকে আরও একটু খোঁচাতে হবে।

—'সে কী? কোথায় গেল সে? ওইই কি তাহলে বিষ্টুকে খুন করে গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে?'

—'আরে তা নয় গো শ্যামাদা। দিনেশের মা পুলিশকে বলেচে যে তুমি নাকি কাল রাতে দিনেশের সঙ্গে দেখা করতে গেচিলে। দিনেশ তো তার মাকে সেই কতাই বলেচিল। তাপ্পর থেকে আর দিনেশের খোঁজ পাওয়া যাচ্চে না।'

—'আমি? আমি তো কাল এখানে ছিলামই না। তু...তু...তুই এসব সত্যি বলছিস তো রঘু?'

—'তোমাকে আমি খামোকা মিচে কতা কইতে যাব কেন শ্যামাদা? তুমি গেরামের লোকেদের সঙ্গে কতা বলে দেকো আমি সত্যি বলচি কি না।'

এবার সত্যিই ধাঁধাঁয় পড়ে যায় শ্যামাদাস। সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। সে তো কাল রাত্তিরে হুগলিতে ছিল। তাহলে কে এসেছিল দিনেশের কাছে? দিনেশ কেনই বা তার নাম বলল মা-কে? ঠিক আছে। রঘুকে আরেকটু ঘেঁটে দেখা যাক। তার ভাগ্য ভালো যে এই সময়টায় দোকানে আর অন্য খদ্দের নেই। তাহলে এত কথা বলা কওয়া যেত না। ঠান্ডা চায়ের কাপটা তাই একপাশে সরিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরায় সে। তারপরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার অভিনয় শুরু করে— 'এ তুই কি কথা শোনালি রে রঘু... বিশ্বাসই হচ্ছে না... আমার দলের দু-দু-জন... আমার দুটো পাঁজর চলে গেল রে ...।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্যামাদাস।

তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে— 'তা দিনেশ গাঁ ছাড়ার সময়ে কি ওর জামাকাপড়, সিগারেটের কৌটো আর মানে ওর নিজস্ব কিছু জিনিসপত্র নিয়ে গেছে? জানিস কিছু?'

—'আজ্ঞে না শ্যামাদা। আমি তো ওর বাড়িতে যাইনি। তবে নরেশদা বলচিল যে দিনেশের মা নাকি বলেচে যে দিনেশের চশমাটা দাওয়ায় পড়েচিল। আর ও নিজের

জিনিসপত্তর কিচুই নে যায়নি।'

—'হুম বুঝলাম।' গম্ভীর মুখে সিগারেটে টান দিতে থাকে শ্যামাদাস। তার মাথায় এখন অন্য চিন্তা ঘুরছে।

শ্যামাদাস জানে যে মাইনাস ফাইভ পাওয়ারের চশমা ছিল দিনেশের। সেটা না থাকলে ওর পক্ষে শুধু রাতে কেন, দিনের বেলাতেও চলাফেরা করা বেশ মুশকিল। আর বারবার দিনেশের গলা নকলই বা করেছে কে? রহস্য। এখানেই রহস্যটা আছে।

ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে শুরু করে সে।

১৯৪৪, ডিসেম্বর

কানাইয়ের প্রস্তুতি, হুগলিতে শ্যামাদাস আর রজনীগন্ধার গলি

—'মা, মা, দ্যাখো, স্যার এসেছে।' রজনী তাদের বাড়িতে ঢোকার আগেই দৌড়ে আসে কানাই। কাছে যেতেই কানাইয়ের মা ঘোমটা ঠিক করতে করতে একটা আসন পেতে দেয় দাওয়ায়। রজনী বসে বলে— 'কলকাতায় কানাইয়ের স্কুলে ভরতির ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। পাঁচ ক্লাসে ভরতি হবে। হিন্দু স্কুলে। কলকাতার খুব নামকরা স্কুল।'

—'তা ও থাকবে কোতায়?'

—'বউবাজারে আমার কাছেই। সকালে দু-জনে দুটো ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ব। আমার বাড়ি থেকে হাঁটাপথেই ওর স্কুল। তারপর বিকেল চারটের সময় ছুটি হলে ও বাড়িতে এসে জলখাবার খেতে খেতেই আমি পৌঁছে যাব।' ইচ্ছে করেই হস্টেলের কথাটা চেপে যায় রজনী। নইলে কানাইয়ের মা ওকে কলকাতায় যেতে দেবে না।

—'তবে কি জানো, কলকাতার যা খপর শুনচি-বোমা পড়চে, লোকে খাবার পাচ্চে না। তাই বড়ো চিন্তে হয়।'

—'ওই ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ওকে আমি....আঃ ছাড় বলছি। গলায় লাগছে।' এই শেষের কথাটা কানাইকে বলা। ও পেছন থেকে রজনীর গলা জড়িয়ে ধরেছে আনন্দে। অনেকদিন পরে স্যার এসেছে যে তাদের বাড়িতে।

—'তা, শুনেচো তো গেরামের অবস্তা। ইস, কী সাংঘাতিক বল তো। দু-দু-জনকে নিশিতে ডেকে নে গ্যালো। একজনকে তো ঘাড় মটকে মারলে আর আরেকজনের কোনো চিন্নত নেই। আমি বাপু কানাই আর ওর বাপকে পইপই করে বলে দিয়েচি রেতে কেউ ডাকলে ওরা দরজা যেন না খোলে।'

—'তা ঠিকই বলেছেন।'

—'তাহলে স্যার, আমরা কবে যাব?' প্রশ্নটা কানাইয়ের।

রজনী হেসে বলে— 'দাঁড়া, দাঁড়া, ক-দিনের ছুটিতে এসেছি। এই ক-দিন একটু গ্রামটায় থাকতে দে। তারপর এই মাসের শেষের দিকে আমরা না হয় কলকাতায় যাব।

সেখানে একদিন তোকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভরতি করে দিতে হবে। নতুন বই, নতুন স্কুলের জামা, জুতো এসব কিনতে হবে তো।'

—'তুমি আমায় পড়া দেখিয়ে দেবে তো? আর বইগুলো কি সব ইংরিজিতে লেখা?'

—'ওরে পাগলা, না না। তবে হ্যাঁ, ইংরাজির জন্যে বই তো থাকবেই। সেগুলো তো ইংরাজিতেই হবে। তবে বাকি বই সব বাংলায় লেখা। আর আমি অফিস থেকে এসে তোকে পড়তে বসাবো, বুঝলি?'

কানাইয়ের মা চা-মুড়ি দিয়ে যায়। রজনী মুড়ির বাটিটা কানাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে— 'নে, এখান থেকে খা।'

কানাইয়ের মা হাঁ হাঁ করে ওঠে— 'না না, তুমি খাও। ও একটু আগেই খেয়েচে।' কানাই কিন্তু ততক্ষণে এক খাবলা মুড়ি তুলে নিয়েছে তার স্যারের বাটি থেকে।

একমুঠো মুড়ি তুলে নিয়ে রজনী বললে— 'বাড়ন্ত বয়েসের খিদে। আর যা লাফঝাঁপ করে সারাদিন..।'

—'তা যা বলেচো।'

—'স্যার তুমি আমায় জাদুঘর দেখাবে তো? তুমি তো ওখানে চাকরি কর।'

—'দেখাব, দেখাব। সব দেখাব। জাদুঘর দেখবি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখবি, মনুমেন্ট দেখবি, চিড়িয়াখানা দেখবি।'

—'দোতলা বাসে চড়াবে?'

—'চড়াব। ট্রামেও চড়াব।'

কানাইয়ের খুশি আর ধরে না। রজনীরও মনে আনন্দ। নিজের প্রিয় শিষ্যকে সে নিজের মতো করে গড়ে তুলতে পারবে। তবে তার থেকেও বড়ো স্বস্তি যে কলকাতায় থাকলে পুলিনের মতো শ্যামাদাস আর কানাইকে কব্জা করতে পারবে না।

চা-মুড়ি শেষ করে রজনী বলে— 'তাহলে আমি আসি। একটা ব্যাগে ওর জামাকাপড় গুছিয়ে রাখবেন। সোয়েটার আর চটিও দিয়ে দেবেন। তবে কম্বল-টম্বল দিতে যাবেন না। ওখানে সব আছে।'

—'আচ্ছা তাইলে এসো। সাবধানে ফিরো। আমি সব গুচিয়ে রাকবোকন। এই কানাই স্যারকে একটু এগিয়ে দে আয়।'

কানাই রজনীর পাশে পাশে তার হাত ধরে চলে। কিন্তু হঠাৎই একটা প্রশ্ন মনে পড়ে যায় তার।

সে বলে— 'আচ্ছা স্যার, একটা কথা বলবে? নিশি কি হরবোলা?'

থমকে দাঁড়িয়ে যায় রজনী। স্থির দৃষ্টিতে কানাইয়ের দিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে কিছুটা গম্ভীর স্বরে বলে— 'ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবেনা। তুমি শুধু রাত্তিরে দরজা খুলবে না ব্যাস; এমনকী আমি ডাকলেও নয়। বুঝেছ?'

কানাই মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

সেদিন বাড়ির টিউবওয়েলের জলে চান করছিল রজনী। পাতলা একচিলতে সাবান গায়ে মাখতে বেশ অসুবিধেই হচ্ছিল। মাথায় মাখার পরেই সেটা হড়কে বেরিয়ে গেল তার হাত থেকে। এদিকে মাথা থেকে সাবানজল গড়াচ্ছে। তাই সে হেঁকে বলল— 'ও সুরেশ কাকা, আমার তাকে যেখানে কলম রাখা আছে, সেখান থেকে একটা সাবান দাও তো।'

—'হ্যাঁ দিচ্চি' বলে সুরেশকাকা একটা সাবান এনে দেয়। মাথার সাবানজল পাছে চোখে ঢুকে যায় তাই রজনী হাঁতড়ে হাঁতড়েই প্যাকেট থেকে সাবান বের করে সেটা জলে ভিজিয়ে গায়ে মাখতে শুরু করে। কিন্তু রোজ যে সাবানটা সে মাখে,এটার গন্ধ তো তেমন নয়। কেমন যেন জুঁইফুলের মতো গন্ধ। সুরেশকাকা কি তাহলে অন্য কোনো সাবান কিনে এনেছে? যাইহোক, সে চোখ বন্ধ করেই গায়ে পিঠে সাবান ঘষতে থাকে। শীতের দিনে এই খোলা কলতলায় গায়ে রোদ্দুর মেখে চান করায় ভারি আরাম। তাই গায়ে ভালো করে সাবান ঘষতে থাকে রজনী। কিন্তু হঠাৎই সাবানটা আবার হাত ফস্কে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় পড়ল? শব্দ শুনে মনে হল যে পেছনে পড়েছে; কিন্তু সাবান তো হড়কে অন্য জায়গায় সরে যায়। এখন চোখ-মুখের ফেনা না ধুলে তো সেটা তোলা যাবে না। তাই বালতি থেকে জল নিয়ে মুখটা ভালো করে ধুয়ে কলতলার মেঝের দিকে তাকায় রজনী। কিন্তু এ কী? সাবানটা মেঝেতে দুটো টুকরো হয়ে পড়ে আছে আর তার ভেতরটা নারকেলের মতো ফাঁকা। সেই ফাঁকেতে একটা সেলোফেনের কাগজে মোড়া সাদা মতো কী একটা রাখা। প্যাকেটের মুখটা সুতো দিয়ে বাঁধা। কৌতূহলে রজনী সেলোফেনের প্যাকেটটা তোলে। ভেতরে সাদা গুঁড়োর মতো কী যেন আছে। এটা কী? সাবানের মধ্যে এটা এলই বা কী করে? কেমন সাবান এটা? তাই নজর একটু ঘোরাতেই তার চোখে পড়ে সাবানের প্যাকেটটার ওপরে। আর তাতেই আশ্চর্য হয়ে যায় সে। আরে, এটা তো পিটারের ঘর থেকে আনা সাবানের একটা। ওপরে লেখা 'স্বদেশি সাবান'। তাহলে সাবানের মধ্যে এই সাদা গুঁড়োটাই পাচার করে শ্যামাদাস আর তার দলবল। নারকোটিক্সের পিটার কি সেটা সন্দেহ করেই তাহলে পুলিনের প্যাকেট নিয়ে গিয়েছিল তার ঘরে?

আজ শনিবার। অতি ভোরে বেরিয়ে যায় শ্যামাদাস। কলকাতা গিয়ে নানান কাজ সেরে যখন সে হুগলির তেমাথায় মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ঢুকল তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। শীতের দিন। সন্ধে নেমে গেছে। একটা কোণের টেবিলে বসে কাঁধের ব্যাগটা টেবিলে রাখল। ব্যাগটা বেশ ভরতি। তারপর একগ্লাস জল খেয়ে হাঁক দিল— 'ভবেশ, কচুরি দে।'

দোকানে মোটামুটি বিক্রিবাটা হয়। দু-একজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। তবে শ্যামাদাসের টেবিলের কাছাকাছি কেউ বসে নেই। এটাই চায় শ্যামাদাস। ভবেশের সঙ্গে তার কথাবার্তা আর কেউ যেন শুনতে না পায়। একটু পরেই ভবেশ কচুরি নিয়ে এল। শালপাতার থালাটা কাছে টেনে নিয়ে ইশারায় সে ভবেশকে বলল তার মুখোমুখি বসতে।

তারপরে বললে— 'আজ রাত্তিরে আসিস। তা হ্যাঁ রে, বিশে, নগাই, মদনাদের ঠিক রেখেছিস তো? দেখিস বাবা, ওরা যেন বিগড়ে না যায়।'

—'হ্যাঁ কাকু, ওরা সব ঠিক আছে। তবে কাল একজন এসে তোমার বাড়ির খোঁজ করছিল। সে নাকি তোমার বাড়িটা কিনতে চায়। কার কাছ থেকে যেন খোঁজ পেয়ে এসেছে।' ভুরু দুটো কুঁচকে যায় শ্যামাদাসের। সে তো বাড়ি বিক্রি করবে বলে কাউকে বলেনি। বিক্রি করার প্রশ্নও ওঠে না। তাহলে এই লোকটা খবর পেল কোথা থেকে? কে

এই লোকটা? পুলিশের লোক নয়তো? নাকি অন্য গ্যাংয়ের কেউ? এই লাইনে তো টক্কর লেগেই আছে। নেহাত কলকাতায় তার ভালো যোগাযোগ আছে বলেই কেউ তাকে ঘাঁটাতে চায় না। তাহলে কে এসেছিল? তবে যেইই এসে থাকুক না কেন, সে জানে যে এখানে তার বাড়ি আছে।

তাই একটুকরো কচুরি মুখে পুরে চশমার কাঁচের ওপর দিয়ে তাকিয়ে ভবেশকে সে বলল— 'লোকটাকে দেখতে কেমন? লক্ষ্য করেছিলিস ভালো করে?'

—'হ্যাঁ, লম্বা, তবে খুব একটা বেশি লম্বা নয়। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা আর কপালের বাঁ-দিকে একটা খয়েরি রঙের জড়ুল। মাথার মাঝখানে সিঁথি, পাতা পেড়ে চুল আঁচড়ানো আর গোঁফ নেই।' একটু থামে ভবেশ। আরও কিছু মনে করতে চেষ্টা করে।

আবার কচুরির টুকরো মুখে পুরে শ্যামাদাস বলে— 'আর?... আর কিছু?'

—'লোকটা এই তোমার কান পর্যন্ত লম্বা হবে বলে মনে হয়। আর...হ্যাঁ, সাদা ধুতি আর নীল শার্টের ওপরে কালো কোট পরেছিল। কোটের পকেটে ছিল চেন লাগানো ঘড়ি। একবার বের করে টাইমও দেখেছিল। আর হ্যাঁ, লোকটার গা থেকে সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছিল। দেখে তো মনে হল পয়সা আছে।'

—'বয়েস কত?'

—'তা এই তোমারই মতো হবে।'

—'তুই কি তাকে আমার বাড়ির খোঁজ দিয়েছিলিস?'

—'কি যে বল কাকু, তাই কখনো কেউ দেয়? আমি বলেছি যে আমি ওই নামের কাউকে চিনি না। তারপর লোকটা মালিককেও জিজ্ঞেস করেছিল। মালিকও ওই একই কথা বলেছে।'

—'আচ্ছা। তা লোকটা গেল কোন দিকে সেটা খেয়াল করেছিলিস?'

—'ওই কুমোর গলির দিকে।'

—'ঠিক আছে। তুই এখন কাজে যা। আর শোন, তুই তাহলে আজ আর রাত্তিরে আসিস না। আর তোর কাকা এলে তাকেও বারণ করে দিস। আর আবার ওইরকম কেউ এলে তার ওপরে বিশেষ করে নজর রাখবি, বুঝলি?'

—'আচ্ছা কাকু' বলে ভবেশ চলে গেল নিজের কাজে। আর কচুরি খেতে খেতে শ্যামাদাস ভাবতে থাকে— তার নিজের হাইট পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি; আর লোকটা যদি তার কান পর্যন্ত লম্বা হয়, তাহলে তার হাইট হবে প্রায় পাঁচ ফুট সাত বা সাড়ে সাত ইঞ্চি। আর লোকটা কুমোর গলির দিকে গিয়েছিল। সে যদি তার বাড়িটা দেখে থাকে? বাড়ির দরজায় তো তার আর তার বাবার নামও লেখা আছে। ওই লোকটা সেটা দেখেও থাকতে পারে। তবে ভবেশ লোকটার যে রকম বর্ণনা দিল, তার সঙ্গে তো নিজের চেনাজানা কাউকে সে মেলাতে পারছে না।

যাইহোক, খাওয়া সেরে, দাম মিটিয়ে দোকানের বাইরে এসে সিগারেটের কৌটো থেকে একটা সিগারেট বের করে সে। কৌটোর ঢাকনা বন্ধ করে তাতে সিগারেটটা দু-বার ঠুকে ঠোঁটে ঝোলায়। হ্যাঁ, সে খানিকটা সময় নিচ্ছে আর সেইসঙ্গে ঈগল-চোখে মেপে নিচ্ছে সন্ধের অন্ধকারে ওইরকম কাউকে দেখা যাচ্ছে কি না। তবে এটা সে বুঝে গেছে যে কেউ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ তো নির্ঘাত অন্য কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সিগারেটটা ধরিয়ে শ্যামাদাস এগিয়ে চলে তার গন্তব্যের দিকে। তেমাথা পেরিয়ে ইচ্ছে করেই কখনো জোরে আবার কখনো আস্তে চলতে থাকে শ্যামাদাস। চলার সময় নানান ছুতোয় পেছন ফিরে দেখে। কখনো জুতো থেকে কাঁকর বের করার অছিলায় আবার কখনো বা ঘড়ির বেল্ট বাঁধার বাহানায় দেখে নেয় সে পেছনে কেউ তাকে ফলো করছে কি না। বার দুয়েক চাদরের ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দেখে নেয় তার কোমরে গোঁজা রিভলভারের অস্তিত্ব। আর এইভাবেই ভয় আর ভাবনার দোলাচলের মধ্যেই একসময় সে পৌঁছেও যায় তার বাড়ির দরজায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে তালা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। আধঘণ্টা পরে তবে আবার তাকে দেখা যায় বেরোতে। তবে খালি হাতে।

পরের দিন নরেশ বাগদি সন্ধে সাতটা নাগাদ শ্যামাদাসের বাড়ি থেকে বেরোয়। তবে তার কাছ থেকে মিষ্টির দোকানে আসা লোকটার যে বর্ণনা সে শুনল সেইমতো নজর রাখতে রাখতে চলল বাসস্ট্যান্ডের দিকে। কিন্তু কই? নজরে এল না তো লোকটা? তবে খুব শিগগিরিই যে এই ঠেকটা পালটাতে হবে তা সে বেশ বুঝতে পারল। শ্যামাকে তাড়া দিতে হবে।

রাত ন-টা নাগাদ ভবেশ দোকানের কাজ শেষ করে সাইকেলে চেপে কুমোর গলির পথ ধরলে। একটু পরেই সে পৌঁছেও গেল শ্যামাদাসের বাড়িতে। দরজায় বিশেষ সাংকেতিক টোকা দিতেই দরজা খুলে দিল শ্যামাদাস। সাইকেলটা লক করে বাইরে রেখে ভবেশ ভেতরে ঢুকে যেতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

হঠাৎই কালো ট্রাউজার, খয়েরি সোয়েটার আর গাঢ় নীল মাঙ্কি টুপি পরা একজন এসে বসল ভবেশের সাইকেলের পাশে। তারপর অতি সাবধানে আওয়াজ না করে সাইকেলের পেছনের চাকার হাওয়া খুলে দিয়েই হারিয়ে গেল রাস্তার আলো-আঁধারীতে।

মিনিট পনেরো পরেই শ্যামাদাসের বাড়ি থেকে হাতে একটা চটের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এল ভবেশ। সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ব্যাগটা হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে লক খুলে সাইকেলটা রাস্তায় নামাতেই সে বুঝতে পারল কোথাও একটা গড়বড় হয়েছে। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে বুঝতে পারল যে সাইকেলের পেছনের চাকাতে হাওয়া নেই। এই অবস্থায় তো আর সাইকেল চালানো যাবে না। এটাকে শ্যামাকাকুর বাড়িতেই রেখে যেতে হবে। নইলে রাস্তায় পড়ে থাকলে চুরি হয়ে যাবে। তাই আবার দরজায় সাংকেতিক টোকা দেয় সে। সামান্য একটু সময় লাগে দরজা খুলতে। দরজা খুলে শ্যামাদাস জিজ্ঞেস করলে— 'আবার কী হল? সেই লোকটাকে দেখতে পেলি নাকি?'

—'আরে না গো। সাইকেলটার পেছনের চাকাটা পামচার হয়ে গেছে। এটা এখানেই রেখে যেতে হবে, নইলে চুরি হয়ে যাবে। আর তুমি যে খামটা দেবে, সেটাও নিতে ভুলে গেছি।'

—'ও আচ্ছা। আয়, ভেতরে আয়। এত ভুলো মন তোদের...।'

ভেতরে ঢুকে উঠোনে সাইকেলটা রাখে ভবেশ। শ্যামাদাস যায় ঘরের ভেতরে। এখান থেকে ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যায়। বিছানায় পড়ে থাকা খামটা শ্যামাদাস তুলতে যেতেই ভবেশের নজর পড়ে শ্যামাদার বিছানায় দুটো প্যাকেট রাখা। ওই প্যাকেট দুটো ব্যাগে ঢোকাতেই যাচ্ছিল শ্যামাদাস, কিন্তু ভবেশ হঠাৎ ডাকতেই তাড়াহুড়োয় সেদুটো ব্যাগে

ঢোকাতে ভুলে গেছে সে। বিছানা থেকে খামটা নিয়ে ভবেশের হাতে দিয়ে বলে —'সাবধানে যাস কিন্তু। আর খেয়াল রাখিস কেউ তোকে ফলো করছে কি না।'

—'ঠিক আছে। তুমি চিন্তা কর না।' বলে রাস্তায় বেরিয়ে আসে ভবেশ। তবে তার মনে একটা খটকা লাগে— তার কাকাকে আর তার তাকে দেওয়া প্যাকেটের সংখ্যা মেলালে তো কোনো প্যাকেটই পড়ে থাকার কথা নয়। তবে শ্যামাকাকুর কাছে আরও যে দুটো প্যাকেট সে দেখল, সেগুলো কী?

সাইকেল নেই, তাই একটু তাড়াতাড়িই পা চালাতে হবে স্টেশনের দিকে। মোড়টা পেরোলেই স্টেশনে যাবার রাস্তাটা এই শীতের রাতে একটু বেশিই সান্নাটা। তার ওপরে বাতিও নেই। তবু ভবেশের মনে হচ্ছে পেছনে কেউ যেন আসছে। হ্যাঁ, একজন আসছে ঠিকই। আসছে অন্ধকারে মিশে, কালো পোশাকে। আরও তাড়াতাড়ি পা চালায় ভবেশ। স্টেশনে পৌঁছলে তবেই নিশ্চিন্ত। সেখানে আলো আছে অনেক। কিন্তু তার দেখাদেখি লোকটাও গতি বাড়ায়। এ নির্ঘাত পুলিশের লোক, কিংবা এর অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। তাই ভবেশ দৌড়তে শুরু করে। কিন্তু লোকটার বেগ তার চেয়েও অনেক বেশি। সে পেছন থেকে এসে তার কলার চেপে ধরে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় মারে তার গালে।

—'পালাচ্ছিলিস কেন?' মাঙ্কিটুপির আড়াল থেকে লোকটার চোখ দুটো শুধু দেখা যাচ্ছে।

—'কই না তো। আমি তো পালাচ্ছি না।' ভয় পেয়ে গেছে ভবেশ। তার কথাতেই সেটা বোঝা যায়।

—'তোর ব্যাগে কীসের প্যাকেট আছে?'

—'কই, কিছু না তো।' আবার গালে একটা ঠাস করে চড় মারতেই ভবেশ বলে ফেলে 'সা সা...মানে সাবান।'

—'তা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? কলকাতায়?'

—'হ্যাঁ।'

—'এতরাতে এখান থেকে কলকাতায় যাচ্ছিস সাবান বেচতে? তা কত প্যাকেট সাবান বিক্রি করবি শুনি?' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে লোকটার গলায়।

—'দু...দু-প্যাকেট। মানে কুড়িটা।'

—'মাত্র দু-প্যাকেট? তা এগুলো এমনকী স্পেশাল সাবান যে রাত্তিরে নিয়ে যেতে হয়? কলকাতায় তো এখন কেনার লোক পাবি না।'

চুপ করে থাকে ভবেশ। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটা আবার তার গালে আরেকটা চড় মেরে বলে— 'যদি বাঁচতে চাস তো সত্যি কথা বল।'

ভয়ে ভবেশ সত্যি কথাটাই বলে— 'এগুলো স্বদেশিদের তৈরি সাবান তাই...।'

লোকটা তার ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা কাগজে মোড়া জিনিস বের করে। তার থেকে বের করে একটা সাবান। ভবেশের নাকের কাছে ধরে বলে— 'শুঁকে দেখ। তোদের ওই সাবানের মতো গন্ধ আছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে একবার ধরে দেখ।... নে। নে। দেখ ভালো করে।'

আঙুল দিয়ে ধরতেই ভবেশ বুঝতে পারে এটা হুবহু তাদের স্বদেশি সাবানের মতো।

তাই সে চুপ করে থাকে।

লোকটা আবার কাগজে মুড়ে সাবানটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলে— 'তোদের ওগুলোয় সাবানের ছদ্মবেশে অন্য জিনিস আছে।'

—'কী আছে?'

—'সত্যিই তুই জানিস না ওগুলোয় কী আছে?'

নার্ভাস ভবেশ বলে— 'সত্যি বলছি জানি না।'

লোকটা এবার তার কাঁধে হাত রাখে। ভবেশ তাতে একটু ভরসা পায়। তারও কৌতূহল হয় জানতে যে তার প্যাকেটে কী আছে?

লোকটা বলে— 'ওগুলোর মধ্যে আছে কোকেন। সাবানের মতো করে বাইরেটা তৈরি করা হয়েছে আর ভেতরটা ফাঁপা। আর সেই ফাঁপা অংশের ভেতরে আছে সেলোফেন কাগজে মোড়া কোকেন। দামি নেশার জিনিস। তোদের ওই শ্যামাদাস স্বদেশি সাবানের নামে তোদের দিয়ে কোকেন পাচার করায়।' এই কথা বলে লোকটা আবার পকেট থেকে সাবানটা বের করে খুলে দেখায় ভবেশকে।

ভবেশের মুখে কথা সরে না। না জেনেই সে শ্যামাদাসের হয়ে কোকেন পাচার করছে।

—'কী রে, বুঝলি তো এবার কী সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছিস তুই? আচ্ছা, বল দেখি, আজ শ্যামা এইরকম ক-টা প্যাকেট এনেছে?'

একটু ঢোঁক গিলে ভবেশ বলে— 'চারটে। ...না না ছ-টা। আমার সাইকেল পামচার হয়ে গিয়েছিল বলে আমি আবার শ্যামাকাকুর বাড়িতে ঢুকেছিলাম। তখন শ্যামাকাকুর বিছানায় আরও দুটো প্যাকেট দেখেছি। মনে হয়, শ্যামাকাকু ওগুলো তার ব্যাগে ঢোকাতে যাচ্ছিল।'

—'হুম, আচ্ছা, নরেশ তো তোর কাকা। তা সে কি জানে শ্যামা যখন নিজে কলকাতায় যায়, তখন সে ক-টা প্যাকেট আনে?'

—'আমি গেলে চারটে প্যাকেট আনি আর শ্যামাকাকু গেলে ওই চারটে প্যাকেটই আনে বলে তো আমরা জানি। কিন্তু আজ সে দুটো প্যাকেট বেশি এনেছে।'

—'বেশ, তোকে যে টাকার খামটা দিয়েছে শ্যামাদাস গুনে দেখ তো তাতে কত টাকা আছে। আগে কখনো গুনে দেখেছিলিস?'

—'হ্যাঁ, একবার দেখেছিলাম। তবে আর কখনো গুনে দেখিনি। কিন্তু খামটার মুখটা আটা দিয়ে আটকানো আছে যে।'

—'ঠিক আছে, খুলেই দেখ না। আবার না হয় আটকে দেওয়া যাবে।' বলে লোকটা সাবানটা আবার কাগজে মুড়ে নিজের পকেটে ঢোকায়।

জিভের লালা দিয়ে ভিজিয়ে খামের মুখটা সাবধানে খুলে ভেতরের টাকাটা গুনে ভবেশ অবাক হয়ে যায়। বলে— 'আরে, এখানে তো অনেক অনেক বেশি টাকা আছে দেখছি।'

—'তাহলেই বুঝলি তো শ্যামা তোকে দিয়ে বেশি টাকা পাঠাচ্ছে যাতে সে নিজে পরের বারে আরও বেশি প্যাকেট আনাতে পারে। চারটে প্যাকেটের লাভের টাকা দিয়ে খরচ-খরচা চালাবে, আর বাকি দুটোর টাকা দিয়ে...বুঝতেই পারছিস। আচ্ছা আর একটা

কথা বল তো, শ্যামা কতদিন পরে পরে নিজে কলকাতায় যায়, যেমন কাল গিয়েছিল আর কী?'

—'মাসে একবার কী কখনো দু-বার তো যায়ই। মনে হয় মালের বন্দোবস্ত করতেই যায়।' খামের মুখটা আবার আটকাতে আটকাতে বলে ভবেশ।

—'তাহলে একটা কথা ভেবে দেখ, তোকে যখন মাসে দু-তিনবার কলকাতায় যেতে হয়, তখন নিশ্চয়ই ওর কলকাতায় একটা পাকা বন্দোবস্ত করা আছে।' ভবেশের ব্রেনটা আরও ওয়াশ করতে থাকে নাম না জানা লোকটা। তাই বলতে থাকে— 'তাহলে মাঝেমধ্যেই ও নিজে কলকাতায় যায় কেন? তোকে দিয়ে কাজটা করালেই তো পারত। আসলে এই সাবানের ব্যবসার আড়ালে ও আরও একটা ধান্দা চালায়। সেটা তোদের জানতে দিতে চায় না। কিন্তু আমি জানি সেকথা। সেটা পরে কখনো তোকে বা তোর কাকাকে বলব। এখন বাড়তি লাভের টাকা দিয়ে শ্যামা কী করে তা যদি জানতে চাস, তাহলে আমার সঙ্গে আয়রে কলুর বলদ। আর যা দেখবি সেটা তোর কাকাকেও বলবি। নে, এখন দেখবি তো চল। কাল আমি সব ঘুরে, দেখে ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছি। আয় তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে সেখানে।'

দু-জনে হনহনিয়ে ফিরতি পথ ধরে।

কুমোর গলি ধরে দু-জনে এগোতে এগোতে লোকটার ইঙ্গিতে তারা দাঁড়িয়ে যায় একটা গলির সামনে। ভবেশের দ্বিধা দেখে লোকটা বলে— 'কী রে আয়, ভেতরে যেতে হবে। ভয় লাগছে নাকি?' ইচ্ছে করেই ভবেশকে এই খোঁচাটা দেওয়া যাতে তার দ্বিধা আর ভয় দুটোই কেটে যায়।

গলির মুখে একজন এই শীতের রাতেও গাঁদা আর রজনীগন্ধার মালা বিক্রি করছে। এই গলিতে যে বাবুরা আসে তাদের কাছ থেকে ভালোই দাম পায় সে। বাবুরা হাতে সেই মালা জড়িয়ে এগিয়ে যায় গলিপথ ধরে। শুধু পেছনে ছেড়ে যায় এক এক রকমের আতরের গন্ধ। গলিটা বেশ অন্ধকার। তবু কোনো কোনো খোলা দরজা থেকে হ্যারিকেনের এক এক ফালি ম্লান আলো ঠিকরে পড়ে গলিপথের ওপরে। এ যেন অন্ধকার পথে যাবার জন্যে আলোর প্রলোভন। আবার কোনো দরজা বন্ধ হলে সেই আলোটুকুও হারিয়ে যায়। পথের সেই অংশটুকু তখন আবার প্রলোভনের আলোর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে থাকে। আলো-আঁধারীতে এক আদিম রোমাঞ্চকর নেশার মাখামাখি চলে এই গলিতে।

ঘরটা এই লাইনের একেবারে শেষপ্রান্তে। ভবেশ তো ভাবতেই পারছে না তার শ্যামাকাকু এত রাতে এইরকম একটা জায়গায় এসে থাকতে পারে। ঘরটার একপাশে আর পেছনদিকে খানিকটা খোলা জায়গা রয়েছে। তারা দু-জনে ঘরটার পেছনে যায়। সেখানে কুয়োতলা। কুয়োতলার দিকে ঘরের জানলাটাও বন্ধ। শীতের জন্যে? নাকি এটাই এখানকার দস্তুর? লোকটা এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরের দেওয়ালের গা ঘেঁষে শুইয়ে রাখা একটা মই তুলে দাঁড় করিয়ে সাবধানে সেটা হেলিয়ে দেয় ঘরের টালির চালে।

লোকটা কি মইটা কাল এখানে রেখে গিয়েছিল? নাকি এটা এখানেই পড়ে থাকে? — মনে মনে ভাবে ভবেশ।

লোকটা উঠতে থাকে মই বেয়ে। টালির ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে নিঃশব্দে সরিয়ে দেয় একটা টালি। সেই ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরের একফালি আলো এসে পড়ে তার মুখে।

তারপর সাবধানে নীচে নেমে এসে সে ভবেশকে ফিসফিসিয়ে বলে— 'চুপিসাড়ে উঠে যা। দেখ ভেতরে তোর শ্যামাকাকু কী করছে। দেখিস, একদম আওয়াজ যেন না হয়। সাবধান।'

ভবেশও লোকটার মতো করেই নিঃশব্দে উঠে পড়ে মইটার ওপরে। তার হাতের ব্যাগটা নিয়ে একটু অসুবিধে হচ্ছে। প্রথমে সে ভেবেছিল যে ব্যাগটা লোকটাকে ধরতে দিয়ে সে ওপরে উঠবে। কিন্তু সে ওপরে ওঠার পরে লোকটা যদি মইটা সরিয়ে দিয়ে তার ব্যাগটা নিয়ে পালায়? তাই সে ব্যাগটা হাতেই রেখেছে। কিন্তু সাবধানে ওপরে উঠে টালির ফাঁকে চোখ রাখতেই সে বুঝে যায় লোকটার কথা একশোভাগ সত্যি। ভেতরের সবকিছু পরিস্কার দেখা যাচ্ছে আর সান্নাটা শীতের রাতের জন্যে ভেতরের কথাও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

শ্যামাকাকুর ব্যাগটা খাটের ওপরে রাখা। তার ভেতরে রাখা দুটো প্যাকেটের আভাষ বেশ বোঝা যাচ্ছে। খাটের ওপরে বসে একটা বাচ্ছাকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে শ্যামাকাকু গ্লাসের পানীয়তে চুমুক দিল। তার পাশে বসা বছর ত্রিশের এক মহিলা। সেও তার পানীয়র গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে।

শ্যামাকাকু বলছে— 'জানো রসু, কাল কেউ একজন মিষ্টির দোকানে আমার পৈতৃক বাড়ির খোঁজ করছিল। সে নাকি আমাদের ভিটেটা কিনতে চায়।'

—'তা ভবা কি তাকে বাড়ি দেকিয়ে দেচে?' নিজের নাম শুনে কেমন যেন একটা শিরশিরানি লাগে ভবেশের।

—'না, তা দেখায়নি বটে। ও চালাক চতুর ছেলে। বলবে না। তবে...।' বাচ্চাটা শ্যামাকাকুর গাল টিপছে।

—'তবে কী গা?'

—'আমি ভাবছি, যে খোঁজ করছিল সে কে? অন্য দলের লোক? নাকি পুলিশ?'

—'পুলিশ তো তোমায় ঘাঁটাবেনি। বলি, তারা তো মাসোয়ারা পায়; নাকি?'

—'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ রসময়ী। আমারও মনে হচ্ছে অন্য কোনো দলের লোক। আমার ব্যবসাটার বারোটা বাজাতে চায়। মনে হয় আমার বাড়িটা ওদের নজরে পড়ে গেছে।' গ্লাসে আবার চুমুক দেয় দু-জনে।

—'তাইলে তো তোমায় অন্য কোতাও ব্যবস্তা কত্তে হয়। তা নতুন জায়গা খুঁজে পেইচো?'

—'না গো রসু, সেটারই সন্ধানে আছি। দু-চার দিনের মধ্যেই একটা ঠেক তৈরি করতে হবে। সেখানে তোমাদেরও নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে তো।'

এই বলে শ্যামাকাকু বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে দেয় খাটে। বাচ্চাটা বলে ওঠে— 'বাবা, তোমার বন্দুকটা দাও না। আমি পুলিশ পুলিশ খেলব।'

মহিলা বলে— 'না বাবা ওসব ধত্তে নেই। এই নাও তোমার বন্দুক।' বলে একটা টিনের খেলনা পিস্তল দেয় তার হাতে। বাচ্চাটা সেটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে।

—'তা রসু, বলি আজ কী রেঁধেছ?'

—'শীতের দিন। তাই আর ভাত করিনি। নুচি, ফুলকপির তরকারি আর কষা মাংস করিচি।'

শ্যামাকাকু তার গালে আদরের চাপড় মেরে বলে— 'এই না হলে আমার রসময়ী। রসে একেবারে টইটুম্বুর।'

রসময়ীও আদুরে হেসে তার হাত ধরে সেটা নিজের গালে চেপে ধরে বলে—'আমার বুড়োই বা কম কীসে? সে তো এক্কেরে গরম জিলিপি। প্যাঁচে প্যাঁচে রস।'

দু-জনেই হেসে ওঠে। এমনসময় বাচ্চাটা পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে বলে— 'বাবা, বাবা, আমি তোমায় গুলি করছি। তুমি বেশ মরে যাবে, অ্যাঁ।'

—'আচ্ছা কর।' বলে বাচ্চাটার গালে আদরের চাপড় মারে।

—'গুরুম।...গুরুম।...গুরুম। এবারে পড়ে যাও।'

ভবেশের শ্যামাকাকু লাশের মতো চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে খাটের ওপরে। আর তখনই তার নজরে পড়ে— টালির ছাদে ঘরের আলোয় দেখা যাচ্ছে একটা মুখ আর ওই মুখটা তার বড্ডো বেশি চেনা।

ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে ভবেশ লাফ মারে চালের ওপর থেকে। কালো প্যান্ট-শার্ট পরা লোকটা আর সে দৌড় লাগায় গলিপথ ধরে।

এদিকে শ্যামাদাস উঠে বসে ঠান্ডা গলায় রসময়ীকে বলে— 'রসু, নগাই এখন কোথায়?'

—'ও তো এখন ফুলমতীর ঘরে।'

—'ওকে একবার ডাকো তো শিগগিরই। জরুরি দরকার। আর ব্যাগটা তোরঙ্গে ঢোকাও।'

সবে সূর্য উঠছে। হাওড়া থেকে আসা দ্বিতীয় ট্রেনটা কুয়াশার জন্যে বেশ ধীরে ধীরে আসছিল। এইসময়ে লাইনে চিড় ধরে। আবার অনেকসময় মানুষজনও লাইনের ধারে প্রাতঃকৃত্য সারতে বসে। তাই ড্রাইভার বারে বারেই হর্ন বাজাচ্ছিল। ট্রেনের হর্ন শুনতে পেলেই গাড়ু হাতে নিয়ে লাইন ছেড়ে উঠে যায় তারা। ওইতো, ওই যে একজন এখনও লাইনে বসে। কালা নাকি রে বাবা! হর্ন শুনেও উঠে যাচ্ছে না। স্টেশন এখনও আধমাইল দূরে। দূর হতচ্ছাড়া সর না— মনে মনেই বলে ড্রাইভার। সে আবারও হর্ন দেয়। কিন্তু লোকটা সরছে না।... আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে লোকটা। তাই বাধ্য হয়েই ব্রেক কষে সে। গাড়ি খানিক এগিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ব্রেকের আওয়াজ তুলে দাঁড়িয়ে যায়।

নিজের কেবিন থেকে নেমে লোকটার দিকে এগিয়ে যায় ড্রাইভার। দশ-বারো গজ দূর থেকেই ব্যাপারটা বুঝে যায় সে। কাছে এগিয়ে যেতে থাকে। অন্ধকার আর কুয়াশার জন্যে দেখতে না পেয়ে প্রথম ট্রেনটা মনে হয় রানওভার করেছে।

কাছে গিয়ে দেখে লাশের বয়স বেশি নয়। যদিও শরীরের ওপরের অংশ ট্রেনের ঘসায় থেঁতলে গেছে, তবুও শরীর আর পোশাক দেখলে বোঝা যায় বড়োজোর উনিশ-কুড়ি হবে। এবারে সামনের স্টেশনে খবর পাঠাতে হবে। তাই কোটের পকেটে রাখা হুইশিলটা বের করে জোরে জোরে তাতে বারবার ফুঁ দেয় সে, সহকারী চালক আর গার্ডের উদ্দেশ্যে। সামনের স্টেশনমাস্টারও হয়তো শুনতে পাবে এই শব্দ।

বিপদের সংকেতধ্বনি যে বহুদূর থেকেও শোনা যায় এই শীতের সকালে।

হুগলির পৈতৃক বাড়িতে সকালবেলা ঢোকে শ্যামাদাস। রসময়ীর কাছে লোক এসে প্যাকেটদুটো নিয়ে যাবে। কাজেই সেসব নিয়ে ভাবার কিছু নেই। এখন শুধু দেখতে হবে কে বা কারা তার পেছনে পড়েছে, আর সেইমতো ব্যবস্থা নিতে হবে। আপাতত আগে চান করতে হবে। তারপরে ফিরতে হবে গ্রামে। তাই সে কাচা পাঞ্জাবি-পাজামা আর গা মোছার জন্যে গামছাটা ভবেশের সাইকেলের ওপরে রেখে উঠোনের একধারের টিউবওয়েলের দিকে এগোতে যায়। আর তখনই ক্যারিয়ারে গামছার টান লেগে উলটে পড়ে সাইকেলটা। সেটাকে আবার সোজা করে রাখতে গিয়ে একটা শক্ত কিছু পড়ে পায়ের তলায়। 'উঃ' বলে পা-টা তুলতেই একটা সোনালি রঙের ধাতব জিনিস নজরে পড়ে তার। ঝুঁকে সেটা হাতে তুলেই বুঝতে পারে যে সেটা সাইকেলের টায়ারের ভালভ টাইট রাখার প্যাঁচ কাটা পিতলের অংশটা। সেটাকে জায়গায় লাগাতে গিয়েই সে বুঝতে পারে যে ভবেশের সাইকেলের টায়ার পাংচার হয়নি। এইটা খুলে গিয়ে হাওয়া বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কেউ না খুলে দিলে এমনি এমনি তো আর ভালভ খুলে যায় না? ভবেশ তো খোলেনি। সে তো ভেতরেই ছিল। তাহলে কে হাওয়া খুলল? আর আরও একটা প্রশ্ন— ভবেশকে কে রসময়ীর ঘর চেনাল? আচ্ছা, তাহলে কি মিষ্টির দোকানে আসা লোকটাই এসব করেছে? সেজন্যেই কি কাল রসময়ীর ঘরে যাবার সময়ে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বারবার সতর্ক করে দিচ্ছিল?

তার চান মাথায় ওঠে। দাওয়ায় ওঠার সিঁড়িতে বসে ভাবতে শুরু করে— বিষ্টু ঘাড় ভেঙে মরেছে। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট বলছে কোনো ভারী বস্তুর আঘাতে তার মৃত্যু হয়নি। অথচ ঘাড় ভাঙতে গেলে জোরালো আঘাত করতেই হবে। আবার দিনেশও নাকি গ্রামছাড়া। কিন্তু সকলে যা ভাবছে তা ঠিক নয়, কারণ তার চশমা পড়েছিল তার দাওয়ায়। পুলিশ নিজেদের পিঠ বাঁচাতে যাইই বলুক না কেন, দিনেশকে লোপাট করে দেওয়া হয়েছে— কারণ বিষ্টু আর দিনেশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিশির ডাক। দু-ক্ষেত্রেই নিশির ডাকের গলা কিন্তু দিনেশের। আবার সেই নিশি কিন্তু তাকেও চেনে। নইলে সে দিনেশের মায়ের ডাকে তার নাম বলত না। তাহলে ওই মিষ্টির দোকানে আসা লোকটাও কি সেই নিশিই? কিন্তু তার কপালে তো জড়ুল ছিল? আর কপালে জড়ুল আছে এমন কাউকে তো সে চেনে না। তাহলে... তাহলে...? অবশ্য সে একটা আন্দাজ করেছে। কিন্তু সে যা আন্দাজ করছে তা কি ঠিক? তাহলে তো একবার টোপ ফেলে দেখতেই হয়।

শ্যামাদাসের টোপ, রাহার কৈফিয়ৎ আর জাদুঘরের নিশি

সাতসকালেই কানাইয়ের গলা। দরজা ধাক্কা দিচ্ছে সে। হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকছে—'স্যার, স্যার। দরজা খোলো, দরজা খোলো শিগগির।'

শীতের সূর্য সবে উঠছে। চারিদিকে গাছপালার মাথায় মাথায় কুয়াশা ধোঁয়ার মতো বয়ে যাচ্ছে। একটু দূরের গাছ, গ্রামের ঘরবাড়ি, সব অদৃশ্য কুয়াশার জাদু-চাদরে। একটু বেলায়

রোদ উঠলেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে সেই চাদর। আবার দেখা যাবে গাছপালা, ঘরবাড়ি, নদী, সবকিছু।

একটা চাদর গায়ে চাপিয়ে দরজা খোলে রজনী। বলে— 'কী হয়েছে রে?'

—'স্যার, সুরেশ কাকা কাল রাতে তোমার এখান থেকে বেরিয়েছিল তো। কিন্তু সারারাত সে বাড়ি ফেরেনি।

একটা ঝটকা লাগে রজনীর। বলে— 'তুই কী করে জানলি?'

—'আমি মাঠে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে সুরেশ কাকার ছেলেদের গলা শুনতে পাই। বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিল তারা। তখন আমি তাড়াতাড়ি পুকুরঘাট হয়ে ওদের বাড়ি যাই। সেখানেই শুনলাম রাতে সুরেশ কাকা নাকি বাড়ি ফেরেনি। তাই আমি সোজা তোমার কাছে এলাম। তুমি একবার তাড়াতাড়ি চল স্যার।'

সত্যি তো, সুরেশ কাকাকে সে ছোটোবেলা থেকে দেখছে। কোনোদিন এইরকম করেনি। তবে বয়স হয়েছে। অজ্ঞান হয়ে কোথাও পড়েটড়ে যায়নি তো? তাই কানাইকে সে বলে— 'একটু দাঁড়া। মুখে চোখে জল দিয়ে আসি।'

সুরেশ কাকার বাড়ি রজনীর বাড়ি থেকে মূল রাস্তা ধরে গেলে মাইলখানেক মতো হবে। কিন্তু রজনীর বাড়িতে সে যাওয়া আসা করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা শর্টকাট পথ ধরে, জ্বালানি কুড়োতে কুড়োতে। তাই রজনী ঠিক করলে মূল রাস্তা নয়, তার বাড়ির পাশের জঙ্গলের রাস্তাই সে ধরবে। সুরেশ কাকার কিছু যদি হয়ে থাকে, তাহলে সেটা এইপথেই হয়ে থাকবে। যদিও এতদিন কিছু ঘটেনি, তবু কেন জানি না আজ রজনীর মন কু-ডাক ডাকছে। তাই জঙ্গলের পথটাই ধরে সে। পেছন পেছন আসতে থাকে কানাই।

প্রায় পৌনে এক মাইল যেতেই সরু জংলা পথের ওপরেই তাদের নজরে পড়ে একটা সাদা কিছু। দৌড়ে যায় সে। পেছনে ছুটে আসে কানাই। কিন্তু এ কী দেখছে তারা? উপুড় হয়ে পড়ে থাকা সাদা ধুতি আর চাদরে মোড়া শরীরটাকে চিনতে ভুল হয় না তাদের। তাই রজনী কানাইকে বলে— 'যা, তাড়াতাড়ি গিয়ে কাকার ছেলেদের খবর দে।' শুনেই কানাই দৌড় লাগায়।

রজনী ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। সুরেশ কাকার মাথাটা একপাশে ফেরানো। শুধু চাদরে একটা ফুটো। ভালো করে লক্ষ্য করলে ফুটোর চারপাশে খুব হালকা সুতো পোড়ার দাগ দেখা যায়। চাদরের তলা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে শুকনো মাটির খানিকটা জায়গা কালো হয়ে গেছে। খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ে আছে হাতের টর্চটা; ম্লান হয়ে প্রায় নিভু নিভু। পাছে আঙুলের ছাপ পড়ে, তাই নিজের এক পরত চাদরের ওপর দিয়ে সুরেশ কাকার হাতের রাডিয়াল পালস আর ঘাড়ের ক্যারোটিড পালস পরীক্ষা করে দেখে। নাঃ, নাড়ি কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না রজনী। সে তো জানেই যা হবার তা হয়েই গেছে। কেউ গুলি করেছে এই নিরীহ, সৎ, বৃদ্ধ মানুষটাকে। কিন্তু কই, কাল রাতে তো কোনো গুলির শব্দ শুনতে পায়নি সে। অবশ্য সুরেশ কাকা বেরোনোর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে খেতে বসে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে সুরেশ কাকার এতটা পথ আসতে সময় লাগার কথা মিনিট কুড়ি। তারমানে রজনী যখন টিউবওয়েলে বাসন ধুচ্ছিল তখনই কেউ গুলিটা চালিয়ে থাকবে। তাই সে আওয়াজটা শুনতে পায়নি। আর আততায়ী গুলি চালিয়েছে অন্ততঃপক্ষে হাত দশ পনেরো দূর থেকে।

প্রাথমিক অনুসন্ধান করার পরে রজনী থম মেরে যায়। মনে হয় পায়ে যেন তার জোর নেই। আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়ে সে। থরথর করে কাঁপছে তার শরীর এক অব্যক্ত

ব্যথায়। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না যে তার সুরেশ কাকা আর নেই। ছোটো থেকেই দাদু নিশিকান্ত ছাড়া এই সুরেশ কাকার সাথেই তার সখ্যতা ছিল বেশি। এদের সাথেই ধীরে ধীরে বড়ো হয়েছে সে, আর এরা ক্রমে হয়েছে বৃদ্ধ। কত প্রশ্রয়, কত স্নেহ দিয়েছে তাকে। গ্রীষ্মকালে এনে দিয়েছে কচি তালের শাঁস, বর্ষায় এনেছে ঝড়ে খসে পড়া বাবুই পাখির বাসা, আবার এমনই শীতের সাতসকালে এনে দিয়েছে ঠান্ডা খেজুর রসের কলসি। আবার তার মা মারা যাবার পরে এই সুরেশ কাকাই দিনের পর দিন প্রখর রোদ, ঝড়বৃষ্টি আর শীতের ছোবলকে উপেক্ষা করে বাজার করে এনেছে, রান্না করে দিয়েছে তাদের। এমনকী তার জন্মদিনেও তার মুখে তুলে দিয়েছে পায়েসের বাটি।

কয়েক বিঘা জমির ফসলের ভাগের বদলে সে যা করেছে তা কি শুধুই কৃতজ্ঞতা? তাতে কি ছিল না স্নেহ আর ভালোবাসার আকুল আবেগ?... না, আর পারছে না রজনী নিজেকে ধরে রাখতে। তার এতক্ষণের বুকে জমে থাকা তীব্র ব্যথাটা এবার গলতে শুরু করেছে আর তা চোখের কোল বেয়ে ঝরে পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে তার বুকের চাদর।

কতক্ষণ যে সে সেখানে বসেছিল তা সে জানে না। এদিকে বনের সরু পথ ধরে আসতে শুরু করেছে সুরেশ কাকার পরিবারের লোকজন আর গাঁয়ের কিছু মানুষ। তারা এসে জড়ো হয় সুরেশ কাকার পাশে। এতক্ষণে হুঁশ ফেরে রজনীর। উঠে দাঁড়িয়ে চাদর দিয়ে চোখ মুছে একপাশে সরে দাঁড়ায় সে। কানাই এসে আঁকড়ে ধরে তাকে। এত কাছ থেকে প্রিয়জনের মৃত্যু কখনো দেখেনি ওই বাচ্চাটা। তাই সে আশ্রয় খুঁজতে আঁকড়ে ধরেছে তার স্যারকে। রজনীও তাকে আঁকড়ে ধরে। এখন কানাই ছাড়া আপন বলতে আর তো কেউ রইল না তার এই দুনিয়ায়। সে একটু দূরেই সরিয়ে নিয়ে আসে কানাইকে। নিজের শরীর দিয়ে তার চোখ থেকে আড়াল করার চেষ্টা করে সুরেশ কাকার দেহটাকে। কিন্তু এভাবে কি আর মন থেকে আতঙ্ক আর ভালোবাসার কষ্টকে দূরে রাখা যায়? তবু দু-হাতে সে চেপে জড়িয়ে ধরে কানাইকে। তার বুকের কাছে কানাইয়ের মাথাটা নিয়ে পরম স্নেহে হাত বোলাতে থাকে। প্রিয়জনের সান্ত্বনা অনেক সময় দূরে সরিয়ে দেয় ভয় আর কষ্টকে। আর তাই বুঝি কানাই একটু পরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে ওঠে— 'স্যার, সুরেশ কাকাকে নিশিতে ডাকেনি। তাই ন্যা স্যার?'

রজনী কানাইকে আরও আঁকড়ে ধরে বলে— 'না, আমাদের সুরেশ কাকাকে কখনো নিশিতে ডাকতে পারে না।'

—'কী ব্যাপার বলুন তো রাহাবাবু, আপনার এলাকায় তো কোনো অশান্তি ছিল না এতদিন। কিন্তু হঠাৎ দু-দুটো মার্ডার আর আরেকজন শাসপিশাসলি মিসিং। জানি আমার কাছে সরাসরি আপনার কারণ দেখানোর দরকার পড়ে না; কিন্তু একটা শান্ত থানার এলাকায় এত ঘন ঘন ক্রাইম ঘটাটা বেশ অস্বাভাবিক বলেই আমার মনে হয়েছে। তাই আপনাকে ডেকেছি।' টেবিলে রাখা কাগজগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ও.সি. জয়ন্ত রাহাকে বলেন ডি সি ডি ডি নির্মল সেন।

—'প্রথম মার্ডারটায় স্যার ভিক্টিমের ক্রিকয়েড কার্টিলেজ আর হাইওয়েড বোন দুটোই ভেঙে দিয়েছে মার্ডারার।'

—'সে তো রিপোর্টে দেখতেই পাচ্ছি।'

—'সেটাই তো মিস্ট্রি স্যার। কোনো স্ট্রাংগুলেশনের চিহ্ন নেই। কোনো ভারী উইপনসও পাওয়া যায়নি। অথচ ঘাড় ভাঙা।'

—'আচ্ছা, তাহলে বলুন, ওই মিসিং ছেলেটা... কি যেন নাম... হ্যাঁ, দিনেশ। তা দিনেশের কি কোনো খোঁজ পেলেন?'

—'না স্যার, আমি ওকে গ্রাম ছাড়তে বারণ করেছিলাম। তবু সে বেপাত্তা। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আমরা তার খোঁজ পাইনি। হতে পারে সে পালিয়ে অন্য কোথাও আছে। আবার এমনও হতে পারে স্যার, যে ওই দিনেশই...।' তাকে থামিয়ে দেন নির্মল সেন।

—'আপনি তো দিনেশকে দেখেছেন, তাকে ইন্টারোগেটও করেছেন। তা তার শরীর স্বাস্থ্য কেমন? ওর পক্ষে কি কারোর ঘাড় ভাঙা সম্ভব বলে আপনার মনে হয়?'

—'না স্যার। পাতলা চেহারা। ওর পক্ষে কারোর ঘাড় ভাঙা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ওর চশমা থেকে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে সেটা ওর নিজেরই।'

—'সেটাই স্বাভাবিক। প্রথম কেসটায় বডি সারারাত জলে ডুবে থাকলে আর তার জিনিসপত্রে কেউ টাচ না করলে তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে না। তবে সেকেন্ড কেসটায় আমার একটা ডাউট আছে। আচ্ছা, দিনেশের পক্ষে কি রাত্তিরে গ্রামে ঢুকে ওই বুড়োকে শুট করা একান্তই অসম্ভব?'

—'কিন্তু স্যার, যদি ধরেই নিই যে দুটো মার্ডারই দিনেশের করা, তাহলেও তো দেখছি কেসদুটোর মোডাস অপারেন্ডিতে কোনো মিল নেই। আর তা ছাড়া দিনেশের ওই বুড়োকে শুট করার মোটিভ কী?'

—'ঠিক। দুটো মার্ডারের কোনোটাতেই মোটিভ স্পষ্ট নয়।'

—'স্যার একটা কথা বলব? আমার মনে হয় স্যার, দিনেশের ডুপ্লিকেট চশমা আছে।'

—'গুড গেস। তাহলে দিনেশ অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকলেও থাকতে পারে, বলছেন? ...ওয়েল, তাহলে একটা কাজ করুন। আপনি কি তার কোনো রিসেন্ট ছবি পেয়েছেন?'

—'না স্যার।'

—'কিন্তু আপনি তো দিনেশকে নিজের চোখে দেখেছেন। তার হাইটও মোটামুটি জানেন।... কি সেটা খেয়াল করেছিলে তো? নাকি...।'

—'হ্যাঁ স্যার। মনে হয় আপনি ওর পোর্ট্রেট পার্লে করানোর কথা বলছেন।'

—'ইয়ে, অ্যাবসোলিউটলি দ্যাট। তাই আপনি যাবার আগে ওটা নীচে আর্টিস্টের কাছ থেকে করিয়ে নিয়ে যাবেন। আর ফিরে গিয়ে সেটা ছাপিয়ে আশেপাশের টাউনের সমস্ত পাবলিক প্লেসে ছড়িয়ে দেবেন। বুঝলেন?'

—'হ্যাঁ স্যার, তবে লাস্ট কেসটায় একটা ক্লু পেয়েছি। রিপোর্টটা জাস্ট কালই পেয়েছি। তাই সেটা সঙ্গে নিয়েই এসেছি স্যার।' একটা খাম থেকে বের করে জয়ন্ত রাহা বাড়িয়ে ধরেন রিপোর্টটা।

—'কী দেখি?' রিপোর্টটার দিকে হাত বাড়ান ডি সি।

—'লাস্ট ভিক্টিমের বুকে যে বুলেটটা আটকে ছিল সেটা পয়েন্ট থ্রি টু বোরের কোল্টের। আর শুট করা হয়েছে পাঁচ-ছ গজ দূর থেকে।'

—'পয়েন্ট থার্টি টু কোল্ট? মানে আমরা পুলিশরা যেটা ইউজ করি?' ভুরু দুটো কুঁচকে যায় নির্মল সেনের। রিপোর্টটা পড়েন। তারপর একটু ভেবে স্বগতোক্তির মতো বলতে থাকেন— 'লাস্ট ভিক্টিমের মার্ডারারের হাতে ওই রিভলভার এল কোথা থেকে? এক হতে পারে, স্বদেশিরা কোথাও পুলিশের রিভলভার ছিনতাই করে থাকবে, আর বেশ কয়েক জায়গায়, এমনকী থানাতেও লুঠপাঠ করেওছে তারা। আর তারই একটা পেয়েছে ওই মার্ডারার। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা হল এই যে— সে সেটা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেছে। আর তিন নম্বর হল...।'

আগ্রহের সঙ্গে জানতে চান রাহা— 'আর তিন নম্বরটা কী স্যার?'

—'আপনার থানার আর্মস আর অ্যামুনিশনসের স্টক লাস্ট কবে মিলিয়েছেন?'

—'ছ-মাস আগে স্যার।'

—'তা এই ছ-মাসে তো অনেক কিছুই ঘটে থাকতে পারে। যাইহোক, আপনি স্টক মিলিয়ে ডিসট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারে সেই রিপোর্ট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জমা করবেন। ইটস ভেরি আর্জেন্ট।'

—'আচ্ছা স্যার।'

—'ঠিক আছে। আপনি এখন আসুন তাহলে। আমি দেখছি আর্মসের সাপ্লাই হল কীভাবে।'

—'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার' বলে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকে ডি সি-র ঘর ছাড়েন জয়ন্ত রাহা। উনি বেশ ভালোই বুঝতে পারেন যে প্রোমোশনের লোভে বেড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাইছেন ডি সি। তবে হ্যাঁ, থানার আর্মস আর অ্যামুনিশনসের স্টক মেলানোটা খুবই জরুরি, বিশেষত এই সময়ে।

সেদিন সন্ধে সাড়ে ন-টা নাগাদ নিখিলেশ মিত্র আর নির্মল সেনকে দেখা গেল নিজামের পর্দা ঢাকা কেবিনে। প্লেটে রাখা পরোটা দিয়ে কাবাবের একটুকরো মুখে পুরে নির্মল সেন বলে— 'হ্যাঁরে চাঁপাডাঙার খুনের খবরগুলো কভার করছিস তো ভালো করে? ভালো জিলিপি আছে কিন্তু।'

—আর বলিস না। আমাদের হুগলি ডিস্ট্রিক্টের যে করস্পন্ডেন্ট আছে সে তেমন এফিসিয়েন্ট নয় বুঝলি। খবর পাঠায়, তাও ভাসা ভাসা, ডিটেলও নেই তেমন। জমিয়ে যে কপি লিখব।...দূর দূর, এভাবে কাজ হয়?'

—'শোন নিখিল, আজকে ওখানকার ওসি জয়ন্ত রাহাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।'

খাবারে কামড় দিতে গিয়েও খবরের আঁচ পায় নিখিলেশ মিত্র। তাই সেটা প্লেটে রেখে রুমালে হাত মুছে ব্যাগ থেকে রাইটিং প্যাড আর পেন্সিল বের করে সে। তারপর বলে — 'হ্যাঁ, এবারে বল।'

হেসে ফেলে নির্মল। বলে— 'একেই বলে ছুঁকছুঁকে রিপোর্টার। যাইহোক, এবার শোন আর যা নোট করার কর। আমি বলে যাচ্ছি এক এক করে।'

—'একটু আস্তে বলিস।'

—'কেন? তুই তো শর্টহ্যান্ডে নোট করবি। আচ্ছা নে, আস্তে আস্তেই বলছি। তবে খাবার খেতে খেতে লেখ, নইলে ওটা ঠান্ডা হয়ে যাবে।'

তাই কাবাব-পরোটায় কামড় দিয়ে এক বন্ধু বলতে থাকে আর নোট নিতে থাকে অন্যজন। রিপোর্ট থেকে যতটা জেনেছে ততটাই আনুপূর্বিক বর্ণনা করে নির্মল আর খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে লিখে চলে নিখিলেশ।

সবটা লেখা শেষ হলে নিখিলেশ বলে— 'আরে বাপরে! বিহাইন্ড দ্য কার্টেন এত্তো ঘটনা?'

—'হুঁ, তাহলে তো দেখছি তোদের কালকের টেলিগ্রাম একেবারে বাম্পার হিট হয়ে যাবে রে। এডিটর তো মনে হয় ডাবল প্রিন্ট ছাপাবে।'

—'তা হয়তো ঠিকই বলেছিস। বাড়িতে বসে জমিয়ে কপি লিখব আজ, তা সে যত রাত্তিরই হোক।'

—'হেডলাইন কি করবি? ভেবেছিস কিছু? নাকি পরে ঠিক করবি?'

—'ভাবা হয়ে গেছে রে। হেডলাইন দেব— ''চাঁপাডাঙায় নিশির ডাক''। পাবলিক একেবারে চেটেপুটে খাবে, বলে দিলাম।'

—'ওঃ, তোরা রিপোর্টাররা পারিসও বটে।'

—'ওরে, ওটাই তো আমাদের...ইয়ে...মানে ট্রেড সিক্রেট। তবে একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার।'

—'কী?'

—'রাইভ্যাল পেপার এসব খবর পেলে না...।'

—'সে তো নিশ্চয়ই। তবে তখন হয়তো দেখবি যে তারা হতাশায় এখানকার কোনো পেটি খুনের কেস নিয়ে না হেডলাইন করে বসে— 'কলকাতায় নিশির হানা'। তবে এইরকম মারকাটারি হেডলাইন হলে পাবলিক টোপ না গিলে যাবে কোথায়?'

—'তা যা বলেছিস। অসম্ভব কিছুই নয়। নয়কে হয় করাই তো এই লাইনের রেওয়াজ। আরে বাবা, এটাও তো একটা ব্যবসা। আমরা যা খাওয়াব, পাবলিক তাই খাবে। ওইসব 'সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতা' হচ্ছে স্রেফ কথার কথা। আসল কথা হল খবর বেচা। ''নিউজ'' আসলে একটা কোমোডিটি, তুই তো সেটা ভালো করেই জানিস।'

—'জানি, জানি, তোদের ''ইয়েলো জার্নালিজম'' এর কথা আমি ভালোই জানি। অনেক সময় স্রেফ টেবিলে বসেই খবর লিখিস তোরা। উড়োকথা শুনেই খবর বানিয়ে ফেলতে জুড়ি নেই তোদের। মানতেই হবে, যেকোনো গল্পকারও হার মানবে তোদের কাছে।'

হা হা করে হেসে ওঠে দুই বন্ধু।

শীতের কলকাতা। যুদ্ধের কলকাতা। রাত দশটার পরেই যেন অঘোষিত কার্ফু জারি হয়ে যায়। জেগে থাকে শুধু পুলিশ আর মিলিটারির গাড়ি আর জেগে থাকে নেড়িকুকুরের দল।

পার্ক স্ট্রিটের মুখটায় তবু দু-একটা মোটর গাড়ির দেখা মেলে। ওগুলোর বেশিরভাগই বড়লোকের জিভ জড়িয়ে যাওয়া ছেলেদের কিংবা কখনো বা কোনো মধ্যবয়স্ক লোককে

বার থেকে ঘরে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত। শুনশান চৌরঙ্গির ওপর দিয়ে দৌড়ে যায় তারা। তবে তাদের চলার আওয়াজে ঘুম ভাঙে না ফুটপাথে ইতিউতি গুটিয়ে শুয়ে থাকা মানুষদের।

তবে সেদিন ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। চৌরঙ্গি ধরে ধর্মতলার দিকে যাওয়া পুলিশের টহলদারি ভ্যানটা হঠাৎই দাঁড়িয়ে যায় মিউজিয়মের গেটের সামনে। গেটের একটা পাল্লা হাট করে খোলা কেন? চোর ঢুকেছিল নাকি? দু-জন কনস্টেবল আর একজন সাব-ইনস্পেকটর গাড়ি থেকে নেমে এগোয় সেদিকে। কিন্তু একী? একী দেখছে? আরে, এই পাগলটা তো রোজ মিউজিয়মের গেটের পাশেই বসে থাকে রাতে। কিন্তু আজ? চাবি সমেত তালাটা পড়ে আছে মাটিতে আর পাগলটা পড়ে আছে ফুটপাথে। কালচে রক্তের ধারা তার মাথা থেকে বেরিয়ে গড়িয়ে পড়েছে পাশের নর্দমায়। আর তার পাশে পড়ে আছে একটা উনুন ধরানোর শক্তপোক্ত চ্যালাকাঠ। সাব-ইনস্পেকটর দ্রুত খবর পাঠায় ওয়্যারলেসে।

কপি লিখে রাত দু-টোয় শুতে গিয়েছিল নিখিলেশ মিত্র। সকাল ছ-টা নাগাদ মাথার পাশে রাখা টেলিফোনটা ঘুম ভাঙিয়ে দেয় তার। ঘুম জড়ানো গলায় 'হ্যালো' বলতেই শুনতে পেল নির্মল সেনের গলা।

ফোনে ভেসে আসে— 'মিউজিয়মের সামনে চলে যা। ওখানে তোর নিশির ডাকের একটা স্যাম্পেল পাবি। সে ওখানে একটা পাগলকে মমি বানিয়ে দিয়ে গেছে কালকে রাতে।' ফোনটা কেটে দেয় নির্মল সেন।

তবে সেদিন সন্ধেবেলা কলকাতার মোড়ে মোড়ে টেলিগ্রাম হকাররা জাঁকিয়ে হাঁকছিল — 'খুন, খুন... চাঁপাডাঙা আর কলকাতায় নিশির ডাকে খুন।' আর অফিস ফেরত লোকেরা হামলে পড়ে কিনছিল সত্যসংবাদের সেই টেলিগ্রাম।

আসলে তারা তো কেউ জানে না রজনীর শোনা মুক্তোরামের 'সমন্যামবুলিজম'-এর কাহিনি।

২০ ডিসেম্বর ১৯৪৪

সেনবাড়িতে আগুনখেলা

গতকাল একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। অকালবর্ষণ। তাই চারিদিকে স্যাঁতসেতে কুয়াশা। কিন্তু তার জন্যে রুটিনে ছেদ পড়েনি। আজ ঠিকসময়েই ছেলেরা এসে গেছে। তারা প্র্যাকটিস শুরু করার আগেই রজনীই তাদের জন্যে ছোলা-গুড়ের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। সুরেশ কাকা নেই। তাই বেশ একটু অসুবিধেই হয়েছে রজনীর। তবে রজনীর অনুরোধে কানাইয়ের মা খিচুড়ি রেঁধে রেখে গেছে। শীতকাল, তাই খিচুড়ি নষ্ট হবে না।

ছেলেরা যখন এসেছিল, তখন রজনী নিজের প্র্যাকটিস করছিল। ওরা আসতে ছোলা-গুড় দেবে বলে খানিকটা সময় থেমেছিল শুধু।

প্র্যাকটিস চলছে। আজ রজনীও তাদের সঙ্গে জোরকদমে প্র্যাকটিস করছে; বরং মনে হচ্ছে আজ একটু বেশিই রোখ তার। ছেলেরা তাকে এর আগে এত কঠোর অনুশীলন

করতে দেখেনি। আজ গাছের গায়ে তৈরি প্যাডে তার এক একটা কিক, পাঞ্চ আর ব্যাকহিল আছড়ে পড়ছে সজোরে। তাই মাঝে একটু থামতেই দলের সবচেয়ে সিনিয়র পল্টু বলে উঠল— 'দারুণ হচ্ছে স্যার, দারুণ।'

রজনী বললে— 'অনেকদিন পরে একটু বেশি গা ঘামাচ্ছি আজ। দেখে নিচ্ছি নিজের কী হাল।'

দুপুরে খাওয়ার আগে সে পল্টুকে বলে— 'শোন, বাড়ি যাবার আগে তুই, পটাই আর নেলো আমার সঙ্গে একটু দেখা করে যাস। বিশেষ কথা আছে।'

কানাই বলল— 'কী কথা স্যার?'

—'সেটা শোনার মতো বড়ো তুই এখনও হোসনি। যেদিন হবি, সেদিন নিজেই সব বুঝতে পারবি।'

রজনী আজ নিজের হাতেই সবাইকে পরিবেশন করে বলে— 'যার যা দরকার পড়বে নিয়ে নিবি। আমি এবারে তাহলে খেতে বসছি।'

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে পল্টু, পটাই আর নেলো রজনীর কথা মন দিয়ে শুনল। একান্তে। তারপরে মাথা নাড়িয়ে বললে—'ঠিক আছে স্যার পারব।'

—'তবে এই কথাটা কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও না জানে। এমনকী তোদের বাড়ির লোকও নয়। বুঝেছিস?'

—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার।'

রজনী তাদের হাতে কিছু পয়সা দিয়ে বলল— 'যা, এখন বাড়ি গিয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নে।'

ছেলেরা চলে গেলে সে মনে মনে ভাবে— পুলিন গেল, সুরেশ কাকা গেল। একে একে তার সব প্রিয়জন তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কানাইও তার সঙ্গে কলকাতায় যাবে। হ্যাঁ, প্রতি রবিবার তারা হয়তো এই গ্রামে আসবে, একসঙ্গে তাইকোন্ডো শিখবে, কিন্তু এই ছেলেরা কি সবাই এখনকার মতোই একসঙ্গে থাকবে?

দূরে থাকলে টান ক্রমশ কমতে থাকে আর কমতে কমতে সেই টানটা একসময় মিলিয়ে যায়। সেটাই কি হবে? তার এই ছেলের দল কি একটা সময় পরে তাকে ভুলে যাবে? ভেঙে যাবে তার প্রাণপাত করে তৈরি এই দলটা?... কোনো উত্তর খুঁজে পায় না সে। আসলে কেউই তো আর ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। সেইই বা তা দেখতে পাবে কীভাবে?

তিনদিন হয়ে গেল শ্যামাদাসকে কেউ দেখেনি গ্রামে। কিন্তু সেনেদের পোড়ো বাড়ির সামনে অন্ধকারে মিশে থেকে চোখে ঠুলির মতো চশমা পরা কালো মূর্তি জানে সে কোথায় আছে। তাই সে এখন বাড়িতে ঢোকার অকালবৃষ্টিতে ভেজা সরু পথটা পরীক্ষা করে দেখছে।

অন্ততঃপক্ষে খান পাঁচেক সাইকেল ঢুকেছে আর রয়েছে খান চারেক চটিজুতোর ছাপ। তারমানে আজ ভালোই লোক জড়ো হয়েছে সেনেদের ভিটেয়। তাহলে তো আর সোজাপথে ঢোকা যাবে না। ঢুকতে হবে বাঁকাপথে। কিন্তু কীভাবে ঢুকবে? সেটাই হদিস করতে থাকে সে। হঠাৎই খেয়াল করে যে জলার ধার থেকে উঠেছে যে আমগাছটা,

তারই একটা ডাল হেলে গিয়ে পড়েছে বাড়িটার ছাদের ওপরে। হ্যাঁ, ওটাই সবচেয়ে সুবিধেজনক পথ। এমনিতেই দোতলার সিঁড়িটা বাদে ছাদটার অবস্থা বেশ বিপজ্জনক। তাই ওখানে কেউই ওঠে না। তার ওপরে কাল বৃষ্টি হয়েছে। ছাদটার অবস্থা তাই আরও খারাপ হয়েও থাকতে পারে। কিন্তু বিপজ্জনক হলেও তার কাছে ওটাই একমাত্র সুবিধেজনক পথ।

তাই কালো মূর্তি তরতরিয়ে উঠতে থাকে ওই আমগাছ বেয়ে। যদিও গাছের ডাল বেশ পিছল হয়ে আছে, তবু তার হাতে আর পায়ে কাপড় জড়ানো থাকায় তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। একটু পরেই ঝুঁকে পড়া ডালটা থেকে ঝুপ করে ছাদে নেমে সাবধানে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির মুখে খানিক অপেক্ষা করে সে। শরীরে পৈতের মতো করে জড়ানো ল্যাসো আর বুমেরাংটায় হাত বুলিয়ে দেখে নেয়। তারপর সন্তর্পনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।

সিঁড়িটা গিয়ে শেষ হয়েছে বাড়ির একতলার একটা দাওয়ায়। সেই দাওয়া থেকে দু-ধাপ নামলেই মস্ত উঠোন। সিঁড়ির নীচের মুখ থেকে কয়েকপা দূরে সেই দাওয়াতেই পাশাপাশি বসে আছে দুটো চাদর গায়ে মানুষ। তাদের একপাশে একটা কলাপাতায় রাখা মুড়ি-চানাচুর আর তিনটে মাটির খুরি। পাশে রাখা দুটো কাঁচের বোতল। একটা জলের আর একটা দেশি মদের। তারা গল্প করছে আর মদের গন্ধে ম-ম করছে জায়গাটা। কালো মূর্তি অন্ধকারে মিশে শুনতে থাকে তাদের কথা।

—'আরে ব্যাটা মদনা সেই যে কাজ সারতে গ্যালো, একোনো এলনি।'

—'যা শালা বনবাদাড় চান্দারে। আমার তো ভয় হচ্চে লতায় না কাটে।'

—'লতায় কাটলি তো চেঁচাতো। তবে যাই বল মাইরি, এইভাবে টানা তিনদিন মুড়ি-চানাচুর দে মদ গিলতে ভাল্লাগে? শ্যামাদা আর একটু ভালো চাটের ব্যবস্তা করতি পাল্লোনি?'

—'একী তোমার হুগলি পেয়েচো চাঁদু, যে পাঁটার ছাঁটের চাট মিলবে? নরেশকা তো বল্লে ক-দিন সবুর করতে। তাপ্পর হাতে ট্যাকা নে ফিরে গে যত্তো খুশি গিলিস।'

—'তা ব্যাটাচ্ছেলে তিনজনের জন্যে রোজ মাত্তর একটা বোতল দেয়। এতে কি হয় বল দিকি?'

—'না, নরেশকা বলেচে যে বেশি নেশা করলে চলবেনি। তা নইলে সাপ ধরতে গে ব্যাং ধরবি।'

—'শালা, আমি তো ভেবেচিলাম মালটা কাল আসবে। বিষ্টি হচ্চিল। তা ব্যাটা এলোনি। খুব চালাক মাইরি মালটা। এলে তাড়াতাড়ি কাজটা মিইটে যেত।'

—'আজ কালের মদ্দে এসে পড়বে দেকিস। শ্যামাদা তো তাই বলেচে। একোন সে চার ফেলে বসে আচে মাচ ধরবে বলে। ...দুর শালা মদনার ক্যাঁতায় আগুন। দাঁড়া আরেট্টু ঢালি।'

ঠিক সেইসময়েই সাঁ করে ছুটে এল ল্যাসো। অব্যর্থ টিপে জড়িয়ে গেল কাছাকাছি বসে থাকা দু-জনের গলায়। একজনের মাথার পেছনে লাগল ভারী সীসের বলটা আর হ্যাঁচকা টানে দু-জনেই চিৎ হয়ে পড়ল দাওয়ায়। তাদের পা লেগে বোতলদুটো পড়ল গিয়ে বাঁধানো উঠোনে আর তার পরের মিনিটেই দুটো মারাত্মক চপে ছিঁড়ে গেল দু-জনের গলার কার্টিলেজ আর ভেঙে গেল ঘাড়ের হাড়। দুটোই নিকেশ এক্কেবারে।

কিন্তু ততক্ষণে উঠোনের উলটোদিকের কোণা থেকে বেরিয়ে আসছে মদনা। কালো মূর্তি তাড়াতাড়ি পড়ে থাকা দু-জনের গলা থেকে ল্যাসোটা খুলে নিয়ে একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে ফেলে নিজেকে। মদনা কাছে এসে দেখে বলে— 'যা বাব্বা, এর মদ্দেই শুয়ে পড়লি? তোদের বলেচিল না জেগে...ওঁ ওঁ।' কথা শেষ হবার আগেই ল্যাসো জড়িয়ে গেছে তারও গলায়। উঠোনে চিৎ হয়ে পড়েছে সে।

ওদিকে বোতল ভাঙার শব্দ আর মদনার কাতরানির আওয়াজ পৌঁছে গেছে ঘরে। নরেশ কাকা আর জনা তিনেক লোক বেরিয়ে পড়েছে। দেখে ফেলেছে তাকে। ঘর থেকে বেরিয়ে নরেশ কাকা দাওয়া ধরে দৌড়ে পৌঁছে গেছে সিঁড়ির মুখে। তার হাতে একটা রামদা। পালাবার পথ বন্ধ। এদিকে মদনা কিন্তু তখনও মরেনি। ল্যাসো জড়ানো গলা চেপে ধরে সে লুটোপুটি খাচ্ছে উঠোনে। এমনভাবে ল্যাসোটা জড়িয়ে গেছে মদনার গলায় যে কালো মূর্তি এখন সেটা ছাড়িয়ে নেবে তারও উপায় নেই। এদিকে যে তিনজন ছুটে আসছে তাদের একজনের হাতে তরোয়াল, একজনের ভোজালি আর অন্যজনের হাতে টাঙ্গি। তবু কালো মূর্তি চেষ্টা করে। তার হাতের বুমেরাং দিয়ে ছুটে আসা লোকটার তরোয়ালটা আটকে এক কিকে তাকে ধরাশয়ী করে দেয়। কিন্তু বাকি দু-জন এসে জাপটে ধরে তাকে। একজন পেছনে গিয়ে তার গলায় চেপে ধরে ভোজালি। নরেশ কাকাও রামদা হাতে নেমে আসে। নাঃ, আর পারল না সে। আসলে প্রতিহিংসা যখন চেপে বসে মাথায় তখন সূক্ষ্মবুদ্ধিগুলো দমে যায় সেই চাপে। আজ তারও তাই হয়েছে।

ততক্ষণে ঘরের দরজা হাট করে খুলে গেছে। ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে, তার সিল্যুয়েট অবয়ব দেখেই তাকে চিনতে পারে কালো মূর্তি। সে আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্যামাদাস রায়।

সেখানে দাঁড়িয়েই সে হাঁক দেয়— 'এই, ওর হাত-পা বাঁধ।'

নরেশ কাকা একজনের কাছ থেকে একটা দড়ি চেয়ে নিয়ে প্রথমে তার পা-দুটো বাঁধে। তারপর তাকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে তার হাতদুটো বাঁধতে থাকে পেছনে। তখনই কালো মূর্তি বুঝতে পারে যে তার কোমরের কাছে কিছু যেন ঢোকানো হচ্ছে। দূরে একটা হ্যারিকেন রাখা দাওয়ার ওপরে। উঠোনে এসে পড়া সেই ম্লান আলোতে নরেশ কাকা অস্ত্রধারী লোকগুলোকে বলে— 'এই তোরা অস্তরগুলো সরা দিকি। অস্তরের চোট এর শইরে যেন না থাকে। যা, সব অস্তরগুলো দাওয়ায় একজায়গায় রাক।' লোকগুলো তাদের অস্ত্রগুলো নিয়ে দাওয়ায় রেখে মদনার গলা থেকে ল্যাসো খুলে দেয়। সে তখন উঠোনে বসে গলায় হাত বুলোচ্ছে। শ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তার। আর তখনই কালো মূর্তি দেখে যে শ্যামাদাস এবারে এগিয়ে আসছে তার দিকে। তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে নরেশ কাকা বলতে থাকে— 'আগে আমার হিসেবটা মিইটে নিতে দাও শ্যামা। ও শালা আমার ভবেশকে মেরেচে। আগে সেই হিসেবটা মেটাই, তাপ্পর না হয় তুমি তোমার হিসেব নিকেশ কর। অ্যাই, কেউ ওকে তুলে দাঁড় করা।' শেষের কথাগুলো বলা ওই গুন্ডাগুলোকে।

দু-জনে তুলে দাঁড় করায় তাকে। তবে কালো মূর্তি ততক্ষণে বুঝতে পেরে গেছে যে এরা এখুনি তার ওপরে অস্ত্রপ্রয়োগ করবে না। তাকে মারবে অন্যভাবে আর তারপরে তার লাশ হয়তো ডুবিয়ে দেবে জলায়।

নরেশ কাকা এগিয়ে এসে তাকে বলে— 'কী রে শালা, ভবেশকে এইভাবে মেরিচিলি ন্যা?' বলে টেনে এক ঘুঁষি মারে তার পেটে। ব্যথায় সামনে খানিক বেঁকে যায় সে।

—'...নাকি এইভাবে?' বলে তার বুকের ওপরে সপাটে একটা লাথি হাঁকায়। কালো মূর্তি পড়ে যায় মাটিতে। ঠক করে তার মাথায় ঠুকে যায় তারই ল্যাসোর সীসের বলটা।

এবারে নরেশ কাকা পা দিয়ে ঠেলে তাকে উপুড় করে তার পাছার ওপরে বসে। কনুই দিয়ে কষে বেশ কয়েকবার আঘাত করে তার পিঠে। প্রচণ্ড রাগে বলে— 'আর এইভাবেও মেরিচিলি, ন্যা রে শালা?' কিন্তু নরেশ কাকা তো কই তেমন জোরে মারছে না! হালকা ব্যথার মধ্যেও কালো মূর্তি বুঝতে পারে যে শ্যামাদাসকে আড়াল করে নরেশ কাকা দুটো আঙুল দিয়ে টোকা মারে তার কোমরের কাছে। এটা নিশ্চয়ই কোনো সংকেত হবে। কিন্তু কীসের? যাইহোক, এখন তার কাজ শুধু আঘাত লাগার ভাণ করে যাওয়া আর ঠান্ডা মাথায় সুযোগের অপেক্ষায় থাকা। তাই প্রতিটা আঘাতেই ককিয়ে ওঠে সে।

দূরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে— 'সাবাস নরেশদা। চালিয়ে যাও। আর এই ছোকরারা, দেখে নে অস্তর ছাড়াই নরেশদা কেমন প্যাঁদাচ্ছে ব্যাটাচ্ছেলেকে। শালার সাহস কম নয়, একেবারে বাঘের গুহায় এসে ঢুকেছে। প্যাঁদাও, নরেশদা প্যাঁদাও...।'

শ্যামাদাসের মনে হয় যে নরেশদা বোধ হয় তাতে উৎসাহই পেল। সে তাই দাঁড়িয়ে উঠে পা দিয়ে লোকটাকে চিৎ করে ফেলে পাঁজরায় মারল সপাটে এক লাথি। 'উঃ মা গো' বলে ককিয়ে উঠল কালো মূর্তি। নরেশদা তারপর ঘুরে গিয়ে তার অন্য পাঁজরায় মারল আর এক লাথি। তাতে আবার ককিয়ে উঠল লোকটা।

—'এ্যাই, শালাকে খাড়া কর।' হুকুম দিল নরেশ কাকা। দু-জন তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল আবার। নরেশ কাকা বলে উঠল— 'এইভাবে আমার ভবেশও ''উঃ মা গো'', ''উঃ মা গো'' বলে চেঁচিয়েছিল।' আর তার পরেই দড়াম করে একটা ঘুঁষি আছড়ে পড়ল কালো মূর্তির চোয়ালে। লাগেনি তেমন, তবু টাল সামলাতে না পেরে সে আবার পড়ে গেল মাটিতে।

শ্যামাদাস সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ছদ্ম সহানুভূতি দেখিয়ে বলল— 'আ হা হা, কর কী, কর কী নরেশদা! আমার জন্যেও একটু খেলা বাকি রাখো। এই, ওকে উঠিয়ে বসা। গলায় জল দে। মরার আগে যে মুখে জল দিতে হয়, তাও কি জানিস না?'

একজন মদনাদের ওই মদ খাওয়ার মাটির খুরিটা করে জল নিয়ে এল। তাকে উঠিয়ে বসিয়ে জলটা খাওয়ালে। বিচ্ছিরি কটূ স্বাদ। মদের গন্ধ। তবু খেতেই হল বাধ্য হয়ে। তারপর সরে গেল নরেশ কাকা। কালো মূর্তি লক্ষ্য করলে যে সে দাওয়ায় রাখা অস্ত্রগুলোর পাশে গিয়ে বসল।

শ্যামাদাস সিগারেট টানছে। অন্ধকারে শয়তানের চোখ হয়ে জ্বলছে সেই আগুনটা। এবার সে এগিয়ে আসছে। কোনো তাড়াহুড়ো নেই তার মধ্যে। চোরাচালানের পাণ্ডারা বুঝি এতটাই ঠান্ডা মাথার হয়?

একদম কাছে এগিয়ে এসেছে শ্যামাদাস। এখন ইচ্ছে করলেই জোড়াপায়ের কিকে সে মাটিতে ফেলে দিতে পারে শ্যামাকে। কিন্তু তাতে লাভ?

শ্যামাদাস হাঁক দিল— 'এই, আমার ঘর থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে আয় তো। আমাদের এই অতিথির মুখটা দেখি ভালো করে।'

কেউ একজন ঘর থেকে লণ্ঠনটা এনে দিল। বাঁ-হাতে লণ্ঠনটা তুলে ধরে সে কালো মূর্তির চোখের চশমাটা তার কপালে তুলে দিয়ে বলল— 'বা...হ। এই তো আমাদের

নিশি...। থুড়ি, আমাদের রজনীকান্ত রায়। ও নরেশদা, এ যে আমাদের রজনী গো। এসো। এসো। চাঁদমুখটা শেষ দেখা দেখে যাও একবার।'

নরেশ কাকা উঠে এসে ভালো করে কালিমাখা মুখটা দেখে। বলে— 'হ্যাঁ তাই তো। এ তো দেকচি আমাদের রজনী গো। এইই তাইলে আমাদের পেচনে পড়েচে। নাও শ্যামা নাও, এবার ভালো করে তোমার হাতযশ দেকাও দিকি। একসময় তো ভালোই ঘুসোঘুষি কত্তে।' বলে সরে গিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। রজনীও জানে যে শ্যামাদাস একসময়ে বক্সিং লড়ত ভালোই। কলেজ চ্যাম্পিয়ন ছিল সে। ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও লড়েছে।

এবারে শ্যামাদাস একটা হাঁটু মেঝেতে রেখে লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখে মাটিতে। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে রজনীর মুখে। রজনী মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। আর তখনই শ্যামাদাস জ্বলন্ত সিগারেটটা চেপে ধরে তার বাঁ-উরুতে। 'উঁ উঁ' করে চাপা আওয়াজ বেরোয় রজনীর মুখ থেকে। দাঁতে দাঁত চিপে সে সহ্য করে জ্বালার যন্ত্রণা।

শ্যামাদাস বলে— 'এইটা বিষ্টুর জন্যে।... আর এইটা হল দিনেশের জন্যে' বলে আবার সিগারেটে টান মেরে সেটার আগুন চেপে ধরে রজনীর ডান উরুতে।

—'দিনেশকে আমি মারিনি।'

—'তবে সে কোথায় গেল রে শালা? তার মাকে আমার নাম বলেছিল কে?'

—'আমি জানি না।'

—'দ্যাখ, তুই যখন স্কুলে পড়তিস, তখন একবার স্কুলের ফাউন্ডেশন ডের ফাংশনে হরবোলার ডাক শুনিয়েছিলিস। মনে আছে তোর? সেটা সবাই ভুলে গেলেও, আমি কিন্তু ভুলিনি রে হারামির বাচ্চা।'

—'সত্যি বলছি। আমি এসবের কিচ্ছু জানি না।' শেষ চেষ্টা করে রজনী।

সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে শ্যামাদাসের ঘুঁষি আছড়ে পড়ে রজনীর বাঁ-চোয়ালে। কষ বেয়ে রক্ত গড়াতে থাকে। পরক্ষণেই আবার একটা। এবারে ডান চোয়ালে। একসময়ের বক্সিং এ চোস্ত শ্যামাদাসের গায়ে জোর আছে বটে। ব্যথায় মাথা নীচু হয়ে যায় তার।

এবারে সিগারেট ফেলে দিয়ে চুলের মুঠি ধরে মাথাটা তুলে ধরে শ্যামাদাস। বলে— 'শালা, তোর বাপের ভাগ্য ভালো যে আমি নগাইকে আনিনি। সে থাকলে তোর হাইট ওপর দিক থেকে এক ফুট ছোটো করে দিত রে।' ঠাস করে একটা থাপ্পড় এসে পড়ে গালে।

তারপরে রজনীকে চিৎ করে ফেলে তার বুকের ওপরে চেপে বসে শ্যামাদাস। চুলের মুঠি ধরে মেঝেতে ঠুকতে থাকে মাথাটা। সেইসঙ্গে চলতে থাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ আর একনাগাড়ে চড় আর ঘুঁষি। ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠছে শ্যামাদাস।

—'শালা, তোর জন্যেই আমাকে ব্যবসা লাটে তুলতে হচ্ছে আর তোকে ছেড়ে দেব আমি? তুই শালা আমাকে মেরেছিস, এবারে তুই মর।' বলেই পাজামার কোমরে গোঁজা রিভলভার বের করে সে। রজনীর কপালে ঠেকিয়ে বলে— 'একটা ছোট্ট শব্দ হবে শুধু। জনমনিষ্যি কেউ টেরই পাবে না।'

এইবার একটা মোক্ষম চাল দেয় রজনী। হঠাৎই সে বলে— 'আমাকে মারবে ঠিকই, কিন্তু সেইসঙ্গে মরতে হবে রসময়ী আর তোমার ছেলেকেও। তারা এখন আমার কব্জায়। বারোটার মধ্যে আমি না ফিরলে তারাও মরবে।'

—'রসময়ী? কে সে? কী যা তা বলছিস রে শালা কুত্তার বাচ্চা।' থমকে যায় শ্যামাদাস।

—'চিনতে তো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তাই নয় কি?'

—'চালাকি করছিস? তাই না?'

—'একদমই না। ওই তো বললাম যে, বারোটার মধ্যে না ফিরলে...।' এবার কিন্তু কথাটা শেষ হবার আগেই শ্যামাদাস চিৎকার করে বলে উঠল— 'কোথায় রেখেছিস তাদের? বল শালা।' রিভলভারের বাঁটের বাড়ি পড়ে রজনীর চোয়ালে।

—'উঃ' বলে কাতরে উঠে পিচ করে একটু রক্তমাখা থুতু ফেলে রজনী বলে —'পথে এসেছ তাহলে?'

—'তাহলে শালা বল, কোথায় রেখেছিস?'

—'... বেতো বামনীর ঘাটের কাছে।' ইচ্ছে করেই সময় নিচ্ছে সে। পুরো ঠিকানাটা একেবারে বলছে না। হ্যাঁ, আরও মার হয়তো খেতে হবে তাকে। তবে মার সহ্য করার মতো ক্ষমতা তার আছে। আর যত না লাগছে তার থেকেও বেশি অভিনয় করছে সে।

—'ঘাটের কাছে কোথায়?'

—'সমাজপতিদের পুকুর পাহারা দেয় যারা তাদের কাছে।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় শ্যামাদাস। উঠে বসে রজনীও। শ্যামাদাস রাগে চেঁচিয়ে বলে — 'এই তোরা তিনজন যা তো। মদনা তুই এখানে থাক। যেমন করেই হোক ওদের নিয়ে ফিরবি। তারপরে শালার...।'

ইচ্ছে করেই ভুল জায়গা বলেছে রজনী, যাতে এখানকার কিছু লোক কমে যায়। যে জায়গাটা সে বলেছে, সেটা এখান থেকে মাইল চারেক দূরে। যেতে আসতে অনেক সময় লাগবে। আর তিনজন চলে গেলে এখানে থাকবে শুধু নরেশ কাকা, শ্যামাদাস, মদনা আর সে।

ওরা ওদের অস্ত্রগুলো দাওয়া থেকে নিয়ে চলে গেলে শ্যামাদাস রিভলভারটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে বলে— 'ওদের ফিরতে দে, তারপর তোর হচ্ছে। আর মিথ্যে যদি বলেছিস শালা...।' বলেই ক্যাঁৎ করে একটা লাথি মারে রজনীকে।

রজনী এই সুযোগটাই খুঁজছিল। তার খানিকটা সময় চাই।

তাই সে বলে— 'আমি মিথ্যে বলি না। তাই না নরেশ কাকা?'

—'এই থামবি কুত্তার বাচ্চা। আবার শালা নরেশকে জড়াচ্ছে।' শ্যামাদাসের একটা লাথি এসে পড়ে রজনীর পাঁজর ঘেঁষে।

এতক্ষণ চুপ করে থাকা নরেশ কাকা হঠাৎই দৌড়ে এসে চেপে ধরে শ্যামাদাসের পাঞ্জাবির কলার। গর্জে ওঠে— 'তুই থাম, শালা শুয়োরের বাচ্চা শ্যামা। তুই শালা আমাদের দে কাজ কইরেছিস আর নিজে ফয়দা তুলেচিস? কলকেতা থেকে আনাতিস ছ-প্যাকেট মাল। বিলোতিস চার প্যাকেট। তাহলে দু-প্যাকেট কী ওই মেয়েচেলেটাকে পুষতে যেত? আর শালা পিস্তলগুলোর পয়সা...।'

শ্যামাদাসও নরেশের ফতুয়া দু-হাতে চেপে ধরে বলে— 'চুপ কর শালা বেজম্মা। এই যে দলের খরচ-খরচা, গুন্ডা পোষা, অস্ত্রর ব্যবস্থা করা, মালমশলা আর দানাদারের জোগান, এসবের জন্যে একটা পাই পয়সাও চেয়েছি কোনোদিন তোদের কাছ থেকে? সব নিজের মাল্লু খসিয়ে করেছি রে শালা হাড়হাভাতে হারামখোর। জেনে রাখ, শ্যামা নয়, ওই শালা কুত্তার বাচ্চা রজনী মিথ্যে কথা বলছে।'

—'মিচে কতা ও কইচে, না তুই রে? হারামির বাচ্চা, তুই আমাদের গতর ভাঙিয়ে মাল চালাচালি করেচিস, লুকিয়ে মেয়েচেলে পুষচিস, দামি মাল গিলচিস এমনকী নগাইকে দে মদ গিলিয়ে আমার ভবেশকেও মেরেচিস। আমার ভবেশ তো কক্কোনো মদ খেতোনি। কিন্তু তার পেটের মদ্দে মদ পাওয়া গেল কী করে রা? বল শালা, বল?'

—'চুপ কর শালা ঢ্যামনা। বুঝতে পারছিস না, ও তোর কানে বিষ ঢেলে আমাদের মধ্যে ঝগড়া লাগাতে চাইছে?'

—'বিষটা যে এ্যাদ্দিন ধরে কে ঢেলেচিল, তা তোর নগাইয়ের কাচ থেকেই জানতে পেরেচি আমরা।'

—'মানে, কী বলতে চাইছিস তুই?'

—'শোনরে শালা, তোর প্যারের মাগি বেতো বামনীর ঘাটে নেই। তারা আচে আমার জিম্মায়। আর নগাই? তার নলী কেটে লাশটা ভাইসে দিচি খালের জলে।' এবারে আর সহ্য হয় না শ্যামাদাসের। তাহলে তাকে কি সবই হারাতে হবে?

তারই মাঝে শোনা যায়— 'শালা ধোঁকাবাজ। খুনি। আজ শালা তোর একদিন কি আমার একদিন।' একটা ঘুঁষি আছড়ে পড়ে শ্যামাদাসের বুকে। নরেশ কাকা মাঝারি গড়নের হলে কী হবে, গায়ে তারও জোর কিছু কম নয়। সেই ঘুঁষির ধাক্কায় দু-তিন হাত পেছিয়ে যায় শ্যামা। তার হাতের টানে ছিঁড়ে যায় নরেশ কাকার ফতুয়া।

শ্যামাদাসও ছাড়বার পাত্র নয়। পরক্ষণেই তার দু-হাতের দু-দুটো পাঞ্চ আছড়ে পড়ে নরেশের শরীরে। একটা পড়ে পাঁজরায় আর একটা গিয়ে পড়ে নরেশের মুখে। তার ঠোঁট ফেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত গড়াতে থাকে আর সেই ফাঁকে শ্যামাদাস নিজের কোমর থেকে টেনে বের করে তার রিভলভার।

কিন্তু হঠাৎই মুখে একটা প্রচণ্ড কিক খেয়ে ছিটকে পড়ে মদনা আর পরক্ষণেই একটা ল্যাসো এসে জড়িয়ে ধরে শ্যামাদাসের হাতের কব্জি। হ্যাঁচকা টানে ছিটকে পড়ে তার রিভলভার।

রজনী উঠে দাঁড়িয়েছে। তার একহাতে ল্যাসোর একটা প্রান্ত আর অন্যহাতে একটা ক্ষুর। এটাই নরেশ কাকা তার কোমরে গুঁজে দিয়েছিল।

শ্যামাদাস লাফিয়ে গিয়ে রিভলভারটা তুলতে যায়, কিন্তু মুখে সপাটে একটা কিক খেয়ে ছিটকে যায় সে।

তার অস্ত্রটা এখন রজনীর হাতে। হাতে সময়ও আছে। তাই একবার গুলির খোপটা খুলে দেখে সে। একটা ঘর খালি। এই বুলেটটাই তাহলে সুরেশ কাকাকে বিঁধিয়েছিল। তাই সে বলে— 'নরেশ কাকা, সরে যাও।' তারপর একটানে ল্যাসো ছাড়িয়ে, ক্ষুরটা পেছনে গুঁজে রিভলভারের ইশারায় শ্যামাদাসকে উঠে দাঁড়াতে বলে। বাধ্য ছেলের মতো উঠে দাঁড়ায় শ্যামাদাস।

একহাতে ল্যাসোটা পৈতের মতো করে শরীরে জড়াতে জড়াতে রজনী বলে— 'এবার খেলা ঘুরে গেছে রে শয়তানের বাচ্চা। তোর জন্যেই মরতে হয়েছে পুলিনকে।' দড়াম করে একটা পাঞ্চ পড়ে নাকে। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে থাকে। পাঞ্জাবিতে লাগে রক্তের দাগ। সামনে ঝুঁকে পড়ে শ্যামাদাস।

তাকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে বলে— 'তোর জন্যেই মরেছে বিষ্টু।' আবার একটা পাঞ্চ পড়ে ডান চোয়ালে।

—'তোর জন্যেই লোপাট হয়েছে দিনেশ।' এবার পাঞ্চ বাঁ-চোয়ালে।

তারপর আবার সপাটে পেটে পড়ে একটা ঘুঁষি। ককিয়ে উঠে শ্যামাদাস।

—'আর তোর হাতেই মরতে হয়েছে আমার সুরেশ কাকাকে আর আমাকে হতে হয়েছে একজন সিরিয়াল কিলার। নাম হয়েছে নিশি।' এবারে ছাতিতে একটা কিক খেয়ে মাটিতে পড়ে যায় শ্যামাদাস। তার চশমা ছিটকে পড়ে দূরে।

—'তাই এবারে তোর পালা সেই নিশির হাতে মরার। নে যমকে স্মরণ কর।'

আর ঠিক সেই সময়েই তৃতীয় প্রহরের শিয়ালগুলো যেন হা হুতাশ করে ডেকে ওঠে। মানে রাত বারোটা। মাহেন্দ্রক্ষণ এসে গেছে যে।

হঠাৎই বাইরে থেকে ভেসে আসে একটা সম্মিলিত চিৎকার— 'কী ইহ্যাপ।' সেইসঙ্গে বোতলের কাঁচ ভাঙার শব্দ আর কেরোসিনের গন্ধ। পল্টু, পটাই আর নেলো ঠিক সময়েই সেরেছে তাদের কাজ। আগুন লেগে গেছে শ্যামাদাসের মশলাপাতি আর দানাদারে। পরক্ষণেই বাড়ির পেছনদিকে পরপর কয়েকটা বিস্ফোরণের শব্দ আর চোখ ঝলসানো আগুন। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে থাকে বাড়ির পেছনের অংশটা।

খানিক্ষণের বিহ্বলতা। বারুদের ধোঁয়া, হাতবোমার বিস্ফোরণ আর ভেঙে পড়তে থাকা বাড়ির ধুলোয় ক্রমে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে উঠোন। আগুনের শিখার আলোয় হঠাৎই রজনী

খেয়াল করে যে শ্যামাদাস তার সাইকেলে চড়তে যাচ্ছে। তাই সে উঠোনে পড়ে থাকা মদনার চপারটা নিয়ে সামনে সটান ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে মেঝেতে পড়ার আগেই তার হাতের চপার ফালা করে দিয়েছে শ্যামাদাসের ডানপায়ের কাফ মাসল। কিন্তু শ্যামাদাস দুর্বার। আহত পা নিয়েই সে সাইকেলে উঠে পালায়। রজনীও চটপট তার বুমেরাংটা তুলে নিয়ে দৌড় লাগায় সদর দরজার দিকে। এখন এখান থেকে পালাতে হবে। নরেশ কাকাও তাইই করতে যায়। কিন্তু বিস্ফোরণে একটা বড়ো কার্নিশের টুকরো ভেঙে পড়ে তার মাথায়। ভারী কার্নিশের চাঙড়ের তলায় চাপা পড়ে যায় তার শরীর। পেছনে বাড়ির উঠোনে শুধু পড়ে থাকে মদনার অজ্ঞান দেহটা।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই পরপর আরও বিস্ফোরণের বিকট শব্দে ভেঙে পড়তে থাকে সেনেদের বাড়ির এক একটা অংশ। এক মুহূর্ত থমকে যায় রজনী। শ্যামাদাসের রিভলভারে থাকা পাঁচটা গুলি বের করে নিয়ে কোমরের পাউচে রাখে। রিভলভারটা ছুঁড়ে দেয় বিস্ফোরণের আগুনে। আর তারপরে দেখে অনেক দূরে রাস্তার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে শ্যামাদাসের সাইকেল।

২৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৪

কলকাতায় কানাই, ভিক্টোরিয়ার হাওয়া-মোরগ আর ক্যাথিড্রালে চোখের জল

হাওড়া স্টেশন থেকে বেরোতেই চোখ ধাঁধিয়ে যায় কানাইয়ের। উরিবাব্বা! ওটা কী? গায়ে আবার লম্বা লম্বা দড়ি বেঁধে পটোলের মতো বেলুন ওড়ানো।

রজনী বলে— 'ওই দেখ হাওড়ার ব্রিজ। এতদিন বইয়ে ছবিতে দেখেছিস। এখন ওটার ওপর দিয়েই যাব আমরা।'

—'কিন্তু স্যার, হাওড়া ব্রিজে বেলুন উড়িয়েছে কেন?'

—'সাধে কী আর উড়িয়েছে। জাপানি এরোপ্লেন যাতে ব্রিজে বোমা ফেলতে না পারে, তাই এই ব্যবস্থা। প্লেনগুলো গোঁত্তা খেয়ে বোমা ফেলতে এলেই ওই বেলুনে জড়িয়ে টুপ করে গঙ্গায় গিয়ে পড়বে।'

—'বেশ হবে। বোমা ফেলতে আসা না?'

একহাতে কানাইয়ের ছোটো সুটকেস আর অন্যহাতে কানাইয়ের একটা হাত ধরে রজনী এগিয়ে চলে ট্রাম টার্মিনাসের কাছে। একটা ট্রামে উঠে জানলার ধারে কানাইকে বসিয়ে তার পাশে বসে রজনী। হেসে বলে— 'তোকে বলেছিলাম না যে ট্রামে চড়াবো। তা চড়ালাম তো?' কানাই হাসে।

ট্রাম চলতে শুরু করল আর গ্রামের চঞ্চল ছেলেটার কৌতূহলী দৃষ্টি ট্রামের জানলা দিয়ে আবিষ্কার করতে শুরু করল শহরটাকে। এই শহর তার কাছে একেবারে নতুন। তার জন্যে মহা বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে শহরটার পরতে পরতে। মুগ্ধতার আবেশ তার চোখের প্রতিটা পলকে। এদিকে ওদিকে বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে সে অপার আনন্দে। রজনীর ভারি ভালো লাগছে কানাইয়ের এই বিস্মিত ভালোলাগা।

ট্রামটা ব্রিজে উঠে পড়েছে। গঙ্গার ওপরে মাঝামাঝি পৌঁছে গেছে সেটা। নদীতে কত রকমের জলযান। নৌকো, স্টিমার, গাদাবোট। তারই একটা দেখিয়ে কানাই রজনীকে বলে — 'দেখ স্যার, জাহাজ। ওই যে ওইটা।' আঙুল দিয়ে দেখায় যেটা, সেটা একটা ফেরি স্টিমার। দু-পাশে বড়ো বড়ো গোল দুটো পাখা ঘুরিয়ে জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে।

রজনী বলল— 'ওটা জাহাজ নয়, স্টিমার। লোক পারাপার করে। আর ওই যে দেখছিস দূরে, তোর ডানদিকে, বড়ো বড়ো কালো কালো। ওগুলোই হচ্ছে জাহাজ। কুশায়ায় ঢেকে আছে বলে ঠিক বুঝতে পারছিস না।'

—'আমাকে জাহাজ দেখাবে?'

—'দেখাব, দেখাব, নিশ্চয়ই দেখাব। একদিন তোকে নিয়ে যাব গঙ্গার ধারে। তখন বুঝতে পারবি ওগুলো কত্তো বড়ো।'

খুশিতে ডগোমগো কানাই বলে— 'স্যার, এখন আমরা কোথায় যাব?'

—'বউবাজারে। যেখানে আমি থাকি।'

—'ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে দেবে কিন্তু। সঙ্গে নিয়ে রাখব। মা বলেছে ঠিকানা বলতে না পারলে কলকাতায় লোকে হারিয়ে যায়।'

—'ঠিক আছে দেব। তবে তোর মা ঠিকই বলেছে রে কানাই, কলকাতায় এলে লোকে হারিয়েই যায়। কে, কখন, কোথায় হারিয়ে যায় তা সে নিজেও জানতে পারে না।' হালকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে রজনী।

তার স্যারের শেষের কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না কানাই।

বউবাজারের বাড়িতে পৌঁছে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দেয় কেষ্টদা। ভেতর থেকে সুবিমলের মেসো পরিতোষ মিত্রের গলা শোনা যায়— 'কে রে কেষ্ট?'

—'আমাদের রজনীদা গো। যে ছেলেটাকে আনবে বলেচিল তাকে সঙ্গে নে এসেচে।'

—'ও তাই নাকি? তা আমি আসছি। তুই ওদের ঘরটা পরিষ্কার করে রেখেছিস তো?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা আর বলতে।'

—'আচ্ছা। তাহলে ওদের মালপত্রগুলো ওপরে নিয়ে গিয়ে রাখ।' বলতে বলতেই বেরিয়ে আসেন মিত্তিরমশাই। কেষ্টদা সদর দরজা বন্ধ করে মালপত্র নিয়ে ওপরে উঠে যায়। সেইফাঁকে এসে দাঁড়িয়েছেন সুবিমলের মাসিমাও।

রজনী তাঁদের দু-জনকে প্রণাম করে। তার দেখাদেখি কানাইও।

মাসিমা কানাইয়ের নিষ্পাপ মুখটা দেখে তার গালটা টিপে আদর করে বলেন—'রজনী, তাহলে এই হল গিয়ে তোমার সাধের কানাই?' তারপর কানাইকে বলেন—'তা বাপু কানাই, আমরা হলাম গিয়ে তোমার দাদু আর দিদা।'

কানাই অমলিন হাসে। সে ভাবতেও পারেনি যে কলকাতায় তার দেখা হওয়া প্রথম মানুষগুলো তাকে এতটা আপন করে নেবে।

—'তা কানুবাবু, শুনেছি তোমার কাকু নাকি তোমায় হিন্দু স্কুলে ভরতি করে দেবে?'

—'কাকু নয়গো ঠাম্মি, ও তো আমার স্যার।'

—'ও আচ্ছা। তা কানুবাবু তুমি কি জানো যে মা বাবার পরেই স্যারকে মান্য করতে হয়?'

কানাই ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায়।

পরিতোষ মিত্তির বলেন— 'এবার ওদের ছাড় দাও গো সুনয়না। অনেকটা পথ এসেছে। ক্লান্ত ওরা। একটু বিশ্রাম করতে দাও। আর হ্যাঁ, কেষ্টকে বল ওদের জলখাবার দিতে। জয়নগরের মোয়া এনে রেখেছি।' কেষ্টদা ততক্ষণে মালপত্র ওপরে রজনীর ঘরে রেখে নীচে নেমে এসেছে।

মিত্তির মশাই তাকে বললেন— 'কেষ্ট আজ ওদের দুপুরের খাওয়াটা একটু তাড়াতাড়িই দিস। একে শীতের বেলা। তারপর রজনী হয়তো ওকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতেও পারে। এরপরে স্কুলে ভরতি হয়ে গেলে আর হয়তো সময় পাবে না।'

—'হ্যাঁ মেসোমশাই, ভাবছিলাম আজ ওকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর ক্যাথিড্রাল দেখিয়ে নিয়ে আসব। আর যদি সময় হয়, সেইসঙ্গে পার্ক স্ট্রিটটাও।'

—'বেশ, বেশ, সেই ভালো। আচ্ছা এবারে তোমরা ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও।'

তিনটে নাগাদ একটা ছ্যাকরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রজনী আর কানাই। কানাইয়ের কাছে তো কলকাতার চারপাশেই বিস্ময়। একএকটা কিছু দেখে আর প্রশ্ন করে তার স্যারকে। রজনী একটুও বিরক্ত হয় না তাতে। সে জানে অজানা, অদেখা সব জিনিসেই কৌতূহল থাকে মানুষের— বিশেষ করে শিশু আর কিশোর বয়সে। তাই সে খুশিমনেই কানাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে।

ধর্মতলার কাছাকাছি আসতেই কানাইয়ের নজরে পড়ে একটা লম্বা থাম মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সে রজনীকে জিজ্ঞেস করে— 'স্যার, ওই লম্বা থামটা কী গো?'

—'ওটার নাম অক্টারলোনি মনুমেন্ট।'

—'ও এটাই মনুমেন্ট। কিন্তু ওটা তৈরি করল কী করে বল তো?'

—'তা তো আমি বলতে পারব না বাপু। তবে খোঁজখবর করে জানতে হবে।'

এমন সময় খুবই নীচু দিয়ে উড়ে যায় একটা বোমারু বিমান। কী বিকট আওয়াজ তার। গ্রামে থাকতে কানাই উড়োজাহাজ দেখেছে। অনেক ওপর দিয়ে উড়ে যেত সেগুলো। উড়োজাহাজ দেখলেই তারা বন্ধুরা মিলে দু-হাত তুলে চেঁচাত, কলাপাতা নাড়াত। ভাবত বুঝি বা যে লোকটা চালাচ্ছে, সে তাদের দেখতে পাবে। কিন্তু এত নীচু দিয়ে উড়ে যাওয়া উড়োজাহাজ সে আগে কখনো দেখেনি। তাই চলন্ত গাড়িতেই দাঁড়িয়ে উঠে সেটার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে চিৎকার করে সে। কিন্তু উড়োজাহাজটা তাকে পাত্তা না দিয়েই উড়ে চলে যায়। তার রকমসকম দেখে রজনী মিটিমিটি হাসে। মনে মনে ভাবে— কানাইয়ের এই সরলতাকে কখনোই কুটিল হতে দেবে না সে। একসময় সে নিজেও তো এইরকমই সরল ছিল; কিন্তু সময় আর পারিপার্শ্বিকতা তার জীবনকে আজ জটিল করে তুলেছে। হয়তো এইরকমই হয় সবার।

গাড়ি এসে থামে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তর দিকের গেটের সামনে। সেখান থেকে বাদামভাজা কিনে নিয়ে খেতে খেতে তারা পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। গেটের দু-

দিকে দুটো সিংহ থাবা পেতে বসে। আরও খানিক এগিয়ে গেলেই একটা সিঁড়িওয়ালা বেদির ওপরে ধাতুর গড়া এক মহিলার মূর্তি। তবে সিংহাসনে বসা।

কানাই জিজ্ঞেস করে— 'এটা কে গো স্যার?'

—'ইনি হলেন রানি ভিক্টোরিয়া।'

—'ও, বুঝেছি, ইংল্যান্ডের রানি। বইতে পড়েছি।'

—'হ্যাঁ, এনারই রাজত্বের মধ্যে পড়ি আমরাও। আমরা ব্রিটিশদের কাছে পরাধীন। তাই আমরা চাইছি স্বাধীনতা।'

—'স্বাধীনতা কী স্যার?'

—'সেটা তুই বড়ো হলে হয়তো বুঝবি। তবে আমিও ঠিক জানি না স্বাধীনতা আসলে কী?'

—'তাইজন্যেই বুঝি যুদ্ধ হচ্ছে?'

—'না, এই যুদ্ধটা শুধু আমাদের স্বাধীনতার জন্যে নয়। এই যুদ্ধটা হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে। এটা বিশ্বযুদ্ধ।'

—'তা যুদ্ধ হচ্ছে কেন?'

—'দেশে দেশে শত্রুতা আছে বলে।'

কানাই চুপ করে যায়। এইসব ব্যাপার স্যাপার তার মাথায় ঢোকে না। তাই বাদামভাজা খেতে খেতে তারা এগিয়ে চলে। সামনে এবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। তার খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে তারা।

বাদাম খেতে গিয়েও থমকে যায় কানাই। বলে— 'স্যার, বইতে লিখেছে যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নাকি শ্বেতপাথরের তৈরি। কিন্তু এ তো দেখছি কালো পাথরের।'

—'বইতে ঠিকই লিখেছে। আসলে এটা সাদা পাথরেরই তৈরি। কিন্তু রাত্তিরে যাতে শত্রুদের এরোপ্লেন এটাকে দেখতে না পায়, সেইজন্যেই কালো রং করা হয়েছে। সাদা থাকলে তো বোমা ফেলে দেবে, না। তাই শত্রুদের ধোঁকা দিতে কালো রং মাখাতে হয়েছে, বুঝলি?'

—'স্যার সেনেদের পোড়োবাড়িতেও মনে হয় উড়োজাহাজ থেকেই বোমা ফেলা হয়েছিল। ওটারও কিন্তু রং ছিল সাদা। যুদ্ধের সময়েও কালো রং করেনি যে।'

মুখে বাদাম তুলতে গিয়েও একটু থমকে যায় রজনী। তারপর বলে—'হবে হয়তো।' তারপরেই সে তার অস্বস্তিকর অবস্থাটা কাটানোর জন্যে বলে— 'জানিস কানাই, মাথার ওপরে ওই যে পরিটা দেখছিস, ওটা না হাওয়ার সাথে সাথে ঘোরে। যেদিক থেকে হাওয়া বয়, হাওয়ার ধাক্কায় পরির মুখও সেদিকে ঘুরে যায়।'

হাতের খালি ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে কানাই হো-হো করে হেসে উঠে বলে— 'বুঝেছি স্যার, ওটা হাওয়া-মোরগ।'

রেসকোর্সের দিকে হেলে পড়েছে সূর্য। একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। এটাই উপযুক্ত সময় ক্যাথিড্রালে যাওয়ার। তাই কানাইকে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে রজনী পৌঁছে যায় সেখানে। গেটে ঢুকতে ঢুকতে কানাই জিজ্ঞেস করে— 'এটা কি গির্জা স্যার?'

—'হ্যাঁ, তা বলতে পারিস।'

পায়ে পায়ে খানিক এগোতেই ডানদিকের ছোট্ট লনে নানান রকমের বড়ো বড়ো পুতুল সাজানো। সাজানো দেখে কানাইয়ের মনে হচ্ছে যে এর পেছনে মনে হয় কোনো গল্প আছে। লনের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে রজনীকে বলে— 'এই বড়ো বড়ো পুতুলগুলো দিয়ে সাজানো হয়েছে কেন গো?'

—'এইগুলো দিয়ে যিশুখ্রিস্টের জন্মের গল্প বলা হয়েছে। ওই দেখ বেথলেহেমের আস্তাবলে মায়ের কোলে ছোট্ট যিশু। পাশে বাবা জোসেফ দাঁড়িয়ে।'

—'আর ওই তিনজন লোক? ওরা ওপরের দিকে তাকিয়ে কেন?'

—'ওনারা হলেন পারস্য দেশের তিনজন জ্ঞানী মানুষ। ওঁদের ম্যাজাই বলা হয়। যিশুর জন্ম হলে ওঁরা আকাশে এক অদ্ভুত উজ্জ্বল তারা দেখতে পান। সেই তারাকে অনুসরণ করে ওনারা পৌঁছে যান বেথলেহেমের সেই আস্তাবলে যেখানে যিশুর জন্ম হয়েছিল। সেখানে পৌঁছে নানা দামি দামি উপহার দিয়ে তাঁরা হাঁটু গেড়ে বসে স্বাগত জানান মহান পুরুষ যিশুখ্রিস্টকে।'

এই গল্প আগে শোনেনি কানাই। স্যারের মুখে শুনে তার বড়ো ভালো লাগতে থাকে যিশুকে; আর সেইসঙ্গে একটা কষ্টও। এই মানুষটাকেই পরে ক্রুশকাঠে গেঁথে মারা হয়েছিল।

—'চ, ভেতরে গিয়ে দেখি। আমিও আগে আসিনি। তোর জন্যেই এখানে আসা হল।'

দু-জনে গিয়ে ভেতরে ঢোকে। কোনো বিজলিবাতি নেই। চারিদিকে শুধুই মোমবাতির আলো। সেই আলোয় দেওয়ালের ওপরে লাগানো কাঁচে আঁকা রঙিন ছবি আর ফুলপাতার নকশা জ্বলজ্বল করছে। উঁচু সিলিং আর খিলান। নীচে মাঝখানে সরু পথ সোজা চলে গেছে দূরে বেদির দিকে। সেই পথের দু-ধারে সারি সারি কাঠের বেঞ্চ পাতা। বেদির পেছনে কাঁচের গায়ে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর রঙিন ছবি। বেদির ওপরে ব্রোঞ্জের মোমদানিতে জ্বলছে অনেক মোটা মোটা লম্বা মোমবাতি। আর ধূপের গন্ধের সাথে মিশে চারপাশে ছড়িয়ে আছে এক সুন্দর স্নিগ্ধ নীরবতা।

বিস্মিত রজনী আর তার শিষ্য কানাই। ভেতরে ঢুকতেই মনটা তাদের ভরে গেল শ্রদ্ধা মেশানো মুগ্ধতায়।

—'এই বেঞ্চে বসে সবাই প্রার্থনা করে। আজ রাতে বারোটার সময়ে এখানে বিশেষ প্রার্থনাসভা বসবে। যিশুর জন্মদিন পালন করা হবে। তাঁর নামগান হবে। বাইবেল পড়ে শোনানো হবে। বুঝলি?'

একেই যুদ্ধের বাজার তার ওপরে গভীর রাতের প্রার্থনার এখনও অনেক দেরি। তাই লোকসমাগম তেমন নেই। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাঁচ-সাতজন। রজনী কানাইকে নিয়ে এগিয়ে যায় একেবারে সামনে। একটা বেঞ্চে গিয়ে বসে তারা দু-জনে। সামনে হাইবেঞ্চের মতো টেবিল। প্রতিটা বসার জায়গায় একটা করে ছোটো ছোটো বই রাখা। রজনী বলল— 'ওগুলো বাইবেল।' কানাই একটার পাতা উলটে-পালটে দেখে। ইংরাজিতে লেখা কীসব। বুঝতে পারে না সে।

বসার বেঞ্চের সামনে খুব নীচু গদিমোড়া পাদানীর মতো রাখা। ড্যানীবাবুর কাছে রজনী শুনেছে যে, ওগুলোর ওপরে নাকি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে হয়। তারা দু-জনে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে সেই শান্তিময় দেবগৃহে। কানাইয়ের মতো চঞ্চল ছেলেও চুপটি করে বসে আছে আজ যিশুর সামনে।

কতক্ষণ তারা যে সেইভাবে বসেছিল খেয়ালই নেই। একটু পরে কানাই তার স্যারের দিকে তাকাতেই দেখে যে তার স্যার চোখবুজে বসে আর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা।

সে প্রায় ফিসফিসানির মতো করে ডাকে— 'স্যার'।

চোখ খোলে রজনী। জামার হাতা দিয়ে চোখ মোছে।

কানাই বলে— 'তুমি কাঁদছিলে স্যার?'

ঈষৎ বিব্রত রজনী ম্লান হেসে বলে— 'না রে। মনের কষ্ট আর পাপ ধুচ্ছিলাম।' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক ঠেলে। কানাইও বুঝতে পারে না তার স্যারের কথা।

—'নে চ। এবারে বাড়ি ফিরতে হবে। কাল বরং তোকে পার্ক স্ট্রিটে নিয়ে যাব। সেখানে দেদার মজা।'

বেঞ্চের সারির মাঝের সরুপথ ধরে তারা ফিরতে থাকে। রজনীর পেছনে যেতে যেতে কানাই ভাবে— তার এই স্যারকে তো সে আগে কখনো দেখেনি। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে তার স্যারের। তাই তারও মনটা কেমন যেন ভারী হয়ে যায়। ভারী মন নিয়েই সে নিঃশব্দে রজনীর পিছুপিছু চলতে থাকে।

তারা বাইরে আসতেই ক্যাথিড্রালের মাথার ওপর দিয়ে অন্ধকার আকাশের স্তব্ধতা ফুঁড়ে উড়ে যায় একটা যুদ্ধবিমান। তার গায়ে জ্বলছে লাল আর সবুজ আলো।

যুদ্ধ চলছে যে। যুদ্ধ চলছে ভেতরে, বাইরে। সর্বত্র...।

২৪-২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৪

আচার চোর, পার্ক স্ট্রিটের কালো কুমির আর সুবচনীর হাঁস

কেষ্টদা দরজা খুলে দিতেই শোনা গেল মেসোমশাইয়ের গলা— 'কে? রজনী নাকি?'

—'হ্যাঁ, মেসোমশাই।'

—'শোনো, সুবিমল ফোন করেছিল তুমি দেশের বাড়ি থেকে ফিরেছ কি না জানতে। তা আমি হ্যাঁ বলতে ও বলল যে তুমি ফিরলে ওকে যেন একটা ফোন কর।'

—'আচ্ছা মেসোমশাই করছি।'

—'যাও। ফোনের কাছে আমি ওর বাড়ির নম্বরটা একটা কাগজে লিখে রেখেছি। নাকি তুমি ওর নম্বরটা জানো?'

—'ওর নম্বরটা আমার কাছে আছে। ঠিক আছে, আমি কল করছি। আর এই কানাই, চাবিটা নিয়ে ওপরে গিয়ে জামাকাপড় পালটে মুখ হাত ধো। আমি ফোনটা করে আসছি।' কানাইয়ের হাতে চাবিটা দিতেই ও ছুট্টে চলে যায় ওপরে আর রজনী বসার ঘরে ঢোকে ফোন করতে।

মিনিট দশেক কথা বলে সে যখন বেরিয়ে আসছে তখন মেসোমশাই বললেন—'কী? কথা হল?'

—'ও নাকি কাল বউ আর মেয়েকে নিয়ে সকালে আপনার এখানে আসছে?'

মিটিমিটি হেসে মেসোমশাই বললেন— 'আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে বলিনি। সারপ্রাইজ। বুঝলে? তা কাল তো বড়োদিন। ওরা না এলে বাড়িটা কেমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে থাকত। কাল কিন্তু একটু ভালোমন্দ খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে তারপরে তোমরা না হয় পার্ক স্ট্রিটে ঘুরেটুরে এসো।'

—'হ্যাঁ মেসোমশাই, ওরও সেরকমই ইচ্ছে।'

—'তা রজনী, কানুবাবু কোথায় গেল?' গলাটা মাসিমার। উনি রজনীর গলা শুনে বেরিয়ে এসেছেন। গায়ে একটা শাল।

—'একবার ডাকো দেখি তাকে। কেমন বেড়াল শুনি।'

রজনী হাঁক দেয়— 'কানাই, এই কানাই, নীচে আয় তো একবার। ঠাম্মি ডাকছেন।'

ধুপ ধুপ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল কানাই। এতক্ষণে তার জামাকাপড় পালটানো হয়ে গেছে। জল দিয়ে চুল হালকা করে ভিজিয়ে, আঁচড়ে পরিপাটি সে।

সে নেমে আসতেই মাসিমা বলেন— 'এসো গো গোঠের কানু। একটু গল্প শুনি তোমার কাছে। কেমন দেখলে সব?' বলে কানাইকে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন মাসিমা।

এদিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রজনী ভাবতে লাগল— কানাইয়ের গা থেকে সে খুব হালকা আমের আচারের গন্ধ পেয়েছে। কিন্তু কোথা থেকে এল সে গন্ধ? একটু তদন্ত করতে হয়। তাই ঘরে না ঢুকে সে পাশে ছাদে যাবার সিঁড়ির পথ ধরল। দরজায় শিকল তোলা। শিকল খুলে সে ছাদে এসেই বুঝতে পারল যে ছাদে খান তিনেক আচারের বয়াম রাখা। রোদ খাওয়ার জন্যেই এগুলো রাখা থাকে ছাদে। ঝুঁকে পড়ে সে দেখল, তিনটে বয়ামের মুখই সাদা কাপড় দিয়ে বাঁধা। শুঁকে দেখল— একটায় আমের, একটায় কুলের আর একটায় লেবুর আচার রাখা। রজনী ভালো করে বয়ামগুলো দেখে। নিঁখুত করেই বাঁধা বোতলের মুখ। দেখে বোঝারই উপায় নেই যে কেউ খুলেছিল। তবে সে বুঝে গেছে এই কীর্তি কার। মিনিট পনেরোতেই কাজটা সেরেছে নিখুঁতভাবে।

ছাদ থেকে নেমে এসে মুখ হাত ধুয়ে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে বসতেই কেষ্টদা এসে চা দিয়ে গেল। মিনিট পনেরো পরে চা শেষ করে কাপ-প্লেট টেবিলে রাখতেই কানাই এসে হাজির। হাতে তার একটা বই।

রজনী হাতের ম্যাগাজিনটা টেবিলে রেখে বলল—'গল্প হল?'

কানাই হেসে বলল— 'হ্যাঁ, অনেক। জানো ঠাম্মি না আমাকে চারটে ক্রিম বিস্কুট দিয়েছে।'

—'তাই যখন দিল, তখন আমের আচার খাবার শখ হলে সেটা তো ঠাম্মিকেই বলতে পারতিস।' একটু গম্ভীর ভাবে বলে রজনী।

—'আর কখনো হবে না স্যার। আমি বয়ামের মুখ যেমনভাবে বাঁধা ছিল, তেমনভাবেই বেঁধে দিয়েছি। কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারবে না।'

—'ঠিক আছে। আর করবি না কিন্তু। ইচ্ছে হোলে ঠাম্মির কাছ থেকে চেয়ে নিবি।'

একটু চুপচাপ থেকে কানাই একটা গল্পের বই পড়তে শুরু করে। ঠাম্মি তাকে এটা দিয়েছে। অবন ঠাকুরের লেখা 'বুড়ো আংলা'। আর রজনী ভাবতে থাকে কানাইয়ের স্কিলের কথা। ওইটুকু সময়ের মধ্যে সে জামাকাপড় পালটেছে, মুখ-হাত ধুয়েছে, নিঃশব্দে ছাদে উঠে আচার খেয়েছে আর ছাদের অন্ধকারেও আচার নিয়ে আবার নিঁখুত করে বেঁধে রেখেছে বয়ামের মুখ। এমনকী তারপরে হাতমুখ পরিষ্কার করে নীচেও নেমে এসেছে সে।

কানাইয়ের মধ্যে সে যেন কিছু একটা দেখতে পাচ্ছে।

পরের দিন। বড়োদিন। হই হই করে সকাল ন-টার মধ্যেই বউবাজারের বাড়িতে সুবিমল এসে পড়েছে তার পরিবার নিয়ে। সঙ্গে এনেছে ফ্রুট কেক আর প্যাস্ট্রি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তার মেয়ে সুরঞ্জনার সঙ্গে কানাইয়ের জমে গেছে বেশ। বড়ো দাদার মতো হাবভাব এখন কানাইয়ের। মাঝে মাঝে বোনকে শাসন করছে সে, আবার আদরও করছে। তবে রজনী তাদের ছাদে যেতে বারণ করে দিয়েছে।

কড়াইশুঁটির কচুরি, আলুর দম আর মোয়া দিয়ে জমিয়ে জলখাবার। বোন ঠিকমতো খেতে পারছে না দেখে কানাই সুবিমলের স্ত্রীর উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ে— 'ও কাকিমা, বোন সব ফেলে ছড়াচ্ছে। ওকে খাইয়ে দাও না।' কাকিমা অঞ্জনা এসে খাওয়াতে শুরু করে মেয়েকে। বলে— 'বাড়িতে একা একা খাস কি করে? তখন কি আমি সবসময় থাকি?' বোনও ছাড়বার পাত্রী নয়। বলে— 'তকোন কি তুমি কতুলি দাও আমাকে?'

যাইহোক, দুপুরবেলা ফুলকপির তরকারি, খাসির মাংস, ভাত আর আরও কতকিছু খেয়ে দাদু-দিদা বাদে আর সবাই মিলে একটা ট্যাক্সি ডেকে পৌঁছে গেল 'লাইটহাউস' সিনেমার সামনে। সেখানে চলছে ওয়াল্ট ডিজনির ছবি 'পিনোচ্চিও'। এর আগে শীতকালে দু-একবার গ্রামের মাঠে পর্দা খাটিয়ে যে সিনেমা দেখানো হত তা দেখেছে কানাই। কিন্তু অ্যানিমেটেড সিনেমা কখনো দেখেনি। তাই রজনীর পাশে বসে হাঁ করে গিলতে থাকে। মাঝে একফাঁকে রজনী তাকে জিজ্ঞেস করেছিল— 'কী রে? কেমন লাগছে?' পর্দা থেকে চোখ না সরিয়ে সামান্য বিরক্তি মিশিয়ে কানাই বলেছিল— 'উফ, সিনেমাটা দেখতে দাও। ডিসটাব করো না।' রজনী মজাই পেয়েছিল কানাইয়ের এই বিরক্তিতে। ও সিনেমার ইংরাজি ভাষা বুঝতে পারছে না ঠিকই; কিন্তু ছবির ভাষা বুঝতে পারছে সে। এখানেই ডিজনি সায়েবের কেরামতি।

ছোটো ছবি। তাই মাঝখানে কোনো ইন্টারভাল না দিয়েই একেবারে টানা চলে শেষ হল সিনেমা। হল থেকে বেরিয়ে সুবিমল জিজ্ঞেস করলে— 'তা কানাইবাবু, কেমন লাগল সিনেমা?' দু-হাত তুলে আড়মোড়া ভেঙে কানাই লাজুক হেসে বলল—'দারুণ কাকু।' রজনী বলল— 'এই, কাকুকে ''থ্যাঙ্ক ইউ'' বল।'

—'থ্যাঙ্ক ইউ, কাকু।'

—'ওয়েলকাম মাই সন।' কানাইয়ের কাঁধ ধরে কাছে টেনে নিয়ে একটু আদরের চাপ দিল সুবিমল।

এরপরে ফুচকা খাওয়ার পালা। কানাই আগে কখনো খায়নি। তাই প্রথমবারে ফুচকা দিতেই শালপাতার ঠোঙার তলা দিয়ে গড়িয়ে পড়া টকজল তার সোয়েটারের বুকের কাছটা ভিজিয়ে দিল।

রজনী বলল— 'সামলে খা। এই দেখ, কেমন করে একটু ঝুঁকে মুখে তুললে জামায় জল পড়বে না।' বলে নিজেই একটা ফুচকা মুখে পুরলো।

ব্যাস, আর দেখতে হল না। তার শালপাতায় ফুচকা পড়লেই কানাই তা মসৃণভাবে চালান করে দিচ্ছে মুখে আর মনে মনে ভাবছে— যাই বল বাপু, কলকাতার সেরা খাবার এটাই। যেন কলকাতার সব খাবারই চেখে দেখেছে সে।

ফুচকাপর্ব শেষ হতে সুবিমল অঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করলে— 'হ্যাঁগো, এবার কোথায় যাবে বল।'

—'কোথায় আবার? সোজা পার্ক স্ট্রিট।' কর্ত্রীর জবাব।

এবারে ছ্যাকরা গাড়িতে চেপে পার্ক স্ট্রিটের মুখে। গাড়ি থেকে নেমে কানাইয়ের মনে হল এটাই কলকাতার সেরা জায়গা। বাব্বাঃ, কত সুন্দর সুন্দর দোকান। কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যায় টিমটিম করে আলো জ্বলছে ভেতরে। রজনী বলল— 'জানিস কানাই, এগুলো কলকাতার সবচেয়ে নামিদামি খাওয়ার জায়গা।'

সুবিমল বলল— 'ব্ল্যাকআউট চলছে। নইলে সারা ডিসেম্বর আর জানুয়ারি মাস রঙিন আলোয় ঝলমল করত এই রাস্তা।'

অঞ্জনা বলল— 'কানাইয়ের ব্যাড লাক। প্রথমবার এল, কিন্তু পার্ক স্ট্রিটের সেই জমকালো সাজ দেখতে পেল না।'

কানাইয়ের মনে কিন্তু কোনো বিষণ্ণভাব নেই। সে তো আর জানে না আলোয় রঙিন পার্ক স্ট্রিটের সৌন্দর্য কেমন। তাই যা দেখছে তাতেই খুব খুশি সে। সে জানে কলকাতায় যখন থাকছে, তখন আরও কতকিছু দেখবে সে। অল্পে সন্তুষ্ট থাকার অভ্যেসটা তো তার তৈরি হয়ে গেছে এতদিনের গ্রাম্যজীবনে।

ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল তারা। খেলনাওয়ালা ফেরি করছে রংবেরঙের মুখোশ, টিনের খেলনা, তালপাতার তৈরি ডোরাকাটা লম্বা ভেঁপু। একটা লম্বা লাঠিতে খড় জড়িয়ে তাতে আটকানো খেলনাগুলো। খেলনাওয়ালা মাঝে মাঝেই ভেঁপু বাজাচ্ছে।

আরেকজন খেলনাওয়ালা হাতের কাঠির টানে ফুটপাথে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে খাঁজকাটা কালো কাগজের তৈরি কুমির। এঁকেবেঁকে তাদের পায়ের সামনে দিয়েই ঘোরাচ্ছে সেটা। সেটা দেখে ভয় পেয়ে ছোট্ট সুরঞ্জনা জড়িয়ে ধরে তার দাদাকে। খেলনাওয়ালার হাতের টানে সাঁ করে তাদের পায়ের সামনে বাঁক খেয়ে যায় কুমিরটা। কানাই বোনকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়— 'দূর বোকা, ভয় পাচ্ছিস কেন? ওটা তো কাগজের কুমির।'

তবে বেশ খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে থেকে কানাই বুঝতে চেষ্টা করে কুমির চলার রহস্য। তার কৌতূহল বুঝতে পেরেই রজনী তাকে একটা কুমির কিনে দেয় আর সুরঞ্জনাকে কিনে দেয় একটা মুখোশ আর একটা ঢোল। বলে— 'এইগুলো সব তোদের জন্যে সান্তাক্লজের গিফট।' সান্তাক্লজ কে আর গিফটই বা কি, তা জানে না কানাই। কিন্তু নতুন পরিচিত লোকেদের সামনে সেটা জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ হয় তার। পরে একসময় স্যারকে জিজ্ঞেস করবে সে।

কেনাকাটা হয়ে যেতে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পরে সুবিমল বলল— 'অনেকক্ষণ তো হল। তা এবারে ফ্লুরিজে গিয়ে হালকা কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।' সবাই মিলে তাই ফিরতি পথে এসে পৌঁছল ফ্লুরিজে।

ঢুকতেই একটা সুন্দর গন্ধ নাকে এল কানাইয়ের। একটা টেবিলে জাঁকিয়ে বসার পর রজনী বলল— 'সুবিমল এবারেরটা কিন্তু আমার।'

—'অ্যাজ ইউ উইশ।'

বেয়ারা টেবিলে এসে দাঁড়াতে রজনী বলল— 'এই, কে কী খাবে বল।'

অঞ্জনা বলল— 'ঠান্ডায় কিন্তু হট চকোলেট জমবে ভালো।' সুবিমলও সায় দিল তাতে।

—'বেশ তাইই হোক।'

হট চকোলেটে চুমুক দিয়ে কানাই বুঝল সত্যিই কী অপূর্ব স্বাদ। চুমুক দিতে দিতে সবাই গল্পগুজব করছে আর কানাই ভাবছে অন্য কথা— কলকাতার সেরা খাবার কোনটা? হট চকোলেট? নাকি ফুচকা?

খাওয়া শেষ হলে রজনী ইশারায় বেয়ারাকে ডাকল। দাম মিটিয়ে টিপস দিতেই সে বলল— 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

—'ওয়েলকাম।' সব্বাই উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। বাইরে বেরিয়ে এসেই তারা বুঝতে পারল যে ঠান্ডাটা এখন বেশ একটু বেড়েছে।

সুবিমল তার পরিবারকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসে বলল— 'ঠিক আছে আবার দেখা হবে অফিসে। আমি চার তারিখে আসছি।'

—'মেসোমশাই জানে যে তুই এখান থেকে ফিরে যাবি?'

সুবিমলের জবাব ভেসে এল— 'হ্যাঁ জানে। আচ্ছা চলি। গুড নাইট।'

এরপরে দু-জনে চড়ে বসল একটা ছ্যাকরা গাড়িতে। কুমিরটা উলটে-পালটে দেখতে দেখতে কানাই প্রশ্ন করে— 'হ্যাঁ গো স্যার, সান্তাক্লজ কে গো? আর ''গিফট'' এর মানে কী?'

বউবাজার পর্যন্ত যেতে যেতে সে রজনীর মুখে শোনে সান্তাক্লজের গল্প আর মনে মনে ভাবে— ইস, যদি তার বয়স দশ বছরের কম হত তাহলে সে বারান্দায় তার নতুন কেনা মোজা ঝুলিয়ে রাখত আর সক্কালে উঠে দেখত যে সান্তাক্লজ তাতে 'গিফট' মানে উপহার রেখে গেছে। কিন্তু সে তো এখন বড়ো হয়ে গেছে। কী আর করা যাবে।

বাড়িতে পৌঁছে সে জামাকাপড় পালটে মুখ হাত ধুয়ে রজনীকে জিজ্ঞেস করে—'আচ্ছা স্যার, কলকাতার লোকেরা কথায় কথায় এত ''থ্যাঙ্ক ইউ'' বলে কেন গো?'

—'ওটা এক ধরণের ভদ্রতা জানানোর কথা। এর মানে হল ''আপনাকে ধন্যবাদ'' কিংবা ''তোমাকে ধন্যবাদ''।'

—'ও তাইই? তা আমাদের গ্রামে কেউ এমন বলে না কেন? ভাত বেড়ে দিলে বাবা তো কই মাকে ''থ্যাঙ্ক ইউ'' বলে না?'

কি উত্তর দেবে তা বুঝে উঠতে পারে না রজনী। তাই সে চুপ করে থাকে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে কানাই বলে— 'ও বুজেছি। গ্রামের চেয়ে কলকাতার লোকেরা বেশি ভদ্র।'

এমন সময় নীচের থেকে মাসিমার হাঁক শোনা যায়— 'এই যে গোঠের কানু, বলি খেতে হবে না? এসো, নীচে এসে একটু রাতের খাবারটা খেয়ে যাও।'

খাওয়া দাওয়া সেরে কানাই বুক পর্যন্ত লেপ চাপা দিয়ে পড়তে শুরু করে 'বুড়ো আংলা'। সুবচনীর খোঁড়া হাঁসের পাখায় ভর করে তার মন উড়ে যেতে থাকে রিদয় হয়ে। পড়তে পড়তে ক্রমে ঘুম নেমে আসে তার ক্লান্ত চোখে। ঘুম...ঘুম...ঘুম...গভীর ঘুম...।

তার বুকের ওপরে লুটিয়ে থাকা খোলা বইটা তুলে সেটা বন্ধ করে মাথার কাছে সরিয়ে রাখে রজনী। গায়ের ওপরের লেপটা টেনে ঢেকে দেয় তার গলা পর্যন্ত। পাশ ফিরে শোয় কানাই। ছেলেটার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে দেখে পরম তৃপ্তিতে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেয়।

কিন্তু তার কেন ঘুম আসছে না আজ? কীসের জন্যে?

বড়োদিনের গভীর রাত, ১৯৪৪

জিঙ্গল বেলস, ফিফথ সিম্ফনি আর পিটারের কনফেশন

বাইরে রাস্তার ধারে কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা। পিটারের বাড়ির লনেও বেশ কিছু লোক জমা হয়েছে। বন্ধুবান্ধব আর তার কলকাতাবাসী আত্মীয়স্বজন। লনে একটা ছোটো ক্রিসমাস ট্রি লাগানো। তাতে লাগানো রঙিন ইলেকট্রিক বাল্ব শীতের হাওয়ায় মৃদু মৃদু দুলছে। গাছে ঝোলানো জরির গুঁড়ো মাখা তারায় আর রঙিন বলে তাদের আলো চিকমিকিয়ে উঠছে। ক্রিসমাস ট্রির পাশে রাখা লম্বা ডাইনিং টেবিল। সাদা কাপড়ে ঢাকা। তার ওপরে একপাশে রাখা নানান রকমের খাবার— কেক, প্যাস্ট্রি, প্লেট, ফর্ক আর চামচ। আর আরেকদিকে গবলেট আর নানান ধরণের বিদেশি মদের বোতল।

বাড়ির বাইরের গেট আর ড্রয়িংরুমের দরজা আজ হাট করে খোলা। ড্রয়িংরুমের একধারে রাখা একটা চেঞ্জার আর তারপাশেই পিটারের পিয়ানো। পিটার ক্ল্যাসিকাল ওয়েস্টার্ন সিম্ফনি শুনতে ভালোবাসে; যদিও অন্য ধারার গানেও তার আপত্তি নেই। সেই সিম্ফনিরই একটা বাজছে চেঞ্জারে। সুরের লহরি ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরময়। দরজা দিয়ে বেরিয়ে সেই সুর শীতের হাওয়ায় ভর করে পৌঁছে যাচ্ছে লনে; ক্রিসমাস ট্রির পাশ দিয়ে গিয়ে তা ছুঁয়ে যাচ্ছে উপস্থিত অতিথিদের হৃদয়।

ড্রয়িংরুমের ভেতরে একেবারে ডানদিকে একটা টেবিল। তার ওপরে সাদা লেসের টেবিলক্লথ। এটাই বেদি। মেঝের ওপরে বেদি পর্যন্ত কয়েকগজ লাল কার্পেট পাতা। টেবিলের দু-দিকে দুটো ফুলদানিতে সাজানো ফুল আর মাঝখানে একটা ভারী ব্রোঞ্জের তিনমাথাওয়ালা ক্যান্ডেল স্ট্যান্ডে জ্বলছে তিনটে মোটা সুগন্ধি মোমবাতি। একপাশে রাখা সবুজ মলাটের বাইবেল আর দেওয়ালে আটকানো ক্রুশবিদ্ধ যিশু আর মা মেরির পোর্সেলিনের মূর্তি। তার আরেকটু ওপরে মূর্তিদুটোর মাঝখানে ঝুলছে একটা প্রায় একহাত লম্বা ক্রুশকাঠ। বেদির চারপাশ জুড়ে খিলানের মতো করে লাগানো নানান রঙের ছোটো ছোটো বিজলিবাতি। আপাত সাধারণ কিন্তু মহিমাময়। আজ যে সেই

জেরুসালেমের মহান পুরুষের জন্মদিন। তাই আজ খাওয়া দাওয়া, হাসি-হুল্লোড়ে আসর জমজমাট। অনেক রাত পর্যন্ত ফূর্তি হচ্ছে আজ। সানন্দে পালন করা হচ্ছে মহামানবের আগমণ।

পিটার একহাতে পানীয়ের গবলেট আর অন্যহাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে কথা বলছে কখনো একজনের সঙ্গে তারপর আবার অন্যজনের সঙ্গে। ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো তো ক্রিসমাস গিফট পেয়ে খুব খুশি। পিটার তাদের সঙ্গে মজার মজার কথা বলছে আর তারা হেসে উঠলে আঙুল দিয়ে তাদের মাথার চুল ঘেঁটে দিয়ে হো-হো করে হেসে উঠছে।

রাত প্রায় একটা বাজে। এখানে সেলফ সার্ভিস। তাই অতিথিরা অনেকেই প্লেটে খাবার তুলে নিয়েছে। খেতে খেতেই সবাই মনে হয় পিটারকে কিছু বলল। সিগারেটটা নিভিয়ে দিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকে গেল সে। ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসা সিম্ফনির সুর বন্ধ হয়ে গেল। একহাতে গবলেট আর অন্যহাতে গিটার নিয়ে লনে বেরিয়ে এল পিটার। একজনের এগিয়ে দেওয়া হাতলছাড়া চেয়ারে বসে গবলেটের পানীয়তে একটা চুমুক মারল। তারপর গবলেটটা টেবিলে নামিয়ে রেখে হাতে গিটার তুলে নিয়ে গান ধরলে—

Dashing through the snow

In a one horse open sleigh

Over the fields we go,

laughing all the way.

Bells on bob tail ring

making spirits bright

What fun is to ride and sing

A sleighing song tonight...

খেতে খেতেই প্লেটে ফর্ক ঠুকতে ঠুকতে এরপরে সবাই একসঙ্গে সুর জুড়লো—

Jingle bells, jingle bells,

Jingle all the way...

Oh! what fun is to ride

In a one horse open sleigh...

পুরোটাই একেবারে নিখুঁত আর নির্ভুল গাইল পিটার। মদ্যপান করলেও সুর কখনো তার কাছ থেকে দূরে সরে যায় না। সে যেন সুরের বরপুত্র। তারপরে গানটা শেষ করে গবলেট তুলে এক চুমুকে শেষ করে দিল সে বাকি পানীয়টা।

অতিথিদের খাওয়া দাওয়া প্রায় শেষের মুখে। সে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে টেবিলে রাখা তার সিগারেটের কৌটো থেকে একটা নিয়ে ধরিয়ে ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসে।

একটু পরেই অতিথিদের খাওয়া শেষ হয়। ডাইনিং টেবিলের একপাশে এঁটো প্লেট সাফ করছে দু-জন বেয়ারা। এই কাজটা হলেই তারা চলে যাবে। সায়েব বাবুদের ফুরতির সময় তাদের থাকা মানা। এদিকে ভালোমন্দ খেয়ে তৃপ্ত অতিথিরা। মহামানবের জন্মদিনের আনন্দের আশ্লেষে তারা আজ রোমান্টিক। সবকিছুই ভালো লাগছে তাদের— এই আতিথেয়তা, শীতের আমেজ আর তার সঙ্গে পানীয়ের মোহময় আবেশ। তারা এসে

পিটারকে অনুরোধ করে আর একটা গান গাইতে যাতে তারা যুগলে নাচতে পারে। পিটারও ফেলতে পারে না তাদের অনুরোধ। তাই এবারে উঠে দাঁড়াল সে। সিগারেটে পরপর কয়েকটা টান মেরে সেটা হাতে নিয়ে ঈষৎ স্খলিত পায়ে ড্রয়িংরুমের দিকে এগিয়ে যায়, যেখানে রাখা তার পিয়ানো। পাশের টুলের ওপরে অ্যাশট্রেতে রাখে সিগারেটটা।

তারপরে শুরু করে রবার্ট বার্ণেসের লেখা একটা স্কটিশ গান—

Ye banks and braes o' bonnie Doon

How can ye bloom sae fresh and fair?

How can ye chaunt, ye little birds,

And I sae weary, fu' o' care.

এরপরেই তার ভাঙা ভাঙা বাংলায় পিটার যোগ করে—

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কি বা মৃদু বায়

তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে বহিয়া যায়।

Ye'll break my heart, ye warbling birds

That wanton o'ver the flowerin' thorn,

Ye mind me o' departed joys,

Departed, never to return.....

ছোটোবেলায় তার মায়ের কাছে পিটার এই গান শুনেছে, তারপরে শিখেছে। এইগানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার কত দুঃখ-সুখের স্মৃতি। সেইসব মনে আসছে আজ। তাই গভীর তন্ময়তায় সে গেয়ে চলে গানটা; সঙ্গে সুর মেলাচ্ছে তার পিয়ানো। সত্যিই পিটারের এদিকে ড্রয়িংরুমের টেবিলের পাশে হাতে হাত ধরে পাক মেরে মেরে নেচে চলেছে খুদেরা আর পাশের ফাঁকা জায়গায় জোড়ায় জোড়ায় একে অন্যের কাঁধে হাত রেখে নেচে চলেছে মহিলা আর পুরুষেরা। তারা কেউবা নাচছে স্ত্রী-র হাত ধরে, কেউবা বাগদত্তার আবার কেউবা তার সদ্য ভালোলাগা মেয়েটার সাথে।

পিটার চোখবুজে এই বন্ধনের গান আজ নিবেদন করছে সমবেত সকলকে; এমনকী সেই পরমপুরুষকেও যিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মৈত্রীর বাণী, শান্তির বাণী। এখন সে যেন যিশুর প্রথম ভক্ত সেন্ট পিটার। তাই এমন স্বর্গীয় আনন্দসুর বেরোচ্ছে তার গলা থেকে।

একসময় গান শেষ হয়। পিয়ানোর পাশের টুলের ওপরে অ্যাশট্রেতে রাখা সিগারেটটা তুলতে গিয়ে দেখে যে নিভে গেছে সেটা। সুরের স্নিগ্ধ আর্দ্রতা বুঝি নিভিয়ে দিয়েছে তার যন্ত্রণার আগুন।

এখন রাত প্রায় আড়াইটে। একে একে বিদায় নিচ্ছে অতিথিরা। পিটার এসে দাঁড়িয়েছে বাইরের গেটের মুখে। পুরুষেরা তাকে আলিঙ্গন করে ভালোবাসা জানাচ্ছে আর মহিলারা হ্যান্ডশেক করে গিয়ে বসছে তাদের গাড়িতে।

কুয়াশায় ঢাকা ম্লান আলোর পথ ধরে একে একে শেষ গাড়িটাও চলে গেল। গেটটা বন্ধ করে পিটার এগিয়ে যায় ড্রয়িংরুমের দিকে। ভেতরে ঢুকে একটা গবলেটে খানিকটা পানীয় ঢালে সে। বোতলের মুখ বন্ধ করে টেবিলের ওপরে রাখতে গিয়েই তার হঠাৎ

মনে হল ছাদের দরজায় যেন একটা আওয়াজ হল। পানীয়তে একটা চুমুক মেরে, গবলেটটা টেবিলে রেখে দু-তিন ধাপ সিঁড়িতে উঠে বুঝতে চেষ্টা করে ছাদে কেউ আছে কিনা। কেউ যে ওপরে নেই সেটা নিশ্চিত হয়ে সে নামতে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎই ড্রয়িংরুমের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু বন্ধ দরজার সামনে কে ও? ভুল দেখছে না তো সে? চোখ কচলে আবার দেখে। মনে হচ্ছে ওখানে কেউ একজন দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছে পিটার। তার ড্রয়িংরুমের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হাতে পায়ে কাপড় জড়ানো, কালো হাফপ্যান্ট আর চোখে গোল ঠুলির মতো চশমা পরা এক কালো মূর্তি। তার কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত জড়ানো একটা ল্যাসো, কোমরে গোঁজা রিভলভার আর একটা বুমেরাং। আর আজ কী যেন একটা অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছে সে। গন্ধটা কেমন যেন স্পিরিটের গন্ধের মতো মিষ্টি।

মদের ঘোরেও চমকে ওঠে সে। এই লোকটাই তো ক-দিন আগে এসেছিল তার ঘরে। বেদম মেরে লুঠ করেছিল তার মানিব্যাগ আর রিভলভার। লোকটা আজ আবার না মারধর করে। কিন্তু সেদিন স্পিরিটের এই গন্ধটা তো ছিল না। আজ কি তাহলে লোকটা স্পিরিট ঢেলে জ্বালিয়ে দেবে সব? তাই ভয়েই সে একটু জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে বলে—'Who are you? W... Why are you here again? What d...do you want from me?'

আগন্তুক লোকটা কোমরে গোঁজা রিভলভার বের করে তার দিকে তাক করে বলে—'Don't shout. I am the messenger of the devil.'

—'But a few days ago you robbed my house, bastard.' পিটারের স্বর খানিকটা উচ্চগ্রামে।

—'Yes, I did. But now I have come not to rob, but for your answers on some matters.'

—'On what matters? I don't want to talk to you on any matter.' একটু জোরেই বলে উঠল পিটার। তার এই ঔদ্ধত্য সহ্য হল না আগন্তুকের। একহাতেই সে পিটারের বাঁ-হাতটা মুচড়ে ধরল পেছনে আর সেইসঙ্গে একটা হাঁটুর গুঁতো মেরে তার কানের পাশে হিসহিসিয়ে উঠল— 'Keep quiet you bloody swine and do what I say.'

—'What to do?' ভয় পেয়ে গেছে পিটার।

—'Put a few disk on your changer. Don't you know, devil's messenger also likes symphonies?' বিদ্রূপ ঝরে পড়ে আগন্তুকের গলায়।

নিতান্ত অনুগতের মতো পিটার এগিয়ে গেল চেঞ্জারের দিকে। আগের বারের অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে এই কালো মূর্তি কতটা নৃশংস হতে পারে। তাই দু-চারটে সিম্ফনির ইম্পোর্টেড লং প্লেয়িং রেকর্ড নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে চেঞ্জারে চাপায় সে। তারপর সুইচ টিপে দিয়ে এসে দাঁড়ায় কালো মূর্তির সামনে।

'খুট' করে একটা আওয়াজ আর তারপরেই সারা ঘরে গমগম করতে থাকে বেঠোভেনের ফিফথ সিম্ফনি। যেন কোনো শিকারি ঈগল ডানা মেলে উড়ছে ঘরময়।

—'Now tell me what was in those soap packets?'

—'Which packets are you talking about? I don't know. Really I don't know anything.' পিটার চেষ্টা করে আগন্তুককে ঠেকানোর।

—'Tell me Peter, what was in those packets of the kid who was shot dead by the O.C.' কালো মূর্তির স্বরে নির্মমতা স্পষ্ট। সে বুঝেছে, এবারে আর মায়াদয়া নয়। পিটারের কাছ থেকে কথা বের করতে গেলে তাকে নির্মম হতেই হবে। তাই আবার পিটারের বাঁ-হাতটা পেছনে মুচড়ে ধরল সে। 'কট' করে একটা আওয়াজ। 'Oh my God' বলে হাতের কবজি ধরে নুয়ে পড়ল পিটার। তার হাতের কড়ে আঙুলটা ভেঙে দিয়েছে কালো মূর্তি। কিন্তু তার কাতরানির আওয়াজ চাপা পড়ে যায় সিম্ফনির শব্দে।

ককিয়ে উঠে সে কোনোরকমে বলে— 'Co...Co...Cocaine.'

—'Humm, now you have come to the track. Well, go to your writing table and take out your official writing pad.'

পিটার কোনোরকমে গিয়ে বসে তার রাইটিং টেবিলে। কাঁপা কাঁপা ডান হাতে বের করে তার অফিসিয়াল প্যাড আর কলম।

—'Write what was in those packets.'

পিটার লিখতে চায় না। ইতঃস্তত করে। তার দেরি দেখে আগন্তুক রিভলভারের বাঁট দিয়ে তার ঘাড়ের নীচে আঘাত করে। পিটারের চাপা আর্তনাদ ঢাকা পড়ে যায় সিম্ফনির উচ্চগ্রামের আওয়াজে। এখানে তাকে সাহায্য করার কেউ নেই। তাই সে বাধ্য হয়েই লিখতে থাকে।

বাক্যটা লেখা শেষ হতেই আগন্তুক জিজ্ঞেস করে— 'Who arranged the killing of the kid?'

—'Not me. O.C of the local P.S killed him.'

—'How did he know that the kid was a carrier unless he was informed earlier by someone?'

—'That I don't know.'

পিটার ভাঙবে, তবু মচকাবে না। তাই আবার একটা 'কট' করে হালকা শব্দ। ভাঙল এবার বাঁ-হাতের অনামিকাটা। গুঙিয়ে উঠে পেছনদিকে ধনুকের মতো বেঁকে যায় পিটার। বুঝতেই পারে— নাঃ, এ তাকে আজ ছাড়বে না। যন্ত্রণায় তার মুখ থেকে কথা বেরোয় না।

আগন্তুক কঠিন গলায় বলতে থাকে— 'Tell me the truth Peter. I know your car was waiting at the very next bend so that you can come to the spot as soon as the murder is committed. Isn't it?'

—'Oh...Oh...Yes. I had informed the O.C earlier. He chased the kid and shot him. I expected two shots— one from O.C and the other from that kid. But when I heard the third sound, I felt there was something unusal.' হাঁপাতে হাঁপাতে বলে পিটার। তারপর আবার শুরু করে— 'So I rushed to the spot with Karim. But believe me, I'm still cofused. I don't know who shot the constable.'

—'You will get that answer in time. But right now, you put your words on paper. Confess that you had planned the murder of that kid and that was for your double profit, you greedy bastard.'

পিটারকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে আবার হাতের রিভলভারের খোঁচা মেরে কালো মূর্তি বলে— 'Write that. Quick.' পিটার বাধ্য হয়েই অনুগত ভৃত্যের মতো লিখতে থাকে। কালো মূর্তির এই অত্যাচার ক্রমশ আর সহ্য করতে পারছে না সে। কখন যে এ তাকে মুক্তি দেবে?...

লেখা শেষ হয়ে গেলে ঠান্ডা গলায় অর্ডার আসে— 'Now tell me Pit, where is Shyamadas?'

নামটা শুনেই এত যন্ত্রণার মধ্যেও চমকে ওঠে পিটার। দিন চারেক আগে চাঁপাডাঙা থেকে পালিয়ে আসার পরে পিটারই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে; কাছাকাছিই একটা মেসের মতো বাড়িতে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেয়, যাতে নাকি তারা আবার নতুন করে রাকেট গড়ে তুলতে পারে। তখনই শ্যামাদাসের মুখে সে শুনেছে রজনীকান্ত বলে একজনের নাম, যে একাই ধ্বংস করে দিয়েছে তাদের রাকেটের একটা ঠেক। তাই আগন্তুকের মুখে শ্যামার নাম শুনে বিস্ময়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে— 'You Rajonikant?... Oh my God. You have reached even here?'

—'Yes, You are right. I am that Rajonikanto Roy. Now tell me where is Shyama?'

—'He lives at 47 Kid Street.'

—'Well write it down and don't try to fool me. Write.' ভয়ে আর মারে বিধ্বস্ত পিটার প্যাডের কাগজে লিখতে থাকে শ্যামাদাসের ঠিকানা। কোনোরকমে সঠিক ঠিকানাটা লেখে সে। এখন সে চাইছে এই কালো মূর্তির হাত থেকে কোনোভাবে পরিত্রাণ পেতে।

এইসময়ে দেওয়ালের কাক্কু ক্লকটা ডেকে উঠল। রাত এখন সাড়ে তিনটে। যা করার তাড়াতাড়িই করতে হবে রজনীকে। হাতে সময় কমে আসছে। একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে সে কলার টেনে দাঁড় করায় পিটারকে।

বলে— 'Now give me that telegram you have got from Dispur.'

—'Telegram? What telegram?' পিটার কি সময় নিচ্ছে? অন্য কোনো মতলব আছে নাকি তার? কিন্তু তা তো হতে দিলে চলবে না। সন্দেহ আর রাগ দুটোই চড়তে থাকে রজনীর।

সে সাপের মতো হিসহিসিয়ে ওঠে— 'Don't try to make me a fool. I know where you have kept it. Just take it out, otherwise I will break all your fingers.' বলে পিটারের পেছনে কষিয়ে এক লাথি মারে। আজ একটু বেশিই মদ খেয়েছে পিটার, তাই বোধ হয় তার আঙুল ভাঙার ব্যথাটা ততোটা প্রবল বোধ হচ্ছে না তার। কিন্তু পায়ে তার এখনও তেমন বশ নেই। লাথির ধাক্কায় কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তাই ধড়াম করে সে আছড়ে পড়ে পিয়ানোটার ওপরে। বেঠোভেনের ফিফথ সিম্ফনিকে ছাপিয়ে বিকট গর্জনে বেজে ওঠে গ্র্যান্ড পিয়ানো।

তবু কোনোরকমে উঠে নিজেকে সামলে নিয়ে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে এগিয়ে যায় দোতলায় তার শোওয়ার ঘরের দিকে। রজনী তুলে নিয়ে যায় তার রাইটিং প্যাড আর কলম। ঘরে ঢুকে চাবি দিয়ে খোলে তার আলমারি। আলমারির ভেতরে হয়তো তার নতুন পাওয়া সার্ভিস রিভলভার লুকিয়ে রাখতে পারে পিটার। তাই রজনী নিজের অস্ত্রটার নল ঠেকিয়ে রাখে তার মাথায়। পিটার রিভলভার বের করার আগেই গুলি চালাবে সে। এমনও হতে পারে যে প্রথমবার তার বাড়িতে রজনী আসার পরে পিটার টেলিগ্রামটা নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু না, পিটার সেটা রাখার তাক বদল করেছে মাত্র। হয়তো সে এটা রেখে দিয়েছে এই কারণে যে যদি কখনো পুলিশের জেরার সামনে পড়তে হয় তাকে, তবে সে এইটা দিয়েই নানান যুক্তি সাজিয়ে নিজের পিঠ বাঁচাতে চেষ্টা করবে।

টেলিগ্রামটা বের করতে করতে পিটার ভাবে-এটা নষ্ট করে ফেলাই তার উচিত ছিল।

খপ করে তার হাত থেকে টেলিগ্রামটা ছিনিয়ে নেয় রজনী। একঝলক উলটে-পালটে দেখেই বুঝতে পারে এটাই সেই টেলিগ্রাম।

এবার সে পিটারকে জিজ্ঞেস করে— 'Who is Lin Aung?'

স্খলিত কণ্ঠে জবাব আসে— 'He is just a carrier from Burma.'

পিটারকে কলার ধরে টেনে একটা চেয়ারে বসায়। তার কোলের ওপরে রাইটিং প্যাড আর কলমটা দেয়। এবার কিছু বলার আগেই সে লিখতে থাকে। তার বাঁ-হাতটা ঝুলে আছে চেয়ারের পাশে। মার খেয়ে আর টেনশনে তার মদের নেশা হালকা হতে শুরু করেছে। সে বুঝতেই পারছে যে সে এখন ডাবল ক্রশে পড়ে গেছে। রজনী তার কীর্তিকলাপ লালবাজারকে জানালে সে অ্যারেস্ট হবেই; আর সেইসঙ্গে বর্মার ডনও তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। রাকেটে সে বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত হয়ে যাবে; আর এই লাইনে বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি মৃত্যু। তার ওপরে আজ হয়তো রজনীও তার কিডের খুনের বদলা নিতে তাকে শেষই করে দেবে আর তারপরে হিসেব নেবে শ্যামাদাসের।

—'Now write the name of your don and also write his address.' কিন্তু এটা লেখা মানেই নিজের মৃত্যুকে নিশ্চিত করা। তাই তার হাতের পেনটা থরথর করে কাঁপছে। এবারে 'খুট' করে একটা ছোট্ট শব্দ। রজনী তার রিভলভারের সেফটি ক্যাচ টেনেছে।

তাই পিটার মুখে বলে— 'Aung Thiha. Lives in Rangoon. There he runs a curio shop at Merchant Street.'

—'What's the name of that shop?'

—'The... "The Vintage"... Oh... that much I know. Believe me. I know nothing more.'

—'Write it.' হুকুম করে রজনী। নিতান্তই অপারগ হয়ে লেখে পিটার। মদের নেশা প্রায় কেটেই গেছে তার। আঙুল ভাঙার যন্ত্রণা আর মৃত্যুভয়ে মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠছে তার শরীর।

—'Put your signature below.'

পিটার সই করে লেখার নীচে। রজনী সঙ্গে সঙ্গে প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে সেটা আর টেলিগ্রামটা চালান করে দেয় কোমরের পাউচ ব্যাগে।

লং-প্লেয়িং রেকর্ডটা থেমে গেছে। ওপর থেকেও স্পষ্ট শোনা গেল 'খুট খুটাস' করে একটা শব্দ। তার মানে চেঞ্জারে আর একটা রেকর্ড এসে পড়ল। একটু পরেই বেজে উঠল আরেকটা সিম্ফনি। এবারে মোজার্ট। এখন আর ঈগল নয়, ঘরময় উড়ছে সুরের প্রজাপতি।

তারপরে রজনী বলতে থাকে— 'Listen Pit, I had shot that constable. But you cannot prove that anyway. Then I had to be a brut because I lost my beloved kid. But you ... you have become a monster because of your greed.'

—'Yes... yes... I am a monster. But you know, once this monster was a man... He also had a family... a wife, a little girl... All I had. But I lost those just because of my greed for money.' পিটারের চোখ ছলছল করে ওঠে।

তার মনে হয়— এ যেন প্রভু যিশুর কাছে বড়োদিনে পিটারের কনফেশন। তাই চুপ করে শুনতে থাকে রজনী। মারার আগে পিটারকে তার শেষ কথাগুলো বলতে দিতে চায় সে।

—'Where are they now? What happened to them?'

পিটার বলতে থাকে— 'Before coming here we used to stay together in my bunglow near Bagbazar ghat... My wife told me to leave them when she came to know that I got involved with such a notorious smuggler racket. She wanted me to remain an honest dutiful police officer... She was well aware of the dangers of smuggling... tried a lot to refrain me, but I didn't listen to her. In the mean time I became habituated with the lavish life-style and also there was no way to escape from that racket.' পিটার এবারে বাঁ-হাতের কবজি ধরে একটু থামে। হাড় ভাঙার যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠছে সে। রজনীও চায়নি তাকে এতটা মারধর করতে। কিন্তু কথা বের করার জন্যে তার আর অন্য উপায় ছিল না।

পিটার আবার বলতে শুরু করে— 'So, one day I had to leave them...and after that I started living here...She even kept away my little princess from me. You know Rajni, when my little girl had cancer I told my wife that I would bear all the expenses of her treatment. But she refused to accept my offer. Being a father I couldn't stand by my dear princess that time. And then on....'

—'But where does your wife live now?'

—'After the death of my daughter, she went to her native village in England. Forever.'

পিটারের চোখে জল। একটু সামলে নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করে— 'And I... this devil's son is still alive... Oh Jesus, why don't you...?'

কান্নার ভারে পিটারের কথা আটকে যায়। নুয়ে পড়ে সে; যত না শরীরের ব্যথায়, তার চেয়েও বেশি মানসিক যন্ত্রণায়। রজনীর মনে হতে থাকে— এইসব কথা পিটার আগে কখনো কাউকে বলে উঠতে পারেনি। তাই আজ তাকে তার মৃত্যুদূত জেনেও, শারীরিক কষ্ট সহ্য করেও পিটার তাকে তার এতদিনের বুকে চেপে রাখা কষ্টগুলো বলছে। আজ সেই কষ্টগুলো থেকে হালকা হতে চাইছে সে।

তাই রজনী ঠিকই করে ফেলে, আজকের এই বিশেষ দিনে নরহত্যা সে করবে না। যথেষ্ট হয়েছে। পিটারকে সে তুলে দেবে পুলিশের হাতেই। তাতে হয়তো সে ডনের মৃত্যু-পরোয়ানা থেকে বেঁচে গেলেও যেতে পারে।

তাই সে বলে— 'Where is the telephone?' পিটার কোনোরকমে ডান হাত দিয়ে ঘরের কোনে রাখা এক্সটেনশন রিসিভারটা দেখিয়ে দেয়। সে যেন আর কথা বলতে পারছে না। একেবারে থম মেরে গেছে।

রজনী দেখে দূরে ঘরের বিছানার একপাশে রাখা এক্সটেনশন রিসিভারটা। সে এগিয়ে গিয়ে ডায়াল করে একশো নম্বরে।

—'হ্যালো, লালবাজার?'

—'বলছি। বলুন কী চান?' নিশ্চয়ই টেলিফোন অপারেটর। প্রয়োজন মতো লাইনটা দিয়ে দেবে নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্টে। কী বলবে রজনী? একটু থমকে থেকে সে বলে— 'ডি ডি ডিপার্টমেন্টে দিন।'

—'দিচ্ছি। একটু ধরুন প্লিজ।' মহিলা কণ্ঠে অনুরোধ।

লাইন পাওয়ার জন্যে একটু অপেক্ষা করতে হবে এবার। তাই কানে রিসিভারটা ধরে পিটারের অবস্থা দেখার জন্যে ঘুরতেই দেখে পিটার ঘরে নেই। মেঝেতে পড়ে তার প্যাড আর কলম। তবে কোথায় গেল সে? তাড়াতাড়ি রিসিভার রেখে ঘর থেকে বেরোতেই দেখে ছাদে যাবার সিঁড়ির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল পিটারের শরীরটা। ছাদে কেন যাচ্ছে সে? তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে রজনী। কিন্তু সিঁড়ির দরজায় যখন সে পৌঁছোলো ততক্ষণে বড়ো দেরি হয়ে গেছে। শেষ শক্তি দিয়ে দৌড়ে পিটার পৌঁছে গেছে ছাদের নীচু পাঁচিলের কাছে, আর পরমুহূর্তেই তার শরীরটা পাঁচিল টপকে খসে পড়ল নীচে। ধপ করে একটা আওয়াজ। পাঁচিলের কাছে ছুটে এসে রজনী দেখে— নীচের বাঁধানো চাতালে পিটার পড়ে আছে চিৎ হয়ে। তক্ষুনি তরতরিয়ে ছাদের ড্রেন পাইপ বেয়ে নেমে সে টিপে দেখে পিটারের নাড়ি।

নাঃ। সব শেষ। আর কিচ্ছু করার নেই। তাই আবার পাইপ বেয়ে সে উঠে পড়ে ছাদে আর তারপরে সোজা চলে যায় দোতলার টয়লেটে। সাবান দিয়ে কালি ধুতে ধুতে রজনী অনুভব করে যে তার ভেতরেও কেমন যেন একটা উথালপাতাল চলছে।

সব কালি ধুয়ে নীচে নেমে ড্রয়িংরুমের যিশুর বেদির সামনে সে হাতজোড় করে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ। তবুও তার ভেতরের উথালপাতাল ভাবটা যাচ্ছে না কেন? ধীরে ধীরে চোখদুটো বোজে সে, আর তখনই কাক্কু ক্লকটা জানান দেয় চারটে বাজল।

ধীর পায়ে রজনী বেরিয়ে আসে লনে। তখনও শীতের আকাশ অন্ধকার। ভোররাতের কুয়াশা আরও ঘন হয়েছে। তবু লনের ক্রিসমাস ট্রিতে লাগানো রঙিন বাতিগুলো তখনও

আলো ছড়াচ্ছে। বাইরের ডিনার টেবিলে রাখা গবলেট আর কিছু খালি আর কিছু ভরতি কয়েকটা মদের বোতল।

ভেতরের উথালপাতাল ভাবটা এখনও একটা দলা হয়ে আটকে আছে তার গলার কাছে। বিশ্রী লাগছে। খুব...খুব বিশ্রী। কিন্তু এই বিশ্রী ভাবটা না কাটালেই নয়। কেন? কেন এমন লাগছে তার? উত্তর খুঁজে পায় না রজনী। তাই হঠাৎই একটা মদের বোতল তুলে নিয়ে ছিপি খুলে ঢকঢক করে চার-পাঁচ ঢোঁক গিলে নেয়। জীবনে প্রথমবার।

গলা দিয়ে নামছে তরল আগুন। আর যত সে আগুন নামছে, ততই তার গলার কাছে আটকে থাকা বিশ্রী দলাটা গলে গলে যাচ্ছে।

টেবিলে বোতলটা নামিয়ে রেখে একটু অপেক্ষা করে সে। তারপরে বাকি বোতলগুলো থেকে সব মদ ছড়িয়ে দেয় লনে। এবার বেশ একটু স্বাভাবিক লাগছে। শুনতে পাচ্ছে সে — পিটারের ড্রয়িংরুমের ভেতর থেকে ভেসে আসছে মোজার্টের ফর্টিয়েথ সিম্ফনির সুর। সেই সুর এখন উড়ছে প্রজাপতির ভেলভেট নরম রঙিন পাখার মতো।

লোহার গেট ঠেলে বেরিয়ে রাস্তার দু-দিক দেখে নিয়ে উলটোদিকের বাড়ির পাইপ বেয়ে ছাদে উঠে পড়ে রজনী। ওখানেই যে সে রেখে এসেছে তার শার্ট, প্যান্ট আর ঝোলাব্যাগ।

বউবাজারের বাড়িতে ঢোকার মুখেই দেখা পরিতোষ বাবুর সঙ্গে। উনি মর্‌নিং ওয়াকে বেরোচ্ছেন। রজনীকে দেখে বললেন— 'হাঁটা হয়ে গেল? তা ঠান্ডায় সোয়েটার গায়ে দাওনি কেন? কেমন লাল হয়ে আছে চোখদুটো। জল কাটছে।'

—'হ্যাঁ মেসোমশাই। বোধ হয় ঠান্ডা লেগে গেছে। কেমন জ্বালা জ্বালা করছে চোখদুটো।' পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকে সে।

অন্যান্য রাতের মতো আজও সকালে বড়োদিনের পবিত্র আনন্দ-রাত চলে গেছে। তবে যাবার আগে সে শুধু রেখে গেছে একজন ব্যাকুল পিতার শব আর একজনের কুয়াশা ভেজা ভারী মন।

জানুয়ারি, ১৯৪৫

কানাইয়ের মমি দর্শন, জবানবন্দির ফোটোকপি আর নির্মল সেন

পয়লা জানুয়ারি। তাই আজ ছুটি। যুদ্ধের বাজারেও যার যেমন সামর্থ্য, তেমন করেই নতুন ইংরাজি বছরকে বরণ করে নিয়েছে সবাই। যুদ্ধের বাজার হলেও গতকাল মাঝরাতে সায়েবপাড়ায় যে আতসবাজি পুড়েছে তার রোশনাই দেখা গেছে বউবাজারের ছাদ থেকেও। কানাই এই প্রথমবার দেখছে সব। তাদের গ্রামে তো এসবের কোনো বালাই নেই। তাই তার মনটাও বেশ খুশি খুশি।

সেইজন্যেই বোধ হয় দুপুরের খাওয়া শেষ হতেই কানাই বলল— 'স্যার, আজ তোমার আর সুবিমল কাকুর অফিসটা দেখে এলে হত না?'

বুদ্ধিমান ছেলে। আসলে সে জাদুঘরটা দেখতে চাইছে। তাই সরাসরি না বলে ঘুরিয়ে বলল কথাটা। তার ইচ্ছেটা বুঝেই রজনী বলল— 'ঠিক আছে চল। দেখবি কেমন কাঁচের বাক্সে শুয়ে আছে মমি।'

মিশর দেশে পিরামিড আর মমি, দুটোই আছে। পিরামিডের মধ্যে থাকত মমি। আর আছে নীলনদ। এসব কথা বইতে পড়েছে কানাই। তাই আজ মমি দেখতে পাবে বলে বেশ উত্তেজিত সে। তাই দুপুর একটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ে তারা।

জাদুঘরের গেটে ঢুকেই সে বলে ওঠে— 'ওই দেখ স্যার, অশোকস্তম্ভ।' যেন রজনী কখনো দেখেনি সেটা আগে। সে কানাইয়ের এই উৎসাহ আর কৌতূহলকে দমিয়ে দিতে চায় না। বলে— 'আগে আমার অফিস ঘরটা দেখে নে। তারপর মেলাই সময় পাবি।' রজনী তাকে নিয়ে যায় সেই ঘরে, যেখানে সে বসে কাজ করে।

ঘরে ঢুকে দেখে আজ ছুটির দিনেও ড্যানীবাবু তাঁর টেবিলে বসে কাজ করছেন। তাকে দেখে হেসে বললেন— 'আরে রজনী যে। এসো এসো। তা কেমন যেন একটা লাগছে তোমায়। হুম, বুঝেছি, ক-দিন দাড়ি কামাওনি মনে হচ্ছে।'

—'হ্যাঁ স্যার। মানে এই নানান ব্যস্ততায়...। তারপর একে নিয়ে কলকাতা দেখাতে হচ্ছে। তাই আর কী...।'

—'ও, তা এই বুঝি তোমার সেই ছেলে যার জন্যে তুমি স্কুল খুঁজছিলে?

—'হ্যাঁ স্যার, এইই সেই। এই কানাই স্যারকে প্রণাম কর।'

কানাই গিয়ে ড্যানীবাবুকে প্রণাম করতেই উনি তাকে কাছে টেনে নিয়ে একটু জড়িয়ে ধরেন।

—'তা তোমার নাম কী বাবু?'

—'আজ্ঞে কানাই। মানে শ্রীকানাই দত্ত।'

—'তা তুমি কি মিউজিয়ম দেখতে এসেছ তোমার স্যারের সঙ্গে?'

—'হ্যাঁ। আমার স্যার বলেছে যে এখানে নাকি মিশর দেশের মমি আছে?'

—'তা শুধু মমি কেন, এখানে আরও কতকিছু আছে যা তুমি একদিনে দেখে শেষ করতে পারবে না।'

—'আবার অন্যদিন এসে দেখব। স্যার আর সুবিমল কাকু তো এখানেই কাজ করে।'

—'তবে এবারে তো তোমায় এখানের স্কুলে ভরতি হতে হবে। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে যে।'

—'ঠিক আছে স্যার, আমি তো কলকাতায় পড়বো বলেই এসেছি।'

—'তা তোমায় তো হস্টেলে থাকতে হবে।'

বিস্ময়ে রজনী বলে— 'হস্টেলের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে স্যার?'

—'হ্যাঁ। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের মুকুলবাবুকে বলেছিলাম। রিটায়ার করলে কি হবে, উনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। সবাই সম্মান করে। তা উনিই বলে কয়ে হস্টেলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।' বলে ড্রয়ার খুলে একটা খাম রজনীর হাতে দিয়ে বললেন—'এই নাও ওনার রেফার লেটার। তুমি আজ না এলে আমিই ফোন করে আসতে বলতাম তোমায়। মনে থাকে যেন, পরশু দিন অ্যাডমিশন।'

—'বাঃ, তাহলে তো ভালোই হল। কানাই, তোর হস্টেলের ব্যবস্থা স্যার করে ফেলেছেন।'

কানাই ড্যানীবাবুকে বলে— 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

—'ওয়েলকাম মাই বয়। তা শুনেছি যে তুমি নাকি জুডো জানো?'

—'জুডো নয় স্যার, তাইকোন্ডো।'

—'ও আচ্ছা, আচ্ছা। বুঝেছি। তা কখনো রাগ হলে যেন হস্টেলের ছেলেদের ওপরে ওটার প্রয়োগ করে বোসো না। তাহলে কিন্তু হস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেবে।'

—'না স্যার, ওরা তো আমার বন্ধু হবে। বন্ধুদের সাথে তাইকোন্ডো খেলতে হয়। বন্ধুদের মারতে নেই।'

—'ঠিক বলেছ। তবে আমার মনে হয় ওরা তাইকোন্ডো জানে না।' এই সরল ছেলেটার সাথে ড্যানীবাবু গল্প জুড়েছেন বলেই মনে হচ্ছে।

—'আমি ওদের শিখিয়ে দেব স্যার।'

—'হুমম, হি ইস আ ভেরি স্মার্ট বয় রজনী। যাও, আর সময় নষ্ট না করে ওকে মিউজিয়মটা ঘুরিয়ে দেখাও।'

এমন সময় হাজির মুক্তোরাম। রজনীকে দেখেই সে বলে উঠল— 'হ্যাপি নিউ ইয়ার স্যার। ভালো আচেন তো?'

শহরে থাকতে থাকতে মুক্তোরামও আদব-কায়দা বেশ শিখে গেছে। জবাবে তাই রজনী বলে— 'হ্যাপি নিউ ইয়ার। তা তোমার কী খবর কি মুক্তোরাম?'

—'এই চলে যাচ্চে। অপিসের আদ্দেকের বেশি লোকই তো ছুটিতে স্যার। ক্যান্টিনে খাবার লোক খুবই কম। তা আপনাকে একটু চা দেব নাকি? সবারই তো চা খাওয়া হয়ে গেচে।'

—'না, চা লাগবে না। তা তোমার হাতে কি সময় আছে? যদি থাকে, তাহলে এই ছেলেটাকে একটু মিউজিয়মটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারবে?'

—'এটি কে স্যার?' মুক্তোরাম কথাটা বলে কানাইকে দেখে।

—'এ আমার ছাত্র। এখানকার স্কুলে ভরতি হবে। তাই ক-দিন কলকাতা ঘুরে দেখছে আমার সাথে।'

—'সে তো ভালোই। ইস্কুল খুলে গেলে তো আর ছুটিছাটা ছাড়া দেকা হবে না। তা তোমার নাম কী বাবু?' শেষের কথাটা কানাইকে বলা। সে এতক্ষণে বুঝে গেছে যে মুক্তোরাম জাদুঘরে কাজ করে।

—'শ্রীকানাই দত্ত।'

—'বাঃ। বেশ সোন্দর নাম। তা চল, আমরা ঘুরে দেকে আসি সব।'

—'আগে আমাকে মমির ঘরে নিয়ে চল।'

—'বেশ তো, মমি দিয়েই শুরু করা যাক। চল।'

কানাই আর মুক্তোরাম চলে যেতেই জাদুঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে রজনী। কাছেই ৪৭ নম্বর কিড স্ট্রিটে খোঁজ করে শ্যামাদাসের দেখা পায় না। সে নাকি তিনদিন আগে ঘর

ছেড়ে চলে গেছে। তার মানে সে পিটারের মারা যাওয়ার খবর পেয়েই কেটে পড়েছে। পিটারের মৃত্যুর পর থেকেই রজনীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বলতে থাকে আবার হয়তো কিছু একটা ঘটবে। বিশেষ করে ডনের তরফ থেকে। তাই সে তার কাঁধের ঝোলানো অফিসে আসার ব্যাগে বিশেষ বিশেষ কিছু জিনিসপত্র নিয়েই বেরোয়। কখন কী ঘটে তার জন্যে আগে থেকেই সবরকমভাবে তৈরি থাকা ভালো। কে জানে কখন কোনটা কাজে লাগে। তাই অফিসে ফেরার পথে সে একটা ভ্যাটের কাছে একটু দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে বের করে একটা শিশি। তার ভেতরের তরলটা দু-হাতের চেটোয় ভালো করে মেখে শিশিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ভ্যাটে। অফিসে ঢুকতে ঢুকতেই শুকিয়ে যাবে হাতে মাখা তরলটা।

আধঘণ্টার মধ্যেই অফিসে ঢুকে নিজের টেবিলে বসে তার ব্যাগ থেকে বের করে সে লিন আঙের টেলিগ্রাম আর পিটারের লেখা জবানবন্দির ফোটোকপি। বাড়ি থেকে একফাঁকে বেরিয়ে ধর্মতলার একটা স্টুডিয়ো থেকে ছবি তুলিয়েছে সেগুলোর। তবে সেগুলো স্টুডিয়োতে দেওয়ার বা নেওয়ার সময়ে আগে থেকেই সে হাতে মেখে নিয়েছিল তার ব্যাগে রাখা সেই বিশেষ তরলটা। অর্থাৎ কি না, কোনো কিছুতেই তার হাতের ছাপ থাকবে না। তাই এবারে টেবিলের টাইপ মেশিনের ঢাকা খুলে একটা সাদা কাগজ লাগায় সেটায়।

—'পার্সোনাল কাজ বুঝি?' ভেসে এল ড্যানীবাবুর গলা।

—'হ্যাঁ স্যার।'

—'ঠিক আছে কর।' বলেই স্মিত হেসে নিজের কাজে ডুবে গেলেন ড্যানীবাবু। তারপরেই বলে ওঠেন— 'কোথায় যেন স্পিরিটের গন্ধ পাচ্ছি। ল্যাব থেকে কি? মনে হয় বোতলের ছিপিটা খুলে রেখে এসেছি।' তাড়াতাড়ি উঠে ল্যাবরেটরির দিকে দৌড়ন ড্যানীবাবু।

চিঠির টাইপ শেষ করে ব্যাগ থেকে একটা মাঝারি সাইজের খাম বের করে মেশিনে চড়ায় সে। খামের ওপরে টাইপ করে লিখল— 'ডি.সি, ডি ডি ডিপার্টমেন্ট, লালবাজার, কলকাতা'। তারপরে সেই খামের মধ্যে টাইপ করা চিঠি, টেলিগ্রাম আর জবানবন্দির ফোটোকপি ঢুকিয়ে খামের মুখটা আঠা দিয়ে আটকে দিল। একটা স্ট্যাম্পও লাগিয়ে দিল খামে। কানাইকে আজ যখন কে.সি.দাসের কড়াপাকের সন্দেশ খাওয়াতে নিয়ে যাবে, তখন ওখানেরই একটা লেটার বক্সে ড্রপ করে দিলেই হবে।

দু-দিন পরে

—'আমি ভাবতেও পারছি না যে আমাদেরই একজন সিনিয়র অফিসার একজন কোকেন মাফিয়া।' হতাশা ফুটে বেরোয় পুলিশ কমিশনারের গলায়।

—'স্যার, তার কাজের শাস্তি সে পেয়েছে। এখন আমাদের নজর দিতে হবে অন্য জায়গায়। আমাদের সামনে অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে স্যার।' বলল নির্মল সেন।

—'কী কী? পরপর বলে যান।'

—'স্যার, যদি ধরে নিই যে পিটার সুইসাইড করেছিল, তাহলেও তার সুইসাইড করার আগে কেউ তার ঘরে ঢুকেছিল। সে পিটারের মদ্যপ অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে প্রচণ্ড মারধোর করে। এমনকী তার বাঁ-হাতের আঙুল ভেঙে দেয়।'

—'রাইট ইউ আর মিস্টার সেন। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট বলছে পিটারের আঙুল ভাঙা ছিল। ওপর থেকে কেউ পড়ে গেলে তার স্কাল ড্যামেজ হতে পারে। তার হিউমারাস, রেডিয়াস বা আলনা ভেঙে যেতে পারে; তার রিবস বা পায়ের টিবিয়া কিংবা ফিমার বোনসও ভেঙে যেতে পারে; এমনকী তার শোল্ডারের জয়েন্ট ডিসলোকেট হতে পারে। কিন্তু আমার সার্ভিস লাইফে কখনোই ফ্যালাঞ্জেস ভাঙতে দেখিনি। আই মিন, বিগ বোনস ভাঙতে পারে কিন্তু স্মল বোনস নয়। তাই আপনার অনুমান একেবারে ঠিক। কোনো একজন পিটারের বাড়িতে ঢুকেছিল সেই রাতে। তবে মিস্টার সেন, সে কি পিটারকে ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে মার্ডার করে থাকতে পারে না?' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে যান কিঞ্চিৎ উত্তেজিত কমিশনার।

—'ইয়েস স্যার, সেটারও চান্স আছে। তবে স্যার, এর আগেরবার যে লোক পিটারের পার্স আর রিভলভার চুরি করে সে, আর এই বড়োদিনের রাতের ইন্ট্রুডার কিন্তু একই লোক। দু-বারের ঘটনা থেকে পাওয়া কালো রং কিন্তু সেই কথাই বলছে। তার মানে সে মুখে কালো রং মেখে তার পরিচয় আড়াল করতে চেয়েছিল। তাহলে, পিটার কি তাকে আগে থেকেই চিনত? আরও একটা কথা এই যে, দু-ক্ষেত্রেই তার কোনো ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া যায়নি। লোকটা মনে হয় গ্লাভস পরে এসেছিল আর চারপাশে মদ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে স্নিফার ডগও কোনো ট্র্যাক করতে পারেনি। আমার মনে হয় লোকটা প্রফেসনাল মার্ডারার, নইলে সে এত ট্রিক জানল কী করে।'

—'হতেই পারে মিস্টার সেন। আচ্ছা সে তো পিটারের কনফেশন লেটার আর এই টেলিগ্রাম নিতে এবারে বাড়িতে ঢুকেছিল। তাহলে তার কাছে তো আগেরবারের চুরি যাওয়া পিটারের রিভলভারটাও থেকে থাকবে হয়তো। তা একটা বুলেটেই তো সে এবারের কাজটা মিটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে সেটা করেনি কেন?'

—'সে জন্যেই তো বলছি স্যার, হয় পিটারকে ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, নয়তো পিটার সুইসাইড করেছে বা তাকে তা করতে বাধ্য করা হয়েছে। আর ওই লোকটা হয়তো পিটারের রিভলভার চুরি করেনি। আবার এমনও হতে পারে যে পিটার সেটা স্মাগল করে দিয়েছে কাউকে। স্যার, চাঁপাডাঙার গ্রামে যে বুড়ো লোকটাকে গুলি করে মারা হয়েছিল, সেই বুলেটটা কিন্তু ছিল পয়েন্ট থ্রি টু বোরের।'

—'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে মিস্টার সেন, যে এই ইন্ট্রুডার পিটারের রাইভ্যাল রাকেটের লোক। পিটারকে মারার পরে আমাদের কাছে এই ডকুমেন্টস পাঠিয়ে বলতে চাইছে যে আমরা যেন পিটারের ওই রাকেটটাকে নষ্ট করে দিই।'

—'হতেই পারে স্যার। তবে রাইভ্যাল রাকেটের লোক হলে তো এসবের কোনো প্রয়োজনই হয় না। তারা গ্রুপে আসবে, মার্ডার করবে আর চলে যাবে। নিজেদের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে থাকে স্যার। তাহলে এটাই দাঁড়ায় যে এই মার্ডারার কোনো রাকেটের লোক নয়। সে একা আর তাই সে পিটারের রাকেট ডেসট্রয় করার জন্যে পুলিশের হেল্প চাইছে।' ব্যাখ্যা দেন নির্মল সেন।

একটুখানি চুপ করে ভাবেন কমিশনার। সেনের যুক্তিগুলো কিন্তু ফেলনা নয়। তবুও কতকগুলো প্রশ্ন এখনও থেকেই যায়।

তাই বলেন— 'আচ্ছা, কালো কালিটার অ্যানালিসিস রিপোর্ট বলছে যে এটা নাকি যাত্রা বা থিয়েটারের সময় গায়ে রং করতে কাজে লাগে। তাহলে ইন্ট্রুডারের সঙ্গে কি যাত্রা বা থিয়েটারের কোনো কানেকশন আছে?'

—'সেটাও সম্ভব স্যার। আর তাই কালিটার খোঁজে আমি লোক লাগিয়েছি। কয়েক দিনের মধ্যে কে কিনেছিল এই কালি?'

—'নেক্সট বলুন, হু ইস দিস শ্যামাদাস রায়? এই চিঠি অনুসারে তো পিটারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। তবে তার খোঁজ পেয়েছেন কি?' রজনীর লেখা চিঠিটা দেখতে দেখতে প্রশ্নটা করেন কমিশনার।

—'না স্যার তার খোঁজ পাইনি, তবে তার সম্বন্ধে যেটুকু জানতে পেরেছি যে সে হুগলির বাসিন্দা। সেখানে তার একটা পৈতৃক বাড়ি আছে। চাঁপাডাঙার সঙ্গেও তার একটা কানেকশন ছিল। সে সেখানে একটা স্বদেশি দল চালাত। কলকাতাতেও তার যাওয়া আসা ছিল। পিটারের কাছে তো সে যেতোই কিন্তু কলকাতায় আর কোথায় কোথায় তার যোগাযোগ ছিল, সেটা এখনও জানতে পারিনি। তবে কলকাতা, চাঁপাডাঙা বা হুগলি কোথাও কিন্তু তার হদিশ পাওয়া যায়নি। নট অনলি দ্যাট, তার সঙ্গী দিনেশ নামের ছেলেটাও এখনও মিসিং। তবে ওই পাগলের কেসটার জন্যে মিউজিয়মের সামনে নজরদারী রাখার ব্যবস্থা করেছি স্যার।'

চুপ করে থাকেন কমিশনার। কেসটা বড়ো জটিল। সব অঙ্ক কেমন যেন মিলতে মিলতেও মিলছে না। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে একসময় নির্মল সেন বলেন—'স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

—'বলুন।'

—'রেঙ্গুনের ওই মিস্টার আঙ থিহার ব্যাপারটায় কিছু করা যেতে পারে কি?'

চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে কমিশনার সাহেব বলেন— 'ওই ব্যাপারটায় আপাতত তেমন কিছু করার নেই মিস্টার সেন। জানেনই তো বার্মা এখন জাপানিদের দখলে।'

—'স্যার, আমরা কি ওখানে খোঁজখবর করার জন্যে কোনো সিক্রেট এজেন্ট পাঠাতে পারি না?'

—'তা হয়তো যায়; কিন্তু কিছুটা মোঙ্গোলিয়ান দেখতে, বার্মিজ ল্যাংগুয়েজ জানা ইনটেলিজেন্ট কোনো লোক কি আপনার জানা আছে?'

—'না স্যার। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

—'তাহলে ওই ব্যাপারটা এখন সেকেন্ডারি। প্রায়োরিটি দিন পিটারের বাড়ির ইন্ট্রুডারকে। হি ইজ নট অনলি ফেরোসাস অ্যান্ড ক্লেভার, বাট ইনটেলিজেন্ট অলসো। ওকে পেলে আমাদের সব প্রবলেম সল্ভ হয়ে যাবে। সো ট্রাই টু ফাইন্ড হিম। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।'

ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫

স্কুলের হিরো কানাই দত্ত

একমাসের বেশি হল স্কুলে ভরতি হয়েছে কানাই। কাছাকাছি হস্টেলে থাকার বন্দোবস্তও হয়েছে তার। এমনিতেই সে চৌখস ছেলে। তাই নিজের জামাকাপড় কাচতে পারে, নিজের মশারি নিজেই খাটাতে পারে, নতুন বইখাতা সে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখতে পারে নিজের বুককেসে। আর সেই বুককেসের ভেতরেই রাখে তার রজনী স্যারের দেওয়া নিজের বুমেরাংটা।

শহুরে বাংলা বলা সে তার স্যারের সঙ্গে থাকতে থাকতেই অনেকটা আয়ত্ত করেছিল, তবে তাতে এখনও মিশে আছে খানিকটা গ্রাম্য টান। তবে হস্টেলের কোনো ছেলেই সেটা নিয়ে মস্করা করে না, কেন না তারাও যে এসেছে গ্রাম থেকেই। বরং কানাইয়ের চেয়ে তাদের কথায় গ্রাম্য শব্দ আর টান দুটোই বেশি। তবে তাদের খুব কৌতূহল তার বুমেরাং নিয়ে আর তারা আরও আশ্চর্য হয় জেনে যে সে তাইকোন্ডো জানে। দুটোই তাদের কাছে পরম বিস্ময়ের।

তাই ইদানীং বিকেলে ছুটির পরে তারা কয়েকজন মিলে চলে যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে। সেখানে খোলা মাঠের দু-দিকে বাঁশ দিয়ে দুটো গোলপোস্ট করা আছে। তবে তাতে জাল লাগানো নেই। সেই গোলপোস্টের একটা বারপোস্টকে তাক করে কানাই তার বুমেরাং ছোঁড়ে। সাঁ করে উড়ে গিয়ে সেটা লাগে গোলপোস্টের বারে। ছেলেদের মধ্যেই কেউ একজন ভারি উৎসাহে দৌড়ে গিয়ে কুড়িয়ে আনে সেটা। এবার কানাই তাদের দেখায় যে টার্গেট মিস হলে বুমেরাং কী করে? তাই সে ইচ্ছে করেই টার্গেট মিস করে। বুমেরাংটা গোলপোস্টের বারটাকে পাক মেরে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে কানাইদের থেকে খানিকটা দূরে। ছেলেরা এই আজব অস্ত্রের তাজ্জব করা কাণ্ডকারখানা দেখে হাততালি দিয়ে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।

আবার কখনো বা তারা তাইকোন্ডোর প্যাঁচ জানতে চায়, বুমেরাং ছোঁড়া শিখতে চায়। কানাই তখন তাদের দু-চারটে প্যাঁচ শিখিয়ে দেয় আবার কখনো বা তাদের বুমেরাং ছোঁড়ার কৌশল শেখায়। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তারা কানাইকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতে শুরু করে। কানাইয়ের তাইকোন্ডোর গাউন, তার শক্তপোক্ত শরীর তাদের ভারি আকর্ষণ করে। তারা কানাইয়ের কাছে শিখতে চায়। কিন্তু তাইকোন্ডোর গাউন তারা পাবে কোথায়? তাই বুদ্ধিমান কানাই তাদের হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি গায়ে পরিয়েই তালিম দিতে শুরু করে।

এদিকে মাস দেড়েকের মধ্যেই স্কুলে ছড়িয়ে যায় তার কথা। তাই একদিন স্কুলের গেমস টিচার সুধাংশু স্যার টিফিনের সময়ে তাইকোন্ডোর প্যাঁচ দেখাতে বলেন। ছেলেদের মুখে উনি শুনেছেন কানাইয়ের এই গুণের কথা। তাই তাকে বলা। অন্যদিকে কানাইও চায় নায়ক হতে। একজন গাঁয়ের ছেলেও যে কলকাতার ছেলেদের চেয়ে কিছু বিষয়ে সেরা, সেটা সে জানান দিতে চায়। তাই তার সঙ্গী ছেলেরাই ব্যায়ামের ঘর থেকে জিমন্যাস্টিকস শেখানোর ম্যাট এনে পেতে দেয় উঠোনে। তার ওপরে দাঁড়িয়ে সে তার রোজের প্র্যাকটিসের সঙ্গী সুবীরকে নিয়ে তাইকোন্ডোর প্যাঁচ-পয়জার দেখাতে থাকে। একেবারে শেষে সুবীরের হাতে একটা স্কেল ধরিয়ে দিয়ে কীভাবে খালিহাতে ছুরির মোকাবিলা করতে হয়, তাও সে দেখায়।

এর ফলে ক্লাস ফাইভের কানাই দত্ত অল্পদিনেই বনে যায় স্কুলের হিরো। এমনকী তার থেকে বয়সে বড়ো ছেলেরাও তাকে চড়-চাপাটি মারতে সাহস করে না। সাহস করে না খামোখা তার পেছনে লাগতে বা তার সঙ্গীদের অযথা উত্যক্ত করতে।

এরই মধ্যে এক রবিবার সন্ধেবেলা তার রজনী স্যার হস্টেলে এসেছিল। এখানে তার লোকাল-গার্জেন তো সেইই। তবে এবারে তার স্যার কী একটা বিশেষ কাজে এখানে আটকে থাকবে বলে তাদের গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হয়নি। কিন্তু হস্টেলে এসে স্যার তাদের সবার সঙ্গে বসে খবরের কাগজের ওপরে মাখা মুড়ি-বাদাম-চানাচুর খেয়ে গেছে। রজনী যে কানাইয়ের তাইকোন্ডো-স্যার হয়েও তাদের সবার সঙ্গে বসে মুড়ি-চানাচুর খেলো, তাতেই হস্টেলের ছেলেরা আপ্লুত।

তবে এবারে গ্রামে যেতে পারল না বলে কানাইয়ের তেমন আফশোষ নেই। নতুন নতুন বন্ধুদের সাথে গল্পগুজব করা, খেলাধুলো করা, একসাথে পড়াশোনা করা, একসাথে খাওয়া-শোওয়া, এসবেই এক নতুন আনন্দের স্বাদ পাচ্ছে সে।

মার্চ, ১৯৪৫

মার্চেন্ট স্ট্রিট, গোখরো-নেউল আর বর্মার চায়না টাউন

বর্মায় পৌঁছেছে শ্যামাদাস অনেক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে। জাহাজের ভাড়া, জাল কাগজপত্র তৈরির খরচ ছাড়াও খসেছে ট্যাঁকের কড়িও। রেঙ্গুন পোর্ট থেকে বেরিয়ে মানি এক্সচেঞ্জের দোকান থেকে কিছু ইন্ডিয়ান রুপি বদলে বর্মি 'কায়াত' নিল সে।

বর্মায় এখন জাপানি সেনার দাপাদাপি। রাস্তায় রাস্তায় মাঝে মধ্যেই দেখা মিলছে 'চি-হি' ট্যাঙ্কের। মোড়ে মোড়ে বসানো অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান আর যখন তখন মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে জাপানি যুদ্ধবিমান। যুদ্ধ চলছে, আর তার পাশাপাশি চলছে জীবনও। পোর্টের বাইরে সারি সারি রিক্সা আর ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে জাহাজে আসা প্যাসেঞ্জার ধরবে বলে। ব্রিটিশ শাসনের দৌলতে তারা কিছু কিছু ইংরাজি শব্দ বলতে পারে আবার বুঝতেও পারে। অবশ্য শুধু এখানেই নয়, পৃথিবীর সব ইংরেজ ঔপনিবেশিক দেশের বন্দরের রিক্সাওয়ালারা বা ট্যাক্সিওয়ালারা একইরকম।

তাই একজন রিক্সাওয়ালাকে 'মার্চেন্ট স্ট্রিট' 'দ্য ভিন্টেজ' বলতেই সে শ্যামাদাসকে বলে — 'সিট স্যার, সিট।' হাতে টানা রিক্সা। কলকাতাতেও রিক্সা চড়েছে শ্যামাদাস; কিন্তু এখানকার রিক্সাগুলোর গঠন কিছুটা অন্যরকম। যথেষ্ট আরামদায়কও বটে। রিক্সা চলছে মোটরগাড়ি, গাধায় টানা গাড়ি আর মালবাহী খচ্চরদের পাশ কাটিয়ে। রিক্সা তো চলছে, কিন্তু সঠিক জায়গায় যাচ্ছে তো? সন্দেহ জাগে শ্যামাদাসের। তাই সে রাস্তার দু-পাশের দোকানগুলোর সাইনবোর্ড দেখতে দেখতে যায়। কিছু সাইনবোর্ডে শুধু বর্মি ভাষায় লেখা। সেগুলোর জিনিসপত্র দেখে ঠাহর করার চেষ্টা করে। কিছুর আবার কিছুই বোঝা যায় না। তবে তার মনে হল 'দ্য ভিন্টেজ' নামটা নিশ্চয়ই ইংরাজিতেই লেখা হবে। কিন্তু রিক্সাওয়ালা সেটা বুঝলে তো? তাই বারবার সে তাকে ঠিকানাটা বলতে থাকে আর বারবারই জবাব পায়— 'ওক্কে স্যার, ওক্কে স্যার।'

এভাবেই চলতে চলতে একসময় রিক্সা এসে থামে একটা চওড়া রাস্তার ধারে একটা বড়ো বাড়ির সামনে। সারি সারি দোকান। নেমে ভাড়া মিটিয়ে রিক্সা ছেড়ে দেয় সে। তারপর দোকানগুলোকে ডাইনে রেখে এগিয়ে চলে। দারুণ সাজানো সব দোকান।

কলকাতার পশ এলাকার দোকান যেমন হয় আর কী। কোনো দোকানের শো-কেসে সাজানো নানান বাদ্যযন্ত্র, কোনোটায় বিদেশি মদ আবার কোনোটায় বা থরে থরে সাজানো সিগার আর সিগারেটের প্যাকেট। বর্মার চুরুট বিখ্যাত। খেয়ে দেখতে হবে। তাই একটা কেনে সে। সযত্নে কাঁধের ঝোলা ব্যাগে রেখে দেয় সেটা। পরে একসময় খাবে।

হঠাৎই একটা বন্দুকের দোকান। একটু দাঁড়িয়ে যায় শ্যামাদাস। কাঁচের শো-কেসে সাজানো রাইফেল আর সুন্দর কারুকাজ করা তরোয়াল দেখে তার মনে হয়— ইস, এইরকম একটা সুন্দর অস্ত্র যদি তার থাকত!

কিন্তু না, সময় নষ্ট করলে হবে না। দোকানের সাইনবোর্ডগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে চলে সে। আরও মিনিট তিনেক এগোনোর পরে হঠাৎই নজরে পড়ে একটা সাইনবোর্ড। সোনালি ফ্রেমের সাইনবোর্ডের সবুজ মখমলের ওপরে উঁচু উঁচু সোনালি ইংরাজি অক্ষরে লেখা 'দ্য ভিন্টেজ'। হ্যাঁ, এটাই তার আকাঙ্খিত লক্ষ্য।

কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই সুন্দর একটা গন্ধ নাকে লাগে। বোধ হয় কোনো ধূপেরই হবে। ওপরের তিনদিকের দেওয়ালে কাঁচে ঢাকা শো-কেসে সারি সারি সাজানো পুরোনো দিনের বন্দুক, পিস্তল, মিনের কাজকরা খাপওয়ালা তরোয়াল। নীচের শো-কেসে সাজানো নানান কিউরিও। কী নেই সেখানে? হাতির দাঁতের পালকি, ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি, কাঠের জালিকাজ করা বর্মীবাক্স, পিতলের ওপরে নানান রঙিন পাথর বসানো পেখমমেলা ময়ূর, আরও কত কী। মনে হচ্ছে যেন কুবেরের ঘরে ঢুকে পড়েছে সে। দূরে সোজা দেওয়ালের বেশ ওপরে আটকানো একটা বাঘের ছাল। তার নীচের দেওয়ালে বেশ খানিকটা তফাতে ঝোলানো দুটো সুদৃশ্য পার্শি কার্পেট আর সেইদুটোর মাঝখানে কাউন্টারের ওপারে রিভলভিং চেয়ারে বসা স্যুট পরা একজন। মুখে তার আধা মোঙ্গোলিয়ান ছাপ স্পষ্ট। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। শ্যামাদাস এগিয়ে যায় তার দিকে।

লোকটা তাকে বলে— 'What can I do for you, Sir?'

—'I want to meet Mr. Aung Thiha.'

জবাব শুনেই ভুরু একটু কুঁচকে যায় লোকটার। সেটা বিস্ময়ে, সন্দেহে, নাকি তার কথা বুঝতে না পারার জন্যে, সেটা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারে না শ্যামাদাস। তাই সে আবার বলে— 'I am Shaymadas Roy coming from Calcutta to meet Mr. Aung Thiha.'

লোকটা কয়েক সেকেন্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে — 'Who is Aung Thiha? I don't know anyone by that name.'

শ্যামাদাস ভাবে— লোকটা কি ভান করছে? নাকি পিটার তাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছে? আচ্ছা, পিটার তো তাকে এই ঠিকানা দিয়েছে। তাহলে পিটারের কথা বললে কেমন হয়? তাই সে আরেকবার চেষ্টা করে— 'Sir, Peter Braganza of Lalbazar has sent me here.'

লোকটা এবারে তার রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে মৃদু মৃদু এদিকে ওদিকে দুলতে থাকে। সে কি এবারেও তার কথা বুঝতে পারেনি? কিন্তু লোকটার চোখ অন্য কথা বলছে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করে যাচ্ছে তাকে। একটু পরেই সে টেবিলের নীচে লাগানো একটা সুইচ টেপে।

এক মিনিটের মধ্যেই ঘুরে যায় দেওয়ালে টাঙানো একটা পার্শি কার্পেট। সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে বর্মি পোশাক পরা একজন। কার্পেট সমেত দেওয়ালটা ঘুরিয়ে আবার আগের মতো করে দেয় সে। বোঝার উপায়ই নেই যে ওখানে একটা যাওয়া-আসার লুকোনো পথ আছে কার্পেটের পেছনে।

চেয়ারে বসা লোকটার ইশারায় সেই বর্মি লোকটা কাউন্টারের একটা অংশ সরিয়ে এসে দাঁড়ায় শ্যামাদাসের কাছে। ইঙ্গিতে তাকে দাঁড়াতে বলে। আপাদমস্তক হাত বুলিয়ে আর তার ব্যাগে উঁকি মেরে নিশ্চিত হয় যে শ্যামাদাসের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। তারপর কাউন্টার পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় চেয়ারে বসা লোকটার পাশে।

চেয়ারে বসা লোকটা এবারে বলে— 'Can you show me any proof that Braganza has sent you?'

—'Yes Sir' বলে চেয়ারে বসে শ্যামাদাস তার ব্যাগের ভেতরে রাখা ডায়েরির ভাঁজ খুলে পিটারের দেওয়া তার ছবি লাগানো ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট মেলে ধরল লোকটার সামনে।

ভালো করে সেটা দেখে ফেরত দিয়ে লোকটা বলল— 'Well Mr. Shayamadas, now why do you want to meet Mr. Thiha?'

—'Sir, I want to carry on the business again and so I need his help.'

লোকটা চেয়ারে বসে মৃদু মৃদু মাথা নাড়ছিল। শ্যামাদাসের কথা শেষ হতে সে টেবিলে রাখা ফোনের রিসিভার তুলে একটা নম্বর ডায়াল করল। তারপরে মিনিট চারেক বর্মি ভাষায় কথা বলে ফোনটা নামিয়ে রেখে শ্যামাদাসকে বলল— 'Well Mr. Roy, Meet here after three days at five in the afternoon.'

তিন দিন হোটেলের ঘরে বসে সময় কাটানো যে বেশ কঠিন ব্যাপার তা বেশ বুঝতে পারে শ্যামাদাস প্রথম দিনেই। তাই সেই দিনটা হোটেলের ঘরে কাটিয়ে সেখানকার রিসেপশন থেকে জেনে নেয় রেঙ্গুনের দর্শনীয় জায়গাগুলোর নাম আর অবস্থান। তারপরে একটা রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে স্যুইড্যাগন প্যাগোডার উদ্দেশ্যে যেটাকে স্থানীয়রা বলে 'গ্রেট ড্যাগন প্যাগোডা'। বেশ খানিকক্ষণ চলার পরে রিক্সা এসে থামে প্যাগোডার সামনে। এটা নাকি রেঙ্গুনের দ্বিতীয় প্রাচীন প্যাগোডা। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা উলটোনো ঘণ্টা। তবে এটাকে প্যাগোডা না বলে বৌদ্ধস্তূপ বলা যেতে পারে। কান্দ্যাওগি লেকের পশ্চিমে সিঙ্গুত্তারা পাহাড়ের মাথায় এর অবস্থান। সোনার জল করা পাতে মোড়া মূল চূড়োর গায়ে শেষ বসন্তের রোদ ঠিকরে পড়ে চকচক করছে। মূল স্তূপের চারপাশে আরও অনেক ছোটো ছোটো স্তূপের মতো চূড়ো। যুদ্ধের বাজার বলে সাদা চামড়ার বিদেশি ট্যুরিস্ট প্রায় নেই বললেই চলে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে ঘোরার পরে বেরিয়ে আসে শ্যামাদাস। কিন্তু ঘুরেও শান্তি নেই মনে। বিশেষ করে শান্তির দূত বুদ্ধের এই স্মারক মন্দিরে ঘুরেও। সর্বদাই একটা টেনশন তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাকে। সর্বদাই মনে হচ্ছে কেউ যেন তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

হ্যাঁ, সে জানে না যে তাকে নজরে রাখা হচ্ছে দিনরাত— এমনকী হোটেলের ঘরেও যখন সে থাকে। সে জানে না হোটেলে তার ঘরে রুম সার্ভিস দেয় যে ছেলেটা, সেও

আঙ থিহারই একজন নজরদার। এমনকী শ্যামাদাস এও জানে না যে হোটেলের বাইরেও কেউ না কেউ তাকে পালা করে অনুসরণ করে চলেছে। আর এই অদৃশ্য অনুসরণটাই সর্বক্ষণ তাকে খোঁচা দিচ্ছে।

প্যাগোডা থেকে বেরিয়ে আরেকটা রিক্সা ধরে এবার পৌঁছে যায় রেঙ্গুনের চিড়িয়াখানায়, যদি তাতে মনের খচখচানিটা একটু কমে। কিন্তু যুদ্ধের এই টালমাটাল সময়ে সর্বত্রই অরাজকতা। তার ছাপ যেমন পড়েছে কলকাতা শহরে, তেমনই পড়েছে এই রেঙ্গুনেও; এমনকী চিড়িয়াখানাতেও। সংখ্যায় কম বলে কলকাতার চিড়িয়াখানার থেকেও এখানকার প্রাণীরা অনেক খোলামেলা জায়গায় থাকে। তবে কাছে গেলেই বোঝা যায় যে কতটা বুভুক্ষু তারা। যদিও চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থীর সংখ্যা বেশ কম, তবু প্রানীগুলো একটু খাবার পাবার আশায় দর্শকদের কাছাকাছি এগিয়ে আসে। শ্যামাদাস বোঝে যে যুদ্ধের জন্যে ছাঁটাই হয়েছে চিড়িয়াখানার বাজেটে আর তাই পর্যাপ্ত খাবার না পেয়ে উরাংউটাং, হাতি এমনকী জলহস্তীও খাবার চায়। কেউ কিছু খাবার দিলে বাছবিচার না করেই তা খায়। এ যেন বাংলার দুর্ভিক্ষের ছবি রেঙ্গুনের চিড়িয়াখানায়।

বেশি বড়ো নয় চিড়িয়াখানাটা, তবু ঘুরে দেখতে দেখতে বেলা পড়ে আসে। তাই সেখান থেকে বেরিয়ে হোটেলমুখী হয় সে। রিক্সায় ফিরতে ফিরতে তার নজরে পড়ে রাস্তার ধারে সাপখেলা দেখাচ্ছে এক সাপুড়ে। একটা শঙ্খচূড় আর একটা গোখরো। সঙ্গে আবার একটা বেজিও রেখেছে সে। লোক জমতে শুরু করেছে তার পাশে। একটু পরেই হয়তো খেলা শুরু হবে।

রিক্সা ক্রমে এগিয়ে চলে। খানিক পরেই একটা পাবলিক পার্ক। সেখানে জুডো শিখছে একদল ছেলেছোকরা। তাই দেখে শ্যামাদাসের হঠাৎই মনে পড়ে যায় চাঁপাডাঙার রজনী আর তার ছেলেদের কথা। অস্বস্তি হয় ভাবলেই। আর সেটা কাটাতেই একটা চুরুট ধরায় সে। আগুনের তাপে তামাকপাতা ধোঁওয়া হয়ে উড়ে যায় পেছনে; কিন্তু অস্বস্তিটা তার থেকেই যায়।

সেইদিন রাতে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন আসে শ্যামাদাসের কাছে। আঙ থিহা শঙ্খচূড়ের মতো সামান্য ফণা তুলে এগিয়ে আসছে তার দিকে। গোখরো হয়ে পুরো ফণা তুলেও সে আটকাতে পারছে না শঙ্খচূড়ের আগ্রাসন। হিসহিসিয়ে ওঠে গোখরো। সমস্ত শক্তি দিয়ে বারবার ছোবল মারতে চায় শঙ্খচূড়টাকে। বারবার...। কিন্তু কিছুতেই থামছে না শঙ্খচূড়। সেটা এগিয়ে এসে কামড়ে ধরে গোখরোর ঘাড়। কামড় ক্রমশ প্রবল হতে থাকে। শঙ্খচূড়ের বিষ ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে দিতে থাকে গোখরোরূপী শ্যামাদাসকে। তবু মরতে মরতেও সে দেখতে পায় বেজিটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে শঙ্খচূড়ের ওপরে। চকিতে ঘাড়ে কামড় দিয়েই পায়ের নখ দিয়ে ফালাফালা করে দিতে চাইছে সেটার শরীর। কিন্তু গোখরোর মৃত্যু আসন্ন। তবু শেষবারের মতো তার যেন মনে হয় যে বেজিটার মুখটা যেন রজনীকান্তর মতো... ভয়ংকরেরও ভয়ংকর মৃত্যুদূত সে।

ঘুমটা ভেঙে যায় শ্যামাদাসের।

তীব্র টেনশন। টেনশন কমিয়ে মনটা হালকা করতে তাই সে বেরিয়ে পড়ে। আজ সে যাবে চায়না টাউনে।

স্যুলে প্যাগোডা। বর্মার সবচেয়ে পুরোনো প্যাগোডায় ঢুকতে যাচ্ছে সে। বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখে নিল প্যাগোডার রূপ। যতোই দেখে ততোই মোহিত হয়ে যায় সে। শেষ

বসন্তের নীল আকাশে ছোটো ছোটো তুলোর টুকরোর মতো মেঘ জমেছে আজ। ছড়িয়ে গেছে আকাশের অনেক দূর পর্যন্ত আর আটকোণা সোনালি প্যাগোডার চূড়ো যেন ছুঁতে চাইছে সেই স্থির সাদা মেঘ-বন্ধুদের। বেশ খানিকক্ষণ সেদিকে অপলক তাকিয়ে থাকে শ্যামাদাস। হঠাৎ তার সম্বিৎ ফেরে। নিজের মনের গভীর তলটাকে উপলব্ধি করে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়। এতটাই সুন্দর কি তার অন্তস্তল? কই, এতদিন তো সেটা ধরা পড়েনি তার কাছে? সব মানুষেরই কি মনের মধ্যে আরও একটা সুন্দরতর মন থাকে? থাকে হয়তো? হয়তো এতদিন সেটা তেমনভাবে বুঝতে পারেনি সে। তবে হ্যাঁ, একবার সে বুঝেছিল, যখন রসময়ীর কোলে এসেছিল তার সন্তান। এখন তারা কোথায় কে জানে। সব হারিয়ে সে এখন বুঝতে পারছে, কেন সে প্রতি সপ্তায় রসময়ীর কাছে যেত? সেটা কি শুধুই ব্যবসা আর রসময়ীর সান্নিধ্যসুখের জন্যে? না, শুধু সেই কারণেই সে সেখানে যেত না। সপ্তাহান্তে সন্তানের নিষ্পাপ মুখটা দেখার জন্যেও সে যেত। এক অব্যক্ত বাৎসল্যরসে তার অজান্তেই ভরে যেত তার অন্তর যখন সে তার সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করত। অথচ আজ নিজের লোভের বশে সব হারিয়ে দীনের চেয়েও দীন সে।

ধ্যুস, এখন আর ওসব ভেবে কী হবে? যা ফিরে পাবার নয়, তা নিয়ে আর ভেবে লাভ কী? নিজেকে বোঝায় শ্যামাদাস। তবু একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক চিরে। তারপরে সোজা রাস্তা ধরে ধীরপায়ে সে এগিয়ে যায় প্যাগোডার দিকে।

কী সুন্দর ভেতরটা। চারিদিকে সোনালি রঙের ছটা। মেঝেতে লাল কার্পেট পাতা। মাঝে মাঝে ঢং ঢং করে বাজছে গম্ভীর ঘণ্টা। এমন পরিবেশে এলে মানুষ নির্বাক হয়ে যায়। মনের ঔদ্ধত্য আপনিই নত হয়ে যায় এক অজানা সম্ভ্রমের আবেশে।

একপাশে উঠোনে নেমেছে একঝাঁক পায়রা। দর্শনার্থীদের আনাগোনাকেও তারা আমল দিচ্ছে না। চারিদিকে ধূপের গন্ধ। মাঝে মাঝেই মেরুন রঙা চাদর পরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের যাতায়াত। এসব পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে শ্যামাদাস। সোনালি ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তির গায়ে হলুদ রঙের কাপড় জড়ানো। বেদির দু-পাশে ফুলদানিতে রাখা সুগন্ধি ফুলের তোড়া আর একপাশে কোমর সমান উঁচু বার্নিশ করা আবলুষ কাঠের রাকের ওপরে সারি সারি রাখা দণ্ডায়মান বুদ্ধের বেশকিছু মূর্তি। এক একটা মূর্তির হাতের মুদ্রা এক এক রকমের।

শোনা যায় যে 'তাপুসা' আর 'ভাল্লিকা' নামের দুই ভাইকে বুদ্ধ স্বয়ং তাঁর মাথার চুল দিয়েছিলেন আর তার ওপরেই তৈরি করা হয় এই স্তূপ। শ্যামাদাসের মনে হয়— ভয় আর সম্ভ্রম থেকে ভক্তি যেমন উদ্‌গত হয়, তেমনই বিশ্বাস থেকেও জন্ম হয় তার।

বেশ খানিকক্ষণ সেখানে কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। এরপরে তার গন্তব্য চীনামন্দির খেং হক কিয়ং। সামনে লেখা বোর্ড পড়ে জানতে পারে যে এটা বর্মার প্রাচীনতম আর সবচেয়ে বড়ো চীনামন্দির। এই মন্দিরে পুজো পান চীনাদের সমুদ্রের দেবী 'মাজু'। মূলত হোক্কিয়ান চীনারা এখানে পুজো চড়াতে আসেন। প্রবেশ পথের দু-ধারে নখ মেলে পাহারা দিচ্ছে দুই ড্রাগন আর লাল, হলুদ, সবুজ আর সোনালি রঙের কারুকাজ করা এই মন্দির দেখতেও বেশ সুন্দর বটে। আরও ভেতরে পেছনে সোনালি কাজ করা প্যানেলের মাঝে সোনালি ঝালর মাথায় অবস্থান করছেন দেবী 'মাজু'। উজ্জ্বল হলুদ আর লাল রঙা সিল্কে ঢাকা তাঁর সর্বাঙ্গ। খানিকক্ষণ এসব দেখেশুনে এবার শ্যামাদাস চলল মাহা বান্দুলু রোডের দিকে। সন্ধে তখন নামছে।

উরিবাব্বা, এটা তো কলকাতার বড়োবাজারের মতো একটা রাস্তা। দু-পাশে নানান দোকান, ফুটপাথে মানুষের সারি আর রাস্তায় গাদাগাদি মোটরগাড়ি, রিক্সা, খচ্চর আর

গাধায় টানা গাড়ি। আশেপাশের দোকান থেকে ভেসে আসছে দোকানিদের হাঁকডাক আর নানান খাবারের গন্ধ। ভিড়ে ঠাসা এই রাস্তা একেবারে নরক গুলজার।

খুঁজেপেতে একটা বার্মিজ লিকার শপে ঢুকে পড়ল শ্যামাদাস। একটা নড়বড়ে টুলের সামনে ছোটো একটা কাঠের টেবিল। সে শুনেছে এখানকার আখের রস থেকে তৈরি মান্দালয় বিয়ার নাকি খুব জনপ্রিয়। তাই সেটাই একবোতল অর্ডার করল। একটু পরেই বেয়ারা এসে তার টেবিলের ওপরে যব-ভাজা, নুন-লঙ্কা আর বিয়ারের বোতল রেখে গেল। এতক্ষণ ঘোরাঘুরি করে পিপাসাও পেয়েছিল বেশ। তাই ঢকঢক করে আদ্ধেক বোতল গলায় উপুড় করে দিয়ে খানিকটা যব-ভাজা মুখে পুরলো শ্যামাদাস। পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে ধরাল। আঃ, এবারে একটু ভালো লাগছে। সে বাকি বিয়ারটাও ধীরে ধীরে গলায় ঢালতে লাগল। মিনিট বিশেক পরেই বুঝতে পারল যে এই বিয়ারে অ্যালকোহলের মাত্রা একটু বেশিই আর সেইজন্যেই বর্মিজদের কাছে এটা এত জনপ্রিয়। যাইহোক, আরও আধঘণ্টা পরে যখন শ্যামাদাস রাস্তায় বেরিয়ে এল, তখনই মেজাজটা তার ফুরফুরে। সমস্ত টেনশন ঢাকা পড়ে গেছে অ্যালকোহলের দরাজ মহিমায়।

হালকা ঠান্ডা বসন্তের হাওয়ায় বেশ আরাম লাগছে তার। ধূর, যে তাকে ফলো করে করুক। সে এখন থোড়াই কেয়ার করে সেইসব। তাই চুরুট টানতে টানতেই সে হেঁটেই ফিরতে শুরু করে হোটেলে।

শ্যামাদাসের ইন্টারভিউ, প্ল্যানিং, ব্ল্যাক টিউলিপ আর হরিশরণ

আজ আঙ থিহার সাথে দেখা করার দিন। সে তো কখনো ভাবতেই পারেনি যে ডন তাকে পাত্তা দেবে। তার মতো একজন হরিদাসকে যে ডন ডেকেছেন, এতেই কৃতার্থ সে। ডন ডেকেছেন; তার মানে নিশ্চয়ই তাকে একটু হলেও গুরুত্ব দিচ্ছেন ডন। কে জানে, ডন তাকে কী বলবেন। তাই প্রবল একটা টেনশন কাজ করছে তার মধ্যে। হোটেল থেকে 'দ্য ভিন্টেজ' মিনিট দশেকের হাঁটা পথ। তবু এই পথটুকুই তার কাছে অন্তহীন বলে মনে হচ্ছে। কী যে হবে আজ সেখানে কে জানে?

হঠাৎ বিকট গোঁ গোঁ শব্দ। বসন্ত-বিকেলের নীল আকাশে দূর থেকে অ্যারো-হেড ফর্মেশনে উড়ে আসছে তিনটে 'বেটি' ফাইটার আর তার পেছনে একটা 'টপসি' ক্যারিয়ার প্লেন। খবরের কাগজেই তাদের ছবি আর নাম দেখেছে সে। প্লেনগুলো উড়ে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। বেশি দ্রুত নয় তাদের গতি। হয়তো কাছাকাছি কোথাও রসদ পৌঁছতে যাচ্ছে তারা। যতক্ষণ না প্লেনগুলো তার মাথার ওপর দিয়ে পশ্চিমদিকে হেলে পড়া সূর্যের দিকে মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ তাদের দেখতে থাকল সে। তারপর এগিয়ে চলল গন্তব্যে।

'দ্য ভিন্টেজ' এর ভেতরে বাঘছালের নীচে আজ অন্য একজন বসে। গতদিনের লোকটার তুলনায় একটু বয়স্ক। সৌম্যদর্শন। গায়ের রং ফর্সা আর তাতে গোলাপি আভা। আকাশি রঙের স্যুটের সঙ্গে সাদা শার্ট আর নীলের ওপরে সোনালি কাজ করা টাই। ইনি নিশ্চয়ই ডন হবেন— ভাবল শ্যামাদাস। হাতের ঘড়ি দেখল। পাঁচটা পাঁচ। ঠিক সময়েই পৌঁছেছে সে। সোজা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে যেতেই তাঁর পাশের কার্পেটে ঢাকা

দেওয়ালের অংশটা ঘুরে গেল। বেরিয়ে এল আগের দিনের সেই বর্মি পোশাক পরা লোকটাই। আবার আগের দিনের মতো তল্লাশি।

তার কাজ মিটতেই সেই লোকটা বর্মি ভাষায় সৌম্যদর্শন ভদ্রলোককে কিছু বলল। সুবেশ ভদ্রলোক তখন উঠে দাঁড়িয়ে আধা স্বচ্ছ বাংলায় বললেন— 'আসুন, ভেতরে আসুন, মিস্টার শ্যামাদাস।'

বর্মা মুলুকে এসে এইভাবে বাংলা শুনে ভারি অবাক লাগল তার। কাউন্টারের ভেতরে তাকে নিয়ে গিয়ে বর্মি লোকটা খুলে দিল কার্পেট ঢাকা দরজা। সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক শ্যামাদাসকে নিয়ে তার ভেতরে ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল পেছনে। বর্মি লোকটা রয়ে গেল বাইরে, দোকান পাহারায়।

ভেতরের সরু বাঁধানো পথ ধরে আগে আগে চললেন ভদ্রলোক আর তাঁর পেছনে পেছনে চলল শ্যামাদাস। একসময়ে কৌতূহল চাপতে না পেরে সে ভদ্রলোককে বলল— 'আপনি বাংলা জানেন?'

জবাব এল— 'আমি ছোটোবেলা থেকে টোয়েন্টি ইয়ার্স ক্যালক্যাটায় ছিলাম। ওখানের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করি। মাই ফাদার ওয়জ বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ দেয়ার। আমার মাদারও একজন বেঙ্গলি লেডি; অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াই আই ক্যান স্পিক বেঙ্গলি।' শুনে তাজ্জব হয়ে গেল শ্যামাদাস।

একটুখানিই পথ। পথের শেষে একটা সুন্দর শ্বেত পাথরে বাঁধানো ঘরে পৌঁছে যায় তারা। বিরাট টেবিলের সামনে একটা চেয়ার দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন— 'বসুন। আমি ড্যাডিকে খবর দিচ্ছি।' বলে ঘরের অন্য একটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। শ্যামাদাস এবারে বুঝতে পারে যে এই ভদ্রলোকের বাবাই হলেন আঙ থিহা। যার দেখা পিটার পর্যন্ত কখনো পায়নি, আজ তার দেখা পাবে ভেবে সে বেশ উত্তেজিত।

এই অবসরে শ্যামাদাস দেখতে থাকে ঘরটা। তাকে যে মেহগনি কাঠের টেবিলটার সামনে বসানো হয়েছে তার ওপরে সবুজ মখমলের টেবিলক্লথ টানটান করে বিছানো। রয়েছে একটা ফুল দিয়ে সাজানো সুন্দর ফুলদানি। একটা টেলিফোন। ওপারে একটা গদিমোড়া সুইং চেয়ার। তারও পিছনের দেওয়ালে শ্বেতপাথরের সুন্দর সূক্ষ্ম জাফরি। বাকি দু-পাশের দেওয়ালে ছোট্ট ছোট্ট র

াকের ওপরে রাখা সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন ভঙ্গিমার ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি।

মিনিট পাঁচেক পরে বর্মি পোশাক পরা একজন এসে তাকে একটা সাদা পাথরের গেলাসে গোলাপি রঙের শরবত দিয়ে গেল। একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে শ্যামাদাস একটা আলতো চুমুক দিল তাতে। কয়েকমিনিট অপেক্ষা করল। নাঃ, মুখের ভেতরটা গোলাপের স্বাদে ভরে গেল একেবারে। তাই সে নিশ্চিন্ত হয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগল ঠান্ডা শরবতে।

এমনসময় টেবিলের পেছনের দরজাটা খুলে গেল। আগের দেখা ভদ্রলোকই এসে বসলেন টেবিলের ওপারে তাঁর গদিমোড়া চেয়ারে শ্যামাদাসের ঠিক বিপরীতে। তারপর টেলিফোনের একটা বোতাম টিপে দিয়ে বললেন— 'তারপর বলুন মিস্টার রয়, আপনি এখন আমাদের কাছে কী আশা করেন?'

একটু গলাখাঁকারি দিয়ে নিজের নার্ভাস ভাবটা কাটিয়ে শ্যামাদাস বললে— 'আমি আবার আপনাদের সাথে নতুনভাবে বিজনেস শুরু করতে চাই।'

—'আচ্ছা মিস্টার রয়, আগে আপনি বলুন তো, আপনি কি অক্টোপাস দেখেছেন?' এমন প্রশ্ন শুনে শ্যামাদাস থতমত খেয়ে যায়। চুপ করে ভাবতে থাকে কী উত্তর দেবে সে। এমন সময় তার নাকে ভেসে আসে বার্মা চুরুটের গন্ধ। কিন্তু সামনে বসা ভদ্রলোক তো চুরুট খাচ্ছেন না। তাহলে?

—'কী হল মিস্টার রয়, আপনি অক্টোপাস দেখেছেন?' ভাবনায় ছেদ পড়ে শ্যামাদাসের।

—'না। মানে ছবিতে দেখেছি।'

—'ও। তা অক্টোপাসের একটা হাত কাটলে কি হয় আপনি জানেন?'

চুপ করে থাকে শ্যামাদাস। কোন বিষয়ে, কি কারণে এই প্রশ্নটা করা হয়েছে তা সে বুঝে উঠতে পারে না। চুপ করে থেকে সে ভদ্রলোককেই কথা বলার সুযোগ করে দেয়।

—'অক্টোপাসের একটা হাত কাটলে সে বাকি সেভেন আর্মস দিয়ে এনিমিকে অ্যাটাক করে। পিটার ওয়জ সাচ এ্যান আর্ম ইন ক্যালকাটা।'

কথাটায় বিপদের আভাষ পায় শ্যামাদাস। পিঠ বাঁচাতে সে তাই বলে— 'পিটারের মৃত্যুর জন্যে আমি তো দায়ী নই স্যার, বলুন?'

—'ইয়েস, আপনি ডাইরেক্টলি রেসপনসিবল না হলেও ইনডাইরেক্টলি রেসপনসিবল।'

শ্যামাদাস চুপ করে থাকে। সে শরবতে চুমুক দিতেও ভুলে গেছে।

ভদ্রলোক আবার বলতে শুরু করেন— 'আর্মস আর বম্বের মশলার বিজনেস আমরা করি না। ইউ নিউ দ্যাট ভেরি ওয়েল। ইন স্পাইট অফ দ্যাট আপনি আদার র

াকেটের সঙ্গে ওই বিজনেসে ইনভলভড্ হয়ে যান। অ্যান্ড বিকজ অফ দ্যাট আ ফিউ মার্ডার টুক প্লেস, ইভন পিটার হ্যাড টু সুইসাইড। আর সেটার জন্যেই রজনীকান্ত অ্যালোন আমাদের ক্যালকাটা বেসের নেটওয়ার্কটা ব্রড ডে লাইটে নিয়ে আসে। নাউ হি ইজ আওয়ার গ্রেটেস্ট এনিমি ইন ক্যালকাটা।'

ভদ্রলোকের গলার স্বরে উত্তেজনার আভাষ। শ্যামাদাস টের পায় সেটা আর তাই সে চুপ করে থাকে।

একটু থেমে ভদ্রলোক আবার বলতে শুরু করেন— 'ইন ফ্যাক্ট আপনার গ্রীড আমাদের ক্যালকাটার বিজনেসকে অলমোস্ট কোলাপ্স করে দিয়েছে। পারবেন আপনি পিটারের মতো ক্যালকাটার র

াকেটকে কন্ডাক্ট করতে? আই নো, আই নো, আপনি পারবেন না। ক্যালকাটায় আপনার পিটারের মতো ইনফ্লুয়েন্স নেই। দেন?'

ভদ্রলোকের মুখটা উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে। এইরকম একটা ধমকানি যে নিশ্চিত ছিল তা শ্যামাদাস জানত। এর কোনো জবাব নেই তার কাছে। তাই সে চুপ করে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে চুপ করে থাকলে অনেক সময় ফল পাওয়া যায়।

—'নিন শরবতটা খেয়ে নিন।' এবারে কথাটা ভেসে আসে ইন্টারকমের স্পিকার থেকে। একজন বয়স্ক পুরুষের শান্ত কণ্ঠস্বর সেটা। তার মানে ডন আঙ থিহা অলক্ষ্যে থেকে তাদের ওপরে নজর রাখছেন, ইন্টারকমে তাদের কথাবার্তা শুনছেন।

তাই শ্যামাদাস শরবতের গেলাসটা তুলে এক চুমুকে সেটা শেষ করে নামিয়ে রাখে টেবিলে। শরবতের গোলাপি স্বাদের সঙ্গে মিশে যায় ঘরময় ভেসে থাকা চুরুটের গন্ধ।

ইন্টারকম থেকে ভেসে আসে ডনের গম্ভীর অবিচল কণ্ঠস্বর— 'আমরা আপনার সঙ্গে ডিল করতে পারি, বাট ইন ওয়ান কন্ডিশন।'

—'কী স্যার বলুন?'

—'ইউ হ্যাভ টু এলিমিনেট রজনীকান্ত এনিওয়ে।'

—'আচ্ছা স্যার। আমি চেষ্টা করব।'

শ্যামাদাস বেশ বুঝতে পারে ডন তাকে কী কঠিন কাজ দিয়েছেন। এই কাজটা তার একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আর এটা না করতে পারলে তার ভাগ্যে কিছুই জুটবে না। যে দায়িত্বটা তাকে দেওয়া হয়েছে সেটার জন্যে চাই লোকবল, যেটা কলকাতায় তার নেই। এখন দেখতে হবে ডনের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যায় কি না।'

তাই সে সামনে বসা ভদ্রলোককে বলল— 'রজনী এখন কলকাতায় থাকে। সে মিউজিয়মে কাজ করে, কিন্তু কলকাতায় তো আমার লোকজন নেই। তাই আপনারা যদি...।'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন— 'আমরা রজনীকান্তর সবকিছু জানি। নাউ টেল মি ইফ ইউ হ্যাভ এনি স্পেসিফিক প্ল্যান।'

—'স্যার, রজনী যখন মিউজিয়ম থেকে বাড়ি ফেরে তখন যদি ওকে শুট করা যায়?'

—'হোয়াট? ইউ হ্যাভ লস্ট ইয়োর উইপন। দেন হু উইল শুট হিম? আই সাপোজ ইউ আর নট।' বিদ্রূপ ঝরে পড়ে ভদ্রলোকের গলায়।

শ্যামাদাস বুঝতে পারে সে ভুল বলে ফেলেছে। তাই নিজের ভুল শুধরে নিতে সে বলে — 'স্যার, আপনার লোক যদি...।'

উত্তেজিত জবাব আসে— 'হ্যাভ ইউ গন ম্যাড? মিউজিয়মের সামনের মার্ডারের পর থেকে ওখানে পুলিশের নজর আছে। একটা ভ্যানও লাগানো থাকে। যদিও আমরা জানি যে ওই মার্ডারের মোডাস অপারেন্ডি রজনীকান্তর মতো নয়, স্টিল ব্রড ডে লাইটে অ্যাকশন করতে গেলে আমাদের কেউ যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, তাহলে...? নো, নো, দ্যাট ডাস নট ফিট ওয়েল। অন্য কিছু ভাবুন, মিস্টার রয়, অন্য কিছু ভাবুন।' ভদ্রলোক বুঝি কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। তাই তাঁকে সামাল দিতে একটু চিন্তা করে শ্যামাদাস। তার মাথায় অন্য একটা প্ল্যান এসেছে।

সে বলে— 'আচ্ছা, আমি যদি ওর ডিয়ার কিড কানাইকে কিডন্যাপ করি তাহলে রজনী সেখানে আসতে বাধ্য। আর সেখানেই...'

ভদ্রলোক একটুখানি ভাবেন। তারপরে বলেন— 'ওয়েল, দ্যাটস এ গুড আইডিয়া। কিন্তু তাকে রাখবেন কোথায়?'

—'স্যার, বাগবাজারে গঙ্গার ঘাট থেকে খানিকটা দূরে নদীর একেবারে পাশে পিটারের একটা বাংলো আছে। কেউ থাকে না সেখানে। কাছাকাছি তেমন লোকবসতিও নেই। ওখানেই আমরা রাখতে পারি রজনীর কিডকে।'

উলটোদিকের ভদ্রলোক চোখ বুজে কী যেন ভাবছেন। ভুরু দুটো কুঁচকে গেছে তাঁর। ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর মধ্যমা দিয়ে কপালের রগ থেকে ভুরুর মাঝখান অবধি

রগড়াচ্ছেন ধীরে ধীরে। মনে হচ্ছে শ্যামাদসের কথা মনে ধরেছে তাঁর। আশায় বুক বেঁধে শ্যামাদাস বসে থাকে তাঁর উত্তরের আশায়।

সামান্য পরেই প্রশ্ন আসে— 'বাট ব্রড ডে লাইটে আপনি তাকে কিডন্যাপ করবেন কীভাবে? তাকে গাড়িতে তুলবেন...পাবলিকে গাড়ির নম্বর নোট করবে...আর সেই গাড়ির নম্বর চেজ করে পুলিশ পৌঁছে যাবে ডেস্টিনেশনে। দেন?'

কথাটায় যুক্তি আছে যথেষ্ট। আসলে ডনের ঘরে বসে নার্ভাস হয়ে গিয়ে শ্যামাদাস এতটা তলিয়ে ভেবে দেখেনি। সত্যি নিজেকে কেমন বোকা বলে মনে হয় তার। তাই সে সারেন্ডার করে।

—'দেন ইউ প্লিজ সাজেস্ট এ প্ল্যান স্যার।'

—'ওয়েল, আপনার প্ল্যান পার্টলি রাইট, অ্যান্ড উই উইল ডু দ্য রেস্ট। এমনিতে আমরা বাচ্চা আর মহিলাদের এসব ব্যাপারে জড়াতে চাই না, বিকজ দে আর ইনোসেন্ট। তা ছাড়া ড্যাডিও এসব পছন্দ করেন না। স্টিল, রজনীকে ট্র্যাপ করার জন্যে আর কোনো সেফ ওয়ে-আউট দেখছি না। শুনুন মিস্টার রয়, গাড়ির নম্বর প্লেট ডুপ্লিকেট হবে। সেটা আমরা করে দেব, বাট কিডন্যাপিং এর কাজটা আপনাকেই করতে হবে। মাই মেন উইল জাস্ট গিভ ইউ প্রোটেকশন। বাট রিমেমবার, বাচ্চাটার যেন কোনো হার্ম না হয়। আদারওয়াইজ...। আর হ্যাঁ, এটা একটু টাফ জব। অ্যাটলিস্ট ফর ইউ।... আর ক্যালকাটায় কোনো হেল্প লাগলে আপনি একজনের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইনফ্যাক্ট, তার হেল্প আপনার লাগবেও।'

—'তাহলে স্যার, আপনি যদি কাইন্ডলি তাঁর নাম আর ঠিকানাটা একটু দেন...।' আগ্রহের সঙ্গে বলে শ্যামাদাস।

—'ইউ মিট মিস্টার হরিশরণ ভাটিয়া। ক্যামাক স্ট্রিটে ওর জুয়েলারি শপ আছে। নাম ''গোল্ডেন গ্যালারি''। বাট আনলেস উই গিভ ইউ আ পাসওয়ার্ড, হি উইল নট টক টু ইউ।'

—'দেন স্যার, প্লিজ গিভ মি দ্যাট পাসওয়ার্ড।' নিজের অতীব আগ্রহকে দমন করেই কথাটা বলে সে।

—'ওয়েল। পাসওয়ার্ড ইজ ''ব্ল্যাক টিউলিপ''। ওক্কে। রিমেম্বার ইট ওয়েল। ডোন্ট ফরগেট।'

শ্যামাদাস বিড়বিড় করে মনে গেঁথে নিতে চায় সেটা। তারপর বলে— 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ।'

—'ওয়েলকাম। আপনি তাহলে এখন আসতে পারেন।' বলে ভদ্রলোক টেবিলের আড়ালে রাখা একটা সুইচ টেপেন। একটুপরেই যে লোকটা শরবত এনেছিল সে পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে। ভদ্রলোক তাকে বর্মি ভাষায় কিছু একটা বলতেই সে পথ দেখিয়ে শ্যামাদাসকে নিয়ে আসে 'দ্য ভিন্টেজ' এর বাইরে।

শ্যামাদাস বেরিয়ে যেতেই পেছনের দরজা ঠেলে অফিস ঘরে ঢোকেন একমাথা সাদা চুলের ফর্সা সৌমদর্শন সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ আঙ থিহা। পরনে সাদা লুঙ্গি বর্মি ধাঁচে পরা। তার ওপরে ঢোলাহাতা কুর্তার ওপরে বাদামি রঙের মখমলের হাতাকাটা কোট। হাতে আধা জ্বলন্ত চুরুট। বৃদ্ধ, তবু টানটান শরীর। উনি ঘরে ঢুকতেই তাঁর ছেলে ইন্টারকম বন্ধ করে

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বৃদ্ধ এসে বসেন সেই চেয়ারে। মৃদু মৃদু দোল খেতে থাকেন। তাঁর ছেলে এসে বসে উলটোদিকের চেয়ারে।

—'তুমি কি রয়কে আবার বিজনেসে নামাতে চাইছ?'

—'এখনও সেটা ডিসাইড করিনি। আগে ও রজনীর চ্যাপটার ক্লোজ করুক।'

—'ইয়েস, দ্যাটস রাইট। তবে আমি যতদূর বুঝলাম, রয় ইজ ক্লেভার বাট নট কানিং। সো মেক আ ফুলপ্রুফ প্ল্যান, বাট রিমেমবার আমাদের গ্যাংয়ের কোনো লোক যেন পুলিশের হাতে না পড়ে। নাউ দ্য গেম ইজ ইন ইয়োর হ্যান্ড অ্যান্ড প্লে ইট ওয়েল মাই বয়। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।'

চুরুটের ছাইটা অ্যাশট্রেতে ঝেড়ে ফেলে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন ডন আঙ থিহা। চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থাকেন বড়োছেলের দিকে। তারপর উঠে পড়েন চেয়ার থেকে। পেছনের দরজার আড়ালে মিলিয়ে যাবার আগে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ছেলেকে শুধু বলেন— 'ট্রাস্ট ইস লাইক আ গ্লাস হাউস, মাই সন।' তাঁর সে হাসি আর দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারে শুধু তাঁর ছেলে আর্নল্ড থিহা।

দিন পনেরো পরে

ক্যামাক স্ট্রিট। কলকাতার বিত্তশালীদের এলাকা। নামিদামি দোকানপাটও আছে। সেই রাস্তা ধরেই শ্যামাদাস উত্তরমুখী হেঁটে চলেছে পার্ক স্ট্রিটের দিকে। দু-দিকেই চলছে তার নজর। দোকানের সাইনবোর্ডগুলো পড়ে যাচ্ছে সে। প্রায় মিনিট সাতেক হাঁটার পরে তার নজরে আসে একটা সাইনবোর্ড যাতে ইংরাজি আর বাংলা দু-ভাষাতেই লেখা 'গোল্ডেন গ্যালারি'। পেয়ে গেছে সে। এবারে রাস্তা পার হয়ে ওপারে যেতে হবে।

দরজায় বন্দুকধারী পাহারাদার। তবু স্মার্টলি ঢুকে পড়ে। এখন তার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে— ডন আঙ থিহার হাত যে আছে তার মাথার ওপরে।

দু-চারজন ক্রেতা বিরাট কাউন্টারের এদিকে ওদিকে বসে গয়না দেখছে। দোকানের কর্মচারীরা কাঁচের শো-কেস থেকে ভেলভেট কাপড়ে মোড়া গয়নার বাক্স পেড়ে তাদের দেখাচ্ছে। ওসবে শ্যামাদাসের কোনো দরকার নেই। তার দরকার দোকানের মালিককে। চারপাশে নজর ঘোরাতেই দেখে ডানদিকে খানিকটা দূরে একটা উঁচু জায়গার ওপরে সাদা কাপড়মোড়া গদি। তার চারপাশ ঝকঝকে পেতলের নীচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। গদির ওপরে সাদা শার্ট, ধুতি আর ধূসর রঙের কোট পরা একজন বসে। চোখে রিমলেস চশমা। একটা লাল কাপড় দিয়ে বাঁধানো খাতায় মগ্ন হয়ে কী যেন লিখছে। তার পেছনে প্রায় ফুট পাঁচেক উঁচু একটা হাতল লাগানো সিন্দুক। ওই লোকটাই মনে হয় হরিশরণ ভাটিয়া। তাই শ্যামাদাস সোজা এগিয়ে যায় তার দিকে।

পেছন থেকে কাউন্টারের একজন কর্মচারী বলে— 'মে আই হেল্প ইউ স্যার।' কিন্তু তাকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে সে পৌঁছে যায় সেই রেলিংঘেরা জায়গাটায়। সে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা খাতা থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকায়। বলে— 'এক্সকিউজ মি। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?'

শ্যামাদাস বলে— 'আমার নাম শ্যামাদাস রায়। আমি মিস্টার হরিশরণ ভাটিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

লোকটা জহুরির চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বোধ হয় ভালো করে খতিয়ে দেখে নেবার জন্যেই। তার কাছে ইতিমধ্যেই রেঙ্গুন থেকে খবর পৌঁছে গেছে। তবুও আরেকবার বাজিয়ে দেখার জন্যে সে বলে— 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

—'রেঙ্গুন। রেফারড বাই...।'

—'নাম নেবেন না। এনি পাসওয়ার্ড?'

—'হ্যাঁ, ব্ল্যাক টিউলিপ।'

ভদ্রলোক কলমটায় খাপ লাগিয়ে খাতার মাঝখানে রেখে বন্ধ করেন খাতা। তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে শ্যামাদাসের উদ্দেশ্যে বলেন— 'প্লিজ কাম।'

ঘেরা জায়গাটা থেকে নেমে সে পাশের একটা দরজা ঠেলে খোলে। ভেতরে আলো জ্বলছে। শ্যামাদাসকে ভেতরে যেতে ইশারা করেন হরিশরণ। সে ভেতরে ঢুকতে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতে দিতে বলেন— 'প্লিজ বি সিটেড। হামার নাম হরিশরণ ভাটিয়া।'

এই ঘরটা একটা অফিসঘর। তারই একটা চেয়ারে নিজে বসে সামনের একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করেন তাকে। শ্যামাদাস বসলে হরিশরণ শুরু করেন— 'পিটারের হাউস হামার লোকেরা রেইকি করে এসেছে মিস্টার রয়। দ্য প্লেস ইজ ওয়েল চুজেন। এখোন বোলেন, আপনি ক্যাইসে কিডন্যাপ করতে চান রজনীর কিডকে?'

—'স্যার, ও যখন স্কুল থেকে বেরিয়ে খেলতে যাবে, তখন ওকে তুলে নিতে হবে।'

—'লেকিন আপনি তো একেলা ওহি কাম করতে পারবেন না। ফেথফুল ড্রাইভার লাগবে। উসকে বাদ লেড়কাকে যোখোন পিক আপ করবেন তোখোন ও সাউট করবে। রাস্তার আদমি ওহি গাড়িকা নাম্বার নোট করে নেবে। পোলিশে খোবোর হয়ে যাবে। ব্যাস, আপনাকে পোলিশ... ক্যা মিস্টার রয়, বাত সহি হ্যায় ইয়া নেহি?'

—'সেইজন্যেই তো আপনার হেল্প লাগবে। আপনার লোক আমার সঙ্গে থাকলে আর গাড়িতে ফলস নম্বর প্লেট লাগালে ব্যাপারটা হয়ে যাবে।'

—'নেহি, নেহি, অপারেশন কে বাদ ওহি ঝুটা নাম্বার প্লেট বদলনে মে যিতনা টাইম লাগবে, উতনা হি টাইম পর পোলিশ আপনাকে ট্র্যাক করে নেবে। নো, নো, মিস্টার রয়, আপনার প্ল্যান ফুলপ্রুফ নেহি।'

—'তাহলে অপারেশন কীভাবে হবে স্যার?' আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করে শ্যামাদাস।

—'শোনেন মিস্টার রয়, হামার আইডিয়া কী বোলে।'

—'বলুন।'

—'রজনীকান্ত যোখোন ওফিসে আসবে তোখোন আপনি দূর সে হামার আদমিদের ওকে দেখিয়ে দেবেন। হামার আদমি ওর মুভমেন্ট ওবসার্ভ করবে। আর ও যোখোন পিটারের বাড়িতে যাবে, তোখোন হামার আদমি ওকে... সমঝে না?'

—'হ্যাঁ।'

—'বাচ্চাকো যব কিডন্যাপ করা হোবে, আপনি ওহি গাড়ি মে থাকবেন। আপনি হামার আদমিদের সির্ফ বাচ্চাটাকে দেখিয়ে দেবেন। ওহ গাড়িকা অ্যারেঞ্জমেন্ট, আদমিকা বন্দোবস্ত, সোব আপ মুঝ পর ছোড় দিজিয়ে। অগর রজনী কুছ গড়বড় করনে কা কোশিশ

কোরবে তো হামার আদমি উসসে নিপট লেঙ্গে। ক্যা, ঠিক হ্যায় না? সমঝে না আপ হামার বাত?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার ভাটিয়া, থ্যাঙ্ক ইউ।'

মিষ্টি হেসে হরিশরণ বললেন— 'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। আপনি এক উইক বাদ একবার হামার সাথে দেখা কোরবেন। সোব জেনে যাবেন। ওক্কে।'

—'ওক্কে স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ।'

রাস্তায় বেরিয়ে শ্যামাদাস ভাবতে থাকে— এখন এরা তাকে যেদিকে চালাবে, সেদিকেই তাকে চলতে হবে। এসব থেকে যে সে বেরিয়েও আসবে, তারও কোনো উপায় নেই। শয়তানের ঘরের একটাই দরজা, আর সেটা শুধু ভেতরে ঢোকার জন্যে, বেরোনোর জন্যে নয়।

মে, ১৯৪৫

কিডন্যাপ, অদ্ভুত ছদ্মবেশ, পুলিশের অভিযান আর আঙ থিহার লম্বা হাত

কানাই এখন স্কুল আর হস্টেলে সুন্দরভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। এতে খুব খুশি রজনী। আর ক-দিন পরেই তো গরমের ছুটি পড়বে। ইচ্ছে আছে তখন হপ্তাখানেক সে কানাইকে নিয়ে গ্রামে গিয়ে কাটাবে। মেসোমশাইকে বলেওছে সে এইকথা। এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছিল সে অফিস যাবে বলে।

এমন সময় মাসিমার গলা— 'বলি ও রজনী, অফিস বেরোচ্ছ নাকি?'

—'হ্যাঁ মাসিমা।'

—'এই দেখ, পিছু ডেকে ফেললাম। একটু দাঁড়িয়ে যাও বাবা।'

রজনী বলল— 'কিছু বলবেন মাসিমা?'

—'হ্যাঁ, বলব বলেই তো ডাকলাম। বলি আমার গোঠের কানু কেমন আছে? স্কুলে আর হস্টেলে মানিয়ে নিতে পেরেছে তো? কয়েকমাস তো হয়ে গেল।'

—'সে আর বলতে। সে তো এখন রোজ বিকেলে হস্টেলের ছেলেদের তাইকোন্ডো শেখাচ্ছে। স্কুলের গেমস টিচারও এখন মাঝে মাঝে ওকে দিয়ে স্কুলের ছেলেদের তাইকোন্ডো শেখায়। তাই তার তো এখন স্কুলে বেশ নামডাক।'

—'তা নামডাক তো হবেই বাবা। ও যে আমার গোঠের কানু। তা রজনী, আর ক-দিন পরেই তো ওর গরমের ছুটি পড়বে। তাই অসময় হলেও ওর জন্যে একটু পিঠে-পুলি করব বলে ভাবছিলাম। সেইসঙ্গে একটু আম, জাম, জামরুল। তাই বলছিলাম কী, যেদিন ছুটি পড়বে সেদিন তুমি যদি অফিসফেরতা ওকে একটু নিয়ে আসতে পার...। তারপরে

তাকে না হয় দেশের বাড়িতে নিয়ে যেও। তার মাও তো চায় ছেলেকে টানা ক-দিনের জন্যে কাছে পেতে, তাকে ভালোমন্দ খাওয়াতে তাই না?'

রজনী তো জানে কানাইদের বাড়ির অবস্থা কেমন। সেখানে ডাল-ভাতের সঙ্গে গুগলির ঝাল আর গরমের সময়ে বড়োজোর খালছেঁচা খলসে, পুঁটি বা মৌরলা জুটতে পারে। তাও সবদিন জুটবে কিনা সন্দেহ; আর হস্টেলের মতো মাছ, মাংস বা ডিম তো সেখানে স্বপ্ন।

তাই সে বলে— 'আচ্ছা মাসিমা, ছুটি পড়লে দেশের বাড়ি যাবার আগে নিশ্চয়ই ও এখানে ক-দিন থাকবে।'

—'তাইই এনো বাবা। মাত্র এই ক-দিনেই ছেলেটার ওপরে কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। তা হ্যাঁ গো রজনী, তুমি কি দাড়ি রাখছ নাকি?'

দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে রজনী অল্প হেসে বলে— 'এইই মানে...।'

—'না না দাড়ি টাড়ি কেটে ফেল। কেমন যেন বৈরিগি বৈরিগি লাগে।'

অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে হাতের ঘড়ি দেখে সে বলে— 'তাহলে আমি আসি মাসিমা, দেরি হয়ে যাচ্ছে। কেষ্টদা, ও কেষ্টদা, দরজাটা বন্ধ করে দিও।'

—'হ্যাঁ, এসো বাবা। সাবধানে যেও। দুগগা দুগগা।' কপালে হাত ঠেকান মাসিমা।

আসলে পুলিনের মৃত্যুতে রজনী একটা জোর ধাক্কা পেয়েছিল। সেটা কাটিয়ে উঠে একটু স্বাভাবিক হতে না হতেই ঘটে গেল পিটারের ঘটনাটা। তারপর থেকেই তার আর নিজের যত্ন নিতে তেমন ভালো লাগে না। সেজন্যেই তার গালের দাড়িও বড়ো হয়ে গেছে। এখন সে শুধু কানাইটাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। তাকে গড়ে তুলতে হবে যে ভালো করে।

মিউজিয়মে স্টাফেদের ঢোকার রাস্তা পাশের গলি দিয়ে। রজনী সেই পথেই যায় আসে। আজও সেখান দিয়েই ঢুকছে সে। কিন্তু খেয়াল করল না যে লোকের ভিড়ে মিশে দূরে দাঁড়িয়ে শ্যামাদাস আর তার সঙ্গে তিনজন লোক তাকে নজরে রাখছে।

রজনী ঢুকে যাবার পরেই শ্যামাদাসের তিন সঙ্গীর একজন জাদুঘরের গলিমুখের দরজায় আর একজন মেন গেটের সামনে পাহারায় রইল। বাকি আরেকজন কাউন্টার থেকে টিকিট কিনে ঢুকে গেল জাদুঘরের ভেতরে। কাজ হয়ে গেছে বুঝে শ্যামাদাস ফিরে গেল অন্যদিকে। হাতের ঘড়িটা দেখল একবার। হ্যাঁ, যথেষ্টই সময় আছে হাতে।

হস্টেল থেকে তাইকোন্ডোর গাউন পরে কানাই তার দলবল নিয়ে চলেছে রাস্তাপারের প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠের দিকে। কানাই একটু এগিয়ে রাস্তাটা পার হতেই একটা ট্রাম ঢুকে পড়ল তার আর বন্ধুদের মাঝখানে। ফলে ট্রামের একপারে কানাই আর অন্যপারে রইল তার বন্ধুদের দল। এমনসময় হঠাৎই কে যেন তার মুখে কিছু একটা চেপে ধরল। তারপরে আর কিছু মনে নেই তার। এদিকে ট্রামটা চলে যেতেই তার বন্ধুরা দেখতে পেল দু-জন লোক ধরাধরি করে কানাইকে একটা গাড়ির পেছনের সিটে তুলছে। তারা হই হই করে দৌড়ে যায়; কিন্তু ততক্ষণে গাড়িটা এগিয়ে গেছে। তাদের চিৎকারে সচকিত হয়ে পথচলতি দু-চারজন মানুষও দৌড়ে যায় তাদের সঙ্গে। হঠাৎ কী ঘটে গেল তা বুঝে ওঠার

পরেই সকলে খেয়াল করল যে তারা গাড়িটার নম্বরটাই দেখতেই ভুলে গেছে। শুধু তাদের মনে আছে যে, গাড়িটা ছিল গাঢ় বটল গ্রিন রঙের একটা মরিস গাড়ি।

খানিকক্ষণ আলোচনার পরে সবাই বুঝতে পারল যে— যেকোনো কারণেই হোক কানাই দত্তকে অপহরণ করা হয়েছে। কিন্তু কেন? কিইই বা উদ্দেশ্য? কারাই বা এটা করল? কিন্তু জল্পনা করে কী হবে? হস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্টকে খবর করাই আশু কর্তব্য। উনিই তো হস্টেলের দায়িত্বে। ছেলের দলের সঙ্গেই পাড়ারই তিন-চারজন ছুটল হস্টেলের দিকে।

এদিকে বটল গ্রিন রঙের মরিস গাড়িটা ততক্ষণে পৌছে গেছে প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে একটা ফাঁকা জায়গায়। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা অ্যাম্বুল্যান্স। গাড়ি থেকে নামিয়ে তাতেই তোলা হল কানাইকে। রাস্তা হুটারের আওয়াজে কাঁপিয়ে সেটা ছুটল সোজা আর মরিস গাড়িটা উলটোদিকে মুখ ফিরিয়ে চলল কাছেই খিদিরপুরের দিকে। ওখানে অনেক গ্যারেজ আছে। সেখানে একবার গাড়িটা ঢুকিয়ে দিতে পারলেই হল। পনেরো মিনিটেই তাতে লেগে যাবে ওরিজিনাল নম্বর প্লেট।

স্ট্রান্ড রোড ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স চিতপুর রোড ধরে এগিয়ে যেতে যেতে বন্ধ করে দিল তার হুটার। তারপর মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে গেল বাগবাজার ঘাটের থেকে প্রায় তিনশো ফুট দূরে গঙ্গার গা-ঘেঁষা একটা ছোটো বাংলো বাড়ির সামনে। এ-বাড়ির পেছনদিকের দেওয়ালে গঙ্গার জল জোয়ারের সময় এলে ছলাৎ ছলাৎ করে আছড়ে পড়ে। সেখানে ধরাধরি করে অচেতন কানাইকে নামিয়ে ঢোকানো হল বাড়ির ভেতরে। অ্যাম্বুল্যান্স থেকে শ্যামাদাস ছাড়াও আরও চারজন নেমে যেতেই উলটোমুখে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। আর তার মিনিট পাঁচেক পরেই বাড়িটা থেকে প্রায় গজ বিশেক দূরে এসে দাঁড়াল একটা ট্রাক। কাজ সারার পরে এটাই তাদের পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা।

নীচের তলার একটা ঘরের বিছানায় শোয়ানো হল কানাইকে। ওই ঘরে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল একজন। শ্যামাদাস তাকে জিজ্ঞেস করল— 'যাদব, এর জ্ঞান ফিরতে কতক্ষণ লাগবে?'

যাদবই এখানে শ্যামাদাসের রক্ষাকর্তা। সে ঘরে উপস্থিত তার তিন সাঙ্গকে বলল— 'অ্যাই শুন, তু তিনো বাহর যা কর তিনো সাইড মে আপনা আপনা পজিশন লে লে।'

তারা বাইরে বেরিয়ে যেতে সে শ্যামাদাসকে বলল— 'এক ঘন্টে কী অন্দর বচ্চা সেন্স মে আ জায়েগা।'

—'তাহলে তো রজনী আসার আগেই এর জ্ঞান ফিরে যাবে। ওরা দু-জনেই কিন্তু তাইকোন্ডো জানে।'

একটা সোফায় বসতে বসতে যাদব নিজের কোমরে হাত চাপড়ে বলল— 'আরে বাবু, ছোড়ো ও ফোরেন কুস্তি কী বাত। ইয়ে তো হ্যায়। ইতনা ঘাবড়াচ্ছেন কেনো? অগর বচ্চা কা হোশ ভি আয়ে তো উসে থোড়া আফিম খিলা দেঙ্গে।'

—'কিন্তু ডন বলেছেন বাচ্চাটার যেন কোনো ক্ষতি না হয়।'

—'আরে হামি জানে সোব। বাচ্চা হোশ মে আনেকা বাদ সহি ডোজ হি দেঙ্গে জিসসে বাচ্চা কো কোই নুকসান না হোয় অউর ও বেহোশ ভি রহে। আপ আপনা কাম তো

করে। আচ্ছা সে শুনল বাবু, বস নে মুঝ পর ভরোসা করতে হ্যায়, ইসিলিয়ে ইয়ে কাম মুঝ পর সোঁপা গয়া। সমঝে?' লোকটার স্বরটা এবার রূঢ় শোনায়।

এখন শ্যামাদাস বুঝতে পারে যে— এখন থেকে এদেরই হুকুম পালন করে যেতে হবে তাকে। ইতিমধ্যে খিদিরপুরের গোপন ডেরা থেকে সে যে একটা রিভলভার কিনেছে, যাদব বোধ হয় সেটা জানে না। আবার পরক্ষণেই মনে হয় যে ডনের লোকেরা রজনী আর তার ওপরে তো সর্বক্ষণই নজর রাখছে। তাই তার কাছে রিভলভার আছে জেনেও হয়তো তারা তাকে ছেড়ে রেখে দিয়েছে অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত। যাকগে, যা হবার তা হবেই। সময় যখন আসবে তখন দেখা যাবে। হয় এসপার নয় ওসপার। মরতে হলে সে মেরেই মরবে। তবে একটা অস্ত্র সঙ্গে থাকলে মনে সাহস থাকে।

এমন সময় যাদব বলল— 'ক্যা শ্যামাবাবু, রজনীকো ফোন নেহি করেঙ্গে ক্যা?'

এবার রজনীকে ফোন করে জানাতে হবে কানাইয়ের খবর। সে এগিয়ে যায় ঘরের কোণে রাখা ফোনটার কাছে। রিসিভার তুলেই বুঝতে পারে যে পিটার মারা গেলেও ফোনটার লাইন এখনও কাটা হয়নি। চালু আছে সেটা। সে ডায়াল ঘোরাতে থাকে একটাই আশা নিয়ে যে, রজনীকে নিকেশ করতে পারলেই সে ডনের কাছে নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করতে পারবে।

একটু পরেই শুনতে পায়— রিং হচ্ছে ওদিকে।

পৌনে পাঁচটা বাজতে চলল। এবার মোটামুটি কাজ শেষ করে টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছে রজনী। এমন সময় ড্যানীবাবুর টেবিলের ফোনটা বেজে উঠল। ততক্ষণে নিজের ব্যাগটা টেবিলের ওপরে রেখে হাতমুখ ধুতে যাবে বলে রেডি হচ্ছে রজনী।

তখুনি ড্যানীবাবু বলে উঠলেন— 'রজনী, তোমার ফোন।'

ফোনটা কানে তুলে 'হ্যালো, রজনী বলছি' বলেই চুপ করে যায়। ফোনের ওপার থেকে যে কথাগুলো ভেসে আসছে তা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় সে। —'শোনো রজনী। তোমার কানাইকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। যদি তার দেখা পেতে চাও, তাহলে মেন গেটের সামনে যে হলদে পাগড়ি পরা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার সঙ্গে দেখা কর। আর পুলিশে খবর দেওয়ার মতো ভুল কর না। নইলে...।'

—'ঠিক আছে। ঠিক আছে। কিন্তু...মানে...ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়...।' উত্তরের প্রত্যাশায় থাকে রজনী। কিন্তু ওপার থেকে কোনো কথা ভেসে আসছে না। তবে লাইন কাটেনি এখনও। হঠাৎই তার কানে ভেসে আসে একটা স্টিমারের ভোঁ। আর তার একটু পরেই ''কট্'' করে কেটে যায় ফোনটা। কয়েকবার ''হ্যালো'' ''হ্যালো'' বলে জবাবের আশা করেও কোনো উত্তর পায় না। তাই ফোনটা রেখে নিজের টেবিলে এসে বসে।

টেবিলে কনুই রেখে দু-হাতের তালুতে মাথার রগ চেপে ধরে সে। ভয়ংকর এক উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে তার ভেতরটা। এ কী সর্বনাশ হয়ে গেল তার। সে না পৌঁছতে পারলে কানাইকে হয়তো মেরেই ফেলবে ওরা। দু-দু-জন প্রিয় মানুষকে ইতিমধ্যেই বলি হতে হয়েছে তার জন্যে। পুলিন আর সুরেশ কাকার মুখ ভেসে আসে তার মনে। আর এখন কানাই। তার শিষ্য, নাকি তার সন্তানসম নির্দোষ বাচ্চাটা বলি হতে যাচ্ছে? ভয়ে শিউরে ওঠে তার মন।

কিন্তু না, এইসময়ে সর্বনাশের আতঙ্ককে প্রশ্রয় দিলে হবে না। বরং ঠান্ডা মাথায় মোকাবিলা করতে হবে পরিস্থিতির। টেবিলে রাখা গ্লাসের জলটা ঢকঢক করে খেয়ে চেয়ারের পেছনে মাথাটা হেলিয়ে দেয়। সারা শরীরটা ঢিলে দিয়ে বেশ কয়েকবার বুকভরা শ্বাস নেয় সে। মিনিট তিনেকের মধ্যেই শরীর আর মন খানিকটা স্বাভাবিক হয় তার। এবারে ভাবতে হবে কীভাবে কানাইকে উদ্ধার করা যায়।

তবে রজনীর মনে হয় টেলিফোনে যার গলা সে শুনল, সেটা কেমন যেন চেনা চেনা। এই কণ্ঠস্বর সে আগেও শুনেছে। কিন্তু কে সে?... একটু ভাবতেই মনে পড়ে যায় তার নাম। ওই গলা শ্যামাদাসের। তার মানে, আহত শ্যামাদাসই কিডন্যাপ করেছে তার কানাইকে। কিন্তু তার একার পক্ষে কানাইকে কিডন্যাপ করা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই আরও লোক আছে এর পেছনে। তারা কানাইয়ের গতিবিধির ওপরে নজর রেখেছিল, আর তাই আজ মওকা বুঝে...। তাহলে সেও নিশ্চয়ই তাদের নজরে আছে। এদিকে পুলিশে খবর দিলেও কানাইয়ের বিপদ হবে বলে হুমকি দিয়েছে শ্যামাদাস। এখন এখান থেকে বেরোতে গেলেও সে শ্যামাদাসের লোকের নজরে থাকবে। কিন্তু বেরোতে যে তাকে হবেই। হলদে পাগড়ির সঙ্গে দেখা সে করবেই না। তাহলেই সে ওদের মুঠোয় পড়ে যাবে। তাই অন্য কোনো উপায় তাকে নিতেই হবে। ভাবতে হবে কী উপায়ে ওদের নজর এড়িয়ে বেরোনো যায় এখান থেকে।... একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবতেই প্ল্যানটা হঠাৎই ধরা দেয় তাকে।

—'কী হল রজনী, বসে রইলে যে? বাড়ি যাবে না?' জিজ্ঞেস করলেন ড্যানীবাবু।

—'হ্যাঁ স্যার, এই বেরোচ্ছি।'

—'তা টেলিফোন পেয়ে অমন চুপচাপ বসেছিলে কেন? কোনো খারাপ খবর নাকি?'

—'হ্যাঁ... মানে না স্যার। কানাইয়ের জন্যে হস্টেলে মিষ্টি নিয়ে যেতে হবে। মাসিমার অর্ডার।'

—'ও, তাই বলো। তা কলেজ স্ট্রিটেই ভালো মিষ্টির দোকান পেয়ে যাবে। আচ্ছা তবে এসো। সন্ধেবেলাটা গুরু-শিষ্য মিলে আনন্দে কাটিও।'

—'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

—'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।'

টেবিল থেকে সবার অলক্ষ্যে একটা সাদা কাগজ ব্যাগে ঢুকিয়ে ব্যাগটা নিয়ে টয়লেটের দিকে যেতে যেতে চারপাশে নজর রাখে রজনী। এমনও তো হতে পারে যে দর্শকদের সঙ্গে ওরা ওদের লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে জাদুঘরে। কিন্তু না। এই ফ্লোরে কেউ তো নেই। এমনিতেই নীচে হাতেগোনা দু-চারজন দর্শক ঘোরাফেরা করছে। একটু পরেই তারাও বেরিয়ে যাবে।

টয়লেটের দিকে যেতে যেতে হঠাৎই তার নজর পড়ে পাশের ঘরে। জাদুঘরে তারই সহকর্মী সুদেব গুহর কালো ফ্রেমের চশমা আর চশমার বাক্সটা পড়ে আছে তার টেবিলে। মনে হয় চশমাটা খুলে রেখেই টয়লেটে গেছে সুদেব। অযাচিত সুযোগ একটা। তাই রজনী টুক করে ঢুকে পড়ে সেই ঘরে। কেউ নেই। সবাই বেরিয়ে গেছে। চটপট সুদেবের চশমাটা তুলে নিয়ে ব্যাগে রাখে সে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে টয়লেটের দিকে এগিয়ে যায়। পথে দেখা পায় সুদেবের। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে ফিরছে নিজের ঘরে। সুদেব খেয়াল করেনি তাকে। রজনী তার পাশ কাটিয়ে টয়লেটে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে

দেয় ভেতর থেকে। পরনের জামা, প্যান্ট খুলে চালান করে দেয় ব্যাগে আর বের করে আনে ক্ষুরটা। পরনে থাকে শুধু টাইট হাফপ্যান্ট। বেসিনের কাছে গিয়ে জল দিয়ে ভালো করে চুল আর দাড়ি ভিজিয়ে বেসিনের পাশে রাখা হাত ধোওয়ার সাবান নিয়ে মাখায় চুলে আর দাড়িতে। তারপর চালাতে থাকে ক্ষুর। মিনিট সাতেকেই সব চুল আর দাড়ি উধাও। বেসিন থেকে সেগুলো তুলে নিয়ে ফেলে দেয় ময়লা ফেলার বাস্কেটে। ভয় তার একটাই। কাজ শেষ হবার আগেই কেউ না এসে দরজা খটখটায়। তাই দ্রুত হাতে ক্ষুরটা ব্যাগে রেখে বের করে আনে সুদেবের চশমা, সীসে বাঁধানো ল্যাসো আর তার কেনা সেই সস্তার চাদর। ল্যাসোটা কোমরে জড়িয়ে চোখে পরে নেয় চশমা। তারপরে লুকিয়ে আনা কাগজ ছিঁড়ে সরু করে পাকিয়ে লম্বা করে গুঁজে দেয় নীচের দু-চোয়ালের পাশে। ব্যাগের কাপড়ের হাতলে গিঁট বেঁধে সেটাকে ছোটো করে ঝুলিয়ে নেয় কাঁধে আর তারপরে গায়ে জড়িয়ে নেয় চাদরটা। ব্যাগটা ঢাকা পড়ে যায় চাদরের তলায়। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে ব্যাগের জিনিসপত্র আরেকবার দেখে নেয় সে। ক্ষুর, পিটারের রিভলভার, গগলস, কাঁচের ছোটো শিশি আর রঙের কৌটো সব ঠিকঠাকই আছে। এবারে আয়না দেখে নিশ্চিন্ত হয় সে। না, আর তাকে রজনী বলে মনেই হচ্ছে না। হঠাৎই নজর পড়ে টয়লেটের কোণে রাখা মেথরের ময়লা ফেলার টিনের পাত্র আর খ্যাংরা ঝাঁটা। চটপট সেগুলো তুলে নিয়ে দরজা খুলে টয়লেটেরই লাগোয়া অন্য একটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় রজনী। তখন কেউ তাকে দেখলে এক প্রৌঢ় মেথর ছাড়া আর কিছুই ভাববে না।

বাইরে বেরিয়ে একটা বাঁকের পরেই ময়লা ফেলার ভ্যাট। সেখানেই ময়লা ফেলার পাত্র আর ঝাঁটাটা ফেলে দিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে। একটু পরেই চৌরঙ্গিতে উঠে একটা ট্যাক্সি থামায় সে। ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে— 'বাগবাজার ঘাট।' সে একটা আন্দাজ লাগিয়েই বাগবাজার ঘাটে যেতে চাইছে। তাই একটু আগেই নেমে পরিস্থিতিটা যাচাই করে নিতে চায় সে।

সন্ধে ক্রমশ নেমে আসছে। নীচের ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে সিগারেট ধরায় শ্যামাদাস। এখান থেকে দূরের আধ-ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে যে ঘরের মধ্যে কানাই এখনও অচৈতন্য। কিন্তু বসেও তার শান্তি নেই। রজনী কখন, কীভাবে আসতে পারে সেটা নিয়েই সে চিন্তিত। আরও একটা ব্যাপার তার মাথায় ঘুরছে। বস, মানে, মনে হয় হরিশরণ, যাদবের ওপরে ভার দিয়েছে এখানকার সবকিছুর। কিন্তু তার অভিজ্ঞ চোখ বলছে— যাদবের হাবভাব তেমন সুবিধের নয়। সে বুঝতে পারে যে লোভে পড়ে বর্মায় ডনের ডেরায় যাওয়াটাই তার বড়ো ভুল হয়েছিল। ডন নিশ্চয়ই চাইবেন না যে তার মতো একজন 'দ্য ভিন্টেজ' এর কথা জেনে চোরাচালানে যুক্ত থাকুক। তা ছাড়া ডনের ছেলেকে তো সে নিজে বলেইছিল যে রজনী মিউজিয়মে কাজ করে। এমনকী তার লোকেদেরও সে রজনীকে চিনিয়ে দিয়েছিল। যারা এতবড়ো রাকেট চালায় তারা তো অনায়াসেই রজনীকে ট্র্যাক করে কলকাতারই কোথাও শেষ করে দিতে পারত। কিন্তু তারা সেটা না করে তাকে দিয়ে কানাইকে কিডন্যাপ করিয়ে রজনীকে এখানে আনাতে চাইছে। কিন্তু কেন? সিগারেটে টান দিতে দিতে শ্যামাদাসের মনে প্রশ্ন জাগে— ডন কি তাহলে তাকে আর রজনীকে একই জায়গায় এনে একসাথে শেষ করে দিতে চাইছে? সে কি তাহলে ডনের টোপ হয়ে গেছে?

তাই যদি হয়, তবে এখন এখান থেকে মুক্তি পেতে গেলে শুধুমাত্র একটাই রাস্তা খোলা আছে। সেই পথে হাঁটলে সে প্রাণে বেঁচে গেলেও তাকে হারাতে হবে অনেককিছু।

এখন শুধু যদি তার ভাগ্য তাকে সাহায্য করে।

সিগারেটে শেষ টানটা মেরে অ্যাশট্রেতে চেপে নিভিয়ে দেয় শ্যামাদাস।

—'জল...স্যার একটু জল দাও না...।'

খৈনি ডলতে ডলতে চমকে পেছনে তাকায় যাদব। শ্যামাদাসও উঠে পড়ে। হুঁশ আসছে কানাইয়ের। তাই তারা দু-জনেই উঠে গিয়ে দাঁড়ায় তার পাশে।

শ্যামাদাস বলে— 'যাদব, ওর হুঁশ আসছে। আফিং চড়াও।'

—'হাঁ, হাঁ, হামি আনছি। আপ দোশ মিনট সামলে রাখেন বাচ্চাকে।'

বলে যাদব বেরিয়ে যায় ট্রাক থেকে আফিংয়ের কৌটো আনতে। ওটা অ্যাম্বুল্যান্সে ছিল না। পরের গাড়িতে আনার কথা ছিল। তাড়াহুড়োয় সেটা আনার কথা ভুলে গেছে সে। তাই যাদব সেটা আনতে যায়। শ্যামাদাস ভাবতেও পারেনি যে এইরকম একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ জুটে যাবে তার কপালে। এখন এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাতে হবে। কাজটা সারতে হবে যাদব ফেরার আগেই। তাই ফোনের দিকে এগিয়ে যায় সে।

সন্ধে নেমে গেছে। বাগবাজারের ঘাটের গঙ্গার জলে এখন টুকরো টুকরো টালমাটাল শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদের ছবি। জোয়ার আসতে শুরু করেছে আর সেই হালকা হালকা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে সেই ছবি আছড়ে পড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে রজনীর পায়ের ঠিক নীচের ধাপটায়। সন্ধে হয়ে গেছে বলে সে ছাড়া ঘাটে আর লোকজনও নেই। এখন একটা নৌকো পেলে হত। কারণ রজনী ভেবে দেখেছে যে— ওরা নিশ্চয়ই ভেবে রেখেছে রজনী স্থলপথে আসবে কানাইকে বাঁচাতে। সেকারণেই জলপথটা অরক্ষিত থাকার সম্ভাবনাই প্রবল। তাই সেই জলপথেই হানা দিতে চায় রজনী। এখন একটা খালি জেলে নৌকো বা ফেরি নৌকো পেলে বর্তে যায় সে। তারই খোঁজে আশেপাশে তাকায়। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকায়। বের করে আনে একটা ছোট্টো শিশি। তারপরে শিশির তরলটা ঢেলে নেয় হাতে। ছুঁড়ে ফেলে দেয় শিশিটা গঙ্গার জলে। ন্যাচারাল কালারের নেল পালিশটা ভালো করে দু-হাতের চেটোতে মেখে নেয়। নেল পালিশে থাকা স্পিরিটের গুণে গঙ্গার হাওয়ায় সেটা শুকিয়ে বসে যায় হাতের তালুতে। পালিশের পরতে ঢেকে যায় হাতের চেটোর আর আঙুলের খানাখন্দ।

আরে, ওই তো। ওই তো ঘাটের ডানপাশে তার আকাঙ্খিত জিনিসটা। সম্পূর্ণ অরক্ষিত একটা ছোটো নৌকো। কাদায় পোঁতা একটা নোঙরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। কথায় বলে — উদ্যোগী মানুষ ভাগ্যের সাহায্য পায়। এক্ষেত্রেও বুঝি তাইই ঘটল।

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওপরে উঠে আসে সে। পাড় বরাবর গিয়ে কাদামাটি ভেঙে নেমে নৌকোটায় চড়ে বসে। তারপর একটা টানে উপড়ে নেয় নোঙরটা। সদ্য আসতে থাকা জোয়ারের ধাক্কায় পাড় থেকে দূরে সরে যায় সেটা। গা থেকে চাদর আর সুদেবের চশমাটা খুলে ঢুকিয়ে দেয় কাঁধের ব্যাগে। মুখ থেকে ফেলে দেয় নীচের চোয়ালে গোঁজা কাগজ আর নৌকোয় বসেই রঙের কৌটো থেকে মুখে, হাতে, পায়ে যতটা সম্ভব মেখে নেয় কালো রং; চোখে পরে নেয় গগলস। হাতের চেটোর কালি আর পায়ের কাদা ধুয়ে ফেলে গঙ্গার জলে আর তারপরে ছোটো দাঁড়টা দিয়ে বাইতে থাকে নৌকো।

মিনিট চারেক পরে একদল গাদাবোটের পাশ কাটিয়ে এগোতেই তার নজরে পড়ে একদম তার সামনে জলের ধার ঘেঁষা একটা বাংলো ধাঁচের বাড়ি। বাগবাজার ঘাট থেকে

দূরত্বের হিসেব করলে মনে হয় ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে গেছে সে। আশেপাশে তো আর কোনো পাকা বাড়ি নেই। তার মানে এটাই পিটারের বাংলো বাড়ি। গঙ্গার দিকে বাড়ির দুটো জানলা। তার একটাতে আলো জ্বলছে। তার মানে ভেতরে মানুষ আছে। তাই বাড়ির আড়ালে নৌকোটা নোঙর করে সে। এরপরে কাদা ভেঙে ওঠার পালা। সন্তর্পণে পাড়ের দিকে চোখ রেখে উঠতে থাকে রজনী। অর্ধেকের বেশি পথ কাদা ঠেলে শুকনো মাটিতে উঠতেই তার নজরে পড়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে। রাস্তার দিকে মুখ করে সিগারেট ফুঁকছে সে। নদীর দিকে তার নজরই নেই।

দারুণ সুযোগ। তাই কোমরের ল্যাসো খুলতে খুলতেই লোকটার হাত পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছে যায় রজনী। চকিতে ল্যাসোর প্রান্ত জড়িয়ে যায় লোকটার গলায়। ভারী সীসের বলটা সজোরে আঘাত করে লোকটার মাথার পেছনে আর তারপরেই এক হ্যাঁচকা টানে লোকটা এসে পড়ে প্রায় তার পায়ের কাছে। এই সীসের বল আর ল্যাসো ফাঁসুড়ের দড়ির মতোই নির্মম। তবু লোকটার পড়ে থাকা শরীরটা যাতে কারোর চোখে না পড়ে, তাই তাকে তুলে নিয়ে গঙ্গার ঢালু পাড়ে ছুঁড়ে ফেলে সে। 'থপ্' করে একটা হালকা আওয়াজ ওঠে আর অচেতন শরীরটা ঢালু পাড় বেয়ে গড়িয়ে গিয়ে পড়ে গঙ্গার জলে।

ফিরে এসে আবার সে ল্যাসোটা জড়িয়ে নেয় পৈতের মতো করে।

এখন বাড়ির এই দিকটা একেবারে পাহারাশূণ্য আর যে ঘরটায় আলো জ্বলছিল সেটা এদিকেই পড়ে। এমনকী একটা গরাদ লাগানো জানলাও আছে এদিকে। খুব সাবধানে জানলার পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখে রজনী আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে শিউরে ওঠে সে। ওই তো, ঘরের একটা খাটে তাইকোন্ডোর গাউন পরেই চিৎ হয়ে শুয়ে আছে কানাই। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাহলে আন্দাজে হলেও ঠিক জায়গাতেই এসেছে সে। এখন তার আর কানাইয়ের মাঝের ব্যবধান শুধু কয়েকটা জানলার গরাদ।

দূর থেকে একটা স্টিমারের ভোঁ শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় এদিকেরই কোনো ফেরিঘাটে ভিড়বে। এদিকে জোয়ারও ক্রমশ বাড়ছে। ছলাৎ ছলাৎ করে গঙ্গার ঢেউ আছড়ে পড়ছে পাড়ে।

জানলার কাঠের ফ্রেমে আর শিকগুলোর গোড়ায় হাত বুলিয়ে সে বোঝে— গঙ্গার জোলো হাওয়া আর বেশ কিছুদিন রং না করানোর জন্যে জানলার নীচের কাঠ বেশ ক্ষয়িষ্ণু আর সেইসঙ্গে মরচেও পড়েছে শিকগুলোর গোড়ায়। একটা শিক তো বেশ নড়বড়েই। একটা হ্যাঁচকা টান মারতেই সেটা খুলে বেরিয়ে আসে তার হাতে। কিন্তু কানাইকে নিয়ে বেরোতে গেলে আরও অন্তত দুটো শিক ভাঙার দরকার। সেগুলো কিন্তু অতোটা নড়বড়ে নয়। তাই প্রাণপণে কিক লাগায় সে। একবার...দু-বার...তিনবার...

স্টিমারের ভোঁ এর শব্দটা এখন অনেক কাছে। তার প্রপেলারের তোলা ঢেউ জোয়ারের ঢেউয়ের সাথে মিশে আরও জোরে আছড়ে পড়ছে পাড়ে আর সেই শব্দে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে রজনীর কিকের শব্দ, যদিও সে আওয়াজ তেমন জোরালো নয়। হঠাৎই হালকা 'মচ' শব্দ। হ্যাঁ, এবারে মনে হয় একটু আলগা হয়েছে শিকদুটো। তাই একটা শিক ধরে টান মারে সে। নাঃ, আরও একটু ঢিলে হওয়া দরকার। পাশের শিকটার অবস্থাও তাই। তাই আবার পরপর পাঁচ-ছটা কিক। তারপরে দ্বিতীয় শিকটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারতেই সেটা খুলে এল তার হাতে। কিন্তু তার পাশের শিকটা যেন নাছোড়বান্দা। বেশ খানিকটা ঢিলে হয়েছে তার গোড়াটা, কিন্তু টান মারলেও খুলে আসছে না। তাই বাধ্য হয়েই আবার কিক লাগাতে শুরু করে রজনী। তিন-চারটে কিকের পরেই 'ঠং' করে আওয়াজ তুলে শিকটা ছিটকে পড়ে ঘরের মেঝেতে।

এখন দিব্যি ফাঁকা হয়ে গেছে জায়গাটা। এখান দিয়ে সে ঘরে ঢুকে অচেতন কানাইকে তুলে অনায়াসেই বেরিয়ে আসতে পারবে। তাই জানলা গলে ঘরে ঢোকে সে। কিন্তু কানাইকে তুলতে যেতেই পেছনে ঘরের দরজা থেকে আওয়াজ ভেসে আসে— 'রুখ যা, নেহিতো গোলি মার দুঙ্গা। কৌন হ্যায় বে তু?'

রজনী বুঝতেই পেরেছে যে ঠিকরে পড়া জানলার শিকের শব্দ শুনেই ছুটে এসেছে ওরা। সে দু-হাত মাথার ওপরে তুলে আস্তে আস্তে পেছনে ফেরে। দেখে ঘরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে দু-জন। একজন তার অচেনা আর অন্যজন তার অতিপরিচিত শ্যামাদাস রায়।

যাদবের হাতে রিভলভার। কিন্তু আগন্তুককে অচেনা লাগছে তার। সে আর তার লোকেরা জাদুঘরে যে লোকটাকে ঢুকতে দেখেছিল, তার সঙ্গে এই আগন্তুকের কোনো মিলই নেই। কোথায় সেই চুল, দাড়িগোঁফ আর শার্ট-ট্রাউজার? এই লোকটার তো মুখে কালিমাখা, চোখে গগলসের কাঁচে আলো ঠিকরে পড়ছে। পৈতের মতো করে শরীরে পেঁচানো দড়ি আর পরনে হাফপ্যান্ট। একে তো রজনীকান্তর সঙ্গে মেলানো যাচ্ছে না। এর শরীরে কোথায় যেন একটা ভয়ংকরের আভাষ। তাহলে এই লোকটা কে? তাই সে আবার বলে— 'আবে, কৌন হ্যায়রে তু? বোল।' কিন্তু শ্যামাদাস চিনতে পেরেছে। তাই সে বলে ওঠে— 'যাদব, এহি হ্যায় রজনী। গোলি সে উড়া দো উসকো।' কিন্তু হাতের ইশারায় শ্যামাদাসকে থামিয়ে যাদব রিভলভারের ইঙ্গিতে রজনীকে ডাকে। বলে— 'আ, ডরয়িংরুমমে আ।'

উঁচিয়ে থাকা রিভলভারের নির্দেশ পালন করে রজনী। সে জানে, এখন শুধু সময় নিয়ে ধৈর্য ধরতে হবে আর অপেক্ষা করতে হবে যাদবের সামান্যতম ভুলের জন্যে। তাই দু-হাত তুলে ধীরপায়ে সে এগিয়ে যায় খোলা দরজা দিয়ে ড্রয়িংরুমের দিকে। বাড়ির বাইরে একটাকে সে নিকেশ করেছে বটে, কিন্তু বাইরে আর কতজন মোতায়েন আছে তা তো সে জানে না। সে এও জানে না যে বাড়ির ভেতরে যাদব আর শ্যামাদাস ছাড়া আরও কতজন আছে। যদি ভেতরে ওই দু-জন ছাড়া আরও কেউ থেকে থাকে তবে ব্যাপারটা বেশ মুশকিল হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে যে, আজই তার শেষদিন। হোক গে। তবে আজ সে মরীয়া।

ফোনটা পাবার পর থেকেই নিজের টেবিলে বসে আনচান করছেন নির্মল সেন। অনেকসময় ভুয়ো ফোনও আসে। তাই বাগবাজার অঞ্চলের শ্যামপুকুর থানার ওসি কে নির্দেশ দিয়েছেন যে সে যেন কোনো সাদা পোশাকের পুলিশ বা কোনো সোর্সকে পাঠিয়ে জানায় যে পিটারের ওই বাড়িতে কোনো লোকজন আছে কিনা। যদি লোকজন থাকে তবেই পুলিশ অ্যাকশনে যাবে। কিন্তু এখনও শ্যামপুকুর কিছু জানাল না। যদি শ্যামপুকুর থানা কনফার্মডও করে তবুও সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। জায়গাটা এমনিতে একটু সান্নাটা। তবে অন্ধকারে অপারেশন চালানোর সুবিধে যেমন আছে, তেমনই অসুবিধেও আছে। তাই একটু টেনশনে রয়েছেন সেন।

এইরকম সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই বেজে উঠল টেলিফোন।

—'হ্যালো, ডি সি ডি ডি বলছি।'

—'গুড ইভিনিং স্যার। আমি শ্যামপুকুর থানা থেকে ওসি রাঘব আচার্য বলছি।'

—'হ্যাঁ বলুন। লোক পাঠিয়েছিলেন?'

—'হ্যাঁ স্যার। সোর্স বলল যে ওই বাড়ির ভেতরে আলো জ্বলতে দেখেছে সে। তা ছাড়া বাড়ির বাইরেও তিন-চারজন লোককেও ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে।'

—'ঠিক আছে মিস্টার আচার্য, আপনি বাড়িটার ওপরে নজর রাখার ব্যবস্থা করুন। আমি ফোর্স নিয়ে অ্যাস সুন অ্যাস পসিবল পৌঁছচ্ছি। আর আপনিও ফোর্স রেডি রাখার ব্যবস্থা করুন। প্রয়োজনে ওয়্যারলেসে ডেকে নেব। ওক্কে।'

—'ওক্কে স্যার। তাই হবে। থ্যাঙ্ক ইউ।'

ফোনটা রেখে দিয়ে ইন্টারকমের রিসিভার তোলেন নির্মল সেন। ওপারের কাউকে নির্দেশ দেন— 'হ্যাঁ, জনা দশেক আর্মড ফোর্স রেডি করুন কুইকলি। আর সঙ্গে একটা অ্যাম্বুল্যান্সও রেডি রাখবেন। জানি না ওখানের বাচ্চাটার অবস্থাটা কেমন আছে। তেমন হলে তো তাকে হসপিট্যালাইজ করতে হতে পারে। ঠিক আছে? আর সবকিছু রেডি হলেই আমাকে জানাবেন। আমি থাকব অপারেশনে।'

ইন্টারকমের রিসিভার নামিয়ে রাখেন নির্মল সেন।

ড্রয়িংরুমে এসে পড়তেই যাদব তার রিভলভারের ইশারায় শ্যামাদাসকেও বলে রজনীর পাশে দাঁড়াতে। শ্যামাদাস ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিল। সে একটু দোনামোনা করে। তার দেরি দেখে যাদব তাকে বলে— 'ক্যা বে শালা, ইশারা নেহি সমঝে হ্যায় ক্যা? যা, যা, তু যাকে উসকা বগলমে খাড়া হো যা। চল, জলদি।' অনুগতের মতো শ্যামাদাস দু-হাত মাথার ওপরে তুলে এসে দাঁড়ায় রজনীর পাশে। সে বুঝতেই পারছে যে এবার যাদবের দুটো নির্মম গুলি ফুঁড়ে ফেলবে তার আর রজনীর শরীর। আঙ থিহার পথের কাঁটা নির্মূল হবে।

এত কাণ্ডের মধ্যে রজনী কিন্তু বুঝে গেছে যে বাড়ির ভেতরে কানাই, সে, শ্যামা আর যাদব ছাড়া আর কেউ নেই। থাকলে সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারত। তাই তার কাজটা সহজ হলেও হতে পারে।

কিন্তু যাদব যে রিভলভার উঁচিয়ে শ্যামার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। তার সামনে গিয়ে একটু থামল সে আর তারপরেই যাদবের বাঁ-হাতের উলটোপিঠের একটা চড় ঠাটিয়ে পড়ল শ্যামাদসের বাঁ-গালে। দীর্ঘদেহী যাদবের গায়ে প্রচণ্ড জোর। চড়ের ধাক্কায় মাথা টলে গেল তার। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে দু-হাত তুলে দাঁড়াতেই যাদব এক হ্যাঁচকায় শ্যামাদাসের কোমরের পেছনে গোঁজা ছোটো রিভলভারটা টেনে বের করে নিয়ে গালাগালি দিয়ে উঠল— 'শালা কুত্তা কা বাচ্চা, খুদ কো তু বহোত চালাক সমঝা থা না? তেরে রিভলভারকে বারে মে হামলোগ কুছ জানতে নেহি থে ক্যা?' তারপরে ছোটো রিভলভারটা নিজের প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে আবার একটা কষে চড় হাঁকাল শ্যামাদাসকে। আবারও শ্যামাদাস টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিয়ে দাঁড়াল। নির্লিপ্ত মুখে একদলা খৈনির রস আর থুতু মাটিতে ফেলে যাদব বললে—'ব্যাস বাচ্চোঁ, অভি তুরন্ত খেল খতম হো...

যাদবের বাকি কথা মুখেই রয়ে গেল। কারণ পুলিশভ্যানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। খুব কাছেই। আর তারপরে বাইরে দুটো গুলির শব্দ। ঘটনাটা বুঝতে গিয়ে একটু আনমনা হয়ে পেছনে দরজার দিকে তাকাল সে; আর সেই মুহূর্তেই একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে গেল ঘটনাটা।

যাদবের ক্ষণিকের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে রজনী চকিতে শ্যামাদসের ঘাড়টা দু-হাতে আঁকড়ে ধরে শূণ্যে ভাসিয়ে দিল শরীরটা আর তার ডানপায়ের কিক গিয়ে আছড়ে পড়ল যাদবের বাঁ-ঘাড়ে। 'কট' করে একটা হালকা আওয়াজ। তারপরেই প্রবল সেই আঘাতে দীর্ঘদেহী যাদব লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। দুপাশে দু-হাত ছড়িয়ে সে যেভাবে পড়ল, তাতে মনে হল হয়তো তার ঘাড়ের হাড় ভেঙে গেছে। হাতের রিভলভারটা ছিটকে গেল একটু দূরে।

দৌড়ে গিয়ে রজনী সেই রিভলভারটা তুলে নিল। শ্যামাদাসও মওকা বুঝে ঝাঁপিয়েছিল যাদবের প্যান্টের পকেট থেকে তার নিজের রিভলভারটা বাগিয়ে নিতে; কিন্তু চোয়ালে এক লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল সেও। উঠতে গেল, কিন্তু ততক্ষণে রজনী যাদবের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে নিয়েছে।

দু-হাতে দুটো রিভলভার নিয়ে সে শ্যামাদাসের দিকে তাকায়। তার চশমার কাঁচে ঠিকরে পড়া আলো দেখে হঠাৎই শ্যামাদাসকে এক প্রবল মৃত্যুভয় গ্রাস করে। তার মনে হয়— এবারে আর তার মুক্তি নেই। স্বয়ং যমরাজ আজ রজনীর রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। সে সম্মোহিতের মতো রজনীর সামনে হাঁটু গেড়েই বসে থাকে।

—'কী রে যমের বাচ্চা, আমার একটা বাচ্চাকে খেয়েও শান্তি হয়নি তোর? আরেকটাকেও খেতে যাচ্ছিলিস? এইবারে দেখ, কেমন করে তোর বিষ্টুকে শেষ করেছিলাম...।' বলেই সে যাদবের চুলের মুঠি ধরে খানিকটা তুলে মাথাটা হেলিয়ে দিল পেছনে। আর তারপরেই কণ্ঠনালীতে একটা চপে ভেঙে দিল তার ক্রিকয়েড কার্টিলেজ। নরহত্যা করবে না বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিল রজনী। কিন্তু পাছে যাদব তার ঘাড় ঠিক হয়ে গেলে পুলিশের কাছে তার নাম বলে দেয়, তাই সে এখন বাধ্য হয়েই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল। তার গায়ে তো একজন সিরিয়াল কিলারের তকমা লেগেই গেছে।

শ্যামাদাসকে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু বাইরে থেকে ভেসে আসছে গুলির শব্দ আর মাঝে মাঝে মানুষের আর্তনাদ। কাদের সঙ্গে কাদের গুলির লড়াই হচ্ছে? এদেরই কোনো রাইভ্যাল গ্যাং, নাকি পুলিশ? সে নিজে তো পুলিশে খবর দেয়নি। যাইহোক না কেন, আর বেশি দেরি করা যাবে না। সে ঠিকই করে নিয়েছে যে খুন না করলেও আজ শ্যাদাসকে এমন শিক্ষা দেবে যাতে ভবিষ্যতে সে পঙ্গু থাকে সারাজীবনের মতো।

শ্যামাদাস কিছু বলতে যাচ্ছিল। হয়তো বা ক্ষমাভিক্ষা। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে রজনী বলে উঠল— 'থাম শালা পা-চাটা কুত্তা কোথাকার। এতদিন তো অনেকের পা চেটেছিস। নে এবার আমার পা চাট।'

শ্যামাদাস ইতস্তত করছিল। তাই দেখে রজনী চাপা ক্রুর স্বরে বলে উঠল— 'শালা, চাট বলছি।'

বাধ্য হয়েই শ্যামাদাস রজনীর সামনে ক্রীতদাসের মতো হাঁটু গেড়ে বসে। জিভ বের করে সে নীচু হতে যাবে, এমনসময় রজনীর জোরালো হাঁটুর গুঁতো এসে লাগলো তার থুতনীর নীচে। 'উঁ' বলে শুধু ককিয়ে উঠতে পারল শ্যামাদাস। দু-পাটির দাঁতের চাপে তার আধখানা জিভ টুকরো হয়ে পড়ে গেছে মাটিতে। খসে পড়া টিকটিকির ল্যাজের মতো দু-সেকেন্ড তিরতির করে কেঁপে স্থির হয়ে গেল সেটা। প্রচণ্ড যন্ত্রনায় দু-হাতে মুখ চেপে শ্যামাদাস এলিয়ে পড়ে মাটিতে। গলগল করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার দু-হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে। ভিজে যাচ্ছে তার জামা। কিন্তু তাতেও আক্রোশ কমে না রজনীর। সে টেবিল থেকে একটা হাত দেড়েক লম্বা ভারী মার্বেল পাথরের মূর্তি তুলে নিয়ে আসে। তারপরে শ্যামাদাসের একটা হাত পা দিয়ে মাটিতে চেপে ধরে সেই মূর্তি দিয়ে একের পর এক আঘাত করতে থাকে তার আঙুলে। কাতরে কাতরে উঠতে থাকে শ্যামাদাস। কিন্তু মুখ দিয়ে শুধু 'ওঁ ওঁ' শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ বেরোয় না। সেই হাতের সবকটা আঙুল থেঁতলে দিয়ে রজনী এবারে চেপে ধরে শ্যামাদাসের অন্য হাতটা। একইরকম নির্দয়ভাবে থেঁতলে দিতে থাকে সেই হাতেরও সব আঙুলগুলো। তার চোখের সামনে রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাটিতে পড়ে থাকা দেহটা আর প্রতিটা আঘাতের অভিঘাতে বেঁকে বেঁকে উঠছে। তবুও থামছে না সে।

একসময় আক্রোশ কমলে উঠে দাঁড়ায় রজনী। সে এবারে নিশ্চিত হয়েছে যে, শ্যামাদাস আর কোনোদিন মুখ দিয়ে কিছু বলতে আর হাত দিয়ে কিছু লিখতে পারবে না।

না পুলিশের কাছে, না কোনো গ্যাংস্টারের কাছে।

এমন সময় বাইরে থেকে চোঙা ফোঁকার আওয়াজ শোনা যায়— 'বাড়ির মধ্যে যারা আছ, তারা বেরিয়ে এসে ধরা দাও। নইলে দু-মিনিটেই আমরা দরজা ভেঙে ফেলব।' এটা নির্ঘাত পুলিশের হুমকি। তার মানে, বাইরে পুলিশের সঙ্গে লড়ার মতো আর কোনো লোকজন নেই। আর মাত্র দু-মিনিট সময়। ওইটুকু সময়ের মধ্যে রজনী কি পারবে কানাইকে নিয়ে বাড়ি ছাড়তে? তাই একটা রিভলভার কোমরে গুঁজে আর একটা হাতে নিয়ে সে ছুটে যায় কানাইয়ের ঘরে। তার ঘুমন্ত শরীরটা তুলে নিতে যায় কাঁধে। কিন্তু কি একটা ভেবে কানাইকে ছোঁয় না সে।

জানলা দিয়ে সবে পা বের করেছে, এমন সময় 'খটাং' করে একটা বুলেট এসে লাগে জানলার পাল্লায়। সে বুঝতে পারে যে পুলিশ মোটামুটি ঘিরে ফেলেছে বাড়িটাকে। তাই যেদিক থেকে গুলিটা এসেছিল, সেদিকেই আন্দাজ করে পরপর তিনটে গুলি ছোঁড়ে সে। ওদিকে কেউ একজন ককিয়ে উঠতেই বুঝতে পারে যে আবারও অন্ধকারে শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছে সে। এখন আরও পুলিশ আসার আগেই বেরোতে হবে তাকে। তা ছাড়া পুলিশ তো একটু পরে বাড়িতে ঢুকবেই। তারাই উদ্ধার করবে কানাইকে। বরং সেটাই ভালো হবে। কানাইয়ের সঙ্গে তার গোপন সত্ত্বার যোগাযোগও পুলিশ ধরতে পারবে না। তার নিজের গোপন পরিচয়ও অজানাই থাকবে তাদের। তারপরেই জানলা গলে বেরিয়ে সে দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকে নৌকোর দিকে।

চতুর্দশীর চাঁদের টানে ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে সেটা। আরও জোরে ঢেউ উঠছে গঙ্গার বুকে। ফলে নৌকোটাও এসে গেছে পাড়ের অনেক কাছে। জলে ঢেকে গেছে পাড়ের কাদা। তাই নৌকোর কাছে এসে সে লাফ মারে। আরও দুলে ওঠে নৌকোটা। আর একটু হলেই ডুবে যেত আর কী। সেটা সামলে নিয়ে একটা টানে তুলে নেয় নোঙরটা। হাতে তুলে নেয় দাঁড়। নৌকো বাইতে থাকে গঙ্গার খানিকটা ভেতরে ঢুকে গিয়ে, জোয়ারের উলটোপথে, গঙ্গার বুকে সারি দিয়ে বাঁধা গাদাবোটগুলোর আড়ালে আড়ালে। যাতে পুলিশ গুলি ছুঁড়লেও তা গায়ে না লাগে।

সেখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে এবার সে মন দেয় নিজের দিকে। অস্ত্র দুটো, গগলস আর ল্যাসোটা ব্যাগে রেখে ভালো করে গঙ্গাজলে মুখ হাত ধুয়ে নেয়। ব্যাগ থেকে বের করে পরে নেয় তার শার্ট-প্যান্ট। আর তারপরে আবার দাঁড় তুলে নেয় হাতে।

ফায়ারিংয়ের শব্দ একেবারে থেমে যাওয়ার পরে নির্মল সেন কনস্টেবলদের বলেন দরজা ভাঙতে। বন্দুক উঁচিয়ে পাঁচ ছ-জন আর্মড পুলিশ ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে। তাদের একটু পেছনেই নির্মল সেন আর রাঘব আচার্য ঢোকেন রিভলভার উঁচিয়ে। হঠাৎ একটা 'গোঁ গোঁ' আওয়াজ শুনে দু-জন কনস্টেবল ছুটে যায় সেদিকে। একী দেখছে তারা! একজন মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে। তার মুখ আর দুটো হাত থেকে রক্ত বেরিয়ে ভিজে যাচ্ছে মেঝে। তারই পাশে পড়ে আছে লম্বা-চওড়া একজন লোক।

নির্মল সেন বাকিদের বাড়িটা তল্লাশি করতে বলেন। ওসি আচার্য তিনজন কনস্টেবলকে নিয়ে বাড়িটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে থাকেন আর সেন এগিয়ে যান পড়ে থাকা মানুষ দুটোর কাছে। প্রথমে যাদবকে নেড়েচেড়ে দেখেন। নাঃ, কোনো সাড়াশব্দ নেই। হাতের নাড়ি টিপে দেখেন। নাঃ, কোনো আশা নেই। তারপরে এগিয়ে যান শ্যামাদাসের কাছে। থ্যাঁতলানো আঙুলের নুলো হাতদুটো তুলে সে কিছু বলতে চায় তাঁকে। তার সারা

শরীর কাঁপছে। কিন্তু পাশে পড়ে ওটা কী? হাঁটু একটু মুড়ে বসে তুলে ধরেন জিনিসটাকে। তাঁর বুঝতে বাকি থাকে না সেটা কি। তাই লোকটা কথা বলতে পারছে না আর অসম্ভব ব্লিডিং হচ্ছে মুখ আর হাত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে কনস্টেবলদের আদেশ করেন— 'এদের অ্যাম্বুল্যান্সে তোলো, কুইক।' তারপরে একজন সাব-ইনস্পেকটরকে জিজ্ঞেস করেন— 'আমাদের লোকেদের অবস্থা কী?' সে বলে— 'একজনের কাঁধে গুলি লেগেছে স্যার আর দু-জনের বডি ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে গুলি। ওরা আমাদের ভ্যানেই আছে স্যার।'

ইতিমধ্যে স্ট্রেচার এসে তুলে নিয়ে যায় প্রথমে শ্যামাদাসকে আর তারপরে যাদবকে।

—'অ্যাম্বুল্যান্স ছেড়ে দাও' বলে নির্মল সেন বাইরে আসেন। এখন অনেক কাজ বাকি। মাথার ওপরে বাতি জ্বালিয়ে আর সাইরেন বাজিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স এগিয়ে যায় দ্রুতগতিতে। কিন্তু খানিক এগোতেই একটা বিকট শব্দ। চমকে উঠে সবাই দেখে দূরে আধো অন্ধকারে একটা ট্রাক পুরো দলা পাকিয়ে দিয়েছে অ্যাম্বুল্যান্সটাকে।

—'কাম অন, কুইক' বলে নির্মল সেন দৌড়ে গিয়ে ওঠেন নিজের জিপে। সঙ্গে সেই সাব-ইনস্পেকটর আর জনা তিনেক রাইফেলধারী পুলিশ। জিপ চলতে শুরু করে। দুর্ঘটনাস্থলের খানিকটা দূর থেকেই সেন বুঝতে পারেন যে দু-জন লোক ট্রাক থেকে নেমে পালাচ্ছে। তাই ড্রাইভারকে বলেন— 'জোরে চালান।' জিপের ড্রাইভার চাপ দেয় অ্যাকসিলেটরে। লোকদুটোর খানিকটা কাছাকাছি যেতেই সেন উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন জিপে। রিভলভার তুলে অন্যদের বলেন— 'পায়ে গুলি করুন।' খান সাতেক বুলেট ছুটে যায় পুলিশ জিপ থেকে। পড়ে যায় লোকদুটো। কাছে গিয়ে বুঝতে পারেন, একজনের পেট ভেদ করে গেছে বুলেট আর অন্যজনের কাঁধের নীচে দিয়ে ঢুকে ডানদিকের গলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এখন এদের বাঁচানো খুব জরুরি। অনেক খবর মিলতে পারে এদের কাছ থেকে। তাই বলেন— 'এদেরকে জিপে তুলুন।' কনস্টেবলরা তাদের পুলিশ জিপেই তুলতে থাকে। সেই ফাঁকে সেন এগিয়ে যান অ্যাম্বুল্যান্সটার দিকে। সব দেখেশুনে তাঁর মুখ থেকে হতাশা আর বিস্ময়ে বেরিয়ে আসে— 'ওঃ মাই গড। সব শেষ।' এখানে আর কিচ্ছু করার নেই। তাই জিপে উঠে জিপ ঘোরাতে বলেন পিটারের বাড়ির দিকে। সেখানে পৌঁছে ভ্যানে লোকদুটোকে তুলে দিয়ে ভ্যানটাকে সোজা হাসপাতালে যেতে বলেন। ভ্যান বেরিয়ে যায়।

ততক্ষণে বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি শেষ।

নির্মল সেন আচার্যকে জিজ্ঞেস করেন— 'পেলেন বাচ্চাটাকে?'

—'হ্যাঁ স্যার। বাচ্চাটা একটা ঘরে শুয়ে আছে।'

—'চলুন তো, আর একবার দেখি গিয়ে ভেতরে। খবর তো ছিল যে বাচ্চাটাকে এখানেই রাখা হয়েছে। আর বাচ্চাটা থাকলেও বাড়িতে এত পাহারার ব্যবস্থাই বা রাখা হয়েছিল কেন?'

ভেতরে গিয়ে নির্মল সেনের চোখ ঘোরে ফেরে। মেঝেতে যেখানে যাদব পড়েছিল, সেখানটাই ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। নজর চালাতে চালাতে চোখে পড়ে একটা ছোটো দস্তার কৌটো। এটা কী? পকেট থেকে রুমাল বের করে সাবধানে খোলেন সেটা। ভেতরে কালো রঙের চিটচিটে পদার্থ একটুখানি। নাকের কাছে তুলে শোঁকেন। তারপর রাঘব আচার্যকে বলেন— 'ওপিয়াম। কিন্তু এখানে ওপিয়াম এল কেন? আর এত ছোটো কৌটতেই বা কেন? এদের দু-জনের মধ্যে কি কেউ আফিংখোর ছিল?'

—'ব্যাপারটা দেখতে হবে স্যার। কার ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে এতে।' নির্মল সেনের কাছ থেকে কৌটোটা নিজের রুমালে নিয়ে পকেটে ঢোকান আচার্য।

ডি সি ডি ডি তারপরে এগিয়ে যান সেখানে, যেখানে জিভকাটা লোকটা পড়েছিল। কোমরে দু-হাত রেখে ভালো করে জরিপ করতে থাকেন জায়গাটা। তার এপাশে ওপাশে ইতস্তত ছড়িয়ে কাদামাখা পায়ের ছাপ। সেই ছাপ যে একই লোকের, তা বেশ স্পষ্ট। ড্রয়িংরুম থেকে এদিক-ওদিক ঘুরে সেই ছাপ চলে গেছে একটা ঘর পর্যন্ত। ওই ঘর থেকে সেই লোকটা এখানে এসেছিল আর এখান থেকে আবার ঘরে ফিরে গিয়েছিল তা কাদামাখা পায়ের ছাপে স্পষ্ট। তাই ঘরটা একবার দেখতে হবে। ঘরের মুখেই পড়ে আছে একটা শিক।

নির্মল সেন এগিয়ে যান বিছানার কাছে। বাচ্চাটা শুয়ে ঘুমচ্ছে অঘোরে। ওকে এখুনি হাসপাতালে পাঠানো দরকার। তাই উনি রাঘব আচার্যকে বলেন— 'মিস্টার আচার্য, বাচ্চাটাকে ইমিডিয়েটলি হসপিটালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

—'হ্যাঁ স্যার।' আচার্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন কানাইকে হাসপাতালে পাঠানোর জন্যে।

তারপরে সেন এগিয়ে যান জানলার দিকে। জানলাতে কিন্তু তিনটে শিক নেই। একটা তো মেঝেতে পড়ে আছে, তবে বাকি দুটো গেল কোথায়? জানলার কাছে এগিয়ে যান। ঘরের আলোয় ভালো করে দেখেন যে জানলার ফ্রেমের নীচের কাঠের যে জায়গাগুলোয় শিক গাঁথা থাকে সেখানে নতুন ভাঙা কাঠের চিহ্ন আর বাইরে পড়ে আছে বাকি শিক দুটো। তার মানে এখান দিয়েই কেউ ঢুকেছিল। আর সে বেরিয়েও গেছে এই পথেই, কারণ জানলার কাঠে রয়েছে কাদার দাগ।

এবারে নির্মল সেন পায়চারি করতে করতে তলিয়ে ভাবতে থাকেন— তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায় যে কেউ একজন জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু কে সে? এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই আবার এগিয়ে যান জানলার কাছে। আরে, ওটা কী? জানলার কাঠের ফ্রেমে কালো ছোপটা কীসের? এতক্ষণ তাঁর নজর এড়িয়ে গিয়েছিল সেটা। হয়তো ছোটো দাগ বলেই। তাই আঙুল দিয়ে কালো ছোপটা ঘষে দেখেন। হাতে লেগে যায় সেটা। এটা কী? কিন্তু তারপরে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষতেই একটা শিহরণ ছড়িয়ে যায় তাঁর শরীরে। তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছে কয়েকমাস আগের খবরের কাগজের একটা হেডলাইন— 'কলকাতায় নিশির ডাক'।

তার মানে এখানেও নিশি এসেছিল। কিন্তু এবার দুয়েকটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তাঁর মাথায়। আচ্ছা, 'নিশি' কি এদের দলের লোক, নাকি এদের রাইভ্যাল দলের? এদের দলের লোকই যদি হয়, তাহলে এরা নিজেদের মধ্যেই মারপিট করল কেন? কিডন্যাপ করা নিয়ে কি তবে কোনো গন্ডগোল হয়েছিল? কিন্তু ইন্ট্রুডার রাইভ্যাল দলের লোক হলে অঙ্কটা যেন অনেকটাই মিলে যায়। সে কি এদেরকে ডেস্ট্রয় করতেই এখানে এসেছিল? আর তাই যখনই সে দেখেছে যে পুলিশ বাড়িতে ঢুকতে পারে, তখনই সে পালিয়েছে জানলা দিয়ে। কিন্তু এদের ওপরে তার এত আক্রোশ কেন? এই লোকটাই কি তাঁদের কাছে পিটারের জবানবন্দির ফোটোকপি পাঠিয়েছিল? এইই কি ফোন করে তাঁদের জানিয়েছিল কিডন্যাপের ব্যাপারটা? এখন তাঁকে সেই ব্যাপারটাই খুঁজে দেখতে হবে। জানতেই হবে 'নিশি' লোকটা আসলে কে?

সেদিন রাতে দশটা নাগাদ রজনী এসে কড়া নাড়ল বউবাজারের বাড়ির দরজায়। শুনতে পেল ভেতর থেকে মেসোমশাইয়ের হাঁক— 'কেষ্ট দেখতো, এত রাত্তিরে কে এল।'

দরজা খুলে রাস্তার ম্লান আলোতে দাড়ি গোঁফহীন, ন্যাড়ামাথা রজনীকে দেখে প্রথমটা কেমন যেন ঘাবড়ে গেল সে। সামনের মানুষটা তার পরিচিত কি না তা ঠাহর করতে একটু সময় নিল। তারপরে রজনী যখন বলল— 'কী গো কেষ্টদা সরো। ভেতরে ঢুকতে দাও;' তখন চিনতে পেরে— 'আরে দাদাবাবু, তুমি? এসো, এসো। ভেতরে এসো।' বলে দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়াল সে। রজনী ভেতরে ঢুকতে দরজায় খিল দিতে দিতে বলতে লাগল— 'আর বলো না, সারাদিন যা কাণ্ড...।'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই মেসোমশাইয়ের গলা— 'কে রে কেষ্ট?'

—'আজ্ঞে আমাদের দাদাবাবু।'

—'কে রজনী?' বলতে বলতে বেরিয়ে আসেন মেসোমশাই। তারপরে নতুন রূপের রজনীকে দেখে একটু উষ্মা মিশিয়ে বলেন— 'তা অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?'

—'আজ্ঞে মেসোমশাই, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে। ডার্মাটোলজিস্টের কাছে।' আগে থাকতে এই প্ল্যানটাই ছকে রেখেছিল সে।

—'তা চামড়ার ডাক্তারের কাছে কেন? কী হয়েছে তোমার?' প্রশ্নটা এল মাসিমার কাছে থেকে।

—'আর বলবেন না মাসিমা। মিউজিয়মে তো ল্যাবরেটরিতে হাড়গোড় নিয়ে কাজ করতে হয়। সেখানে নাকি মাথা ঢেকে কাজ করার নিয়ম। তা ড্যানীবাবুও আগে আমাকে সতর্ক করে দেননি। আত্মভোলা লোক তো। কাজেই না জেনেই আমি খালি মাথাতেই কাজ করতাম। এদিকে কিছুদিন হল মাথা আর দাড়ি চুলকোত। তা উনিই একদিন সেটা খেয়াল করে আমাকে ডাক্তার দেখাতে বলেন। তাই আজ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম।'

—'তা ডাক্তার কী বললেন শুনি?' প্রশ্নটা এবার করেছেন মেসোমশাই।

—'আজ্ঞে, ডাক্তার বললেন যে, চুলে আর দাড়িতে নাকি চাম-উকুন হয়েছে। তাই সব চুল-দাড়ি কামিয়ে ফেলতে বললেন। আর একটা লোশন লিখে দিয়েছেন লাগানোর জন্যে।'

এবারে কেষ্টদা বলে উঠল— 'উরিবাবা, চাম-উকুন। সে বড়ো বাজে জিনিস গো দাদাবাবু। চামড়ায় ঘা করে দেয়।'

সব শুনে মাসিমা বললেন— 'তা বাবা রজনী, এবার থেকে আর ওসব দাড়ি-গোঁফ রেখো না। আগে যেমন ছিলে তেমনই থেকো। আর অফিসে কাজ করার সময় মাথায় একটা স্কার্ফ বেঁধে রেখো। বুঝলে?'

—'হ্যাঁ, তাই করতে হবে দেখছি।'

—'ঠিক আছে, সব বুঝলাম। তা আজ এদিকে সারাদিনে কি ঘটেছে সেটা জানো কি?' মেসোমশাইয়ের স্বর গম্ভীর।

—'আজ্ঞে, মানে...কী হয়েছে মেসোমশাই?' কিছুটা যেন অপ্রতিভ রজনী।

—‘তোমার কানাইকে কারা যেন স্কুলের সামনে থেকে কিডন্যাপ করেছিল। ফোন এসেছিল থানা থেকে।’

—‘কিডন্যাপ? বলেন কী মেসোমশাই? কিন্তু কেন? কী বলল থানা থেকে?’ বেশ উদগ্রীব দেখায় রজনীকে।

—‘ব্যস্ত হবার কিছু নেই। থানা থেকে ঘণ্টাদেড়েক আগেই ফোন এসেছিল। পুলিশ নাকি তাকে বাগবাজার ঘাটের কাছে একটা বাড়ি থেকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করেছে। ওকে হাসপাতালে দেখিয়ে তবেই হস্টেলে নিয়ে যাবে। আমার কী মনে হয়, জানো রজনী, কিডন্যাপাররা অন্য কোনো বাচ্চাকে তুলতে গিয়ে ভুল করে কানাইকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।’

—‘তা হতে পারে। কিন্তু ওকে হস্টেলে নিয়ে যাবে? আমার মনে হয়, এখানে আনলেই বোধ হয় ভালো হত। হস্টেলে কি আর সেই কেয়ার ও পাবে?’ রজনীর গলায় স্বাভাবিক উদ্বেগ।

—‘দেখ রজনী। পুলিশ তো তার নিয়ম মানবেই। তবে আমি একবার হস্টেলে ফোন করে দেখি, ওরা ফিরল কি না। বলে কয়ে দেখি যদি ছেলেটাকে বাড়িতে আনা যায়।’

—‘তাইই করুন মেসোমশাই। ছেলেটা যদি ফিরে থাকে, তাহলে কেমন আছে সেটা তো অন্তত জানা যাবে।’

মেসোমশাই ফোনের রিসিভারটা তোলেন। ডায়াল করতে যাবেন, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। রিসিভারটা রেখে মেসোমশাই আবার হাঁক দেন— ‘অ্যাই কেষ্ট, দেখত আবার কে এল?’

সদর দরজার ওপার থেকে শোনা গেল— ‘দরজা খুলুন। আমরা পুলিশ। থানা থেকে আসছি।’

কেষ্টদা তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দেয়। মেসোমশাই আর রজনী নেমে আসে দাওয়া থেকে। মাসিমাও এসে দাঁড়ান দাওয়ায়। এদিকে পুলিশ ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে বাড়িতে। একজন ইনস্পেকটর সামনে, তাঁর পেছনে দু-জন কনস্টেবল ধরে নিয়ে আসছে কানাইকে আর তাদের সবার পেছনে হস্টেল সুপার। কানাই হাঁটছে ঠিকই, তবে তাকে খুব ক্লান্ত লাগছে।

ইনস্পেকটর জিজ্ঞেস করলেন— ‘আচ্ছা, রজনীকান্ত রায় কে?’

রজনী এগিয়ে গিয়ে বললে— ‘আজ্ঞে আমি।’

—‘আমরা লোকাল থানা থেকে আসছি। তা এই বাচ্চাটার লোকাল গার্জেন তো আপনিই। এই নিন আপনার বাচ্চা।’

মাসিমা ততক্ষণে নেমে এসেছেন দাওয়া থেকে। কনস্টেবল দু-জন কানাইকে তুলে দেয় তাঁর হাতে। মাসিমা জড়িয়ে ধরেন তাকে।

ইনস্পেকটর বলতে থাকেন— ‘আমরা ওকে হসপিটালে দেখিয়েছি। এখন সুস্থ। আমরা গরম দুধও দিয়েছি। তবে ওর এখন ক-দিন রেস্টের খুব দরকার।’

সেইসময় পেছন থেকে হস্টেল সুপার বলে ওঠেন— ‘দেখুন রজনীবাবু, এই অবস্থায় তো হস্টেলে ওকে সর্বদা কেয়ারে রাখা সম্ভব নয়। তাই ওনাদের বলে ছেলেটাকে আমি আপনার বাড়িতেই নিয়ে এলাম।’

মেসোমশাই বলেন— 'তা ভালোই করেছেন। এইসময়টা এখানে থাকলে ও যত্নেই থাকবে।'

—'তা এই বাচ্চাটাকে কেন কিডন্যাপ করা হল, সে ব্যাপারে কি কিছু বলতে পারেন?' প্রশ্নটা ইনস্পেকটরের।

—'আজ্ঞে, তেমন কোনো কারণ আছে বলে তো আমার মনে হয় না।' জবাব দেয় রজনী।

—'ঠিক আছে। তবে তেমন কোনো কারণ খুঁজে পেলে বা কোনো হুমকি চিঠি পেলে সেটা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। তবে এইটুকু শুধু জেনে রাখুন যে আপনাদের বাচ্চাকে একটা খুব নোটোরিয়াস গ্যাং তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের দু-জন ড্রাইভার ধরা পড়েছে। সিভিয়ারলি ইনজিওর্ড। তবে তারা হসপিটালে ট্রিটমেন্টে আছে। আর এই কিডন্যাপের ব্যাপারে আমরা তদন্তও করছি। সে যাইহোক, এখন থেকে ওকে খুব সাবধানে রাখবেন।'

—'ঠিক আছে। অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনাদের ডিস্টার্ব করার জন্যে আমাদের মাফ করবেন।' কথাটা বলেন মেসোমশাই।

ইনস্পেকটর বলে ওঠেন— 'না না, এটা তো আমাদের কর্তব্য। আমরা তো আছিই এই জন্যে। আর হ্যাঁ, মিস্টার রায়, কাল একবার ওসি-র সঙ্গে দেখা করবেন থানায়। আমাদের কিছু কথা জানার আছে। আচ্ছা আসি তাহলে।'

পুলিশ দরজার দিকে একটু এগিয়ে যেতেই হস্টেল সুপার রজনীর কাছে এসে বলেন— 'কিছু মনে করবেন না মশাই। আজ সারাদিন যা গেছে। আমি তো জেরবার একেবারে। এইরকম কেস আমার হস্টেলে আগে কখনো ঘটেনি। বড্ড ভয় করছে মশাই। তাই বলছিলাম কী, আপনি বরং ওকে হস্টেল থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজেদের কাছেই রাখুন। আমার পক্ষে এসব উটকো ঝামেলা সামলানো সম্ভব নয়, বুঝলেন।' হস্টেল সুপারের গলায় যেন বেশ বিরক্তির সুর।

তাই বোধ হয় মাসিমা বলে উঠলেন— 'বাবা রজনী, উনি যেটা বলছেন তুমি বরং তাইই কর। দু-একদিনের মধ্যে গিয়ে কানুর জিনিসপত্র নিয়ে এসো। ও এখন থেকে এখানেই থাকবে। কে জানে বাবা, চোখের আড়ালে থাকলে আবার কখন কী বিপদ ঘটবে।'

কেষ্টদা ততক্ষণে মাসিমার কাছ থেকে কানাইকে নিয়ে ওপরের ঘরে উঠে গেছে।

রজনীও ভেবে দেখল যে কানাইয়ের নিরাপত্তার জন্যে এটাই সেরা উপায়। তবে এরপরেও যে তারা কানাইয়ের ওপরে ঝাঁপাবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি?

সদর দরজা বন্ধ করে মেসোমশাই আর মাসিমার সাথে কথাবার্তা শেষ করে একটুপরে ওপরে এসে রজনী দেখে কানাই গভীর ঘুমে ডুবে। কেষ্টদাও নেমে গেছে নীচে। এটাই মস্ত সুযোগ। সে চটপট তার কাপড়ের ব্যাগ থেকে সবকিছু বের করে খাটের তলায় তার দাদুর প্যাঁটরায় ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়। তার কেন জানি না মনে হচ্ছে যে পুলিশ তাকে যেকোনো কারণে হোক সন্দেহ করতে শুরু করেছে। কানাইয়ের কিডন্যাপের পরে সে যে অফিসে ছিল না সেটাই কি কারণ? তা যাইহোক এবার গ্রামে গেলে এই প্যাঁটরাটাকে ব্যাগের মধ্যে করে নিয়ে গিয়ে রেখে আসতে হবে সেখানে, যেখান থেকে সে এটাকে বের করে এনেছিল একসময়ে।

তাই পরের দিনই স্কুলে গিয়ে কানাইয়ের জন্যে দু-দিনের ছুটির দরখাস্ত করে সেখান থেকে সোজা হস্টেলে গিয়ে সইসাবুদ সেরে কানাইয়ের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতেই সন্ধে হয়ে গেল। এদিকে থানায় ডেকে পাঠিয়েছে। ঠিক আছে, কালই না হয় যাবে। কিন্তু ফিরে এসে দেখে কানাইয়ের মুখ ভার।

—'কী রে কানাই, কী হয়েছে তোর? এত চুপচাপ কেন?'

উত্তরটা দিলেন মাসিমা— 'আর বলো না, বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে আসতে হয়েছে বলে মুষড়ে পড়েছেন কানুবাবু। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দুষ্টুমি করা তো আর হবে না, তাই।'

—'কি রে কানাই, তাইই?'

কানাই শুধু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দেয়।

রজনী বলে— 'তা স্কুলে গেলে তো বন্ধুদের সাথে দেখা হবেই। তখন তুই ওদের সঙ্গে গল্প করার, টিফিন পিরিয়ডে খেলা করার সুযোগ তো পাবিই। তা ছাড়া অফিস থেকে ফিরে আমি তোকে পড়া দেখিয়ে দিতে পারব। তারপরে সকালবেলায় ফাঁকা রাস্তায় দু-জনে মিলে জগিং করে এসে ছাদে তোকে তাইকোন্ডোও শেখাতে পারব। কতকিছু তোর শিখতে বাকি আছে জানিস? এখন তো তুই একজনকে কাত করতে পারিস; কিন্তু যদি চারজনকে সামলাতে হয় তখন? পারবি?'

সব শুনে মেসোমশাই বললেন— 'বুঝলে রজনী, ছেলেটার এখন একটু মেন্টাল রিলিফ দরকার। তুমি বরং এই সামনের গরমের ছুটিতে ওকে নিয়ে একটু দেশের বাড়িতে ঘুরে এসো। বাবা-মা আর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে দেখবে ওর এই মনমরা ভাবটা কেটে যাবে। তা কি গো কানুবাবু, গরমের ছুটিতে গ্রামে যাবে তো?' শেষের কথাটা কানাইকে বলা।

কানাই এবারেও শুধু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়।

এদিকে সন্ধে হয়ে গেছে। এমন সময় আবার দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

—'কে?' বলে হাঁক পাড়েন মেসোমশাই।

—'আমি। গোপালদার লোক। দরজাটা একটু খুলুন।'

—'কেষ্ট, দরজাটা খুলে দে তো।'

কেষ্টদা গিয়ে দরজাটা খুলে দিতে ট্রাউজার আর হাফহাতা শার্ট পরা বলিষ্ঠ চেহারার একজন যুবক ভেতরে আসে।

—'বসুন ভাই, একটু বসুন। আমি ভেতর থেকে আসছি।'

—'ঠিক আছে। তবে মেসোমশাই একটু তাড়াতাড়ি করবেন। এখনও অনেক বাড়ি যেতে বাকি। আর পারলে এবারে একটু বাড়িয়ে দেবেন।'

একটু পরেই মেসোমশাই বেরিয়ে এসে বলেন— 'এবারে এগারো টাকা নাও ভাই।'

—'সামনের বছরে মার্চে তো ইলেকশন। তাই এখন থেকেই ফান্ড তুলতে হচ্ছে। জানেনই তো ইলেকশনে কী পরিমাণে খরচ-খরচা হয়।'

মেসোমশাই টাকাটা যুবকের হাতে তুলে দিতে দিতে বলেন— 'তা ইলেকশনে কে জিতবে বলে মনে হয়? কংগ্রেস না মুসলিম লীগ? হাওয়া কোন দিকে?'

যুবক ঈষৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে— 'এত তাড়াতাড়ি কি আর তা বলা যায়। তবে যুগলদা তো বলছেন যে কংগ্রেস জিতবে। কিন্তু ওদের তো জনসংখ্যা ঢের বেশি। তাই গোপালদা তো বলছিলেন যে মুসলিম লীগের জেতার চান্স বেশি। আচ্ছা, আসি মেসোমশাই। তবে পরের বারে আরেকটু বাড়িয়ে দেবেন।' একটু গলা তুলেই বলে যুবক। মেসোমশাইয়ের হাতে ধরিয়ে দেয় চাঁদার রসিদ।

—'আচ্ছা এসো। আর হ্যাঁ, গোপালবাবু আর যুগলবাবু ভালো আছেন তো?'

যেতে যেতে যুবক বলে— 'হ্যাঁ, মেসোমশাই।'

যুবক রাস্তায় গিয়ে পড়তেই কেষ্টদা সদর দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

রজনী এতক্ষণ চুপচাপ বসে সব দেখছিল আর শুনছিল। এবার সে মেসোমোশাইকে জিজ্ঞেস করে— 'আচ্ছা মেসোমোশাই, এই যুগলবাবুই কি কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়নের নেতা? রাস্তাঘাটে পোস্টারে নামটা দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।'

—'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। যুগল ঘোষ কংগ্রেসেরই কর্মী। গান্ধীবাদী। কলকাতায় কিন্তু ওনার যথেষ্ট প্রভাব আছে।'

—'আর ওই গোপালবাবুটি কে? কোথায় যেন নামটা শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।'

—'আরে, গোপাল পাঁঠার নাম শোনেনি এমন লোক এই অঞ্চলে কেউ আছে নাকি? ব্রাহ্মণের ছেলে। মুখোপাধ্যায়। তবে কলেজ স্ট্রিটে পারিবারিক ব্যবসা পাঁঠার মাংসের দোকান চালায়। কলকাতার সেরা গুন্ডা, কিন্তু কখনোই নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপরে জুলুমবাজি করে না; তা সে হিন্দুই হোক বা মুসলমান। তবে হ্যাঁ, দাঙ্গাবাজ মুসলমানদের গুন্ডামি ও সহ্য করে না। গত দাঙ্গাতেও অনেক দাঙ্গাবাজ মুসলমান খুন হয়েছে ওর আর ওর দলবলের হাতে। বুঝতেই পারছ, কত ক্ষমতা রাখে ওই লোকটা। এই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ওর অফিস। ভোটের সময়ে কংগ্রেসের যে ওকে দরকার। তাই একটু বেশি চাঁদা দেবার কথা বলছিল ওই ছেলেটা।'

—'তা পুলিশ ওকে কিছু বলে না?'

—'পুলিশ কী বলবে ওকে? মাথার ওপরে যে নেতাদের হাত আছে। বুঝলে রজনী, মাথায় রাজনীতির লোকেদের আশীর্বাদ থাকলে পুলিশ...। যাকগে ছাড়ো ওসব কথা।'

—'আমি তাহলে ওপরে যাই মেসোমোশাই?'

—'হ্যাঁ, এসো।'

তারপরের দিন অফিস ফেরত রজনী যায় লোকাল থানায়। একজন কনস্টেবলকে জিজ্ঞেস করতে সে ওসি-র ঘর দেখিয়ে দেয়। রজনী দেখে ঘরের দরজায় একটা কাঠের টুকরোয় নাম লেখা— 'কমল চন্দ্র সান্যাল(অফিসার-ইন-চার্জ)'। সে বলে— 'মে আই কাম ইন।'

ওসি মুখ তুলে দেখে বলেন— 'কে?'

—'আমার নাম রজনীকান্ত রায়। আপনি আমাকে আপনার সাথে দেখা করতে বলেছিলেন।'

—'ও, আপনিই রজনীবাবু? আসুন। বসুন।'

রজনী উলটোদিকের চেয়ারে বসে বলে— 'অফিসটা করেই এলাম। অবশ্য আমার কালকেই আসা উচিত ছিল, কিন্তু ছেলেটাকে হস্টেল থেকে রিলিজ করতে করতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। তারপর আর আপনাকে ডিস্টার্ব করতে ইচ্ছে হল না। তাই আজ এলাম।'

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আসলে আপনার কাছ থেকে কয়েকটা ব্যাপার জানার ছিল। তাই ডেকেছিলাম।'

সে বলে— 'বলুন কী জানতে চান?'

—'আচ্ছা, ওই কানাই দত্ত ছেলেটা আপনার কে হয়?'

—'ও আমাদের গ্রামের ছেলে। রক্তের সম্পর্কে আমার কেউ হয় না। তবে ওরা খুবই গরিব আর ছেলেটা খুবই ইনটেলিজেন্ট। তাই ওকে পড়াশোনার জন্যে এখানে আনা।'

—'তা আপনাদের গ্রামে এরকম গরিব আর ইনটেলিজেন্ট অনেক ছেলেই তো আছে। কিন্তু তাদের কাউকে আপনি কলকাতায় আনলেন না কেন?'

—'দেশে তো কত শিক্ষিত বেকার আছে। তা সরকারের পক্ষে তাদের সবাইকে কি চাকরি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে, বলুন? ঠিক একই কারণে আমার একার পক্ষেও গ্রামের সব ছেলের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রয়োজনে আমি তাদের পড়াশোনায় সাহায্য করে থাকি।'

সান্যালবাবু বুঝে যান যে রজনী সহজে ঘাবড়ে যাবার লোক নয়। এর কাছ থেকে কিছু জানতে হলে ঘুরপথে যেতে হবে। তাই বলেন— 'আপনার ওই বাচ্চাটার গায়ে জুজুৎসুর পোশাক দেখলাম। তা এখানে ও কোথায় জুজুৎসু শেখে?' রজনী বুঝতে পারে এটা হয় সান্যালবাবুর অজ্ঞতা, নয়তো উনি সব জেনেও একটা চাল দিচ্ছেন। তাই সে ঠিক করে — জবাব দিতে গিয়ে তাকেও কিছুটা আক্রমণাত্মক হতে হবে। তাহলে এই যুবক ওসি তাকে খুব একটা বেশি ঘাঁটাতে যাবে না। তাই সে খোলাখুলি বলে— 'ও যেটা শেখে সেটা জুজুৎসু নয়। সেই খেলাটার নাম হল তাইকোন্ডো। একটা কোরিয়ান মার্শাল আর্ট। আর ওকে শুধু নয়, আমাদের গ্রামের আরও অনেক ছেলেকেই আমি ওটা শেখাই।'

সান্যালবাবু কখনো তাইকোন্ডোর নামটা শোনেনি। শুধু বুঝে গেলেন যে রজনী ওই মার্শাল আর্টটা ভালোমতোই জানে। তাহলে সে এটা শিখল কোথায়? তাই জিজ্ঞেস করেন — 'তা আপনি এটা শিখলেন কোথায়?'

—'আমার স্যার সুকুমার ভদ্র। উনি কোরিয়ায় গিয়ে এটা শিখেছিলেন। এখনও ওনার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে উনি শেখান।'

—'তা আপনি গ্রামের ছেলেদের এইসব শেখান কেন? কাউকে আক্রমণ করার জন্যে?'

—'যেকোনো মার্শাল আর্টের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আত্মরক্ষা করতে শেখা, বিনা কারণে কেউ আক্রান্ত হলে তাকে রক্ষা করা আর সুস্থ শরীর-মন গড়ে তোলা। কাউকে অযথা আক্রমণ করা নয়। তাই আমি ছেলেদের সেইগুলোই শেখানোর চেষ্টা করি মাত্র, যাতে তারা একদিন দেশের ভালো নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। আর এই ব্যাপারে আমার স্যারের পূর্ণ সমর্থন আছে। ইচ্ছে হলে আপনারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

রজনীর এই আক্রমণাত্মক জবাবে কিঞ্চিৎ বিব্রত হন ওসি। তাই অন্য প্রশ্ন করে রজনীকেও বিব্রত করতে চান। একটা কাগজের লেখা দেখতে দেখতে বলেন— 'আচ্ছা,

আপনি তো চাঁপাডাঙায় থাকেন। তা আপনি পুলিন বিশ্বাস, বিষ্টুচরণ, দিনেশ, শ্যামাদাস রায় আর সুরেশ বাগদিকে চেনেন নিশ্চয়ই।'

—'চাঁপাডাঙা তো আর কলকাতা শহর নয়, যে কেউ কাউকে চিনবে না। তা একই গ্রামে যখন থাকি তখন ওদের আমি বিলক্ষণ চিনি বই কী। তবে আপনার প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে যে আপনি আমার কাছ থেকে ওদের সম্বন্ধে আমি কী কী জানি, সেটাই জানতে চাইছেন।'

রজনীর এই উত্তরে মনে মনে একটু রাগ হয় যুবক ওসি কমল সান্যালের। কিন্তু তাঁকে জানতে হবে ওদের ব্যাপারে রজনী কতদূর কী জানে। তাই রাগ চেপে রেখে একটু গম্ভীর ভাবেই বলেন— 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

—'প্রথমেই বলি পুলিনের কথা। আমি যাদের তাইকোন্ডো শেখাই পুলিন আর কানাই ছিল তাদের মধ্যে সেরা। তাই পুলিন যখন মারা যায়, তখন আমার খুবই কষ্ট হয়েছিল।'

—'সেটাই স্বাভাবিক, বিশেষত যেখানে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক থাকে। তা আপনার কি মনে হয় যে সত্যিই পুলিন পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল?'

—'আমি তো খবরের কাগজ থেকে তাইই জেনেছি। ডিটেল তো আপনাদেরই জানার কথা।'

—'আর বাকিরা?'

—'গ্রামেই শুনতাম যে বিষ্টুচরণ, দিনেশ আর শ্যামাদাস রায় নাকি স্বদেশি করত। দেখতাম ওরা স্বদেশিদের তৈরি সাবান বিক্রি করত। এমনকী শ্যামাদাস রায় গ্রামের হাটতলায় একবার কোনো একজন শহুরে গায়ককে দিয়ে চারণকবি মুকুন্দদাসের গানের একটা প্রোগ্রামও করিয়েছিল। তবে কেন জানি না, বেশ কিছুদিন হল দিনেশ আর শ্যামাদাসকে গ্রামে দেখছি না। আর গ্রামের সবাই বলছিল যে বিষ্টুচরণকে নাকি নিশিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙে মেরে ফেলেছিল।'

—'আপনিও কি নিশিতে বিশ্বাস করেন?'

—'যা রটে তার কিছু তো বটে।' ঘুরিয়ে উত্তর দেয় রজনী।

—'কিছু তো বটে।...বাঃ, বেশ ভালো বলেছেন। আচ্ছা, মিস্টার রায়, বলুন তো, তাইকোন্ডো দিয়ে কি কারোর ঘাড় ভাঙা যায়?'

—'তা যায় বই কী। তাইকোন্ডো শিখতে হলে মানুষের অ্যানাটমি জানতে হয়।'

—'আপনি জানেন?'

—'কেন জানব না? তা বিষ্টুচরণের ব্যাপারে কি আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন?'

—'না, মানে, সন্দেহ ঠিক নয়...তবে...।' সদ্য যুবক ওসি যে এখনও পোক্ত হয়নি তা বেশ বুঝতে পারে রজনী।

তাই সে বলে— 'আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি মিস্টার সান্যাল। প্রথমত বলি যে বিষ্টুচরণের সঙ্গে আমার কোনোরকম বিরোধ বা শত্রুতা ছিল না। দ্বিতীয়ত, আমি আগেই বলেছি যে তাইকোন্ডো মানুষকে আত্মরক্ষা করতে শেখায়, অকারণে মারতে নয়। আর যদি ধরেই নেন যে আমি তাকে মেরেছি, তাহলে বলি যে তার বডি কেন পুকুরের জলে পাওয়া যাবে? আর একটু মনে করে দেখুন তো, আপনাদের রিপোর্টে মনে হয়

লেখা আছে যে তাকে দিনেশ ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আর দিনেশ এবং বিষ্টু দু-জনেই কিন্তু স্বদেশি করত। তা ছাড়া দিনেশ কিন্তু বেশ কিছুদিন হল গ্রামছাড়া। কাজেই...।'

—'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে বিষ্টুচরণ আর দিনেশের মধ্যে তিক্ততা ছিল, আর সেই কারণেই দিনেশ বিষ্টুচরণকে...।'

কথাটা কেটে দিয়ে রজনী বলে ওঠে— 'আমি কিছুই বলতে চাইছি না। ও ব্যাপারটা আপনাদের। আমি শুধুমাত্র যা জানি, সেটুকুই বললাম।'

—'আচ্ছা বেশ, তা আপনিও কি স্বদেশি করেন?' কথা ঘুরিয়ে দিতে ওসি বলেন।

—'মুকুন্দদাসের গান শুনলেই যদি স্বদেশি করা হয়, তাহলে বলব যে চাঁপাডাঙা গ্রামের সব বাসিন্দাই স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, কেন না তারা সেদিন সবাই মুকুন্দদাসের গান শুনতে হাটতলায় এসেছিল।'

এমন ত্যাড়াবাঁকা জবাব আশা করেননি কমল সান্যাল। তবু রজনীকে খোঁচা দেন— 'আপনি তাহলে কি সশস্ত্র বিপ্লবীদের সমর্থন করেন?'

—'তা আমি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মতো সশস্ত্র সংগ্রামী মানুষকে শ্রদ্ধা করি বটে। আর সেইসঙ্গে একটা কথা আমি বলতে চাই যে, আমি আপনারই মতো একটা সরকারি অফিসে কাজ করি আর সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার আগে ক্যান্ডিডেটের পাস্ট হিস্ট্রির পুলিশ ভেরিফিকেশন করা হয়। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।' আবার পালটা খোঁচা দেওয়া জবাব।

—'আর সুরেশ বাগদি? সে তো আপনার খাস লোক ছিল। তা তাকে কেন মরতে হল?' এই প্রশ্নটা রজনীর কাছে বড়ো নির্মম। তাই সে একটু চুপ করে থাকে। তার এই ক্ষণেকের মৌনতা কমল সান্যালকে উৎসাহিত করে। মনে মনে উনি ভাবেন— বড়ো মোক্ষম জায়গায় আঘাত করেছেন উনি। তাই ফের বলেন— 'কী হল মিস্টার রায়? কিছু বলছেন না কেন?'

—'ছোটোবেলা থেকে যে আমাকে মানুষ করেছে, তার সম্বন্ধে আমি আর কি বলব? তবে এইটুকু বলতে পারি যে সুরেশ কাকা শুধু আমাদের ভাগচাষীই ছিল না, সে ছিল আমার বাবার মতো। আমি যেমন তাকে মান্য করতাম, তেমনই খুব ভালোওবাসতাম। শুধু আমি কেন, আমার কাছে যে সমস্ত ছেলেরা তাইকোন্ডো শিখতে আসে তারাও তাকে আমারই মতো মান্য করত আর ভালোওবাসতো। তাই সুরেশ কাকা মারা যেতে আমরা সবাই, এমনকী গ্রামের লোকেরাও খুব কষ্ট পেয়েছিল।'

—'আপনার সুরেশ কাকা তো মার্ডার হয়েছিলেন। ওঁকে শুট করা হয়েছিল। তা আপনার কী মনে হয়, ওনাকে কেন শুট করা হয়েছিল? ওনার কি কোনো শত্রু ছিল?' রজনী বুঝতে পারে যে ওস. কমল সান্যাল তার কাছ থেকে কোনো ক্লু আশা করছে। তাই সে বলে— 'ওই মানুষটার কোনো শত্রু থাকতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। শুধু আমি কেন, গ্রামের কেউই তা বিশ্বাস করে না।'

—'তাহলে ওঁকে মারল কে? আর কেনই বা মারল? আপনি কি জানেন যে ওঁকে পয়েন্ট থ্রি টু কোল্ট রিভলভার থেকে শুট করা হয়েছিল?'

—'ওঁকে কে মারল আর কেনই বা মারল সেটা তো আপনারা খুঁজে বের করবেন বলেই আমি আশা রাখি। ওটা আপনাদের ভাবনার বিষয়। আমি শুধু সুরেশ কাকার সম্বন্ধে যা জানি সেটাই আপনাকে বললাম। শান্ত গলায় বলে রজনী।

এইসব শুনে ওসি-র মনে হয় লোকটাকে বরং সরাসরি একটা প্রশ্ন করা যাক। তাই তিনি বলেন— 'আচ্ছা মিস্টার রায়, পিটার ব্রাগানজাকে কি আপনি চেনেন?'

—'তা খবরের কাগজের মাধ্যমে চিনি বটে। উনিই সেই অফিসার যিনি ধর্মতলার প্রতিবাদীদের মিছিলে টিয়ার গ্যাসের শেল ব্যবহার করেছিলেন আর সেইসঙ্গে লাঠিচার্জও করেছিলেন। আর কাগজে এটাও পড়েছি যে উনি আত্মহত্যা করেছেন।'

—'আপনি তো জানেন যে বাগবাজারের গঙ্গার ধারের যে বাড়ি থেকে আপনাদের বাচ্চাটাকে উদ্ধার করা হয়েছিল সেটা পিটারের বাড়ি?' একটা টোপ ফেলে রজনীকে বাজিয়ে দেখতে চান ওসি।

রজনীও বুঝতে পারে যে টোপ দেওয়া হয়েছে।

তাই সে অবাক হয়ে বলল— 'তাই নাকি! ওটা পিটার ব্রাগানজার বাড়ি? কিন্তু থানা থেকে কাল আপনারা যে ফোন করেছিলেন তাতে তো সেকথা বলেননি। এখন আপনার মুখেই শুনছি যে ওটা পিটারের বাড়ি। আর আপনারাই তো কাল বলেছিলেন যে কানাইকে একটা খুব নোটোরিয়াস গ্যাং তুলে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পিটার তো মারা গেছে। তাহলে কি ওই নোটোরিয়াস গ্যাং-এর সঙ্গে পিটারেরও একসময় যোগাযোগ ছিল; নইলে ওরা কানাইকে নিয়ে ওখানে তুলবে কেন?'

এবারে উলটোচালে বিপাকে পড়ে যান ওসি কমল সান্যাল। কিন্তু উনি ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। তাই নিজের টোপ নিজেই গিলে নিয়ে বলেন— 'দেখুন মিস্টার রায়, পিটারের সঙ্গে কোনো নোটোরিয়াস গ্যাং-এর যোগাযোগ ছিল কি না তা আমরা তদন্ত করে দেখছি। তবে আমাদের মনে হয়েছে যে, আপনার স্টুডেন্ট কানাইকে হয়তো বা ভুল করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এখন আপনি আসতে পারেন। আপনার সময় নষ্ট করার জন্যে খুবই দুঃখিত। তবে পরে কখনো কোনো প্রয়োজন হলে আপনাকে ডাকতে পারি। আশাকরি আপনার সাহায্য পাব।'

—'নিশ্চয়ই। আপনাদের কাজে লাগলে আমি খুশিই হব। তা আমার বাড়ির ফোন নম্বর তো আপনাদের কাছেই আছে, এখন আমার অফিসের নম্বরটাও একটু লিখে নিন। আসলে মেসোমশাই তো রিটায়ার্ড মানুষ, বয়সও হয়েছে; টেনশনে ভোগেন। তাই ওনাকে ডিস্টার্ব না করাই ভালো।'

ওসি কমল সান্যাল রজনীর অফিসের নম্বরটা নোট করে রাখেন আর রজনীও তাঁকে নমস্কার জানিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে আসে।

বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে রজনী মুচকি মুচকি হাসে আর মনে মনে বলে— ওসি, তুমি আমার পেছনে ফেউ লাগাবে তো জানিই। তা লাগাও লাগাও, ফেউ লাগাও আমার পেছনে। দেখি তোমাদের ফেউয়ের কত ক্ষমতা।

ঢাউস টেবিলটার বিপরীত দিকে বসে আছেন আর্নল্ড থিহা। মূল চেয়ারটা খালি। ওখানে বাবা এসে বসবেন। তাঁর পরামর্শ নেবার জন্যেই তাঁকে খবর পাঠিয়েছেন আর্নল্ড। কতকগুলো নিতান্তই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে আজ। ক্যালকাটার ব্যবসার ব্যাপারে। তাই বাবার মতামত খুবই দরকার। যদিও বিশেষ কারণ না থাকলে ব্যবসার ব্যাপারে বাবা আজকাল মোটেই মাথা ঘামাতে চান না, নাতি-নাতনিদের সঙ্গে সময় কাটাতে আর বই পড়তেই ভালোবাসেন উনি; তবুও আজকে তাঁকে খুবই দরকার। বাধ্য হয়েই তাই

আর্নল্ড আজ ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁকে। রজনী আর দু-জন ট্রাক ড্রাইভারের ব্যাপারে নিজে কিছু ডিসিশন নিয়েছেন। বাবাকে সেগুলো জানানো দরকার।

আর্নল্ড চাইলে সুপারি-কিলার দিয়ে রজনীকে শুট করিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু বাচ্চাটা কিডন্যাপ হওয়ার পর থেকে রজনীর পেছনে এখন পুলিশের ফেউ ঘোরে। আবার যে দু-জন ড্রাইভার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, তারা যদিও এখন পুলিশের ইন্টারোগেশনের সামনে পড়ার মতো শারীরিক অবস্থায় নেই, তবুও দু-একদিনের মধ্যেই হয়তো পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে। সেটা আটকাতে হবে। হরিশরণ ফোনে তাঁকে জানিয়েছে সব। এমনকী তাঁর লোক ভিজিটিং আওয়ারে হাসপাতালে ঘুরেও এসেছে। তাই ওই ড্রাইভারদের জন্যে একটা প্ল্যানও ছকে রেখেছে উনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্যালকাটার পলিটিক্যাল ঝুটঝামেলা। তাই এইসব কিছুর জন্যেই বাবাকে আজ বড়ো দরকার আর্নল্ডের।

এমনসময় পেছনের দরজা খুলে যায়। জ্বলন্ত চুরুট হাতে হাসি হাসি মুখে ঘরে ঢুকে আঙ থিহা তাঁর চেয়ারে বসতে বসতে বলেন— 'গুড মর্নিং। মনে হচ্ছে তুমি খুব সমস্যায় আছ, নইলে...। তা তোমার সমস্যাগুলো কী শুনি?' তারপরে চুরুটটা অ্যাশট্রেতে রেখে দেন আলতো করে। ঘরটা ভরে যায় চুরুটের গন্ধে।

আর্নল্ড তাঁকে সব ব্যাপারগুলো বলেন, এমনকী তাঁর নিজের বর্তমানের প্ল্যানগুলোও। চোখ বুজে চেয়ারে মৃদু মৃদু দোল খেতে খেতে শুনতে থাকেন আং থিহা। আর্নল্ডের বলা শেষ হলে তবেই চোখ খোলেন বৃদ্ধ।

—'দেখ, তোমাদের আগের প্ল্যান সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। তবে বুঝতে পারছি যে তোমাদের প্ল্যান ফুলপ্রুফ ছিল না। তবে সেদিন ওই ট্রাক ড্রাইভারদের পেছনে দুজন শার্প-শুটার বাইক রাইডার লাগিয়ে দিলেই ঝামেলা মিটে যেত। তারা ড্রাইভার দু-জনকে শুট করে বাইক নিয়ে গলি দিয়ে পালাত। ক্যালকাটায় তো আর ন্যারো গলির অভাব নেই। যাইহোক, সমস্যা যখন আসে, জানবে তার পেছনে সেটার সলিউশনও লুকিয়ে থাকে। শুধু খুঁজে নিতে হয়।' একটু থামেন ডন আঙ থিহা। তারপরে বলেন— 'তাহলে এখন তোমার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল ওই ধরা পড়া ড্রাইভার দু-জন। কী তাই তো?'

—'হ্যাঁ বাবা। ওরা মুখ খুললেই বিপদ। তাই আমি ওদের জন্যে সায়ানাইডের কথা ভেবেছি।'

ভুরুদুটো একটু কুঁচকে যায় ডনের। তারপরে বলেন— 'তা সায়ানাইড কী করে দেবে শুনি? তা ছাড়া দ্যাখো, এইসব সাইলেন্ট-কিলার আমার যদিও পছন্দ নয়, কিন্তু এইক্ষেত্রে আমার মনে হয় সায়ানাইডের চেয়ে স্ট্রিকনিন অনেক বেশি উপযুক্ত।'

—'কেন বাবা? সায়ানাইডের চেয়ে স্ট্রিকনিন কেন ভালো? সায়ানাইডে তো মৃত্যুর গ্যারান্টি লেখা থাকে।'

—'সেটাই তো এইক্ষেত্রে প্রবলেম।'

আঙ থিহা শুধু মিটিমিটি হাসতে থাকেন। ছেলেও বুঝে যায় যে ডন তার এই প্রশ্নের জবাব দেবেন না। হয়তো সময়ই বলে দেবে যে এইক্ষেত্রে সায়ানাইডের চেয়ে স্ট্রিকনিন কেন ভালো। হয়তো এইভাবেই বাবা তাকে জটিল সমস্যার উপযুক্ত সমাধান শেখাতে চান। আর তা ছাড়া সায়ানাইড দেবেই বা কী করে হরিশরণের লোক? যাইহোক, সেটা

হরিশরণের ব্যাপার। শুধু তাকে স্ট্রিকনিনের ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে হবে। তাই সে তার দ্বিতীয় প্রশ্ন করে বাবাকে।

—'বেশ, তাহলে বলুন, এখন রজনীকান্তকে নিয়ে কী করা যায়?'

—'আমি বলি কী, এইমুহূর্তে তাকে নিয়ে চিন্তার তেমন কারণ নেই। সে তো নিজে আমাদের নেটওয়ার্কে নাক গলায়নি। পিটার আর শ্যামাদাসের এক্সট্রিম গ্রিড আর তার ডিয়ারেস্ট পার্সনদের মৃত্যু তাকে বাধ্য করেছিল আমাদের ব্যবসায় নাক গলাতে। তুমি আর হরিশরণ তো চেষ্টা করেছিলে তাকে শেষ করে দিতে, কিন্তু পারলে কি? সে তার বুদ্ধি আর ক্ষমতা দিয়ে ঠিক নিজের কাজ সেরে বেরিয়ে গেল। তাই বলছিলাম কি, তার নিজের যেটা করার দরকার ছিল, সে সেটা করে নিয়েছে। তা ছাড়া দেখাই যাক না, পুলিশ তার কী করে? তবে আমার মনে হয়, সে আমাদের আর ঘাঁটাতে আসবে না। আর যদি আবার কখনো আসে, তখন না হয় দেখা যাবে।'

রজনীর সম্বন্ধে বাবার কী ধারণা তা পরিষ্কার হয়ে যায় আর্নল্ডের কাছে। তাঁর মনে হয়, বাবা হয়তো ঠিকই বলেছেন। দেখাই যাক না রজনী কী করে এর পর। তাই পরের পরামর্শের জন্যে বলেন— 'বাবা, বলছিলাম কী, হরিশরণ বলছিল যে ক্যালকাটার এখনকার পলিটিকাল সিচুয়েশন আমাদের ব্যবসার পক্ষে ভালো নয়। তা ছাড়া এখন সেখানে পিটারের মতো একজন প্রভাবশালী লোক আমাদের হাতে নেই। তাই, ক্যালকাটায় আবার একটা স্ট্রং নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে আমাদের সময় লাগবে। তা এই ব্যাপারে আপনার কী মত সেটা যদি বলতেন...'

এবারে স্মিত হাসলেন আঙ থিহা। অ্যাশট্রে থেকে তুলে নিলেন তাঁর চুরুটটা। সেটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে টান মারতে গিয়েই বুঝলেন যে আগুনটা নিভে গেছে। তখন তাঁর কোটের বাঁ-পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলেন দেশলাইয়ের বাক্স। একটা কাঠি জ্বালাতে গেলেন। সেটা জ্বলল না। তাই কাঠিটা অ্যাশট্রেতে ফেলে আবার একটা কাঠি বের করলেন। সেটারও একই হাল। এইভাবে তিন-চারটে কাঠি নষ্ট হতে উনি দেশলাইয়ের বাক্সটাই অ্যাশট্রেতে রেখে তাঁর কোটের ডান পকেট থেকে একটা লাইটার বের করে আনলেন। একবার ক্লিক করতেই সেটা জ্বলে উঠল। তাই দিয়ে চুরুটটা ধরিয়ে আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বললেন— 'I always like to keep a better substitute, my son.'

আর্নল্ড বুঝে গেলেন ডন কী বোঝাতে চাইছেন। তাই উনি বললেন— 'তাহলে বলুন, ক্যালক্যাটা থেকে কোথায় ব্যবসা সরিয়ে নেওয়া যায়?'

বৃদ্ধ আঙ থিহা স্মিত মুখে মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন— 'আজ রাত আটটার পরে হরিশরণের সঙ্গে কথা বল। তার আগে নয়। আশা করি তুমি তোমার সব উত্তর পেয়ে যাবে। যাইহোক, এবার তাহলে আমি উঠি। আর হ্যাঁ, শোনো, টেনশন আমাদের ব্যবসার একটা পার্ট। তাই টেনশনকে ডমিনেট করে একটু চিলড থাকার চেষ্টা কর। আ কুল ব্রেন অলওয়েস অ্যাক্টস বেটার।'

তারপরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরপায়ে দরজার পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বৃদ্ধ ডন আং থিহা। পেছনে ফেলে গেলেন শুধু তাঁর চুরুটের গন্ধ।

হাসপাতালের পাশাপাশি বেডে শোওয়া দু-জন ট্রাক ড্রাইভার। এখনও বেহুঁশ তারা। অপারেশন হয়েছে বটে, তবুও কথা বলার মতো অবস্থায় নেই। তাদের একহাতে

স্যালাইনের ছুঁচ গোঁজা আর অন্যহাতে লাগানো হ্যান্ডকাফ বেডের গায়ের রেলিংয়ের সঙ্গে আটকানো। দুটো বেডের মাঝখানে একটা টুলে বসে একজন কনস্টেবল। দুই রোগীরই দু-জন করে বাড়ির লোক এসেছে তাদের দেখতে। কিন্তু তারা শুধুই বেডের পাশে দাঁড়িয়ে। বেডে শোওয়া মানুষ দু-জন যে জ্ঞানহীন। এমন সময় বেজে উঠল ঘন্টি। ভিজিটিং আওয়ার শেষ। তবুও বাড়ির লোকজন যেন বেড ছেড়ে যেতে চায় না। এই সময়টায় ডাক্তার বা নার্স কেউই থাকে না বেডের পাশে। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হলে, ওয়ার্ড ফাঁকা হলে তবেই ডাক্তার আর নার্সেরা আসবেন। রোগীদের দেখবেন আর তারপরে একজন জুনিয়ার ডাক্তার বিল্ডিং এর নীচে অপেক্ষারত পেশেন্ট পার্টিকে পেশেন্টের নাম ধরে ধরে ডেকে তার পরিজনদের জানাবেন রোগীর অবস্থা।

—'কী হল? বেল পড়ে গেছে আর তবুও আপনারা দাঁড়িয়ে? যান, নীচে যান।' একজন সাদা অ্যাপ্রন পরা নার্স হালকা ধমক দেন বেডের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের। ধমক খেয়ে তারা বেড ছেড়ে নীচে যাবার পথ ধরে।

নার্সের হাতে একটা ছোটো এনামেলের ট্রেতে দুটো সিরিঞ্জ ভরতি জলরঙা ওষুধ। পেশেন্টের মাথার পাশে রাখা টুলে ট্রেটা রেখে একটা সিরিঞ্জ তুলে নেন উনি। তারপরে একজন ট্রাক ড্রাইভারের হাতে লাগানো স্যালাইনের বোতলের মুখের রবারের ছিপিতে নিডলটা ঢুকিয়ে সিরিঞ্জের পুরো ওষুধটা পুশ করে দেন বোতলের ফ্লুয়িডে। বোতলের ফ্লুয়িড আর জলরঙা ওষুধ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। একইভাবে দ্বিতীয় জনের বোতলেও পুশ করে দেন ওষুধ। তারপরে সিরিঞ্জ আর ট্রে তুলে নিয়ে ওয়ার্ডের বাইরে বেরিয়ে যান। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই ছোটো ট্রে আর সিরিঞ্জদুটো অদৃশ্য হয়ে যায় অ্যাপ্রনের পকেটে।

নীচে, একটু দূরে অপেক্ষা করে আছে একটা অ্যাম্বুল্যান্স। নার্স গিয়ে সোজা উঠে বসেন সেই গাড়িতে। স্টার্ট নিয়ে হাসপাতালের মেনগেট দিয়ে বেরিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সটা মিশে যায় কলকাতার রাজপথের গাড়ির মিছিলে।

সেদিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ফোন বেজে ওঠে হরিশরণের দোকানের গদিতে। হরিশরণ ফোনটা রিসিভ করতেই ভেসে আসে আর্নল্ডের গলা। হরিশরণের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে বিস্মিত হয়ে যান আর্নল্ড। নার্স যাতে পালাবার জন্যে হাতে পনেরো-বিশ মিনিট সময় পায় তাই তাঁর বাবা সায়ানাইডের বদলে স্ট্রিকনিনের ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন হরিশরণকে। আর কলকাতা থেকে কোথায় ব্যবসা সরানো হবে তা জানতে চাইলে হরিশরণ বলে যে— বোম্বাইয়ের ক্রফোর্ড মার্কেটে একটা সাইকেলের দোকান আছে। সেখানে কাজ করত হায়দার মির্জা নামের উনিশ বছরের একটা ছেলে। এখন দোকানটা অবশ্য তার বাবা চালায় আর ছেলে এখন দু-বছর হল বোম্বাইয়ের পোর্টে কুলির কাজ করে। অল্পবয়েস হলে কী হবে, করিম লালার সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেইসঙ্গে সে চালায় জুয়ার ঠেক, বেআইনি মদের আড্ডা, হ্যাসিস আর নানান জিনিসের স্মাগলিং। লোকে তাকে মস্তান হায়দার মির্জা বলে ডাকে। নিজে সরাসরি কোনো ঝামেলায় থাকে না, যা করার থাকে সেটা তার আর করিম লালার দলের লোকেরাই করে। এখন যোগাযোগ করতে হবে তার সঙ্গে। তাই আরও দিন পনেরো সময় চাই। ডন বলেছেন, হরিশরণ নিজেই যেন সেই উদ্যোগটা নেয়।

সব শুনে আর্নল্ড বোঝেন— ডন হলেন ডনই। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। বাবার প্রতি সম্ভ্রমে আপনা থেকেই মাথা নীচু হয়ে যায় তাঁর।

রঙিন ফেউ, সাজাহান আর দারোগার তলব

গরমের ছুটি পড়ে গেছে। তাই কানাইকে নিয়ে রজনী এসেছে তাদের গ্রামে। সেই চেনা মাঠ, চেনা রাস্তা, চেনা হাটতলা আর চেনা বন্ধুদের অনেকদিন পরে দেখতে পেয়ে কানাইয়ের খুশি আর ধরে না। ভালো দিনেই এসেছে তারা। বাস থেকে নেমেই তারা বুঝতে পারে যে আজ গ্রামে শীতলা পুজো। পল্টু, নেলো, পটাই আর সব ছেলেরা মিলে বাঁশের চ্যাঁচাড়ি আর রঙিন কাগজ দিয়ে হাটতলার বটগাছটার নীচে মণ্ডপ বানিয়েছে। বেশ দেখতে লাগছে। রজনী ভাবে— সত্যি, এই বুড়ো বটগাছটা কতই না হর্ষ-বিষাদের সাক্ষী।

রঘুর চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এইসবই দেখছিল সে। বাড়িতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই কানাই ছুট লাগিয়েছিল হাটতলার দিকে। তাই কানাইয়ের বাড়িতে বসে এককাপ চা খেয়েই রজনীও এসে পৌঁছেছে এখানে। তবে রঘুর চায়ের দোকানের সামনে তার আসার দুটো কারণ আছে। প্রথমত সে জানতে এসেছে যে এখানকার কেউ কানাইয়ের কিডন্যাপ হওয়ার খবরটা জানে কি না। দু-চার জনের সঙ্গে কথা বলে সে নিশ্চিন্ত হয় যে কানাইয়ের ব্যাপারটা এখানে কেউ জানে না। অবশ্য কলকাতাতেও খবরের কাগজে ঘটনাটা ছাপেনি। আসলে এত কম সময়ের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল যে হয়তো রিপোর্টাররা খবরটা পায়নি। আবার এমনও হতে পারে যে, তদন্তের স্বার্থে পুলিশও খবরটা প্রেসকে জানায়নি। সে যাকগে। পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। তাতে তার মাথাব্যাথা নেই। আর দ্বিতীয়ত, সে ভালো করে বুঝে নিতে চায় যে পুলিশের ফেউ এখানেও তার পিছু নিয়েছে কি না। তাই সে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আশেপাশের প্রতিটা লোককে জরিপ করে নিচ্ছে। এরপরে বেলা যত বাড়বে, লোকও ততো বাড়বে। বেলা আরেকটু বাড়লে গ্রামের বউ-ঝিরা আসবে। শীতলা মায়ের কাছে তাদের অনেকেরেই মানত থাকে। তাই তারা সারি বেঁধে হাটতলার পাশের পুকুরে ডুব দিয়ে ভিজে শাড়ির ওপরে গামছা জড়িয়ে দণ্ডি কাটতে কাটতে মায়ের থানে আসবে। গ্রামের সমর্থ ছেলেরা বালতি বালতি জল ঢেলে ঠান্ডা করে দেবে তাদের দণ্ডি কাটার পথ যাতে তপ্ত মাটির জ্বালা ওই দণ্ডি কাটা মহিলাদের পক্ষে কিছুটা সহনীয় হয়।

কিন্তু ওই ধুতি ফতুয়া পরা, মাথায় গামছা জড়ানো লোকটা কে? বাস রাস্তার ওপারে একটা গাছের তলায় বসে। পাশে শোওয়ানো তার লাঠি। বয়স হবে মধ্য চল্লিশ। তা এই গ্রামের সবাইকে তো রজনী চেনে। প্রতিটা পুরুষ ছাড়াও, প্রতিটা ভিখিরি, বাউল, আলখাল্লা পরা হাতে ধুনুচি আর চামর নেওয়া পীর, সব্বাই তার চেনা। তাহলে এ কে?

লোকটা একমনে বসে বিড়ি টানছে আর মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে রঘুর চায়ের দোকানের দিকে। রজনীর বুঝতে বাকি থাকে না যে লোকটা ফেউ। সে ঠিকই করে নেয় যে বাড়াবাড়ি করলে ফেউটাকে সে এমন দাওয়াই দেবে যে, সেটা যেন তার চিরকাল মনে থাকে। অবশ্য তার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে ওই লোকটাই ফেউ।

—'স্যার, স্যার, চাঁদা দাও।' দৌড়ে এসেছে পল্টু, নেলো, পটাই, কানাই আর সব ছেলেরা।

—'আরে দেব, দেব। নিশ্চয়ই দেব। তবে আমার একটা শর্ত আছে।'

—'কী? কী?' সমস্বরে সোরগোল করে ওঠে ছেলেরা।

—'চাঁদা আমি দিতে পারি, যদি তোরা কাল সকালে প্র্যাকটিসে আসিস। কি রে, আসবি তো?'

—'আসব, আসব। এখন চাঁদা দাও তো। আর আমরা তো মাঝেমাঝেই তোমার ওখানে প্র্যাকটিস করি।' বলে ওঠে নেলো।

মানিব্যাগ থেকে এগারোটা টাকা বের করে দিতে দিতে রজনী বলে— 'ঠিক আছে। তাহলে এই ক-দিনে তোদের কয়েকটা নতুন জিনিস শেখাব। সেইজন্যেই তোদের আসতে বলছি। আমি জানি, আমি না থাকাতে তোরা গা ঢিলে দিয়েছিস। এখন ছুটি আছে, আর তাই কাল থেকে রোজ সকালে বিকেলে প্র্যাকটিস চলবে টানা পনেরো দিন। এটা করতেই হবে। কি রে, রাজি তো?'

—'হ্যাঁ স্যার, আসব, আসব।' ছেলের দল কথা দেয়।

রজনী তখন পল্টু আর নেলোকে একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের হাতে কিছু পয়সা দিয়ে কী যেন বলল। অন্যেরা তা শুনতে পেল না। এরা রজনীর বিশ্বস্ত সৈনিক— সেনবাড়ির ঘটনাতেই তার প্রমাণ রেখেছে এরা।

এরই ফাঁকে রজনী লক্ষ্য করে দেখেছে যে, সে যখন পল্টু আর নেলোর সঙ্গে একান্তে কথা বলছিল, তখন ওই মাথায় গামছা জড়ানো লাঠিহাতে লোকটা তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাই সে ভাবে— রাখুক গে নজর, মওকা পেলে ফেউটাকে সে বুঝিয়ে দেবে কত ধানে কত চাল। তাই ছেলের দল চলে যেতে সে সনাতন মুদির দোকান থেকে একসের ছোলা আর একহাঁড়ি এখোগুড় কিনে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল। কাল সকালে ছেলেদের দিতে লাগবে যে।

বাড়ির পথে যেতে যেতে চোখে পড়ে গ্রামের একমাত্র হাইস্কুলটা। এই স্কুলেই সে একসময় পড়াশোনা করেছে। তার কতই না দুষ্টুমি সহ্য করেছে এই বাড়িটা। তখনও বাড়িটার অবস্থা ছিল মোটামুটি ভালো। অথচ আজ সেই বাড়িটারই কী করুণ হাল। একটা স্মৃতিমেদুরতা কাজ করে তার ভেতরে। তাই সে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে থাকে স্কুলটাকে। পলেস্তারা খসে পড়া দেওয়ালগুলো দেখে মনে হয় যেন ওটা একটা হানাবাড়ি। দু-চারটে ভেঙে পড়া জানলার পাল্লার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলুথালু হয়ে থাকা ফাটাফাটা বেঞ্চগুলো।

নাঃ, স্কুলটার সংস্কার করা দরকার। কিন্তু করবে কে? এর পেছনে যে অনেক খরচা আছে। ইস্, সে যদি তার সুকুমার স্যারের মতো পয়সাওলা ঘরের ছেলে হত...। একটা চাপা হীনমন্যতায় ভুগতে থাকে রজনী।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই সে পৌঁছে যায় তার বাড়িতে। বাড়ির সামনের ফাঁকা আখড়াটা এখন ভর দুপুরে বড়োই নিঃসঙ্গ। তবে আখড়ার মাটি দেখলেই বোঝা যায় যে কিছু ছেলে এখনও এখানে প্র্যাকটিস করে। কিন্তু শেখানোর লোক না থাকলে তারা আর এগোতে পারবে না। তবে যারা এখনও প্র্যাকটিস করছে, তারা নতুন কিছু না শিখলেও তাদের শরীরটা ফিট আছে। এটাই রজনীর সান্ত্বনা।

দাওয়ায় একটা নেড়ি কুকুর পরম নিশ্চিন্তে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। রজনীর পায়ের আওয়াজ পেয়েই সে দাওয়া থেকে নেমে দে ছুট।

ঘরের তালা খুলতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ এসে নাকে লাগল। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকলে যা হয়। ভেতরে ঢুকে কাঁধের ব্যাগ আর চামড়ার স্যুটকেসটা নামিয়ে রাখে। তারপর থাবড়ে থাবড়ে বিছানার ধুলো ঝেড়ে বসে। এখন ঘরটা পরিষ্কার করতে হবে। মেলাই কাজ।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘরটাকে ভদ্রস্থ করে চান সেরে নেয় রজনী। স্যুটকেস থেকে একপ্রস্থ ইস্ত্রি করা শার্ট-প্যান্ট পরে সেটাকে তালাবন্ধ করে চালান করে দেয় খাটের তলায়। ওটাতেই যে তার দাদুর প্যাঁটরাটা আছে। সময়মতো রাতের অন্ধকারে ওটার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এখন তাকে কানাইদের বাড়িতে যেতে হবে। কানাইয়ের মায়ের অনুরোধে এই ক-দিন তাকে কানাইদের বাড়িতেই দু-বেলা খেতে হবে। তাই কাল কিছু বাজারও করে নিয়ে যেতে হবে। না, আর দেরি করে লাভ নেই। কানাইয়ের মা নিশ্চয়ই তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। তাই জামাকাপড় পরে কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। পথে যেতে যেতে কিন্তু সেই মাথায় গামছা বাঁধা লোকটাকে দেখতে পেল না সে। হয়তো বা হাটতলার কাছে কোনো হোটেলে খেতে গেছে। কেউ বলে কি তার খিদে-তেষ্টা নেই?

ভাত খেতে খেতে একফাঁকে একা পেয়ে কানাইকে জিজ্ঞেস করে রজনী— 'হ্যাঁরে, ওই কথাটা কাউকে বলিসনি তো?'

—'না, না। তাহলে আর কলকাতায় ফেরা হবে না।'

—'বন্ধুদের কাউকে?'

—'উঁহু। না।'

কানাই বুঝে গেছে কোন কথাটা বলতে হয় আর কোনটা নয়। গ্রামে আসার পথে রজনী তাকে পইপই করে বলে দিয়েছিল হস্টেলে থাকার কথা আর তার কিডন্যাপ হওয়ার কথাটা কাউকে না বলতে। তখনই কানাই বুঝে গিয়েছিল তার কলকাতার জীবনের কতটুকু এখানে বলতে হবে আর কতটুকু নয়।

পরেরদিন সকালে নিজের প্র্যাকটিস সেরে আখড়ার মাটিটা পরীক্ষা করছিল রজনী। এমনসময় হই হই করে এসে পড়ল ছেলের দল। নিজেরাই পাশের ঘরটা থেকে ম্যাটটা বের করে পেতে দিল আখড়ার মাটিতে আর তারপরে রজনীর রাখা ভিজে ছোলা আর গুড় খেয়ে রুটিনমাফিক দৌড় শুরু করল আখড়ার চারপাশে ঘুরে ঘুরে। রজনী তার অভ্যেস মতো দাওয়ায় হেলান দিয়ে দেখতে লাগল তাদের। সংখ্যায় কমে গেছে ছেলেরা। এটাই স্বাভাবিক। কানাইয়ের ব্যাপারে তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে অনেক ছেলেই হয়তো আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। তাই সে ঠিক করে যারা আসেনি, এই ক-দিন তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কথা বলবে তাদের সঙ্গে আর সেইসঙ্গে রঘুদাকে বলে একটা লোক ঠিক করতে হবে যাতে এই ক-দিন দুপুরে সেই লোকটা এসে খিচুড়ি রেঁধে দিয়ে যায়। তাহলে এই ক-দিন না হয় সে দুপুরবেলা কানাইদের বাড়িতে খাবে না। তাতে কানাইয়ের মায়ের ধকলটাও কমবে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই তার চোখ চলে যায় গজ তিরিশেক দূরে বাসরাস্তার দিকে। সেখান থেকে তার এই আখড়া আর বাড়িটা দেখা যায়। কিন্তু বাসরাস্তার ধারের কলাগাছ আর ছোটো ছোটো খেজুর ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওটা কে? মাথার গামছা আর সাদা ফতুয়ার খানিকটা উঁকি মারছে ঝোপের আড়াল থেকে। রজনীর বুঝতে বাকি থাকে না যে লোকটা হল সেইই ফেউটা। কিন্তু কাল রাতে লোকটা ছিল কোথায়? এই গ্রামেরই কোনো লোকের বাড়িতে, নাকি হাটতলায় শুয়ে থাকা অনেক মুটে-মজুরের দলে মিশে রাত কাটিয়েছে? যাইহোক না কেন, সে বেশ বুঝতে পারছে যে তার গতিবিধির ওপরে নজর রয়েছে পুলিশের। তার অনুমান একেবারে সত্যি।

—'স্যার, আমরা রেডি।' ছেলেরা দৌড় শেষ করে তাকে ডাকছে তালিম দেবার জন্যে।

সেদিন সন্ধে হবার পরে পল্টু আর নেলো আসে রজনীর বাড়িতে। রজনী তাদের জিজ্ঞেস করে— 'হ্যাঁরে, লোকটাকে দেখলি?'

পল্টু বলল— 'হ্যাঁ স্যার, দেখেছি। লোকটা হাটতলায় রঘুকাকার দোকানে চা খাচ্ছিল। কিন্তু লোকটা কেন আপনাকে নজরে রাখছে স্যার?'

রজনী জানত যে এই প্রশ্নের মুখোমুখি তাকে হতে হবে। তাই সে বলে— 'বাড়িটা তো আমার একটেরে, বুঝলি। গ্রামের বাইরেই বলা যেতে পারে। এতদিন তো ঘরে কেউ ছিল না। এখন আমি মালপত্র নিয়ে ঢুকেছি। তা ছাড়া ঘরে তো কিছু কাঁসার বাসনপত্রও আছে, তাই মনে হয়, লোকটা মাল হাতানোর প্ল্যান করেছে। তবে আমিও কম যাই না। আজ ভেবে রেখেছি যে, বাবাজীবনকে এমন শাস্তি দেব যে আর যেন ও এ মুখো না হয়। তা হ্যাঁ রে, মালটা এনেছিস তো?'

—'হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আজ ব্যাটাকে বুঝিয়ে দেব।' অতি উৎসাহে বলে পল্টু।

—'দাঁড়া, আর একটু অন্ধকার হোক। লোকটা মনে হয় আরও কাছে আসবে। তখনই ওকে দাওয়াই দিতে হবে। এখন আয়, সবাই মিলে বসে একটু মুড়ি খাওয়া যাক।'

তিনজনে মিলে একটা কাঁসার থালায় মুড়ি নিয়ে দাওয়ায় বসে। পাশে রাখা আছে লণ্ঠন। তারই আলোয় চলছে গল্প। আজকে রাতে গ্রামের লোকেরা মিলে নাকি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের অভিনয় করবে হাটতলায়। তিনদিক খোলা মঞ্চে অভিনয় হবে। শাজাহান সাজবেন স্কুলের একদা হেডমাস্টারমশায় আর বর্তমানের স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট ঈষৎ ভারী চেহারার হেদায়েত মোল্লা সাহেব। গত দেড়মাস ধরে নাকি শশাঙ্ক চাটুজ্জের বাড়িতে রোজ সন্ধেবেলা জোরকদমে রিহার্সাল দেওয়া হয়েছে। আজ তারই ফাইনাল পরীক্ষা। গ্রামের সবাই দেখতে যাবে সেই নাটক।

এদিকে আখড়ায় এখন চলছে জোনাকিদের স্বপ্নউড়ান। তারই মাঝে নিঃস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে বাসরাস্তা দিয়ে একটা বাস চলে গেল। তার হেডলাইটের আলো পথটাকে একঝলক আলো মাখিয়ে দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল দূরে। ঠিক এমন সময় বাসরাস্তা থেকে দু-ধারে গাছপালা ঢাকা যে সরু পথটা রজনীর বাড়ির দিকে এসেছে সেটাতে একটা টর্চের আলো একবার জ্বলেই নিভে গেল। রজনী, পল্টু, নেলো, সবাই দেখেছে সেই আলো। নেলো ফিসফিস করে বললে— 'স্যার, মনে হয় লোকটা বাড়ির দিকেই আসছে।'

রজনীও চাপা গলায় বললে— ‘হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছিস। যা তো, দৌড়ে গিয়ে ব্যাটাকে জাপটে ধর। তবে সাবধান, লোকটার কাছে যদি কোনো অস্ত্র থাকে, তাহলে কিক চালাবি। নইলে গায়ে একদম হাত তুলবি না। আর সঙ্গে আমার টর্চটা নিয়ে যা। আমি তোদের পেছনে আসছি।’

তার মুখের কথা খসতে না খসতেই পল্টু আর নেলো দাওয়া থেকে নেমে দে দৌড়। রজনীও ছুটল তাদের পেছনে। তারপরেই পল্টুর গলা—‘ব্যাটা চুরির মতলবে এখানে দেখতে আসা না?’ ততক্ষণে রজনীও হাজির হয়ে গেছে সেখানে। নেলোর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে লোকটার মুখে ফেলে সে বলল— ‘এই, তুই এখানে কি করছিস রে? তুই তো এগাঁয়ের লোক নোস বাপ। নিশ্চয়ই চুরির ধান্দায় এখানে এসেছিস?’

লোকটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পাছে সে বিপাকে পড়ে সত্যি কথাটা বলে ফেলে তাই রজনী তার মুখটা চেপে ধরে বলল— ‘পল্টু, দে শিশিটা ওর মাথায় উপুড় করে। ব্যাটা বুঝুক যে কোথায় ও খেপ মারতে এসেছিল।’

ব্যাস, আর যায় কোথা। নেলো লোকটার মাথা থেকে গামছাটা টেনে খুলে নিতেই পল্টু পকেট থেকে একটা শিশি বের করে উপুড় করে দিল লোকটার মাথায়। গড়িয়ে পড়া আলতায় লোকটার মাথা, মুখ আর সাদা ফতুয়া ভিজে একেবারে লাল হয়ে গেল। লোকটা দু-হাত দিয়ে মুখটা মুছতে যেতেই রজনী নেলোর হাত থেকে গামছাটা নিয়ে লোকটাকে দিয়ে বলল— ‘নে ব্যাটা, এটা দিয়ে মুখটা মুছে নে, নইলে বাড়ি গেলে তোর বউও তোকে চোর ভেবে লোক ডেকে পিটুনি খাওয়াবে।’ লোকটা গামছা দিয়ে মুখ মুছতেই সেটাও লালে লাল হয়ে গেল। তাই দেখে পল্টু বলে উঠল— ‘আরিব্বাস, এ যে এক্কেবারে লালমুখো বাঁদর মাইরি।’ সবাই হেসে উঠল হো-হো করে আর সেইফাঁকে লোকটা দৌড় লাগাল ফিরতি পথে।

এদিকে নাটক শুরুর আগের ক্ল্যারিওনেট, হারমোনিয়াম, খোল, ঢোল আর করতালের জগঝম্প শুরু হয়ে গেছে। তাই শুনে ছেলেরা উতলা। তারা এখুনি হাটতলায় যেতে চায়। তাই রজনীকে বলল— ‘আপনি নাটক দেখতে যাবেন না স্যার?’

—‘যাব না আবার? অমন নাটক কি আর ছাড়া যায় রে, আর তার ওপরে দেখতে হবে হেদায়েত স্যারের পার্ট। দারুণ পার্ট করেন কিন্তু। ঠিক আছে, তাহলে তোরা এগো। আমি চানটান সেরে জিনিসপত্র সব গুছিয়ে, ঘরে তালা দিয়ে আসছি। ওঃ, যা খেল দেখালি তোরা আজ। সাব্বাশ।’ বলে হেসে ওঠে রজনী।

পল্টু আর নেলো চলে যেতেই রজনী ঘরে ঢুকে চটপট স্যুটকেস খুলে তার থেকে দাদুর প্যাঁটরাটা বের করে নেয়। তারপরে দরজায় তালা লাগিয়ে সটান হাঁটা লাগায় নদীচরের ওপারের জঙ্গলের দিকে। সেই অর্জুন গাছটার তলায় তাকে যে আবার ফিরিয়ে দিতে হবে তার দাদুর প্যাঁটরা।

—‘আসতে পারি দারোগাবাবু?’ সম্বোধনটা শুনেই কিঞ্চিত বিরক্ত হন কমল স্যানাল। কলকাতায় এইভাবে কেউ ওসি কে ডাকে না। তবু বিরক্তি চেপে রেখে বলেন— ‘হ্যাঁ, ভেতরে আসুন। বসুন।’

—‘তা কী ব্যাপারে আবার ডেকে পাঠালেন, যদি বলেন।... আসলে আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হব।’

—'গ্রামে কেমন ছুটি এনজয় করলেন বলুন?'

—'ভালোই। বেশ ভালোই। এই তো সবে দু-দিন হল জয়েন করেছি।' রজনী বুঝতে পারে যে ওসি মূল কথায় আসার আগে ভূমিকা করছেন।

—'ও। তা দিনেশ কি গ্রামে ফিরেছে?'

—'না। পুলিশ থেকে যেভাবে ওর ছবি চারিদিকে ছড়ানো হয়েছে, তাতে ও গ্রামে ফিরলে গ্রামেরই কেউ না কেউ লোকাল থানায় নিশ্চয়ই খবর দিত।'

ইতিমধ্যে ওসি কমল সান্যাল তাঁর ডান দিকের ড্রয়ার খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কী যেন একটা কিছু করলেন আর তারপর বের করে আনলেন একটা টিনের কৌটো। তাতে কালো রঙের কী যেন একটা পদার্থ। সেটা রজনীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন— 'এটা কি বলতে পারেন? ভালো করে হাতে নিয়ে দেখুন তো।'

রজনী বুঝতেই পেরে গেছে দারোগার চাল। বহুরূপীদের গায়ে মাখার কালো রং এটা। আর সেইসঙ্গে দারোগা ওই কৌটোর গায়ে তার আঙুলের ছাপও নিতে চাইছেন। রজনীর তাতে কোনো আপত্তি নেই। নেলপালিশের গুণে কোথাও সে তার আঙুলের ছাপ ছেড়ে আসেনি। তবু যে কেন দারোগা এটা করছেন সে ভেবে পেল না। তাই সে স্বাভাবিক ভাবেই কৌটোটা নিল দারোগার হাত থেকে। তারপরে ভালো করে দেখে বলল— 'এটা কি জুতোর কালি? নাঃ, কই সেরকম ঝাঁঝালো গন্ধ তো পাচ্ছি না।' তারপরে ওসি-র মুখের দিকে তাকিয়ে বলল— 'কি বলুন তো এটা? ছাপাখানার কালি কি? নাকি পোস্টঅফিসের চিঠিতে ছাপ্পা দেওয়ার কালি?'

—'চিনতে পারলেন না?'

—'দেখুন, আমি জুতোর পালিশ চিনি। এটা কিন্তু সেই কালি নয়। আর আমি ছাপাখানা বা পোস্টঅফিসে কাজও করি না। তাই এই জিনিসটা আমার চেনার কথা নয়।' বলে সে কৌটোটা ফেরত দিয়ে দেয় দারোগাকে।

—'এটা হল গায়ে মাখার কালি।'

—'গায়ে মাখার কালি? সেটা কী রকম ব্যাপার?' রজনী নিঁখুত অভিনয় করে।

—'এটা গায়ে মেখে যাত্রায় কালি সাজা হয়। আপনাদের গ্রামের বিষ্টুচরণ কালি সাজতে এই রঙটাই ব্যবহার করত।'

—'ও, তাই বলুন। তা আপনি এটা আমাকে দেখিয়ে কী জানতে চাইছেন বা কি প্রমাণ করতে চাইছেন?' রজনী দৃঢ় স্বরে বলে।

—'না না, তেমন কিছু নয়। যাকগে, ছাড়ুন ওসব কথা। তা আপনি যখন গ্রামে ছিলেন, তখন কি কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল?'

—'হ্যাঁ। তা ঘটেছিল বটে। এক নম্বর, শীতলা পুজো হয়েছিল। দু-নম্বর, শীতলা পুজোর দিন রাত্তিরে গ্রামের লোকেরা মিলে একটা নাটক অভিনয় করেছিল আর তিন নম্বর হল ওইদিন সন্ধের মুখে আমার বাড়িতে কেউ একজন অচেনা লোক চুরির চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে আমার দুই ছাত্র আর আমার হাতে ধরা পড়ে যায়।'

বিস্মিত কমল দারোগা বলেন— 'তা তাকে তখন ধরে আপনারা উত্তম-মধ্যম দিয়েছিলেন?'

—'না, গায়ে হাত তুলিনি। তবে যে শাস্তিটা তাকে দিয়েছিলাম, সেটা সে জীবনে কখনো ভুলবে না।'

—'কী, কী, শাস্তি দিয়েছিলেন শুনি?' আগ্রহী হয়ে ওঠেন দারোগা। রজনী বোঝে, সব জেনেও না জানার ভান করছেন দারোগা।

তাই হাসতে হাসতে সে বলে— 'তেমন কিছুই না। শুধু ঘরে থাকা আলতা দিয়ে গরমকালের সন্ধেবেলা গা ধুইয়ে দিয়েছিলাম ব্যাটার।'

ওসি কমল সান্যাল এই স্বীকারোক্তি শুনে শুধু একটু কাষ্ঠহাসি হাসলেন। আসলে মনের রাগ মনে চেপে রেখে হাসতে হয় তাই হাসলেন। উনি ভালোই বুঝে গেলেন যে রজনীকান্ত রায় কতখানি ধূর্ত যে তাঁর লাগানো চরের স্বরূপ তার কাছে ধরা পড়ে গেছে। তাই আর তাকে ঘাঁটাতে চাইলেন না। শুধু মুখে বললেন— 'আপনি এখন আসতে পারেন মিস্টার রায়।'

অবশ্য এর পরেও আরও মাস দুয়েক ফেউ লাগিয়ে রেখেছিলেন রজনীর পেছনে, তবে বিশেষ কিছু না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন শেষে।

জুলাই, ১৯৪৬

গোপাল পাঁঠা, যুগল ঘোষ আর রায়টের বীজ

ভোট হয়ে গেছে। কংগ্রেস যা ফল প্রত্যাশা করেছিল তা হয়নি। বেঙ্গল প্রভিন্সের ভোটে মুসলিম লীগ পেয়েছে ১১৩ টা আসন আর কংগ্রেসের ৮৬ টা। হুসেন শাহিদ সুরাওর্দী হয়েছেন বেঙ্গল প্রভিন্সের মুখ্যমন্ত্রী। আর মুসলিম লীগ জিতবে নাই বা কেন? অবিভক্ত বাংলায় মুসলিমরা যে এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর এই ভোটের জোরেই আরও হাত শক্ত হয়েছে মহম্মদ আলি জিন্নার। ১৬ জুন উনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাটলির পাঠানো তিন সদস্যের ক্যাবিনেট মিশনকে বলে দিয়েছেন যে অবিভক্ত ভারতের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিয়ে তৈরি হোক ইন্ডিয়া আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিয়ে তৈরি হোক পাকিস্তান।

তার উত্তরে ১০ জুলাই জওহরলাল প্রেস কনফারেন্স ডেকে বলেন যে জাতীয় কংগ্রেস Constituent Cabinet এ যোগ দিতে পারে, যদি তাঁদের ক্যাবিনেট মিশনের দেওয়া প্রস্তাব পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত করতে দেওয়া হয়।

এইরকম এক পরিস্থিতিতে রাত নটা নাগাদ গোপাল পাঁঠার অফিসে এসেছে দু-জন আমেরিকান কালা আদমি। তারা মিলিটারিতে ছিল, কিন্তু গতবছরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাওয়াতে তাদের হাতে তেমন পয়সা নেই। অথচ ফূর্তি করতে হলে চাই মদ আর সেইসঙ্গে পয়সার প্রয়োজন নিষিদ্ধ পল্লিতে যেতেও। দীর্ঘদিন যে তারা ঘর ছাড়া। তবে তাদের কাছে আছে হিসেব বহির্ভূত কিছু অস্ত্র আর গোলাগুলি। এখন ওইগুলো বেচেই কামাতে হবে ফূর্তির পয়সা। অতএব লোকমুখে শুনে তারা হাজির হয়েছে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের অফিসঘরে। তারা শুনেছে যে এই লোকটা নাকি ক্যালক্যাটার এক মস্ত

হুলিগ্যান। তাই অপেক্ষা করছে তারা কখন গোপালবাবু আসেন আর সেইফাঁকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে অফিসঘরের চারপাশে।

ঘরের দেওয়ালে হিন্দু গডস আর গডেসদের বাঁধানো ফোটোগ্রাফ। তাতে মালা দেওয়া। সামনে প্রদীপ জ্বালা। ইন্ডিয়াতে বেশ কিছুদিন থাকার সুবাদে সেই গডস আর গডেসদের মধ্যে তিনজনকে তারা চেনে। একজন 'বজরংবলী', অন্যজন 'লর্ড মহাদেভা' আর আরেকজন হলেন 'গডেস কালী'। তবে তারা ভারি আশ্চর্য হয় ঘরের একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখা INA এর পোশাক পরা নেতাজি বোসের একটা লাইফ সাইজ স্ট্যাচু দেখে। ভাবে যে— গোপাল একজন হুলিগ্যান হয়ে তার অফিসে বোসের মতো একজন পেট্রিয়টের স্ট্যাচু রাখে কেন?

একটু পরেই তাদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল একটা জিপ। সেটার থেকে নেমে ঘরে ঢুকলেন দুই ভদ্রলোক। একজনের পরনে সাদা পায়জামা আর খদ্দরের পাঞ্জাবি, অন্যজনের পরনে সাদা হাফহাতা শার্ট আর সাদা ধুতি। এই দ্বিতীয় জনের গালে শিখদের মতো কালো দাড়ি আর মাথার চুল শিখদের মতোই মাথার ওপরে গোল্লা পাকিয়ে বাঁধা।

টেবিলের ওপারে দুটো চামড়ায় মোড়া বিরাট চেয়ার। কিন্তু ওই শিখেদের মতো দেখতে ব্যক্তি তাতে না বসে একে একে প্রণাম করলেন দেওয়ালে টাঙানো দেব-দেবীর ছবিগুলোতে। তারপরে একজন লম্বা-চওড়া চেহারার যুবক তাঁর হাতে তুলে দিল একটা বড়ো মালা। ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে ওই ব্যক্তি নেতাজি বোসের স্ট্যাচুতে পরিয়ে দিলেন মালাটা। হাতজোড় করে প্রণাম করলেন মূর্তিটাকে। তারপরে এসে বসলেন টেবিলের ওপ্রান্তের একটা চেয়ারে। সঙ্গে আসা ভদ্রলোকও বসলেন তাঁর পাশের চেয়ারটায়। আমেরিকান দুই সেনা বুঝেই গেল যে ওই ঝুঁটি বাঁধা ভদ্রলোকই বিখ্যাত গোপাল মুখোপাধ্যায়।

দুই মিলিটারিকে দেখিয়ে দৃঢ় অথচ শান্ত স্বরে গোপাল প্রশ্ন করলেন— 'বসন্ত, এনারা কেন এসেছেন? কি দরকার তা জেনেছ?'

দীর্ঘদেহী যুবক জবাব দিল— 'দাদা, ওরা চারটে রিভলভার আর শ-দুয়েক বুলেট এনেছে।'

—'ও, তা কী দর চাইছে?'

—'আজ্ঞে দাদা, দু-হাজার।'

—'মাল দেখেছ?'

—'হ্যাঁ দাদা। সব একদম ঠিকঠাক আছে।'

কথা বলার দৃঢ় অথচ শান্ত ভঙ্গি দেখেই দুই আমেরিকান বুঝে গেছে যে এই ভদ্রলোক নিউ ইয়র্কের মাথামোটা স্ট্রিট হুলিগ্যানদের মতো নন, বরং বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে আটঘাট বেঁধে তবেই কাজ করেন।

—'দামটা একটু বেশিই পড়ে যাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে বসন্ত। যাইহোক, তুমি ওদের হাজার দেড়েক টাকা আর একটা বড়ো রামের বোতল দিয়ে দাও।'

আমেরিকান দু-জন বাংলা বোঝে না। তবু বসন্ত যখন তাদের কাছ থেকে মাল নিয়ে পেছনের একটা ঘরে ঢুকে গেল, তখন তারা ভাবল তাদের চাওয়া দামই বুঝি পাওয়া যাবে।

একটু পরেই বসন্ত ফিরে এসে তাদের সামনে রাখলে একটা বড়ো রামের বোতল আর ওই শিখের মতো দেখতে বাঙালিবাবু চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলে গুণে গুণে দেড় হাজার টাকা এগিয়ে দিলেন তাদের দিকে। টাকাটা যদিও তাদের প্রত্যাশার চেয়ে কম, তবু তারা বিনা বাক্যব্যয়ে সেটাই নিয়ে নিল। আসলে তারা দামটা একটু বেশিই বলেছিল। তাই হাতে যা পাওয়া গেল তাতেই তারা খুশি। উঠে দাঁড়িয়ে তারা হাত বাড়িয়ে দিল গোপালের দিকে। গোপাল কিন্তু হ্যান্ডশেক না করে বুকের কাছে হাতজোড় করে বললেন— 'নমস্তে'। দুই আমেরিকান সৈনিক খুশি হয়েই বেরিয়ে গেল। দিন দশেকের মতো ফূর্তি করার মত টাকা এসে গেছে তাদের হাতে।

তারা চলে যেতে না যেতেই বসন্ত চা এনে হাজির।

চায়ে চুমুক দিতে না দিতেই গোপাল তাঁর পাশে বসা সঙ্গীকে বললেন— 'তা জিন্নার কথা কী যেন বলছিলে যুগলদা। তখন ঠিকমতো শোনা হল না। এবারে বল।'

এই যুগলবাবু ওরফে যুগল চন্দ্র ঘোষই হলেন কংগ্রেস পার্টির ট্রেড ইউনিয়নের ডাকসাইটে নেতা। কংগ্রেসের নেতাদের, বিশেষ করে ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর রীতিমতো ভালোই যোগাযোগ আছে। গোপালের মতো কলকাতা শাসন করার ক্ষমতা না থাকলেও তাঁরও কিছু ডাকাবুকো ছেলের দল আছে।

তা গোপালের কথার জবাবে যুগলবাবু বলতে থাকেন— 'নেহরুর কথা শুনে জিন্নার মনে হয়েছে যে Constituent Assembly তে হিন্দুরা প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারে। তাই অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার ব্রিটিশ প্ল্যানকে সে বাতিল করেছে। এমনকী এও বলেছে যে সে পাকিস্তান তৈরির পক্ষপাতী আর যদি পাকিস্তান তৈরি করতে না দেওয়া হয় তবে সে সরাসরি সংঘাতের পথে হাঁটবে।'

—'কীভাবে?'

—'জিন্না বলেছে যে ষোলোই অগাস্ট সারা দেশ জুড়ে সভা-সমাবেশ করে মুসলিমদের বুঝিয়ে বলা হবে যে মুসলীম লীগ তাদের জন্যে ঠিক কী করতে চায়।'

—'তা আমাদের কলকাতায় কোথায় কোথায় ওদের মিটিং হবে?' জানতে চান গোপাল।

—'ওইদিন তো মনুমেন্টের তলায় বিশাল সমাবেশের ডাক দিয়েছে সুরাওর্দী। জোহরের নমাজের পরেই মুসলিমরা সেখানে আসবে কলকাতা আর আশেপাশের এলাকা থেকে। সমাবেশ তো বিরাট হবে বলেই মনে হয়।'

—'তা সুরাওর্দীর সঙ্গে আর কে কে বক্তব্য রাখবে?'

—'খাজা নিজামুদ্দিন থাকবে, ছাত্র সংগঠনের নেতা আজমিরি থাকবে আর থাকবে ওদের ন্যাশনাল গার্ডের নেতা শেখ মুজিবর রহমান।'

গোপাল এতক্ষণ দু-হাতের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে চোখ বুজে শুনছিলেন যুগলদার কথা আর মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করছিলেন যে ওই সভায় সুরাওর্দী আর খাজা নিজামুদ্দিন কী বলবে।

এই সুরাওর্দীকে গোপাল চেনেন সেই তেতাল্লিশ সাল থেকে যখন সে সিভিল সাপ্লাইয়ের মন্ত্রী ছিল। সেই সময়ে সরকার ব্যর্থ হয়েছিল মানবিক সাহায্য পাঠাতে। খাদ্যশস্যের ব্ল্যাক-মার্কেট আটকাতে পারেনি, এমনকী সেই আকালের মধ্যে রিলিফও পাঠাতে পারেনি সুরাওর্দী। অবস্থা এমনই ভয়ানক হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত মিলিটারিকে

ব্যাপারটা দেখতে মাঠে নামতে হয়েছিল। তাই মনুমেন্টের এই সভা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হবে তো?

তবে নিতান্তই যদি অশান্তি শুরু হয়ে যায়, তার জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা উচিত। এমনিতে মুসলিম বিদ্বেষ নেই গোপালের। ব্যবসার খাতিরে অনেক মুসলিমের সঙ্গে তার ওঠাবসা। তা ছাড়া কলকাতা শহরে কত বিচিত্র পেশায় কত মুসলমান জড়িয়ে — মুটে, রিক্সাওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা, কোচোয়ান, ওস্তাগর আর আরও কত কী। কই তাদের সঙ্গে তো তার শত্রুতা নেই। সে শান্তিতে বিশ্বাসী। তবে কেউ বা কারা যদি অশান্তির আগুন জ্বালাতে চায়, সম্প্রীতি নষ্ট করতে চায়, তবে তাদের সে ছেড়ে কথা বলবে না। সে ভালো করেই জানে যে দাঙ্গা বাঁধায় স্বার্থান্বেষীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্যে।

১৬ অগাস্ট, ১৯৪৬

গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, রাস্তায় শকুন, কেশোরামে আগুন আর আনন্দমঠ

১৬ অগাস্ট সকালে ছাদে প্র্যাকটিস সেরে নীচে নেমে রজনী আর কানাই কেষ্টদার দেওয়া চা-বিস্কুট খাচ্ছিল। এমন সময় দরজার কড়া নাড়ার সঙ্গে আওয়াজ শোনা গেল— ‘কেষ্ট, দরজা খোল তাড়াতাড়ি।’ মেসোমশাইয়ের গলা। সকাল সকালই বাজার করতে বেরিয়ে যান উনি। এখন ফিরলেন বোধ হয়।

কেষ্টদা দরজা খুলতেই হন্তদন্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দুটো ব্যাগভরতি বাজার নিয়ে ঢুকলেন।

—‘এই বাজারেই চালিও একসপ্তা। কেষ্ট, খবরটা চালা দেখি।’ মেসোমশাইকে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।

রজনী বলল— ‘কী ব্যাপার মেসোমশাই, এত হাঁপাচ্ছেন কেন?’

—‘আর বল না। কলেজ স্ট্রিটে দোকানপাট ভাঙচুর হচ্ছে। শুনলাম হ্যারিসন রোড আর কলুটোলাতেও নাকি ইঁট-পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি আর ভাঙচুর হচ্ছে। এমনকী দু-জনকে নাকি স্ট্যাবও করা হয়েছে। তাই আমি যতটা পারি বাজার করে আনলাম। পরে বেরতে পারব কি না কে জানে। মনে হচ্ছে রায়ট শুরু হলেও হতে পারে। শোনো, আজ আর কেউ বাড়ির বাইরে বেরিয়ো না। সাবধানের মার নেই। আর হ্যাঁ রে কেষ্ট, চিঁড়ে, গুড়, মুড়ি এসব ঘরে আছে তো?’

—‘হ্যাঁ কত্তাবাবু, আচে।’ জবাব দিল কেষ্টদা।

ততক্ষণে রেডিয়ো থেকে ভেসে আসছে খবর। বিক্ষিপ্ত ভাঙচুর আর খুন শুরু হয়ে গেছে রাজাবাজার, কলাবাগান, বড়োবাজার এমনকী কলেজ স্ট্রিটেও। সম্ভাব্য বিপদের কথা আন্দাজ করে আজ আগে থেকেই স্কুল, অফিস, দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়েছে। লালবাজারের মতে এই দাঙ্গাগুলো নাকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

রজনী বলে— 'কিন্তু মেসোমশাই, আজ দুপুরে তো মনুমেন্টে মিটিং আছে সুরাওর্দীর।'

একগ্লাস জল খেয়ে কেষ্টদার দেওয়া চায়ে চুমুক দিয়ে মেসোমশাই বললেন— 'কি জানি বাবা, ভোরের সূর্যই যদি এত গনগনে হয় তবে মিটিং এর পরের অবস্থা যে কী হবে কে জানে। কলকাতার দাঙ্গায় যে কী অবস্থা হয় তা তো তুমি দেখোনি রজনী। আমরা দেখেছি। আর সেইজন্যেই বলছি, রেডিয়োর খবরটা শোনো। পরিস্থিতির একটা আন্দাজ পাবে। আর হ্যাঁ, অচেনা কেউ ডাকলেও সদর দরজা খুল না যেন।'

চা খেতে খেতে মেসোমশাই খবর শুনতে লাগলেন। দাওয়ায় বসে কুটনো কুটতে কুটতে মাসিমারও কান ওইদিকে। এমনকী কেষ্টদাও কাজ করতে করতে কান খাড়া রেখে খবর শুনছে। সারা বাড়িটা হঠাৎই যেন থমথমে হয়ে গেছে। দাঙ্গা কি এতই আতঙ্কময়?

তাই একফাঁকে স্যারকে একান্তে পেয়ে কানাই জিজ্ঞেস করে— 'স্যার, রায়ট কী গো?'

—'রায়ট হল দু-দল মানুষের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি।'

—'তাহলে রায়ট কি যুদ্ধ?' কানাইয়ের এই সরল প্রশ্নের সঠিক জবাব কি দেবে তা জানা নেই রজনীর।

তবু সে বলে— 'না যুদ্ধ নয়। কোনো দেশের মানুষের ভেতরটা খুব খারাপ হয়ে গেলে তখন রায়ট হয়। বিনা কারণে তখন মানুষ মানুষকে মারে।'

কানাই কী বুঝল তা সেইই জানে। রজনীও তার মনের ভেতরের নাগাল পেল না।

দুপুরবেলা ছাদে উঠে এল সবাই। দূরে দূরে কালো ধোঁওয়া উঠছে আকাশে। হয়তো কোথাও আগুন লাগানো হয়েছে। একটুপরেই ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে সামনের রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল একটা দমকল। তার পিছু পিছু আরেকটা।

আবার একটু পরেই শুনশান রাস্তা দিয়ে ছুটে এল একটা ট্রাক। তাতে একদল লোক। হাতে তাদের লোহার রড, লাঠি। খোলা তরোয়াল উঁচিয়ে তারা চিৎকার করে বলছে— 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।' আর তার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ইঁট এসে লাগল তাদের বাড়ির বন্ধ দরজায়।

তারা যেতে না যেতেই পেছন পেছন ছুটে এল একটা জিপ আর তারও পেছনে এক ট্রাক ভরতি লোক। জিপের চালকের পাশের আসনে বসা সাদা শার্ট আর ধুতি পরা একজন পাগড়ি ছাড়া শিখ। তার হাতে একটা রিভলভার।

মেসোমশাই ফিসফিস করে রজনীকে বললেন— 'ওই দেখ গোপাল পাঁঠা। ওই যে শিখের মতো গালে দাড়ি আর মাথায় ঝুঁটি বাঁধা।'

পেছনের ট্রাকের ছেলেরাও সশস্ত্র। তাদের হাতে ছোরা, বড়ো চপার, লোহার রড এমনকী পিস্তলও। ছাদের সবাই বুঝতে পারে যে সামনে চলে যাওয়া ট্রাকটাকে ধাওয়া করে চলেছে গোপালের দলবল।

তারা চলে যেতেই মেসোমশাই কেষ্টদাকে বললেন— 'কেষ্ট, একটা তোলা উনুন ছাদে এনে তাতে গরম জল হাঁড়িতে করে ফুটিয়ে রাখবি। কেউ দরজা ভাঙতে এলে ওপর থেকে গরম জল ঢালবি।'

তারপরে মাসিমার উদ্দেশ্যে বললেন— 'শোনো, গোপাল যখন মাঠে নেমেছে, তখন বুঝতে হবে অবস্থা বেশ গুরুতর। তাই আমি ঠিক করেছি যে, আজ আমি, রজনী আর

কেষ্ট ছাদে পাহারায় থাকব সারারাত। আর কানাই নীচে তোমার কাছে শোবে।'

থতমত খাওয়া মাসিমা কানাইকে আঁকড়ে ধরে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দেন শুধু।

রজনী বলে— 'মেসোমশাই, একটা কথা বলব?'

—'বল।'

—'রাতে বরং আমি আর কেষ্টদাই ছাদে থাকব। আপনি রেস্ট নিন। এই বয়সে রাতজাগার ধকল নেওয়া উচিত হবে না। আমরা দু-জন তো আছিই। আপনি চিন্তা করবেন না।'

অনেক বোঝানোর পরে মেসোমশাই রাজি হলেন।

সন্ধের মুখেই ছাদে তোলা উনুন জ্বালিয়ে কেষ্টদা জল চাপিয়ে রাখল হাঁড়িতে। এদিকে নীচের ঘরে মেসোমশাই রেডিয়োর খবর শুনতে শুনতে বললেন— 'বুঝলে, অবস্থা ক্রমে ক্রমে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। কলকাতার আশপাশের অঞ্চলেও রায়ট শুরু হয়েছে। এখন অবস্থা আয়ত্তে থাকলে হয়।'

রজনী বলল— 'পুলিশ কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না কেন?'

—'আরে, পুলিশ তো সরকারের হাতের পুতুল। তাদের যেমন চালানো হবে, তেমন চলবে। তা ছাড়া এতবড়ো শহরে কত গলিঘুঁজি। সেখানে পুলিশ হয়তো ঢুকতেই পারবে না। এখন দরকার... আরে আরে। দাঁড়াও, দাঁড়াও, শোনো রেডিয়োতে কী বলছে।'

রেডিয়ো থেকে যা ভেসে আসে তার সারমর্ম হল এই যে— অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে বুঝতে পেরে সন্ধে ছ-টা থেকে সারা শহরে কার্ফু জারি করা হচ্ছে। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলোয় রাত আটটা থেকে নামানো হচ্ছে মিলিটারি।

—'এবার তাহলে অবস্থা আয়ত্তে আসবে, কি বলেন মেসোমশাই?'

—'আরে বাবা, পুলিশের কাছ থেকে খবর পেলে তবেই না মিলিটারি অ্যাকশন নেবে। মিলিটারি তো শুধু মেন রোডে টহল দেবে। কিন্তু অলিগলিতে? আর পুলিশ তো এখন পলিটিক্যাল পাপেট।'

ঘণ্টাখানেক পরেই রাস্তায় শোনা যায় মাইক নিয়ে পুলিশের গাড়ি 'কার্ফু'র হাঁক দিচ্ছে। এদিকে সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। কার্ফুর ঘোষণা শুনে সবাই পড়িমড়ি করে ছাদে ওঠে। পুলিশের গাড়ি চলে যেতেই সবার নজর পড়ে দূরের দিকে। দেখা যায় সেখানে আকাশ লাল। কোথাও কোনো বস্তি, দোকান বা কারখানায় আগুন লাগানো হয়েছে বোধ হয়। দূর থেকে ভেসে আসছে কখনো 'আল্লা হু আকবর' আবার কখনো বা 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি। মাঝেমধ্যে শোনা যাচ্ছে বোমা আর গুলির আওয়াজও।

রাত দশটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই সবাই আবার ছাদের ওপরে। কিন্তু অবস্থা পালটায়নি। কার্ফু বা মিলিটারি টহলের তোয়াক্কা না করেই দাঙ্গা চলছে শহরে।

খানিকক্ষণ এসব দেখে মেসোমশাই আর মাসিমা কানাইকে নিয়ে চলে গেলেন নীচে। রজনী আর কেষ্টদা রইল ছাদে। শুধু রজনীর সঙ্গী এখন তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ।

কানাই সারাটা দিন খুব একটা কথা বলেনি। কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে ছেলেটা। তবে রজনীর দেওয়া 'রায়ট'এর উত্তর সে ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। তাই এখন বিছানায়

শুয়ে সে মাসিমাকে প্রশ্ন করে— 'হ্যাঁ গো ঠাম্মি, রায়ট কী গো?'

—'রায়ট মানে হল দাঙ্গা। এখন হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা লেগে গেছে।'

—'কই, আমাদের গ্রামে তো এমন হয় না। সেখানেও তো কত মুসলমান আর হিন্দু থাকে।'

মাসিমা এর কী উত্তর দেবেন ভেবে পান না। তাই চুপ করে থেকে কানাইয়ের মাথার চুলে আঙুল চালাতে থাকেন যাতে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ে।

কানাই আবারও প্রশ্ন করে— 'এই দাঙ্গা কি স্বাধীনতা পাবার জন্যে হচ্ছে?'

—'হয়তো হবে; আবার হয়তো বা না। আবার দেশটা ভাঙার জন্যেও হতে পারে।'

কানাই ঠিক বুঝতে পারে না তার ঠাম্মির কথা। বড্ডো জটিল এসব। তাই সে চুপচাপ পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে।

রজনীর কথামতো ছাদের চিলেকোঠার ঘরে কেষ্টদা শুতে চলে যায়। তেমন হলে রজনী তাকে ডেকে দেবে বলেছে। আর রজনী? সে একটা লোহার তারের তৈরি চেয়ারে বসে থাকে ছাদের কোমর সমান উঁচু পাঁচিলে হাতের উলটোপিঠে থুতনিতে ভর রেখে।... এদিকে সময় বয়ে চলে নিজের গতিতে।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পরে একটা মিলিটারি গাড়ি চলে গেল বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে। তাদের হাতে বেয়নেট লাগানো রাইফেল। তারা চলে যেতে বালতিতে রাখা খানিকটা জল নিয়ে হাঁড়িতে ঢেলে দেয় সে। কমজোরী আঁচে ফুটতে ফুটতে হাঁড়ির জল বেশ খানিকটা কমে গিয়েছিল। একবার চিলেকোঠার ঘরে উঁকি দেয়। সারাদিন খাটাখাটুনির পরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে কেষ্টদা। তাই সে আবার চেয়ারে এসে বসে। ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিনটে লোডেড রিভলভারের অস্তিত্ব ঠাহর করে নেয়। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে হাতের ঘড়িতে দেখে রাত পৌনে একটা।

দূর থেকে এখনও মাঝেমধ্যে ভেসে আসছে দলবাঁধা মানুষের চিৎকার। উন্মত্ততার চিৎকার, হিংস্রতার চিৎকার, দেশ ভাঙার চিৎকার। কিন্তু কী করবে সে এই মারণ সময়ে? দেশভাঙার কুটিল খেলায় মত্ত মানুষের কাছে, স্বার্থপর রাজনীতির কাছে সে যে বড়োই নগণ্য।

কোথায় মানুষ চাইবে এদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসকদের তাড়াতে, তা নয়, এখন তারা মেতেছে আত্মধ্বংসের সর্বনাশা খেলায়। হ্যাঁ, তার হয়তো কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে; কিন্তু সে তো অতিমানব নয়। আর যদিও বা সে অতিমানবও হত, তাহলেও এই রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের কাছে সে অসহায়ই হয়ে থাকত। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ক্ষমতা হল রাজনৈতিক ক্ষমতা, যার কাছে অতিমানবিক ক্ষমতাও তুচ্ছ হয়ে যায়।

এইসব ভাবতে ভাবতেই তার চোখদুটো লেগে এসেছিল। হঠাৎই একটা শোরগোলে তার তন্দ্রা গেল ভেঙে। অনেক মানুষের চিৎকার ভেসে আসছে তাদের বাড়িরই কাছাকাছি রাস্তা থেকে। পাঁচিলের আড়াল থেকে দেখল তাদের বাড়ি আর মণ্টুর চায়ের দোকানের মাঝামাঝি জায়গায় দুটো লোককে মাটিতে ফেলে জনা পাঁচ-ছয়েক লোক নির্দয়ভাবে পেটাচ্ছে। মুষলের মতো আছড়ে পড়ছে লোহার রড; রাস্তার ম্লান আলোতেও ঝলসে উঠছে চপারের চওড়া ব্লেড। আর্ত মরণ-চিৎকার আর পাশবিক উন্মত্ততার গর্জন

ফুঁড়ে ফেলছে কলকাতার রাতের ঘুমের শান্তিকে। নাঃ, এই গণ-পাশবিকতা সহ্য করা যায় না। নিজের অজান্তেই তার হাত ঢুকে যায় ব্যাগের মধ্যে। টার্গেট নাগালেই। কিন্তু...।

কেষ্টদা ঘুম ভেঙে উঠে মগে করে ফুটন্ত জল ছুঁড়তে শুরু করেছে। কিন্তু সেই জল কি আর অতদূর যায়! এদিকে রাস্তার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেছে নীচের সবারও। তারা তিনজনেই উঠে এসেছে ছাদে। মাসিমা কানাইকে চেপে ধরে আছেন আর সন্ত্রস্ত কানাই তার ঠাম্মিকে আঁকড়ে ধরে আঁচলের তলা থেকে দেখতে চেষ্টা করছে এই নরমেধের খেলা। কিন্তু ছাদের পাঁচিলটা যে বাধা।

এমন সময় বোমার আওয়াজ। বিকট শব্দ। কেঁপে উঠল পাড়া। আর কী যেন একটা ছিটকে এসে লাগল চিলেকোঠার জানলার কাঠে। বোধ হয় বোমার স্প্লিন্টার। যে লোকগুলো এতক্ষণ মারছিল, তাদের দু-জন ছিটকে পড়ল মাটিতে। কাতরাতে লাগল। বাকিরা পালাতে গেলে পেছন থেকে ধাওয়া করে এল একটা ট্যাক্সি। তাদের বাড়ি পার হয়ে একটু দূরেই ট্যাক্সির লোকেরা ধরে ফেলল পলায়মান লোকগুলোকে। তারপরে মিনিট পাঁচেক ধরে চলল হত্যালীলা। হত্যাকারীদের নৃশংস গর্জন আর মৃত্যুর শেষ আর্তনাদ ফালা ফালা করে দিচ্ছে মানবিকতা। কী ভয়ানক! কী সাংঘাতিক! রজনীর মতো শীতল স্নায়ুর মানুষকেও স্তব্ধ করে দিল সেই নারকীয় দৃশ্য। তারপরে আর ঠিক দু-তিন মিনিট। ট্যাক্সিটা মিলিয়ে গেল দূরে। শুধু তাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে পড়ে রইল ছিন্নভিন্ন কতকগুলো মানুষের শরীর, যারা এখন শব হয়ে গেছে।

নিজে একটু ধাতস্থ হতেই রজনী দেখল মেসোমশাই থরথর করে কাঁপছেন। সে তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে বসিয়ে দিল চেয়ারটায়। অন্যদিকে মাসিমা আর কানাই একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আছে। ভয়ার্ত চাপা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে তাদের শরীর। তাই দেখে রজনী কেষ্টদাকে বলল— 'কেষ্টদা তুমি ওদের নীচে নিয়ে যাও আর পারলে একটু কফি বানাও সবার জন্যে। এখন ওটার খুবই দরকার।'

কেষ্টদা মাসিমা আর কানাইকে নিয়ে এগিয়ে গেল নীচে নামার সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎই পাগলের মতো ছুটে এসে হাঁড়ির ফুটন্ত জলে মগ ডুবিয়ে একমগ জল নিয়ে ছুটে গেল পাঁচিলের কাছে। তারপর ব্যর্থ আক্রোশে 'মর শালা' বলে চিৎকার করে সেই জলটা ছুঁড়ে দিল রাস্তার ওপরে। পাছে আরও কিছু করে বসে, এই ভয়ে রজনী তাড়াতাড়ি গিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। টেনে নিয়ে গেল সিঁড়ির কাছে। তখনও কেষ্টদা হাঁফাচ্ছে এক অব্যক্ত আক্রোশে।

কেষ্টদাকে শান্ত করে তাদের তিনজনকে রজনী পাঠিয়ে দিল নীচে আর তারপরে এগিয়ে গেল মেসোমশাইয়ের দিকে। এই অতি প্রৌঢ় মানুষটার মাথা ঝুলে পড়েছে সামনে। হয়তো এই মানুষটা এত কাছ থেকে এমন হত্যালীলা কখনো দেখেননি। তাই প্রচণ্ড শকে তাঁর এই অবস্থা। রজনী তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল— 'মেসোমশাই, একটু জল খাবেন?'

—'হ্যাঁ, দাও।'

চিলেকুঠুরিতে রাখা কলসী থেকে একগ্লাস জল নিয়ে মেসোমশাইকে দিতে উনি এক চুমুকে জলটা শেষ করে ফেললেন। তারপরে রজনীর দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধু বললেন— 'ওরা কেন এমন করে বল তো?'

১৭ অগাস্ট, ১৯৪৬

পরের দিন সকালে ছাদে উঠতেই সবাই বুঝতে পারল অবস্থা কতটা ভয়ানক। বাড়ির সামনের রাস্তাটা একেবারে খাঁ খাঁ করছে। দূরের আকাশে কালো ধোঁওয়া এখনও উড়েই চলেছে। তবে সবচেয়ে বীভৎস হল তাদের বাড়ির কিছুদূরে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলোর অবস্থা। কাল রাতের অন্ধকারে যে ক্রুরতা স্পষ্ট দেখা যায়নি, এখন দিনের আলোয় তা অতিমাত্রায় প্রকট।

কারোর হাত-পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন, কারোর বা ধড়-মুন্ডু আলাদা। চেরা পেট থেকে বেরিয়ে এসেছে নাড়িভুঁড়ি। কারোর বা একটা পা উর্দ্ধমুখী হয়ে টানটান। রাস্তা ভিজিয়ে রক্ত গড়িয়ে গেছে। তারই কালো ছোপ রাস্তার ঢাল বেয়ে নেমে গেছে পাশের নর্দমায়। রাস্তার দুটো নেড়ি কুকুর শবের পেট থেকে বেরিয়ে আসা অন্ত্র চিবোচ্ছে মহাসুখে। চেটে নিচ্ছে শবদেহের অবশিষ্ট রক্ত আর দেহরস।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা শকুন উড়ে এসে বসলো মন্টুর চায়ের দোকানের চালায়। কুকুরদের ভয়ে তার একা নামতে সাহস হচ্ছে না বোধ হয়; তাই অপেক্ষা করছে দলবলের জন্যে।

দেখতে দেখতে মিনিট পাঁচ-সাতেকের মধ্যেই আকাশ থেকে নেমে এল আরও সাত-আটটা শকুন। এবারে তারা দলে ভারী হয়েছে। দেখতে দেখতে তারা ডানা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্তায় পড়ে থাকা শবদেহগুলোর ওপরে। তাদের দাপটে কুকুরদুটো ভয় পেয়ে পালাল। দূর থেকে শকুনদের দাপাদাপি দেখে তারা চলে গেল অন্য কোথাও; হয়তো বা অন্য কোনো শবের সন্ধানে।

কয়েক মিনিটে এসে জুটলো আরও দুটো শকুন। তারা নামতেই ঝগড়া বাঁধল আগের দলের সঙ্গে। এত্তো খাবার! এত অযাচিত খাবার! তবু খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি। শবের শ্রেষ্ঠ অংশটা কে খাবে তাই নিয়ে। সব দেখেশুনে রজনীর মনে হয়— তার মাতৃভূমিও যেন আজ ওই শবদেহগুলোর মতোই, যাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে কিছু মানুষরূপী শকুন। শকুনগুলো তবু ভালো। তারা শবের পুরোটাই খেয়ে সাফ করে দেয়; আর মানুষরূপী শকুনগুলো?... না, আর ভাবা যাচ্ছে না। সাময়িক হতাশায় ডুবে যায় রজনী।

এই দৃশ্য দেখে মাসিমা বলে উঠলেন— 'ইস মা গো, কী সাংঘাতিক!'

কানাই যেন আরও বেশি চুপচাপ। রজনী জানে— এইসব নারকীয় দৃশ্য কিশোর মনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে। তাই সে বলে— 'মাসিমা আপনি কানাইকে নিয়ে নীচে যান। আমার মনে হয় সেটাই ভালো হবে।'

এদিকে বেলা যত বাড়ছে, ততোই আরও জোরালো হচ্ছে 'আল্লাহ হু আকবর' আর 'বন্দে মাতরম' আওয়াজ। অথচ রাস্তায় কোনো মিলিটারি গাড়ি বা দমকলের চলাচলের আওয়াজ নেই। তার মানে পুলিশ আর মিলিটারির গাড়িও আর শহরের দাঙ্গা সামলাতে পারছে না।

দুপুরের দিকে একটা ফোন এল। ড্যানীবাবুর ফোন। সামান্য কুশল বিনিময়ের পরে উনি রজনীকে জানালেন— 'জানো, আজ মেটেবুরুজের কেশোরাম কটন মিলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদের ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট তাতে মদত জুগিয়েছেন।'

—'তাই নাকি?'

—'জানো রজনী, শুধু তাইই নয়, ওই মিল বস্তির সাতশো শ্রমিককেও খুন করা হয়েছে, তাদের বস্তিতেও আগুন লাগানো হয়েছে। ওরা বেশির ভাগই উড়িষ্যাবাসী।'

—'সাতশো লোক? তা পুলিশ?...'

তার কথা কেটে দিয়ে উত্তেজিত ড্যানীবাবু বলেন— 'পুলিশের বাপ-ঠাকুরদার সাধ্য নেই কিছু করার, তবে শুনেছি মিলিটারি নাকি যাচ্ছে সেখানে। আর...।'

—'আর কী স্যার? বলুন।'

—'শুনলাম গোপাল পাঁঠা আর যুগল ঘোষও নাকি যাচ্ছে।'

—'তার মানে...।'

—'হ্যাঁ, যা ভেবেছ, ঠিক তাইই। অবস্থা আরও গুরুতর হবে। গান্ধীবাদী যুগলও এসব দেখে খেপে গেছে। সেও তার দলের ছেলেদের অ্যাকশন নিতে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে। তাদের চাগিয়ে তোলার জন্যে রিওয়ার্ডও ঘোষণা করেছে। তবে এসব কথা রেডিয়োতে বলবে না নিশ্চয়ই। তাতে উত্তেজনা আরও ছড়াতে পারে।'

—'তা স্যার আপনি এইসব জানলেন কোথা থেকে?'

—'তুমি কি ভুলে গেলে রজনী যে সোসাইটির ওপরমহলের মানুষদের সঙ্গে আমার একটু আধটু আলাপ পরিচয় আছে?... যাইহোক, তোমরা সবাই সাবধানে থেকো আর আমি কাল আবার ফোন করব। আচ্ছা, এখন রাখছি।'

—'আপনিও সাবধানে থাকবেন স্যার।' কিন্তু ততক্ষণে ফোনটা কেটে দিয়েছেন ড্যানীবাবু।

ফোনটা রাখতেই মেসোমশাই কিঞ্চিত গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন— 'ফোনটা কার? স্যার, স্যার করছিলে যে?'

—'আজ্ঞে মেসোমশাই মিউজিয়মের দীনুবাবু ফোন করেছিলেন। আমরা ঠিকঠাক আছে কি না জিজ্ঞেস করলেন।

—'আর কিছু বললেন না? 'সাতশো' না কি যেন একটা কথা বললে যে তুমি।' মেসোমশাইয়ের স্বর সন্দিগ্ধ।

কানাই, মাসিমা আর কেষ্টদা কাছেই রয়েছে। তাই মেসোমশাইয়ের পাশে বসে একটু নীচু গলায় রজনী বলে— 'হ্যাঁ, কেশোরাম কটন মিলে আর সেখানকার বস্তিতে আগুন ধরানো হয়েছে। প্রায় সাতশো মানুষকে খুন করা হয়েছে।'

গম্ভীর হয়ে যান মেসোমশাই। ভ্রু দুটো কুঁচকে যায় তাঁর। নিজের মাথার পাকা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন— 'হুম, বুঝলাম।... শোনো, দুপুরবেলা তুমি আর কেষ্ট একটু ঘুমিয়ে নিও। ওই সময়টা আমি ছাদে থাকব। আর কেষ্ট, শোন, কালকের মতো আজও উনুনে জল চাপিয়ে রাখিস আর পারলে কিছু আধলা ইঁটও তুলে রাখিস। উঠোনের কোণে অনেক ইঁটের টুকরো রাখা আছে।'

মেসোমশাই থামলেন বটে, কিন্তু তাঁর বলা কথা থেকেই রজনী বুঝতে পারে যে দাঙ্গা আরও প্রবল হতে পারে। আরও প্রবল হতে পারে জনজীবনে তার অভিঘাত।

তাই সে বলে— 'দুপুরে আমি চিলেকোঠায় ঘুমোবো মেসোমশাই। আসলে সে মেসোমশাইকে ছাদে একলা ছাড়তে চায় না।

—'ঠিক আছে তাইই কর।'

সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে রজনী নিজের ঘরে একবার উঁকি মেরে দেখল। জানলা সব বন্ধ করে ক্লান্ত কানাই বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে তাই কাছে গিয়ে সাবধানে বইটা নিয়ে সরিয়ে রাখতে গিয়ে দেখে, কানাই যে বইটা পড়ছে সেটা হল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'আনন্দমঠ'।

আই এন এ ট্রায়াল, গোপালের গ্রেনেড আর নড়ে বসলেন ভাইসরয়

অনেকগুলো কুকুরের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল রজনীর। বুঝতেই পারল যে শকুনদের উচ্ছিষ্টে ভাগ বসিয়েছে নেড়ি কুকুরদের দল। ঘড়িতে তখন বাজে সাতটা। ছাদে বেরিয়ে দেখে একপাশে বেশকিছু আধলা ইঁট জড়ো করে রেখে কেষ্টদা তোলা উনুনটা সাজাচ্ছে। রজনীকে দেখে হাতের কাজ থামিয়ে সে বললে— 'দাদাবাবু, নীচে চলো, চা-মুড়ি খাবে।'

—'কানাই কোথায় কেষ্টদা?'

—'সে ছাতে আসতে চেয়েচিল। কত্তাবাবু আটকেচে। সে এখন রেডিয়োর সামনে বসে আচে দেকে এলুম।'

—'আচ্ছা চল, নীচে যাই।'

সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে রজনী দেখে আজ আরও লালচে হয়ে গেছে আকাশ। মেঘেও লেগেছে সেই লালচে রং। দিগন্তে তাকালে মনে হয়— আজ যেন দূরের কোনো জঙ্গলে দাবানল লেগেছে। ধোঁওয়ার সাথে মাঝে মাঝে লকলকিয়ে উঠছে আগুনের ফুলকি। এই দাবানল যে কবে নিভবে? কে নেভাবে এই দাবানল? একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে রজনীর বুক থেকে। তারপরে কেষ্টদার সঙ্গে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসে সে।

চা-মুড়ি খেতে খেতে রেডিয়োর খবর শুনছেন মেসোমশাই। কানাই আর মাসিমাও পাশে দুটো চেয়ারে বসে। রজনী গিয়ে পৌঁছতেই কানাই উঠে গিয়ে পাশের একটা টুলে বসে। রজনী সেই চেয়ারে গিয়ে বসতেই কেষ্টদা মুড়ির বাটিটা এগিয়ে দেয়। সামনের সেন্টার টেবিলে চা টা ঢাকা দিয়ে রাখে।

একগাল মুড়ি গালে ফেলতেই মেসোমশাই বলেন— 'রেডিয়ো সেন্সর করা হয়েছে। অবশ্য এইসময়ে সেন্সর করাই উচিত। নইলে দাঙ্গা আরও ছড়াবে। কেশোরাম মিলের কথা তো কিছু বললই না। খালি দিল্লিতে শাহনওয়াজ খান, প্রেম সাহগল আর গুরুবক্স সিংয়ের বিচারের কথাই কপচে যাচ্ছে মিনিট কুড়ি ধরে। আরে বাবা, সেখানে যখন এই বিচার নিয়ে গণ-বিক্ষোভ হচ্ছে, তখন ওদের ট্রায়াল কি ক-দিন পিছিয়ে দেওয়া যেত না? ওরা কি ব্রিটিশদের এত বড়ো শত্রু?'

কানাই এতক্ষণ চুপ ছিল। এবার হঠাৎ বলে উঠল— 'ওরা তিনজন কি গুন্ডা?'

কানাইয়ের এই বালকসুলভ প্রশ্নে রজনী বিব্রত হলেও মেসোমশাই তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে সামাল দিলেন পরিস্থিতি।

—'না কানুভাই, ওনারা কেউই গুন্ডা নন। ওনারা হলেন আই এন এ মানে নেতাজির "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি"-র তিনজন বড়ো অফিসার। আই এন এ হল নেতাজির সৈন্যদল, বুঝলে? ওঁদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার দেশদ্রোহীতা, গণহত্যা এইসব নানান অভিযোগ এনে ওঁদের বিচার করছে বেশ কিছুদিন ধরে। সেই খবরই বারবার বলছে রেডিয়োতে।'

—'ও, তাহলে তো ওরা মিলিটারির লোক। মিলিটারির লোক তো যুদ্ধ করবেই। আর ওরা তো আমাদের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করছিল।'

—‘সেটা তুমি, আমি আর আমাদের দেশের লোক বুঝলে কী হবে; ব্রিটিশরা তো তা মানতেই চাইছে না। তাদের চোখে ওঁনারা দেশের শত্রু।’

কানাই একটু চুপ করে থেকে বলল— ‘নেতাজি যে কোথায় গেলেন কে জানে। এখন দেশটা স্বাধীন করবে কে?’

সবাই বুঝতে পারেন কানাইয়ের অবোধ বালক মনের এই নির্ভেজাল খেদোক্তি। এই খেদোক্তি যে তাঁদেরও অন্তরের কথা।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে মেসোমশাই আবার বললেন— ‘সুবিমলকেও ফোন করেছিলাম। ওদের ওদিকেও ছুটকো-ছাটকা দাঙ্গা হচ্ছে, তবে তেমন ভয়ানক কিছু নয়। নাও, চা খাওয়া হয়ে গেলে সবাই একবার ছাদে চল।’

মাসিমা বললেন— ‘কী দরকার বাপু ওইসব বীভৎস জিনিস দেখার। আমি যাচ্ছি না। তোমরা গেলে যাও।’

তাই মাসিমা বাদে সবাই এল ছাদে। রাস্তা এখনও শুনশান। চার-পাঁচটা কুকুর শুধু টানা হেঁচড়া করে লাশগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে রাস্তাময়। এরই মধ্যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ধুলো-মারা বৃষ্টি। রজনী চাইছে এখন বৃষ্টি নামুক জোরে। অঝোর বৃষ্টিতে যদি ওই আগুনের আগ্রাসন কমে। কিন্তু সে চাইলেই তো আর তা হবার নয়। বৃষ্টির ছোঁওয়া থেকে বাঁচাতে কেষ্টদা উনুন আর জলের হাঁড়ি সরিয়ে রাখল ছাদেরই একপাশে একটুকরো চালার নীচে। নইলে আগুন নিভে যেতে পারে। এরপরে সবাই নেমে এল নীচে।

রাতের খাওয়া সেরে রজনী আর কেষ্টদা আবার ছাদে আসে। বাকি সবাই নীচে শোওয়ার ঘরে। এই অঞ্চলটা মোটামুটি শান্ত। তাই গতকালের মতো কেষ্টদা চিলেকোঠার ঘরে শোওয়ার তোড়জোড় করছে। রজনী গিয়ে বসেছে পাঁচিলের ধারে তার নির্দিষ্ট চেয়ারে।

হঠাৎই দূর থেকে শোনা যায় গাড়ির আওয়াজ। সেই আওয়াজটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে দলবদ্ধ মানুষের স্লোগান। খানিক কাছে আসতেই বোঝা যায় যে ওটা একটা ট্রাক। তাতে খোলা তরোয়াল হাতে একদল শিখ। রাতের থমমারা স্তব্ধতাকে খানখান করে তারা বলে উঠছে— ‘বোলে সো নিহাল, সৎ শ্রী আকাল।’

আওয়াজ শুনে কেষ্টদাও ছুটে এসেছে পাঁচিলের ধারে। কুকুরগুলোও যে যেদিকে পারে ছুট লাগিয়েছে। গাড়িটা তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় আর একবার শিখদের যুদ্ধ-নিনাদে কেঁপে ওঠে রাস্তা। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়িটা চলে যাওয়ার পরে রজনী আর কেষ্টদা দেখল গাড়ির চাকায় পিষে লাশগুলোর অবশিষ্ট অংশের বেশ কিছুটা চেপটে মিশে গেছে রাস্তায়।

যাইহোক, সেই রাতে আর বিশেষ কিছুই ঘটল না। শুধু মহাভোজে মত্ত কুকুরগুলোর চিৎকার বজায় রইল ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত।

১৮ই অগস্ট, রবিবার

পরের দিন সকালে জলখাবার খেয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিল রজনী। দুপুরের খাওয়ার পরে মেসোমশাই বললেন— 'দাঙ্গা আরও ভয়ানক হবে, বুঝলে রজনী। দেখলে তো কাল রাত থেকেই শিখরাও নেমে পড়েছে মাঠে। কলকাতায় তো ওদের সংখ্যা কম নয়। তা ছাড়া গোপালের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ ভালোই আছে।'

রজনী কী আর বলবে। দাঙ্গার ব্যাপকতা তারা সবাই বেশ ভালোই টের পাচ্ছে। বাড়ির সবার মধ্যেই একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে। সবাই কথা বলছে কম, খাওয়া-দাওয়া করছে কম। রান্নাবান্না আর দৈনিক কাজকর্মেও একটা শিথিলতা। একটা অজানা আতঙ্ক যেন ছড়িয়ে আছে সারা বাড়িতে। এই বুঝি সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে যায়। আর এদিকে ভ্যাপসা গরমে রাস্তার লাশগুলো পচতে শুরু করেছে। হাওয়ায় ভেসে সেই লাশপচা গন্ধ পৌঁছে যাচ্ছে বাড়িতেও। কবে যে মুদ্দফরাসরা এসে তুলে নিয়ে যাবে ওই থ্যাঁতলানো লাশের টুকরোগুলো কে জানে।

কানাই একবার ওই দুর্বিসহ গন্ধের কথা তুলতেই কেষ্টদা বলেছিল— 'দাঙ্গা না থামা পর্যন্ত এই গন্ধ তোমায় সহ্যি কত্তেই হবে। তবে কী জানো, যা সওয়াবে তাই সয়। সন্ধেবেলা দেখবে যে ওই লাশপচা গন্ধ আর তোমার নাকে লাগচে না। আর দাঙ্গা যদি চলতেই থাকে তবে দেখবে যে এই দাঙ্গার ভয়ও তোমার মন থেকে কমে গেছে।'

কেষ্টদার কথা শুনে মাসিমা ফুঁসে উঠলেন— 'যত্তসব অলুক্ষণে কথা। বলি তুই থামবি?' কেষ্টদা চুপ মেরে যায়। কিন্তু তার কথাগুলো যে সত্যি তা বোঝে রজনী। দীর্ঘদিন সন্ত্রাসের আবহাওয়ায় থাকতে থাকতে সন্ত্রাসও একসময় গা-সওয়া হয়ে যায়।

সন্ধে হতেই ছাদে উঠে দেখা গেল কেষ্টদার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি। লাশপচা গন্ধ কেমন যেন সয়ে গেছে নাকে আর দাঙ্গার রং হয়েছে আরও লাল।

ইতিমধ্যেই দুটো ট্রাক 'বন্দে মাতরম' আওয়াজ তুলে আর একটা শিখবোঝাই ট্রাক 'বোলে সো নিহাল' বলতে বলতে ছুটে গেছে তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। হ্যারিসন রোডের দিক থেকেও মাঝে মাঝে ভেসে আসছে 'আল্লা হু আকবর' ধ্বনি। ভেসে আসছে বোমা আর গুলির শব্দও।

এরই মাঝে নীচে থেকে মেসোমশাইয়ের হাঁক— 'রজনী নীচে এসো। ড্যানীবাবুর ফোন।'

তাড়াতাড়ি ছাদ থেকে নেমে রজনী গিয়ে ফোন ধরে। —'হ্যালো স্যার, আমি রজনী বলছি। ভালো আছেন তো?'

—'তা আছি, তবে নীচের রাস্তায় গোটা তিনেক লাশ পড়ে আছে।'

—'আমাদেরও একই অবস্থা স্যার। ষোলো তারিখ থেকে খান ছয়েক পড়ে আছে।'

—'যাইহোক, শোনো, গোপালের দল ও শিখেরা মিলে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শহরময়। বিশেষ করে জঙ্গি মুসলমান এলাকাগুলোতে। গোপাল আর যুগল মিলে ঘুরে ঘুরে তদারকি করছে সব। ওদের দলের কাছে ফায়ার-আর্মস আছে অনেক। তাই দিয়েই অ্যাকশন চালাচ্ছে।'

—'আমরাও হ্যারিসন রোডের দিক থেকে গুলি বোমার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

—'শোনো রজনী, কলকাতার এই দাঙ্গার কথাটা ভাইসরয়ের কানে ঢুকেছে অবশেষে। এখন দেখার, ওই মহামহিম ব্যক্তিটি আই এন এর ট্রায়ালের দিক থেকে মন সরিয়ে এইদিকে মন দেন কি না। যেহেতু কথাটা ওনার কানে গেছে, তাই এবার উনি ভাববেন, বিচার বিবেচনা করবেন, আমাদের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন আর তারপরে হয়তো নড়েচড়ে বসবেন। আসলে এই দাঙ্গায় তো ইংরেজদের কোনো ইনভলভমেন্ট নেই। তাই ওনার নড়েচড়ে বসতে, ফরমান জারি করতে...বুঝেছ তো?'

—'হ্যাঁ স্যার ঠিকই বলেছেন। তা আপনার খাওয়া-দাওয়া...।'

—'ঘরে যথেষ্ট খাবার-দাবার আছে। তা তোমাদের?'

—'আমাদেরও আরও দিন চারেকের মতো খাবার মজুত আছে। আশা করি তার মধ্যে দাঙ্গা থেমে যাবে।'

—'ভালো, আশা করা ভালো। আচ্ছা, তাহলে তোমরা সাবধানে থেকো। গুড নাইট।'

—'আপনিও সাবধানে থাকবেন স্যার। গুড নাইট।'

ফোন রাখতেই মেসোমশাইয়ের প্রশ্ন— 'কী খবর দিলেন ড্যানীবাবু?'

রজনী গোপাল আর যুগলের খবরটা তাঁকে জানিয়ে বলল— 'তারপরে ড্যানীবাবু বললেন যে, দাঙ্গার কথা ভাইসরয়ের কানে গেছে কিন্তু আমাদের নেতাদের সঙ্গে কথা না বলে উনি কিছু অর্ডার করতে পারবেন না।'

—'হুঁ, দাঙ্গায় প্রাণ যায় আর নেতাদের সঙ্গে কথা বলে তবেই ভাইসরয় দেবেন রায়।' ব্যঙ্গের সুর ঝরে পড়ে মেসোমশাইয়ের গলায়।

—'তবে একটা জিনিস খেয়াল করেছেন কি মেসোমশাই?'

—'কী?'

—'আজকে নিয়ে গত দু-দিনে কিন্তু কোনো অ্যাম্বুল্যান্স বা দমকলের যাওয়ার আওয়াজ শুনেছেন কি?'

মাথা নেড়ে মেসোমশাই বললেন— 'না শুনিনি। তার মানে বুঝতেই পারছ— সিচুয়েশন ইজ ভেরি গ্রেভ। এখন সব দেখেশুনে আমার কী মনে হচ্ছে জানো?'

—'কী?'

—'দেশের সর্বত্রই না ছড়িয়ে যায় এই দাঙ্গা।'

তবে সেদিন গভীর রাতে একটা ঘটনা ঘটেছিল। রাত তখন প্রায় দুটো। রজনীর একটু ঝিমুনির মতো এসেছিল। একঘেয়ে রাত হলে যা হয়। হঠাৎই তার তন্দ্রা ভেঙে যায়। হ্যারিসন রোডের দিক থেকে গাড়ির শব্দ আর মানুষের চিৎকার একসঙ্গে ভেসে আসছে। একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে 'আল্লা হু আকবর' আর 'বন্দে মাতরম' হুংকার। তারপরেই ডানদিকে দৃশ্যমান হল দুটো ট্রাক। পেছনেরটা তাড়া করে আসছে সামনেরটাকে। সঙ্গে সঙ্গে কেষ্টদাকে ডেকে তুলল রজনী। কেষ্টদা ছুটে এসে দেখল প্রথম ট্রাকটা তাদের বাড়ি থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে। তাড়াতাড়ি সে ছুটে গেল উনুনের কাছে। বড়ো মগের একমগ ফুটন্ত জল তুলে অপেক্ষা করতে লাগলো ট্রাকটার জন্যে।

আর ঠিক সেইসময়েই পেছনে ধেয়ে আসা ট্রাকটা থেকে উড়ে এল একটা ছোটো গোলমতো জিনিস। সেটা সামনের ট্রাকে গিয়ে পড়তেই বিকট কানফাটানো আওয়াজ। বিরাট একটা আগুনের গোলা লাফিয়ে উঠল আকাশে আর ট্রাকটা মাটি থেকে প্রায় দু-ফুট লাফিয়ে উঠল। ট্রাকের মানুষগুলো শূন্যে উড়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল রাস্তায়। আগুন ধরে গেল ট্রাকে; এমনকী সেই অভিঘাতে ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল পেছনের ট্রাকটার উইন্ডস্ক্রিনও। সেটা দাঁড়িয়ে গেছে ততক্ষণে। প্রথম ট্রাকের মানুষগুলোর ছিন্নভিন্ন শরীর দেখে হুংকার দিয়ে উঠল পেছনের ট্রাকের লোকেরা। মত্ত উল্লাসে তারা নেমে পড়ল রাস্তায়। দাউদাউ আগুনের শিখায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাদের পৈশাচিক আনন্দ।

আধমিনিট পরেই দূরে দেখা গেল আরও একটা গাড়ির আলো। একটা জিপ। সেটা পেছনের ট্রাকের পাশে একটুখানি দাঁড়িয়ে কিছু হয়তো বলল তাদের আর তারপরে দুটো ট্রাকের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা লোকগুলোকে মাড়িয়েই ছুটে এল তাদের বাড়ির দিকে। এক লহমায় রজনী চিনতে পারল জিপের ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটাকে। সে আর কেউ নয়, গোপাল পাঁঠা স্বয়ং। কেষ্টদা কিছু না বুঝেই গরম জল ছুঁড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু রজনী তাকে আটকে দিল। আর একটু হলেই অনর্থ ঘটে যাচ্ছিল আর কী।

সাঁ করে তাদের বাড়ি পেরিয়ে বাঁ-দিকে চলে গেল জিপটা। বিমূঢ় কেষ্টদা তার হাতের মগ নামিয়ে রাখল ছাদের পাঁচিলে। তখনও মগের জল থেকে ধোঁওয়া উড়ছে; কিন্তু তার থেকে লক্ষ গুণ বেশি ধোঁওয়া উড়ছে দূরের ওই জ্বলন্ত ট্রাক থেকে।

একটা গভীর শ্বাস ফেলে রজনী। একটু থিতু হয়ে কেষ্টদা জিজ্ঞেস করে— 'কী বোমা গো ওটা? কত্তো ছোটো, কিন্তু কী তেজ, মা গো!'

—'ওটা হাতবোমা নয় কেষ্টদা। ওটা গ্রেনেড।' বলে পেছনে ফিরতেই রজনী দেখতে পেল তার থেকে দু-হাত পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে কানাই। কোমর সমান উঁচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে সে দেখছে জ্বলন্ত ট্রাকটাকে। হয়তো সে দেখেছে পুরো ঘটনাটাই। যে বীভৎসতা, যে ক্রুরতা সে কানাইকে দেখাতে চায়নি, এখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটাই দেখল কানাই। এখানে রজনী একেবারেই নিরুপায়।

গভীর রাতে ওই বিকট আওয়াজে নিশ্চয়ই ঘুম ভেঙে গেছে সবার। তাই মেসোমশাই আর মাসিমাও উঠে এসেছেন ছাদে। সেইসঙ্গে আশেপাশের বাড়ির ছাদেও লোক জমতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় ট্রাকটা এবার তার আরোহীদের পিঠে তুলে নিয়ে জ্বলন্ত ট্রাকটার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল জিপটার চলে যাওয়ার পথ ধরেই।

আশেপাশের বাড়ির ছাদ থেকে বালতি করে জল ঢেলে ট্রাকের আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে অনেকেই। কিন্তু সেই আগুন নেভানো কী অতই সহজ! ওটা যে দাঙ্গার আগুন।

১৯ অগাস্ট

অবস্থা একই রকম ভয়াবহ। দাঙ্গার উন্মত্ততা ক্রমে বেড়েই চলেছে। অসহায় সাধারণ মানুষ ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁপছে আতঙ্কে । রজনী ভাবে— তারা তো না হয় পাকা

বাড়ির চারদেওয়ালে নিরাপদ; কিন্তু বস্তির গরিব মানুষগুলো? তারা তো সব দলেরই দাঙ্গাবাজদের কাছে সফট-টার্গেট। আকাশজুড়ে ওই যে কালো ধোঁওয়া উড়ছে, ওই ধোঁওয়ায় হয়তো কত জ্বলন্ত বস্তির ধোঁওয়াও মিশে আছে। কলকাতা শহরে তো বস্তির অভাব নেই। এই গণহত্যার উৎসবের কাছে তো জাপানি-বোমার তাণ্ডবও শিশু।

না, আর তার ভালো লাগছে না এসব। সে আবারও চাইছে আকাশ থেকে নামুক প্রবল বৃষ্টি, ধুয়ে যাক রাস্তা থেকে শবদেহগুলোর রক্ত আর দেহরস, নিভে যাক শহরজোড়া দাঙ্গার আগ্রাসী আগুনের আকাশছোঁয়া শিখা। মাথার ওপরে আকাশের দিকে তাকায় সে।

কিন্তু প্রকৃতি কি আর মানুষের কথা শোনে? কবেই বা শুনেছে সে পৃথিবীর মুমূর্ষু জীবজগতের আর্তনাদ? সে চলে আপন মর্জিতে, আপন ছন্দে।

তবে সেদিন বিকেল নাগাদ ড্যানীবাবুর ফোন যেন কিছুটা স্বস্তি দিল। সেইসঙ্গে রেডিয়োর খবরও বয়ে আনল সুখবরের আভাষ।

কলকাতার সার্বিক পরিস্থিতি বিচার করে ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল নাকি কলকাতায় গোরা আর গোর্খা সেনা নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু কবে নামবে তারা, সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। দাঙ্গা তো এখন সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছেছে। কলকাতা থেকে আশেপাশের জেলাতেও ছড়িয়ে পড়েছে তা।

এদিকে ঘরের ভাঁড়ারও ক্রমে কমতে শুরু করেছে। দাঙ্গা আরও কিছুদিন চললে ঘরের ভাঁড়ারও শেষ হয়ে যাবে। হয়তো একবেলা খেয়ে কিংবা হয়তো বা না খেয়েই থাকতে হবে সাধারণ গৃহী মানুষদের।

তবে সুদিনের মতো দুর্দিনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সব কিছুরই যেমন শুরু থাকে, তেমনই শেষও থাকে। আর তেমনভাবেই এসে পড়ল একুশে অগস্ট।

২১ আর ২২ অগাস্ট

কলকাতায় নামল পাঁচ ব্যাটেলিয়ন ব্রিটিশ সেনা আর সেইসঙ্গে চার ব্যাটেলিয়ন ভারতীয় ও গোর্খা সেনা। কলকাতার রাস্তায় টহল দিচ্ছে তারা। কোথাও নামমাত্র দাঙ্গার আভাষ পেলেই ছুটে যাচ্ছে তারা সেখানে। এতদিনে লালবাজারও পেয়েছে রাজনৈতিক চাপ থেকে মুক্তি। তাই পুলিশ আর মিলিটারির সাঁড়াশি চাপে ক্রমশ কমছে দাঙ্গার তাণ্ডব। দিনরাত টহল দিচ্ছে সেনা। কাউকেই রেয়াত করছে না তারা। সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েইছে, কিন্তু আর যেন কলকাতা শ্মশানভূমিতে পরিণত না হয়, সেটাই আটকাচ্ছে তারা বেয়নেট উঁচিয়ে।

অবশেষে পরেরদিন সেনাদের দাপটে থামল দাঙ্গা। তবে একেবারেই থামল কি? এখনও যে দু-সম্প্রদায়ের মানুষের মনে রয়ে গেছে একের প্রতি অন্যের ঘৃণা আর বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষের টুকরো টাকরা ছবিও দেখা যাচ্ছে ইতিউতি। এটা আর ক-দিন চলবে কে জানে? নাকি দুই সম্প্রদায়ের অন্তরের গভীরে থেকে যাবে চিরস্থায়ী হয়ে?

জ্বলন্ত দাঙ্গা তো থেমেছে তবু বাইশ তারিখ সন্ধের পরে কার্ফু উঠল। এবারে শুরু হবে শহরটাকে সাফসুতরো করার পালা। সন্ধেবেলা দেখা গেল রাস্তায় ছুটছে অ্যাম্বুল্যান্স, পুলিশের ভ্যান আর মিলিটারির ট্রাক। তাই দেখে সাহস পেয়ে কিছু মানুষ রাস্তায় বেরিয়েছে কোনো মুদিখানা দোকান খুলেছে কিনা দেখতে। ঘরে যে খাবারের বড়োই অভাব। তাই পেটের দায়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে তারা পাশ কাটিয়ে বা টপকে যাচ্ছে পচা লাশের টুকরো টাকরা অংশ। এসব দেখে রজনী বুঝতে পারল যে হয়তো আর দু-একদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে কলকাতা। আপাতত তাদের সবার শারীরিক আর মানসিক বিশ্রাম দুটোরই বড়ো প্রয়োজন।

তাই ছাদে রাখা উনুন আর হাঁড়ি আবার ফিরে গেল রান্নাঘরে আর আধলা ইঁটগুলোকেও নামিয়ে রাখা হল উঠোনের কোণে।

২৩ অগাস্ট, ১৯৪৬

আমিনদাকে অ্যাটাক আর গোপালদার সাহায্য

তেইশ তারিখ সকালে চা-বিস্কুট খেয়ে ছাদে উঠে রজনী বুঝতে পারল যে অবস্থা এখন অনেক বেশি স্বাভাবিক যদিও মন্টুদা তার চায়ের দোকান খোলেনি। রাস্তাও মনে হয় পরিষ্কার করা হয়েছে রাতের অন্ধকারে বা ভোরের দিকে। তাই সে কানাইকে ডেকে বলল— ‘চ, একটু জগিং করে আসি। শরীরটাতে মনে হচ্ছে যেন জং পড়ে গেছে তারপরে না হয় আজ ছাদে ভালো করে ডামিতে ল্যাসো ছোঁড়া প্র্যাকটিশ করাব।’ ‘ডামি’ আর কিছুই নয়— ভারী কাঠের ওপরে খাড়াভাবে আটকানো ছ-ফুট লম্বা একটা মোটা কাঠের থাম যার গায়ের চারপাশে বিভিন্ন উচ্চতায় ফুটখানেক করে কাঠের লাঠির টুকরো আটকানো থাকে। এতে হাতের আর পায়ের বিভিন্ন অংশ দিয়ে আঘাত করে করে হাত-পা লোহার মতো শক্ত করা হয়। থামের গায়ে লাগানো ছোটো দুটো লাঠির মাঝে বিভিন্ন জায়গায় চক দিয়ে রজনী এক একটা ঢ্যাঁড়া দিয়ে দেয় আর কানাইকে সেই সেই উচ্চতায় ছুঁড়তে হয় একমাথায় ধাতুর বল লাগানো ল্যাসো। রজনী জানে যে এখন থেকে এটা প্র্যাকটিশ করালে কয়েক বছরেই কানাই এই ল্যাসো ছুঁড়তে রীতিমতো দক্ষ হয়ে উঠবে।

তা কানাই তো এককথায় রাজি। টানা ক-টা দিন ঘরবন্দি থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। শুধু মাসিমা গাঁইগুঁই করে বললেন— ‘আজই কি দরকার বাপু? দু-একদিন পরে বেরোলে হত না?’

—‘দোকানপাট খুলেছে মাসিমা। এখন সবকিছু অনেকটা স্বাভাবিক। এদিকে ঘরেও তো খাবারের টান। আমরা বরং দেখি কিছু পাই কি না।’

এই জেদি ছেলেদুটোকে বেশ বুঝে গেছেন মাসিমা। তাই আর কথা না বাড়িয়ে বাজারের ব্যাগ তুলে দিলেন রজনীর হাতে।

এদিকে বেরোনোর আগে দোতলার ঘরে কানাই বলেছিল— ‘আমি কি স্যার তাহলে আমার বুমেরাংটা নেব?’ রজনী বলেছিল— ‘নে। সঙ্গে রাখ। কে জানে বাবা, কখন

কোথায় কী ঘটে। তাই সাবধানে থাকাই ভালো।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে জগিং করতে করতে দু-জনে এসে পড়ল হ্যারিসন রোডের মোড়ে। এই রাস্তাতেই দাঙ্গার সময়ে বেশি অঘটন ঘটেছিল। কার্ফু উঠে যেতে তাই লোক চলাচল কিছুটা হলেও শুরু হয়েছে। টিনের বাক্স আর পুঁটুলি মাথায়, বগলে চাটাই আর ছাতা নিয়ে গরিবগুর্বো মানুষেরা হাওড়ামুখী। ট্রেন চলা শুরু হলেও বাস বা ট্রাম চলা এখনও শুরু হয়নি।

রজনী আর কানাই ফুটপাথ ধরে দৌড়ে যাচ্ছে। হঠাৎই কানে এল গাড়ির আওয়াজ। তাহলে কি বাস চলা শুরু হল? কী গাড়ি আসছে তা দেখার জন্যে একটু দাঁড়াল তারা। ওমা, এ যে ট্রাক! চার-চারটে ট্রাক আসছে। তাদের সামনে দিয়েই হাওড়ামুখী সেগুলো। কিন্তু একী? প্রতিটা ট্রাকে উপচে পড়ছে দাঙ্গায় নিহত মানুষের লাশ। বোধ হয় নিয়ে যাচ্ছে গণ-সৎকারের জন্যে। সেই ট্রাকগুলো থেকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্রী শবপচা গন্ধ আর তার থেকে টপটপিয়ে রাস্তায় পড়ছে তাদের মাথার ঘিলু আর রক্তরস। নারকীয় দৃশ্য।

একের পর এক ট্রাকগুলো চলে গেল। রজনী লক্ষ্য করে দেখল যে এই দৃশ্য দেখেও কানাই অবাক না হয়ে কোমরে দু-হাত রেখে শুধু বিরক্তিতে একটু ভ্রু কুঁচকে রইল খানিকক্ষণ আর তারপরে বলল— 'ধ্যুস, কেন যে রায়ট হয়?'

ট্রাকগুলো চলে যেতেই আবার তারা জগিং শুরু করল। কলেজ স্ট্রিট ক্রশিং তখনও কিছুটা দূরে। ওইখান দিয়ে ঢুকে কলেজ স্ট্রিট বাজারে ঢুঁ-মারতে হবে, যদি কিছু পাওয়া যায়।

কিন্তু হঠাৎই 'আল্লা হু আকবর' চিৎকার। উলটোদিকের ফুটপাথের একটা গলি থেকে রড, লাঠি, তরোয়াল আর ছোরা নিয়ে পাঁচজন লোক তাড়া করেছে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে। দেখলেই বোঝা যায় যে ভদ্রলোক নিরীহ গৃহস্থ মানুষ।

চকিতে বিদ্যুৎ খেলে যায় রজনীর শরীরে। সে দৌড়োয় সেদিকে। কানাইয়ও বুমেরাং বাগিয়ে পিছু নেয় স্যারের।

ভদ্রলোক তাড়া খেয়ে দৌড়তে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যান মাটিতে। আর ঠিক তার আগের মুহূর্তেই একজনের হাতের ছোরায় ফালা হয়ে গেছে তাঁর পাঞ্জাবি। ভদ্রলোক পড়ে যেতেই এক তরোয়ালধারী দু-হাতে অস্ত্রটা তুলে কোপ মারতে যাবে, এমনসময় রজনীর শরীরটা যেন উড়ে যায় হাওয়ায়। তার কিকটা সজোরে গিয়ে লাগে লোকটার চোয়ালে। কাটা কলাগাছের মতো সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। ধাতব আওয়াজ তুলে তার তরোয়ালটা ছিটকে পড়ে রাস্তায়। দ্বিতীয়জন রড তুলতে যেতেই রজনীর বাঁ-পায়ের ব্যাকহিল গিয়ে লাগে তার পাঁজরে। দু-হাতে পাঁজর চেপে ধরে মাটিতে পড়ে যায় লোকটা। একহাতে কানাইকে নিজের পেছনে ঠেলে রজনী তাকে বলে— 'কানাই, আমার পেছনে থাক।' তবে কানাইও কম যায় না। পেছোতে পেছোতেই সে ছুঁড়ে দিয়েছে তার বুমেরাং। হাওয়ায় পাক খেতে খেতে গিয়ে সেটা সপাটে আঘাত করে আরেকজন রডধারীর মুখে। হাতের রড ফেলে দিয়ে লোকটা মুখ ধরে বসে পড়ে মাটিতে। বাকি দু-জন তখন পালাতে উদ্যত। কিন্তু কানাই ততক্ষণে দৌড়ে গিয়ে তুলে নিয়েছে তার বুমেরাং আর সেটা ছুঁড়েও দিয়েছে পলায়মান দু-জনের মধ্যে একজনের মাথা লক্ষ্য করে। নির্ভুল নিশানা। ঠিকানা লেখা বুমেরাং উড়ে গিয়ে আঘাত করে লোকটার মাথার পেছনে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় সে। সঙ্গীদের এই অবস্থা দেখে ছোরা হাতে লোকটা আর পেছনে না

তাকিয়ে সোজা দৌড় লাগায় উর্ধশ্বাসে। এদিকে মাটিতে পড়ে যাওয়া তরোয়ালধারী আর তার দু-স্যাঙাত উঠে বসতে যেতেই রজনী আর কানাইয়ের এক একটা কিক আবার সজোরে আছড়ে পড়ে তাদের চোয়ালে। এবার মাটিতেই সটান লুটিয়ে পড়ে তারা।

মাত্র চার-পাঁচ মিনিটেই ঘটে যায় পুরো ঘটানাটা। দাঙ্গাবাজদের নিকেশ করে শার্টটা ঠিক করতে করতে রজনী দেখে কানাই দৌড়েছে তার বুমেরাংটা আর বাজারের ব্যাগটা কুড়িয়ে আনতে। নিশ্চিন্ত রজনী এবার চোখ ফেরায়। আহত প্রৌঢ় উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় সেদিকে। দেখতে হবে ভদ্রলোকের ইনজুরি কতটা; কারণ পাঞ্জাবিটা ভিজে গেছে রক্তে। সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি তো? কানাইও এসে পড়েছে ততক্ষণে। প্রৌঢ়ের কাছে গিয়ে তারা দেখে ছোরার আঘাতে তাঁর পিঠের মাংসপেশির খানিকটা অংশ ফালা হয়ে গেছে। রজনী হাঁটু গেড়ে পাশে বসে তাঁকে চিৎ করে দিয়েই বিস্ময়ে বলে ওঠে— 'আমিনদা, আপনি!'

ভয়ে, আঘাতে জর্জরিত আমিনদা ককাচ্ছেন আর থরথর করে কাঁপছেন। ইনিই সেই আমিনদা যাঁর সাথে রজনী একসময়ে কাজ করত রডরিক্স সায়েবের অফিসে। এখন রজনীকে দেখেই আমিনদা চোখভরা জল নিয়ে হাতজোড় করে বলে ওঠেন—'আমায় মেরো না রজনী, আমায় মেরো না ভাই। বিশ্বাস কর, আমি কিচ্ছু করিনি, আমি কারোর কোনো ক্ষতি করিনি।'

আমিনদার এই দশা দেখে রজনীর বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। সে প্রৌঢ়কে সান্ত্বনা দিয়ে বলে— 'আমি দাঙ্গাবাজ নই আমিনদা। আমি থাকতে কেউ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তা আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন?'

দু-হাতে রজনীর হাত চেপে ধরে আমিনদা কাতরাতে কাতরাতেই বলেন— 'অফিস থেকে বেরিয়ে দাঙ্গার জন্যে আমি আর বাড়ি ফিরতে পারিনি। এখানেই আমার শালার বাড়িতে...। আ...আজ বাড়ি ফিরছিলাম। কিন্তু...কিন্তু ওরা আমায়...।' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন প্রৌঢ়।

—'ঘাবড়াবেন না আমিনদা। চোট বেশি নয়। হসপিটালে নিয়ে গেলে ঠিক হয়ে যাবে।' সান্ত্বনা দেয় রজনী। কিন্তু এখন এই শূণ্য রাজপথে গাড়ি কোথায় পায় সে? কিন্তু...কিন্তু মনে হচ্ছে দূরে একটা গাড়ির আওয়াজ। রজনী প্রাণপণে আশা করে, গাড়িটা যেন এদিকেই আসে আর সে যেন আমিনদাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কানাই সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে— 'স্যার, পুলিশের গাড়ি নয়তো?' তার এই ভয় অমূলক নয়। এখানে যে কয়েকজন এখনও রাস্তায় পড়ে আছে। পুলিশ এসে দাঙ্গা করার দায়ে তাদেরই না ধরে।

কিন্তু না। ফাঁকা রাস্তায় তীব্রবেগে ছুটে আসতে আসতে হঠাৎই তাদের কাছে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়ায় দুটো জিপ। প্রথম জিপটা থেকে নেমে আসেন গোপাল পাঁঠা আর তাঁর পেছনে পেছনে স্টিয়ারিং ছেড়ে নেমে আসে তাঁর ডানহাত বসন্ত।

তাদের কাছে এসে গোপাল জিজ্ঞেস করেন— 'কী হয়েছে এনার?'

—'পিঠে স্ট্যাব করা হয়েছে স্যার।' বলে রজনী।

—'স্যার নয়, বলুন ''দাদা''। আমি স্যার বলা পছন্দ করি না। ওটা ইংরেজদের জন্যে তুলে রাখুন। তা এনাকে কি ওরাই খুন করতে এসেছিল?' রাস্তায় পড়ে থাকা লোকগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেন গোপাল।

—'হ্যাঁ দাদা, তবে একজন পালিয়েছে।'

বিস্মিত গোপাল কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন— 'তা এদের এই হাল করল কে? এদের কাছে তো অস্ত্র আছে দেখছি।'

—'আর কেউ না জেঠু, শুধু স্যার আর আমি।' কানাই গর্বের সুরে বলে ওঠে।

—'শুধু তোমরা দু-জনে? কোনো অস্ত্র ছাড়াই?' গোপাল আরও বিস্মিত হন।

—'হ্যাঁ জেঠু।'

বসন্ত বলে— 'দাদা, এদের হিম্মৎ আছে দেখছি। স্রেফ খালিহাতে এই অবস্থা করেছে এদের?'

কানাই বুমেরাং উঁচিয়ে বলে— 'আর এইটা দিয়েও।'

গোপাল বলেন রজনীকে— 'তা এনার পরিচয় জানেন? নাকি এমনিই বাঁচাতে এলেন?'

—'দাদা, একসময়ে উনি আমার সাথে একই অফিসে কাজ করতেন। দাঙ্গা যেদিন শুরু হয়, সেদিন হাওড়া গিয়ে ট্রেন ধরতে পারেননি বলে এখানে ওনার শালার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ সকালে পরিস্থিতি ঠান্ডা হতে ট্রেন ধরতে যাচ্ছিলেন। তবে উনি আমার পরিচিত না হলেও আমি একই কাজ করতাম, কারণ উনি একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ, দাঙ্গাবাজ নন। আর আপনিও তো তাইই করে থাকেন বলেই শুনেছি।'

গোপাল একটু চুপ করে থেকে বসন্তকে বললেন— 'এই বসন্ত, এনাকে শিগগিরই হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। হাসপাতালে বলবে গোপালদা পাঠিয়েছে। আর শোনো, কোন হাসপাতালে ভরতি করেছ তা আমাকে পরে জানিয়ে দিও।'

দ্বিতীয় জিপটা থেকে তিনজন নেমে আমিন সায়েবকে ধরাধরি করে তুলে ওই জিপেরই সাইড সিটে উপুড় করে শুইয়ে দেয়। বসন্ত আমিন সায়েবকে জিজ্ঞেস করে—'আপনার নাম কী? কোথায় থাকেন? হাসপাতালে লেখাতে হবে তো।'

আমিনদা কোনোরকমে বলেন— 'আমিনুল হক। থাকি সাঁকরাইলে।' তারপরেই জ্ঞান হারান।

জিপটাকে চলে যেতে বলে গোপাল বসন্তকে বলেন— 'দেখ তো, শয়তানের বাচ্চাগুলো মরে গেছে নাকি?'

সবাইকে নেড়েচেড়ে দেখে বসন্ত বলে— 'না দাদা, এখনও মরেনি। আধমরা। কী করব বল? শেষ করে দেব?'

গোপাল একবার কানাইয়ের দিকে তাকান। তারপর বসন্তকে বলেন— 'না ছেড়ে দাও। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে ওদের। তুমি শুধু ওদের অস্ত্রগুলো তুলে নাও গাড়িতে।'

বসন্ত অন্য ছেলেদের ইশারা করতেই তারা লেগে পড়ে কাজে। অস্ত্রগুলো নিজেদের জিপে তুলে হাত-পা ধরে লোকগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ফুটপাতে।

—'তা এদের চোট কেমন?' গোপাল জিজ্ঞেস করেন রজনীকে।

—'আজ্ঞে দাদা, ওদের বড়োজোর চোয়াল আর পাঁজরের হাড় ভেঙে গিয়ে থাকতে পারে।'

—'তা আপনারা বুঝি জুডো জানেন? সেই জাপানি কুস্তি?'

—'আজ্ঞে দাদা, জুডো নয়, আমরা তাইকোন্ডো জানি। ওটা কোরিয়ান।'

গোপাল তারপর কানাইয়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন— 'তা বাবু, তোমার হাতে কাঠের ওই অস্ত্রটা কী? আগে তো কখনো দেখিনি এ জিনিস।'

—'আজ্ঞে জেঠু, এটা হল বুমেরাং। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের অস্ত্র। ঠিকমতো টিপ করে ছুঁড়ে দিলে এটা লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে।'

—'সাব্বাশ' বলে গোপাল কানাইয়ের হাতের অস্ত্রটা নেড়েচেড়ে দেখে আবার ফেরত দিয়ে রজনীকে বললেন— 'আপনাদের নাম জানতে পারি? থাকেন কোথায়?'

—'আজ্ঞে, আমি রজনীকান্ত রায় আর ও হল কানাই দত্ত। থাকি বউবাজারে।'

গোপাল খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন রজনীর দিকে। তারপরে বলেন —'শুনুন রজনীবাবু, আজ সন্ধেবেলা আমার অফিসে দেখা করে আমিনবাবু কোথায় ভরতি আছেন তা জেনে যাবেন, আর পারলে ওনার বাড়িতে একটা খবর করে দেবেন। আর হ্যাঁ, আমার তরফে আপনাদের দু-জনের জন্যে গিফট পাওনা আছে। সেটাও একদিন এসে নিয়ে যাবেন অফিস থেকে।'

গোপাল জিপে গিয়ে বসেন আর বসন্ত স্টার্ট দেয় জিপে। হ্যারিসন রোড ধরে হাওড়ার দিকে ছুটে যায় জিপটা। তারা শুধু তাকিয়ে থাকে সেদিকে। তবে এতদিন পরে একজন মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পেরে রজনীর কেমন যেন একটা ভালোলাগার অনুভূতি হচ্ছে। সেইসঙ্গে বেশ তৃপ্তিও। তার মনে হচ্ছে যে— এতদিন সে অনেক ভুল করেছে। এখন সেইগুলো শোধরানোর সময় বুঝি আসছে। সময় আসছে প্রায়শ্চিত্ত করার।

ফেরার পথে তারা কলেজ স্ট্রিট বাজার থেকে কয়েক সের চাল, ডাল আর ডিম কিনে নিয়ে বাড়ির পথ ধরে। আজকের রাস্তার ঘটনা কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছিল রজনী। কানাইও স্যারের নির্দেশ মুখবুজে পালন করে।

সেইদিনই দুপুরের পরে কানাইকে নিয়ে আমিনদার সাঁকরাইলের বাড়ি ঘুরে সন্ধেবেলা রজনী গিয়েছিল গোপালবাবুর অফিসে। সেখানে গোপালবাবু তাদের পাঁচশো টাকা উপহার দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু রজনী সবিনয়ে তা ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে যে তিনি যেন তাদের গ্রামের স্কুলটা সারিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। রজনীর কথা শুনে গোপালবাবু খানিকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন তার মুখের দিকে। তারপরে কী যেন একটু ভেবে নিয়ে তাকে বলেছিলেন যে এই ব্যাপারটা উনি যুগলবাবুকে নিশ্চয়ই বলবেন আর যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন যাতে স্কুলের জন্যে কিছু ফান্ডের ব্যবস্থা করা যায়।

সেদিন আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে বাড়ি ফিরেছিল তারা। তবে স্যারের এই প্রস্তাবটা বেশ ভালো লেগেছিল কানাইয়ের। খুব খুশি হয়েছিল সে।

২৬ অগাস্ট, ১৯৪৬

কলকাতায় মহামিছিল, গোপালের গোঁ আর গান্ধীজির টেনশন

গান্ধীজি কলকাতায় এসেছেন। উঠেছেন বেলেঘাটার বাড়িতে— হায়দারি মঞ্জিলে। তিনি দুই সম্প্রদায়ের মানুষকেই অস্ত্র সমর্পণ করতে বলেছেন আর তারই ফলে আজ মহামিছিল বেরিয়েছিল কলকাতায়। সেই মৈত্রী-মিছিলে সামিল হয়েছিল দুই সম্প্রদায়ের মানুষই। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং সুরাওর্দী। মিছিলে আরও ছিলেন মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে। সেইসঙ্গে ছিল হিন্দুস্তান ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরাও। যুগলচন্দ্র ঘোষও ছিলেন। সেই মিছিল যখন বেলেঘাটার মহাত্মাজির বাড়ির সামনে দিয়ে 'মহাত্মাজি জিন্দাবাদ', 'ভারত মাতা কী জয়', 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই' স্লোগান দিতে দিতে যাচ্ছিল তখন গান্ধীজি স্বয়ং বাড়ির সামনে বেরিয়ে এসে জোড়হাতে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করেন।

রাত সাড়ে ন-টা নাগাদ গোপালবাবুর অফিসে বসেছিল রজনী। গতকালই জাদুঘরের নম্বরে ফোন করে বসন্ত তাকে আসতে বলেছিল আজ যুগলবাবুর সঙ্গে কথা বলিয়ে দেবে বলে; যদিও গোপালবাবু তাঁকে আগেই জানিয়ে রেখেছিল সব।

এখন যুগলবাবুর মুখ থেকে গোপালবাবুকে বলা আজকের মহামিছিলের বর্ণনা শুনছিলো সে আর ভাবছিল নেতাজি আর বাপুজির কথা। এই দুটি মানুষকে আসমুদ্র হিমাচল মান্য করে। তাঁদের কথা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে। কিন্তু দুই মহামানবের পথ ভিন্ন, যদিও লক্ষ্য এক। সুভাষচন্দ্র যে কোথায় তা দেশবাসী জানে না, তবে গান্ধীজি আছেন পথ দেখাতে।

আর এখন রজনী বসে আছে তাঁদেরই দুই অনুগামীর সামনে।

—'শোনো গোপাল, বাপুজি যে অস্ত্র সমপর্ণের কথা বলেছেন তা নিয়ে তুমি কী ভাবছ?'

শান্ত অথচ কঠোর গলায় গোপাল বললেন— 'আগে তুমি বল তো যুগলদা, দাঙ্গার সময় গান্ধীজি কোথায় ছিলেন? দাঙ্গা প্রায় থেমে যাওয়ার পরে উনি এসেছেন কলকাতায়; আবার এসে কার সঙ্গে মহামিছিল করেছেন?... কেন?... এরপরেও তুমি আমাকে বলবে অস্ত্র সমপর্ণ করতে?'

—'দেখ গোপাল, আমি আমার ছেলেদের বলেছি অস্ত্র সমপর্ণ করতে। তারা করবে। তা তুমি নিজে না যাও, তোমার ছেলেদের বল। তারা যাক।'

—'শোনো যুগলদা, তুমি গান্ধীজির ফলোয়ার। তুমি তাঁর আবেদনে সাড়া দিতেই পার। কিন্তু আমি...।' একটু থেমে গোপাল আবার একটু উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করেন— 'তুমি তো জানো যে এই ক-দিনে কলকাতায় চার হাজারের মতো লোক মরেছে; প্রায় একলাখ লোকের মাথার ওপরে ছাদ নেই। শয়ে শয়ে লোক কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। আমার ছেলেরা তোমার ছেলেদের সঙ্গে মিলে দাঙ্গার সময় লড়েছে। এমনকী তুমি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করেছ। এরপরেও তুমি আমায় বলছ অস্ত্র সমপর্ণ করতে? না, না, যুগলদা, এ আমি পারব না।'

—'শোনো, গান্ধীজি কিন্তু আমাকে বারবার তোমার কথা বলেছেন। তোমার সম্বন্ধে উনি বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল। তাই বলছিলাম কী ওনার মান রাখতে...।'

—'যুগলদা, দেখ, কলকাতায় দাঙ্গা থেমেছে। কিন্তু বিহার, উত্তরপ্রদেশ এসবেও দাঙ্গা ছড়াচ্ছে। সেই দাঙ্গার ফিরতি আঁচ আবার যদি কলকাতায় লাগে? তখন? ঢাল-তরোয়াল ছাড়া নিধিরাম সর্দার হয়ে তখন কী করব আমি? বল?'

খানিকক্ষণ দু-জনেই চুপচাপ। তারপরে যুগল ঘোষই বললেন— 'ঠিক আছে গোপাল। আমি কল্যাণমকে তোমার বক্তব্য জানাব। দেখি কী হয়?'

তারপরে হঠাৎই গোপালবাবুর চোখ পড়ে যায় রজনীর দিকে।

—'ও, আপনি এসে গেছেন। দুঃখিত, খেয়াল করিনি। আসলে যুগলদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে...। এই যে যুগলদা, এইই হচ্ছে রজনীকান্ত রায়। সেই যে, যে ভদ্রলোকের কথা তোমায় বলেছিলাম। খালি হাতে একটা বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে...।'

—'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই ওনার গ্রামের স্কুলের রিনোভেশনের ব্যাপার...তাই তো গোপাল?'

—'হ্যাঁ যুগলদা।'

—'নমস্কার রজনীবাবু।'

—'নমস্কার দাদা।' রজনী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—'আরে বসুন, বসুন। তা হ্যাঁ, আপনার ব্যাপারটা আমি গোপালের কাছে শুনেছি। তা বসন্ত একদিন আপনার সাথে গিয়ে ঘুরে দেখে স্কুলের রিনোভেশনের সম্ভাব্য খরচের একটা লিস্ট বানিয়ে আমাকে দেবে। আমি সেটা বিধানবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেব। আশা করি উনি নিরাশ করবেন না।'

—'ধন্যবাদ দাদা।'

—'ঠিক আছে। তাহলে দিন কুড়ি বাদে গোপালের অফিসেই দেখা করবেন। আর তারই মধ্যে বসন্তের সঙ্গে একটা দিন ঠিক করে নেবেন।'

—'হয়ে যাবে তো দাদা?' রজনীর গলায় আকুল প্রশ্ন।

—'বললাম তো আমার সাধ্যমতো আমি চেষ্টা করব। আশা করি হয়ে যাবে। বিধানবাবু কখনো ভালো কাজের প্রস্তাব ফেরান না। তাই আপনি মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' বলতে বলতেই যুগলবাবু উঠে দাঁড়ান। তারপর গোপালের উদ্দেশ্যে বলেন— 'আমার দেওয়া প্রস্তাবটা তুমি একটু ভেবে দেখো গোপাল।'

গোপালও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বলেন— 'যুগলদা, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তাই বলছি, তুমি এর মধ্যে থেকো না। আমায় এই অনুরোধ করে আর বিড়ম্বনায় ফেল না।' বলতে বলতে টেবিলের পাশ কাটিয়ে যুগল ঘোষের কাছে পৌঁছে যান।

যুগল ঘোষ বলেন— 'শোনো, তুমি এক কাজ কর। তোমার ঝড়তি-পড়তি মালগুলোকে তুমি জমা করতে পাঠিয়ে দাও গোপাল।'

গোপালও বলেন— 'তুমি আবার আমার সঙ্গে তামাশা করছ যুগলদা। তুমি তো জানো যে আমি মাথা উঁচু করে বাঁচতে ভালোবাসি। তা ছাড়া আমি তো কোনো সাধারণ মানুষকে মারিনি। তাই বলছিলাম কী, তুমি দায় ঝেড়ে ফেলে চাপটা বরং কল্যাণমের ঘাড়েই দাও না। দেখি সে কী বলে। ...এই বসন্ত, দাদাকে পৌঁছে দিয়ে এসো।'

গোপালের কথামতো বসন্ত গিয়ে বসে জিপের স্টিয়ারিংয়ে। পাশে যুগলচন্দ্র ঘোষ। স্টার্ট নিয়ে জিপ এগিয়ে যায় গন্তব্যে।

২৯ অগাস্ট

বেলেঘাটার বাড়িতে রাত আটটা নাগাদ ধবধবে সাদা ফরাসে বাপুজি বসে আছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায়। দুটো হাঁটু মুড়ে ভাঁজ করে একহাতের ওপরে শরীরের উর্দ্ধাংশের ভর রেখে। তাঁর বাঁ-দিকে কিছুটা দূরে বসে সুরাওর্দী। গান্ধীজি যেন বেশ চিন্তামগ্ন। মহামিছিলের পরেও তিনি হয়তো বা কিছুটা শঙ্কিতও। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে— কলকাতা আপাতত শান্ত। দুই সম্প্রদায়ের মানুষই তাদের অস্ত্র সমর্পণ করেছে, শুধু একজন বাদে। সে গোপাল মুখোপাধ্যায়। এর আগে যুগল ঘোষকে তিনি পাঠিয়েছিলেন গোপালের কাছে। কিন্তু গোপাল তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। লোকটার সাহস আছে বলতে হবে, কারণ তাঁর বার্তাকে সে গুরুত্ব দেয়নি। তাই এবারে কংগ্রেসের আরও নেতাদের সাথে তাঁর সেক্রেটারি কল্যাণমকে পাঠিয়েছেন গোপালের কাছে। দেখা যাক, এবারে সে কী করে? এ ছাড়াও বিহার আর উত্তরপ্রদেশে শুরু হয়েছে বিক্ষিপ্ত দাঙ্গা। সেটাও তাঁর একটা দুশ্চিন্তার কারণ। এইভাবে দেশটা জ্বলতে থাকলে...।

এমন সময় কল্যাণম ঘরে ঢোকে। গান্ধীজির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই উনি প্রশ্ন করেন— 'তা কল্যাণম, গোপাল কি অস্ত্র সমর্পণ করবে? কী বলল সে?'

—'বাপুজি, আমি তাকে অনেক অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু...' কথাটা বলতে ইতস্তত করে কল্যাণম।

—'বল, কী বলল সে?'

—'কংগ্রেসের নেতারা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। এমনকী আমিও তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে সে কেন অস্ত্র সমর্পণ করছে না।' একটু থামেন কল্যাণম। গোপালের উত্তর শুনতে গান্ধীজির মতো উদগ্রীব সুরাওর্দীও।

কল্যাণম আবার বলতে শুরু করেন— 'সে বলল যে— আমার অস্ত্র দিয়ে আমি আমার এলাকার মহিলাদের, এলাকার সাধারণ মানুষদের রক্ষা করেছি। তাই সেই অস্ত্র আমি সমর্পণ করব না। তারপর আমাকে বলে— 'শুনে রাখুন কল্যাণমজি; আমি যদি সামান্য একটা পেরেক দিয়েও দাঙ্গাবাজদের কাউকে খুন করে থাকি, তবে সেই পেরেকটাও আমি সমর্পণ করব না।'

গোপালের জবাব শুনে বিমূঢ় বাপুজি। কী করবেন এই লোকটাকে নিয়ে? তাই সেক্রেটারিকে আসতে বলে তিনি আবার চিন্তায় ডুবে যান।

কিন্তু একটু পরেই কল্যাণম আবার ফিরে এসে বলে—'বাপুজি, কমিশনার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

—'ঠিক আছে। আসতে দাও।'

পুলিশ কমিশনার ঘরে ঢুকে স্যালুট করেন। গান্ধীজি মুখ তুলে তাকান। কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর না থাকলে তো কমিশনার আসেন না।

কমিশনার বলতে থাকেন— 'নোয়াখালিতে হিন্দুরা নাকি অস্ত্র মজুত করছে বলে খবর আছে বাপুজি। তবে হয়তো এটা গুজব। কিন্তু তারই জেরে ফেনী নদীতে যখন একদল হিন্দু জেলে মাছ ধরছিল তখন তাদের ওপরে একদল সশস্ত্র লোক হামলা চালায়। সেই

জেলেদের একজন মারা যায় আর দু-জন গুরুতর জখম। এরপরে চারুরিয়ায় আরও একদল হিন্দু জেলে আক্রান্ত হয়। শুধু তাইই নয়, ওখানে অনেক হিন্দুদের বাড়িও আক্রান্ত হয়েছে।'

কমিশনার থামতে গান্ধীজি বললেন— 'আর কিছু?'

—'না বাপু। আপনি এখানে আছেন, তাই নিজেই এলাম আপনাকে সব জানাতে।'

গান্ধীজি চুপ করে শুনলেন। তিনি আগেই জানতেন যে, কলকাতায় তাঁর এই মহামিছিলের জয় ক্ষণস্থায়ী। আর এখন বুঝলেন যে, দাঙ্গার বীজ ছড়িয়ে পড়েছে সারাদেশে। তাই এখন তাঁকে ছুটে বেড়াতে হবে। তবে সবার আগে যেতে হবে নোয়াখালি।

৩০ অগাস্ট

অক্টোপাসের ফসিল, কানাইয়ের গ্রেনেড আর গান্ধীজির অটোগ্রাফ

কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা চেয়ারের পাশে নামিয়ে রেখে টেবিলে ঢাকা দিয়ে রাখা গ্লাসের জলটা এক চুমুকে শেষ করে রজনী। তারপরে টাইপরাইটারের ঢাকা খুলে একপাশে রেখে মেশিনে কাগজ লাগাতেই ড্যানীবাবুর কথা ভেসে আসে— 'দাঙ্গায় সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে রজনী। কলকাতা আর সভ্য কলকাতা নেই।...মানুষ যেন দৈত্য হয়ে গেছে।... আমরা সবাই দিনের পর দিন গৃহবন্দি। ...অফিসে তো আসতে পারিনি। তাই এই ক-দিনে বাড়িতে বসেই ফসিলের ওপরে একটা পেপার লিখছিলাম। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর দিন দুয়েকের মধ্যেই পুরোটা লেখা হয়ে যাবে আশা করি। তা কমপ্লিট হয়ে গেলে তুমি সেটা বেশ গুছিয়ে টাইপ করে দিও তো। ভাবছি ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিকে পাঠাব।'

—'হ্যাঁ স্যার দেবেন। নিশ্চয়ই টাইপ করে দেব।' উৎসাহের সঙ্গে বলে রজনী। স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পেরে ভালো লাগছে তারও।

এদিকে মুক্তোরাম চা নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। ঘরের লাগোয়া বেসিনে কাপ-প্লেটগুলো ধুচ্ছে সে। জলের আওয়াজ, পোর্সেলিনের টুং-টাং আর পাখার হাওয়া কাটার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই ঘরে।

কাপ-প্লেট ধুয়ে মুক্তোরাম যখন চা দিচ্ছে টেবিলে, তখনই ড্যানীবাবু একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন।

—'আচ্ছা রজনী, বল তো, আধুনিক অক্টোপাসের ফসিল এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি কেন?'

আচমকা এই প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে যায় রজনী। সত্যিই তো, এই কথাটা সে তো আগে কখনো ভাবেনি। অবশ্য এই প্রশ্ন তার ভাবনাতেও আসার কথা নয়। সে তো বিজ্ঞানের ছাত্রও নয়। তাই মনে মনে নিজস্ব যুক্তি দিয়ে খুঁজতে থাকে প্রশ্নটার জবাব।

টেবিলে চা দিয়েছে মুক্তোরাম। রজনীকে একটু চিন্তিত দেখে বলে— 'কী ভাবচেন স্যার?'

চায়ে একটা চুমুক মেরে ওপাশ থেকে ড্যানীবাবু হেসে বলেন— 'অক্টোপাসের ফসিল কেন পাওয়া যায় না সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে রজনী।'

—'অ, তাই বলেন।' তারপরেই ড্যানীবাবুর দিকে প্রশ্ন ছোঁড়ে মুক্তোরাম— 'দশভূজা দুগ্গিমায়ের কোনো ফসিল দেকেচেন সায়েব?'

এই বেমক্কা প্রশ্নে চায়ে চুমুক দিতে গিয়েও থমকে যান দীনেন্দ্রনাথ। তারপরে সামলে নিয়ে মুক্তোকে বলেন— 'আরে সে তো হয় পাথরের কিংবা মাটি দিয়ে তৈরি মূর্তি। তার আবার ফসিল হবে কী করে?'

—'ঠিক তেমনই অক্টোপাস হল গে সুমুদ্দুরের জলের তলার অষ্টভূজা দেবী। তাই তারও ফসিল হয় না।' অদ্ভুত যুক্তি। কে এর কীই-বা উত্তর দেবে?

তবু মুক্তোকে থামাবার শেষ চেষ্টা করে রজনী— 'কেন? যে শালগ্রাম শিলাকে নারায়ণ হিসেবে পুজো করা হয়, সেটাও তো শামুক জাতীয় একটা প্রাণীর ফসিল। তা সেটার যদি ফসিল হতে পারে, তো অক্টোপাসেরই বা ফসিল হবে না কেন?'

—'জানি না বাপু অত্তোসব গেরমভারী কতা। বামনেরা বলতে পারবে এসবের উত্তর।' বলে মানে মানে সরে পড়ে মুক্তোরাম।

শালগ্রাম শিলার কথায় হঠাৎই রজনীর মাথায় ঝিলিক মেরে যায় ড্যানীবাবুর প্রশ্নের উত্তর। ড্যানীবাবুর দিকে তাকাতেই সে দেখে মৃদু মৃদু হাসছেন উনি। রজনী তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন— 'মুক্তোরামকে যে এক্সাম্পেলটা দিয়ে থামালে, তার মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে আছে আমার বলা প্রশ্নটার উত্তর। ভালো করে যুক্তি দিয়ে খুঁজে দেখ।'

কিন্তু ড্যানীবাবু বলার আগেই সে পেয়ে গেছে প্রশ্নটার জবাব। সে ড্যানীবাবুকে বললে — 'আজ পর্যন্ত যতরকম ফসিল পাওয়া গেছে, মানে আপনার কাছ থেকেই যা জেনেছি, তাতে বুঝেছি যে শরীরে শক্ত কিছু, যেমন হাড়, কার্টিলেজ বা গাছের ক্ষেত্রে শক্ত টিস্যু, এইসব না থাকলে ফসিল তৈরি হয় না। আর অক্টোপাসের শরীরে যেহেতু হাড় নেই, তাই তার ফসিলও হয় না। সমস্ত শরীরটাই মাটির স্তরের নীচের চাপে আর তাপে গলে যায়।'

—'সাব্বাস, ইউ আর রাইট মাই বয়।' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন ড্যানীবাবু। 'এইটাই তো চাই, নইলে দীনেন্দ্রনাথের শিষ্য হবে কী করে?'

স্মিত হেসে রজনী বলে—'না স্যার, সে যোগ্যতা আমার নেই।'

সত্যি, ড্যানীবাবু মানুষটাই এমন। একদিকে যেমন মিশে যেতে পারেন সমাজের উচ্চস্তরে, তেমনই মিশে যেতে পারেন একজন অধস্তন বেয়ারার সাথেও। পাণ্ডিত্য তাঁকে উদ্ধত করেনি, বরং করেছে মাটির কাছাকাছি থাকা একজন প্রকৃত অন্তর-আলোকিত মানুষ। রজনী ধন্য যে, এমন একজন মানুষের সান্নিধ্য সে পেয়েছে।

এদিকে ক-দিন ধরেই তার মনের মধ্যে একটা ইচ্ছে ঘুরছে। সেটা হল, কাছ থেকে গান্ধীজিকে একবার দেখার, তাঁর একটা অটোগ্রাফ নেওয়ার। রজনী জানে— এ যেন, আকাশের চাঁদ ধরতে চাওয়া। কিন্তু ইচ্ছে ইচ্ছেই। তবে ইচ্ছে থাকলেই যে উপায় সবসময় হবে তার কোনো মানে নেই। আসলে রজনীর এই ধরণের ইচ্ছের একটা কারণও আছে।

সে দেখতে চায় কী এমন শক্তি আছে ওই মানুষটার মধ্যে যে, যার জন্যে তাঁর উপস্থিতিকে সাধারণ মানুষ থেকে দাপুটে রাজনীতিকও সম্মান করে।

রজনী জানে যে তার এই ইচ্ছেটাকে সফল করতে হলে একটা উপায় তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কথায় বলে না— কি না হয় চেষ্টায়। তাই রজনীও একটা শেষ চেষ্টা করে। নয় নয় করে সে ড্যানীবাবুকে বলেই ফেলে— 'স্যার একটা কথা বলব?'

টেবিলে ঘাড় গুঁজে কাজ করতে করতেই ড্যানীবাবু বলেন— 'কী? বল?'

—'স্যার, আমার একটা ইচ্ছে আছে। বলব?'

—'ভণিতা না করে বলেই ফেল। শুনি।'

—'স্যার, গান্ধীজিকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। খুব ইচ্ছে হয় ওনার একটা অটোগ্রাফ নেওয়ার। উনি তো এখন কলকাতায় আছেন।'

এবারে যেন একটা ধাক্কা খেলেন ড্যানীবাবু। টেবিলের কাগজ থেকে মুখ তুলে চশমার ওপর দিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রজনীর দিকে। ঠিক শুনছেন তো তিনি? ছেলেটার মাথার ঠিক আছে তো, নইলে এইরকম ইচ্ছে কারোর হয়? ও বোধ হয় জানে না গান্ধীজির গুরুত্ব।

তাই বলেন— 'তোমার মাথার ঠিক আছে তো? তুমি কি জানো যে উনি কীরকম হাই-সিকিওরিটিতে থাকেন। বাড়ির বাইরে সর্বক্ষণ পুলিশ মোতায়েন। পুলিশের বড়ো বড়ো কর্তাব্যক্তিরা থাকেন সেখানে। আর তা ছাড়া তুমি তো রাজনীতির কোনো কেউকেটা নও বাপু যে চাইলেই যেতে পারবে ওনার কাছে।'

তবু রজনী একবার শেষ চেষ্টা করে। বোঝে যে সে একটা অন্যায্য আব্দার করে ফেলেছে। কিন্তু তার যে সত্যিই বড়ো ইচ্ছে গান্ধীজিকে কাছ থেকে দেখার।

তাই সে আমতা আমতা করে বলে— 'স্যার, বলছিলাম কী, ওপরমহলে তো আপনার কিছু জানাশোনা আছে। মানে...তাই ওঁদের বলে কয়ে যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন...।'

ড্যানীবাবু বলেন— 'আমাকে ভালো মানুষ পেয়ে বেশ ভালোই আব্দার করতে শিখেছ দেখছি।' রজনী লাজুক হাসে।

—'ঠিক আছে দেখছি কতদূর কী করা যায়। তবে কথা দিতে পারছি না। আসলে সময়টাওতো এখন ভালো যাচ্ছে না। তবু দেখি...।' চোখবুজে একটু ভাবেন ড্যানীবাবু। হয়তো ভাবছেন কাকে এই রিকোয়েস্ট করা যায়। উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে রজনী। একটুপরে চোখ খুলে ফোনটা তোলেন।

—'হ্যালো, আমি ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম থেকে প্যালিএন্টোলজিস্ট দীনেন্দ্রনাথ সোম বলছি। কাইন্ডলি ডক্টর রায়কে একটু লাইনটা দেবেন?' ফোন ধরে অপেক্ষা করতে করতে ফোনে হাতচাপা দিয়ে নীচুস্বরে রজনীকে বলেন— 'বিধানবাবু আমাদের ধর্মীয় সমাজের লোক তো। তাই ওনাকেই রিকোয়েস্ট করছি।'

একটুপরেই ড্যানীবাবু বলতে থাকেন— 'হ্যালো বিধানবাবু, আমি মিউজিয়ম থেকে দীনেন্দ্রনাথ বলছি...আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট ছিল... মানে, আমাদের এখানে কাজ করে একটি ছেলে সে গান্ধীজির বড়ো ভক্ত। তা সে ওনার একটা অটোগ্রাফ নিতে চায়। তাই বলছিলাম কী আপনি যদি কোনোভাবে একটু ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।...না না,

খুবই ভালো ছেলে। আমার সঙ্গেই কাজ করে আর পাস্ট হিস্ট্রিও ভালো। তাই বলছিলাম আর কী…।'

ফোনের ওপার থেকে কিছু বলা হচ্ছে। ড্যানীবাবু চুপ করে শুনে যাচ্ছেন। তারপরে হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা রাফ-প্যাড টেনে নিয়ে কলম রেডি করে বললেন— 'ডক্টর রয়, প্লিজ আর একবার নাম আর ডেজিগনেশনটা বলবেন? আমি চিঠি লিখে দেব।…হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, আমি তাহলে মিনিট পনেরো পরে আপনাকে কল-ব্যাক করছি। থ্যাংক ইউ মিস্টার রয়।'

রিসিভারটা ক্রেডেলে রেখে রজনীকে বললেন— 'উনি স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিসির সঙ্গে কথা বলে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। এখন ডিসির পারমিশন পেলে তবেই তোমার গান্ধী-দর্শন হবে। বুঝলে? তাই মিনিট পনেরো অপেক্ষা কর। তারপরই দেখা যাবে যে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে কি না।'

অতএব অপেক্ষা। কিন্তু এই পনেরো মিনিট রজনীর কাছে যেন অনন্তকাল বলে মনে হচ্ছে। একবার তো সে চেয়ার ছেড়ে উঠে টয়লেটে গিয়ে ঘাড়ে মুখে জল দিয়ে এল।

এদিকে ক্রমে পনেরো মিনিট কেটে গিয়ে পঁচিশ মিনিট হতে চলল। ড্যানীবাবু আগের মতোই নিজের কাজে ব্যস্ত। কোনো হেলদোল নেই। রজনী ভাবছে— পনেরো মিনিট হয়ে গেছে, তবু ড্যানীবাবু ফোন করছেন না কেন? উনি কি ভুলে গিয়েছেন কথাটা?

—'কী? টেনশন হচ্ছে?' ড্যানীবাবু বোধ হয় তার মনের কথাটা টের পেয়েছিলেন।

—'আরে, ওনারা সবাই ব্যস্ত মানুষ। দিনে হয়তো কয়েকশো ফোন অ্যাটেন্ড করতে হয়। তাই একটু সময় নিলাম যাতে ওনারা কথাবার্তা বলে নিতে পারেন।' আর তারপরেই টেলিফোনটা তুলে নিলেন।

ফোনে কথাবার্তা চলতে লাগল আর সেইসঙ্গে ড্যানীবাবু রাফ-প্যাডে টুকটাক কী যেন লিখে চলেছেন। মিনিট তিনেক পরে কথা শেষ করে ড্যানীবাবু রজনীকে বললেন— 'মনে হচ্ছে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। শোনো, বিধানবাবু ডিসি আর বাপুজির সেক্রেটারি কল্যাণমকে তোমার নামে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লিখিয়েছেন। আগামীকাল রাত সোওয়া ন-টায়। আর আমি তোমাকে দুটো চিঠি করে দেব। তার একটা দেবে ডিসিকে আর অন্যটা দেবে কল্যাণমকে। বুঝলে?'

—'হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি।' আনন্দে রজনীর বুকটা ভরে গিয়েছিল।

—'তাহলে বাড়ি ফেরার সময়ে ধর্মতলা থেকে একটা অটোগ্রাফ নেওয়ার খাতা কিনে নিয়ে যেও। আর হ্যাঁ, সঙ্গে যদি সুরাওর্দীকে দ্যাখো, তবে ওনারও একটা অটোগ্রাফ নিও, নইলে লোকটার শিক্ষাকে আর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে অবমাননা করা হয়। আর কল্যাণমেরও একটা সই নিয়ে নিও। এঁদের নাম তো ইতিহাসে লেখা হয়ে যাচ্ছে। পরে কোনোদিন তুমি সবাইকে বলতে তো পারবে যে তুমি এঁদের সবাইকে কাছ থেকে দেখেছ।'

—'নিশ্চয়ই স্যার। আপনি একদম ঠিক বলেছেন।'

স্মিত হেসে ড্যানীবাবু বললেন— 'বাড়ি যাওয়ার আগে চিঠিদুটো টাইপ করে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিও। বয়ান আমি লিখে দিচ্ছি দশ মিনিটের মধ্যেই। আর ডিসিকে লেখা চিঠিটায় মুক্তোরামের হাত দিয়ে লালবাজার থেকে অ্যাপ্রুভাল অর্ডারটা আনিয়ে নিও কাল দুপুরের মধ্যেই। নইলে ভাগ্যে জুটবে লবডঙ্কা।'

বাড়ি ফেরার পথে চৌরঙ্গিতে অটোগ্রাফ-বুক কিনতে গিয়ে রজনীর হঠাৎ মনে পড়ল যে কানাই তাকে এক শিশি গ্লিসারিন আর মুখ ধোওয়ার জন্যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কিনে নিয়ে যেতে বলেছিল। ওর মুখের ভেতরে নাকি ছোট ছোট রাশ বেরিয়েছে। তাই গ্লিসারিন আর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে মুখ ধোবে।

অটোগ্রাফ-বুক কেনার পরে কাছেরই একটা ওষুধের দোকান থেকে কানাইয়ের চাওয়া ওষুধ দুটো কিনেই তাই সে সোজা বাড়ির পথ ধরলে। অগাস্টের মেঘলা আকাশ, তবু আজ তার মনটা শেষ বিকেলের ওই মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা স্বচ্ছ নীল আকাশের টুকরোটার মতোই খুশি।

বাড়ি ফিরে নিজের দোতলার ঘরে ঢুকে রজনী দেখে কানাই একমনে ভগ্নাংশের অঙ্ক কষছে। ছেলেটার মাথা রীতিমতো ভালো। তবু সে জিজ্ঞেস করে— 'কি রে? পারছিস তো সব? অসুবিধে হলে বলিস।'

—'হ্যাঁ স্যার পারছি। এগুলো তো সোজা। তুমি নীচে গিয়ে চা-মুড়ি খাও। দরকার হলে আমি তোমায় ডাকব।'

—'আর এই নে তোর ফরমায়েশি জিনিসগুলো।' বলে ব্যাগ থেকে ওষুধ দুটো বের করে টেবিলে রাখে রজনী। তারপর নতুন কেনা টিনের ছোটো তোরঙ্গে ব্যাগটা ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে।

মুখ হাত ধুয়ে জামাকাপড় পালটে যখন সে নীচে নামছিল তখনও দেখে কানাই একমনে অঙ্ক কষে চলেছে।

নীচে নেমে মেসোমশাইয়ের পাশে থাকা চৌকিতে গিয়ে বসে রজনী। কেষ্টদা তেলমাখা মুড়ি-বাদামের বাটি ধরিয়ে দিয়ে যায় হাতে। একগাল মুড়ি খেয়ে রজনী মেসোমশাইকে বলে— 'মেসোমশাই, একটা ভালো খবর আছে।'

রেডিয়োটার ভল্যুম কম করে দিয়ে মেসোমশাই বলেন— 'কী? প্রোমোশন টোমোশন হল নাকি?'

—'না মেসোমশাই, সেসব নয়। আমি কাল হয়তো গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

চরম বিস্মিত মেসোমশাই খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। রজনীর কথাটা বিশ্বাসই হতে চায় না তাঁর। শেষমেশ বলেন— 'কি বলছ তুমি? মাথাটাতা খারাপ হয়ে যায়নি তো তোমার? গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করাটা কি অত্তো সোজা? তুমি কি জানো যে উনি কে আর ওনার চারপাশে কি সিকওরিটি থাকে?'

—'জানি মেসোমশাই। কিছুদিন ধরেই আমার খুব ইচ্ছে ছিল ওনাকে কাছ থেকে দেখার। তাই আজকে ড্যানীবাবুকে আমার সেই ইচ্ছের কথাটা বলেছিলাম। তা উনিও প্রথমটায় বেশ অবাকই হয়েছিলেন। তবে উনি মানুষ ভালো আর আমাকে ভালোবাসেন বলে ডক্টর রায় আর স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিসির সঙ্গে ফোনে কথা বলে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দুটো চিঠিও লিখে দিয়েছেন। আগামীকাল রাত সোওয়া ন-টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কারণ ওই সময়টায় বাপুজি ফাঁকা থাকবেন।'

সব শুনে মেসোমশাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। ব্যাপারটাকে এখনও বিশ্বাসই করতে পারছেন না উনি। তাই রজনীকে তাঁর অবাক প্রশ্ন— 'সত্যি বলছ তো?'

—'আমি আপনাদের মিথ্যে বলব, একথা ভাবলেন কী করে মেসোমশাই?'

এইবারে বিশ্বাস হয় মেসোমশাইয়ের। বলেন— 'আমি উঁচু সরকারি পদে থেকেও যা পারিনি, অবশ্য ইচ্ছেও হয়নি, তুমি কিন্তু তাইই করে দেখাচ্ছ রজনী। প্রথমে গোপালের সঙ্গে দেখা করলে, তারপরে দেখা যুগল ঘোষের সঙ্গেও, আর এবার স্বয়ং গান্ধীজি!... ওগো, শুনছ, একবার এসো তো এদিকে।' শেষের কথাটা মাসিমার উদ্দেশ্যে বলা।

রজনী আরও একগাল মুড়ি মুখে তোলে। আর ঠিক সেই সময়েই শোনা যায় উচ্চস্বরে মাসিমা বলছেন— 'এই কে রে? কে ফেললি ওটা? ওমা গো, কেমন গলগল করে ধোঁওয়া বেরোচ্ছে আর আগুন জ্বলছে। ওরে ও কেষ্ট, দ্যাখ দ্যাখ, কী হল... ও মা গো...।'

মাসিমা দৌড়ে বাইরের ঘরের দিকে আসতে থাকেন। ততক্ষণে তাঁর চিৎকার শুনে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে রজনী আর মেসোমশাই। রান্নাঘর থেকে দৌড়ে আসে কেষ্টদাও। প্রথমে তো সবাই ভয় পেয়ে খানিক পিছিয়ে যায়।

মাসিমা কেষ্টদাকে বলেন— 'ওই দেখ কেষ্ট, ওই দেখ। ও মা গো, কী আগুন আর ধোঁওয়া। বোমা-টোমা নয়তো? ও বাবা রজনী, দ্যাখো তো ওটা কী?'

সত্যিই তো! উঠোনের একপাশে দূরে ইঁটের গাদার পাশে ভসভসিয়ে জ্বলছে জিনিসটা। রজনী আন্দাজ করতে থাকে ওটা কী। বোমা হলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফেটে যেত। তাহলে ওটা কী, আর এলই বা কোত্থেকে? কে পাঁচিল টপকে ছুঁড়ে দিয়ে গেল ওটা?

এমনসময় দোতলার বারান্দা থেকে যাত্রাপালার রাবণের ঢঙে হো-হো হাসি।... কানাই। সে দু-হাতের মাসল ফুলিয়ে হাসতে হাসতে বলল— 'সরে যাও ঠাম্মি। আমি গ্রেনেড ছুঁড়েছি। এখুনি ফাটবে ওটা। সরে যাও, সরে যাও। ....হা-হা-হা-হা।'

মাসিমা ভয়ে খানিকটা দূরে সরে যান। তারপরে যখন বুঝতে পারেন যে এটা কানাইয়ের নিছকই একটা ছেলেমানুষি তামাশা, তখন ওপরের বারান্দার দিকে তাকিয়ে বলেন— 'ও, তাহলে এটা তোমারই কাণ্ড? আমি তাই ভাবি, এইবাড়িতে তো এর আগে এমনটা কখনো হয়নি।'

কানাইয়ের এই হঠাৎ ছেলেমানুষিতে বিব্রত হয়ে পড়ে রজনী। একটু কড়া গলায় সে বলে— 'এ্যাই, নীচে আয়। আজ তোর...।'

স্যারের গলার স্বর শুনে কানাই বুঝতে পেরেছে যে রজনী রেগে গেছে। তাই সে ধীরপায়ে সিঁড়ির দিকে এগোয়। সে ফাঁকে মেসোমশাই বলেন— 'গায়ে হাত তুল না রজনী। এসব বাচ্চা ছেলের দুষ্টুমি। কিন্তু ও এসব পেল কোথা থেকে? এত কোনো বাজি নয়।'

কেষ্টদাও বলে— 'হ্যাঁ গো দাদাবাবু, ও কোতা থেকে পেল এসব? দিনকাল তো ভালো নয় না।'

ততক্ষণে কানাই গুটিগুটি পায়ে এসে হাজির। তার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে রজনী বলল— 'ঘরে আয়।'

সবাই ঘরে গিয়ে বসে। শুধু কানাই অপরাধীর মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে থেকে। সে ধরেই নিয়েছে যে আজ তার কপালে দুর্ভোগ আছে।

—'হ্যাঁরে ওটা কী?'

—'খেলনা বাজি।'

—'ও আচ্ছা। তা এটা কোথা থেকে পেলি শুনি?' রজনীর গম্ভীর প্রশ্ন। তার দুশ্চিন্তা— ছেলেটা বদ সঙ্গে পড়ল না তো?

—'আমি বানিয়েছি।' তার এই অকপট স্বীকারোক্তিতে অবাক সবাই।

—'তা কী দিয়ে বানিয়েছিস শুনি?'

—'তুমি যে ওই গ্লিসারিন আর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এনে দিলে, সেগুলো দিয়ে।'

এবারে সবাই আরও বিস্মিত।

এবারে মেসোমশাই প্রশ্ন করেন— 'তা কীভাবে ওটা বানালে শুনি' ?

—'একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশিতে গ্লিসারিন ভরে তার মুখটা আটকে দিতে হয়। অন্য আরেকটা হোমিওপ্যাথি শিশিতে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ভরে সেটারও মুখটা আটকে দিতে হয়। তারপরে দুটো শিশিকে পাশাপাশি রেখে পাতলা কাগজ দিয়ে ভালো করে মুড়ে জোরে ছুঁড়ে মারতে হয়। তাহলেই শিশি ফেটে কেমিক্যাল মিশে গিয়ে আগুন জ্বলে ওঠে।'

উত্তর শুনে সবাই চুপ। এমনকী রজনীও। একইসঙ্গে বিস্মিত সে। এই বিদ্যে কানাই কার কাছ থেকে শিখল? তাই সে তাকে জিজ্ঞেস করে— 'হ্যাঁরে, কোথা থেকে শিখলি এসব?'

—'স্কুলের বড়ো দাদারা শিখিয়েছে। নাইন ক্লাসের মৃন্ময়দা আর সুহাসদা এসব জানে।'

এতক্ষণে রহস্যটা পরিষ্কার হল। সেইজন্যেই কানাই রজনীকে ওইদুটো কেমিক্যাল আনতে বলেছিল। মুখের রাশ এইসবের একটা অজুহাত মাত্র। কানাই তাকে মিথ্যে বলার জন্যে সে যত না কষ্ট পেয়েছে; তার থেকে বেশি আজ তার মনে একটা আশঙ্কা উঁকি মারছে। আর সেটা হল— দাঙ্গার সময়ে গ্রেনেড ছোঁড়ার দৃশ্য কানাইয়ের মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলে গেছে। আর তারই প্রকাশ ঘটেছে স্কুলের দাদাদের কাছ থেকে শেখা এই নিরীহ বিস্ফোরক খেলনায়। এখন এই উগ্রতার প্রতি ওর অবচেতনের আকর্ষণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে কমে গেলেই হয়।

মাসিমা ততক্ষণে কানাইকে কাছে টেনে নিয়ে বলতে শুরু করেছেন— 'আগুন নিয়ে খেলতে নেই দাদুভাই। তুমি তো জানো না, যদি বড়ো কোনো কাণ্ড ঘটে যেত।'

কানাই করুণ স্বরে বলল— 'আমি তো মজা করার জন্যেই বানিয়েছি।'

রজনী জানে যে এইসব ক্ষেত্রে বকাঝকা করলে বাচ্চাদের আরও জেদ চেপে যায়। তাই মাসিমা যা করলেন সেটাই ঠিক পথ। তাই সে আবার মুড়ির বাটি হাতে তুলে নিয়ে বললে — 'ঠিক আছে, যাও। এবার একটু বই নিয়ে বসো। আমি আসছি।'

মুড়ি খেতে খেতে রজনী ভাবতে থাকে, সেও ছোটোবেলায় গ্রামে থাকতে শিখেছিল বোতলে কেরোসিন ভরে তাতে পলতে লাগিয়ে কীভাবে ছুঁড়ে মেরে কোনো কিছুতে

আগুন ধরাতে হয়। সেইভাবেই সেনবাড়িতে রাখা শ্যামাদাসের বোমা-বারুদের স্তূপে পল্টু, পটাই আর নেলোকে দিয়ে আগুন ধরিয়েছিল সে।

তবে আজ যুগ পালটেছে। কেরোসিনের বদলে কানাইয়ের হাতে উঠেছে কেমিক্যালস। ... তাই ভয় হয়। বড়ো ভয় হয় রজনীর।

পরের দিন অফিস থেকে ফিরে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে চা-মুড়ি খেয়ে রজনী রেডি। আজ আর সে তার ঝোলা ব্যাগটা নেয়নি, কারণ ওতে যা আছে তা নিয়ে ওখানে যাওয়া যাবে না। তাই রোজকার মতোই ব্যাগটা বন্দি রইল তার টিনের তোরঙ্গে। শুধু চিঠিদুটো আর অটোগ্রাফের খাতা আর একটা ভালো কলম সঙ্গে নিল সে।

কানাইও যাবার জন্যে বায়না ধরেছিল; কিন্তু মেসোমশাই বললেন— 'ওসব রাজনীতির ব্যাপার দাদাভাই। তাই ওখানে শুধু বড়োদেরই যেতে দেয়।'

তবুও একটু অভিমান করে সে বলে— 'আমি তো গোপাল জেঠুর কাছেও গিয়েছিলাম। স্যারই তো নিয়ে গিয়েছিল।'

কানাইয়ের এই অভিমান বুঝতে পারে রজনী। বলে— 'গোপালদার অফিস আর গান্ধীজির বাড়ি কি এক হল? তা ছাড়া সব জায়গায় তো ছোটোদের যেতে দেয় না। ঠিক আছে আমি না হয় কাল অফিস থেকে ফেরার সময় তোর জন্যে একটা অটোগ্রাফ খাতা কিনে আনবো।'

কথাটা চুপচাপ মেনে নেয় কানাই আর রজনীও বেরিয়ে পড়ে। তারপর যথারীতি ঠিক সময়ে বেলেঘাটায় পৌঁছেও যায় সে।

বেলেঘাটার মিঞাবাগানের হায়দারি মঞ্জিলের সামনে সিকিওরিটি বেল্টে পৌঁছতেই পুলিশ আটকায় তাকে। পাশে একটা পুলিশ জিপ দাঁড় করানো আছে। তা থেকে ঘড়ঘড় শব্দে ভেসে আসছে ওয়্যারলেসের নানান বার্তা। সেটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইনস্পেকটর গোছের কেউ একজন এগিয়ে এল তার কাছে। সেই অফিসার কোনো কথা বলার আগেই রজনী পকেট থেকে ড্যানীবাবুর লেখা চিঠিদুটো বের করে দেয় তাঁর হাতে। সেইসঙ্গে বলে— 'আমি গান্ধীজির অটোগ্রাফ নিতে এসেছি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া আছে। আপনাদের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিসি আর বাপুজির সেক্রেটারি জানেন। ডিসিকে লেখা চিঠিতে অ্যাপ্রুভাল অর্ডারও নেওয়া আছে।'

—'আচ্ছা, একটু দাঁড়ান। ভেরিফাই করে নিই।' বলে একজন কনস্টেবলের হাতে কল্যাণমের চিঠিটা ধরিয়ে দিয়ে বলে— 'এটা ওনাকে দিয়ে বলবে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। পার্টি দেখা করতে এসেছে।' তারপরে আর একজন কনস্টেবলকে ডেকে বলে — 'এনাকে একবার সার্চ করে নিন। আমি ডিসি সায়েবকে দিয়ে কনফার্মড করিয়ে নিচ্ছি।' বলে ইনস্পেকটর চলে যায় খানিক দূরের বাড়িটার দিকে।

কনস্টেবল রজনীর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল— 'একটু ওয়েট করুন। স্যার এলে যেতে পারবেন।'

অপেক্ষা করতে করতেই রজনী দেখল ইনস্পেকটর ভদ্রলোক ওই বাড়ির খানিক আগে দাঁড়ানো একজন পদস্থ অফিসারকে চিঠিটা দেখাল। প্রায় ছ-ফুট লম্বা সেই সৌম্যদর্শন অফিসার আর কেউ নন, আমাদের নির্মল সেন। এখন কোনো চাপ নেই; তাই দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে উনি ভাবছিলেন বন্ধু নিখিলেশের কথা। সে এখন ঢাকায় গেছে স্কুপের সন্ধানে, আর পলিটিক্যাল স্কুপ তো প্রায় থাকেই না। তাই অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। এখন হাতে দেওয়া চিঠিটা পড়ে সেটা ইনস্পেকটরকে ফেরত দিয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে কিছু বললেন। তারপর ইনস্পেকটর ফিরে এসে রজনীকে বলল— 'আরেকটু দাঁড়াতে হবে। গান্ধীজির ওখান থেকে কী উত্তর আসে দেখি। বাব্বাঃ, এ তো খোদ ডাক্তার রায়ের রেকমেন্ডেশন দেখছি। তা পার্টি করেন নাকি?'

—'আজ্ঞে না, আমি মিউজিয়মে কাজ করি। এই যে আমার আইডেন্টিটি কার্ড।' বলে পকেট থেকে কার্ডটা বের করে রজনী।

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে, রেখে দিন।'

একটু পরেই যে লোকটা কল্যাণমের চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, সে ফিরে এসে বলল —'ভেতরে গিয়ে স্যারকে চিঠিটা দেখাবেন। যান।'

চিঠিটা নিয়ে রজনী এগিয়ে গিয়ে বাড়িতে ঢোকে। বাইরের অফিসঘরে গান্ধীজির সেক্রেটারি কল্যাণমকে 'নমস্তে' বলে চিঠিটা দেখায়। চিঠির এককোণে ওনার ইনিসিয়াল ছিল। সেটা দেখে উনি অফিসের অন্য টেবিলে বসা একজনকে চিঠিটা দেন। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি চিঠিটা থেকে রজনীর নাম, ঠিকানা, পেশা, উদ্দেশ্য ইত্যাদি ভিজিটার্স বুকে লিখে রজনীকে দিয়ে সই করায়। তারপরে চিঠিটায় 'অ্যালাউড' লেখা স্ট্যাম্প মেরে রজনীর হাতে দিয়ে বলে— 'ভেতরে যান। দশ মিনিট সময় পাবেন। আর হ্যাঁ, বাপুজিকে ছোঁওয়ার চেষ্টা করবেন না।'

খানিকটা বারান্দা পেরিয়ে বাপুজির ঘর। তার দরজার সামনে একজন দাঁড়িয়ে। সম্ভবত সাদা পোশাকের পুলিশই হবে। সে চিঠিটা দেখতে চায়। সেটা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে একটা কাঁটা ফাইলে সেটা গেঁথে রেখে বলে— 'যান'।

ভেতরে ঢুকে রজনী দেখে সাদা ফরাসের ওপরে পা দুটো পাশের দিকে ভাঁজ করে বসে গান্ধীজি একটা নীচু ডেস্কের ওপরে রাখা কিছু কাগজ পড়ছেন মনোযোগ দিয়ে। ঘরের এককোণে একটা চরকা রাখা। গান্ধীজির বাঁ-পাশে খানিক দূরে বসে সুরাওর্দী।

সে ধীরপায়ে এগিয়ে যায় গান্ধীজির দিকে। হাঁটু মুড়ে বসে জাতির জনকের সামনে। গান্ধীজি এবারে কাগজটা উলটে পরের পাতাটা পড়তে থাকেন। অটোগ্রাফের খাতা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে রজনী। তার মনে হয়— তার খাতাটা নিয়ে কল্যাণমের লোকই তো সই করিয়ে আনতে পারত। কিন্তু তাকে এতোদূর অ্যালাউ করা হয়েছে কেন? এ নিশ্চয়ই ডাক্তার রায়ের রেকমেন্ডেশনের জোর, কিংবা তার কপালের।

এদিকে মিনিট তিনেক হয়ে গেল সে বসে। বাপুজি কাজে মগ্ন। তাঁকে সামনা সামনি দেখে রজনী এখন বুঝতে পারছে, কেন লোকে ওনাকে এত সম্মান করে। উনি যেন ধ্যানমগ্ন এক সন্ন্যাসী। ইচ্ছে হলেই উনি আরামে, বিলাসে জীবন কাটাতে পারতেন। মহামূল্য পোশাক পরে মহার্ঘ্য গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারতেন। কিন্তু সে পথ না মাড়িয়ে এই জ্ঞানী বৃদ্ধের জীবনদর্শন হল— 'আরাম হারাম হ্যায়।' তাই বুঝি এই বৃদ্ধ বয়সেও উনি অহর্নিশ কাজ করে চলেন, আচ্ছা আচ্ছা যুবকেরাও হার মানে তাঁর চলার বেগের কাছে। এমনই ফিটনেস এখনও।

এমন সময় গান্ধীজির হুঁশ ফিরল। যে কাগজটা পড়ছিলেন তার নীচে সই করে পাশে রাখা একটা পেপার ওয়েট নিয়ে সেটা দিয়ে কাগজটা চাপা দিয়ে বললেন— 'ক্যা চাহিয়ে বেটা?'

রজনী অটোগ্রাফের খাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে— ‘বাপুজি, অটোগ্রাফ।’

গান্ধীজি খাতাটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— ‘তুমহারা নাম ক্যা হ্যায় বেটা?’

—‘রজনীকান্ত রায়, বাপুজি।’

তারপরে উনি প্রথম পাতাতে ইংরাজিতে লিখলেন— ‘ডিয়ার রজনীকান্ত, মেক ইন্ডিয়া এ গ্রেট নেশন’ আর তার নীচে ইংরাজিতেই সই করে খাতাটা সুরাওর্দীর দিকে বাড়িয়ে ধরে মৃদু হেসে বললেন— ‘তুম ভি এক অটোগ্রাফ দে দো, সি এম।’

খাতাটা নিয়ে মৃদু হেসে সুরাওর্দী বাংলায় লিখলেন— ‘রজনীকান্তকে হার্দিক শুভেচ্ছাসহ’। তবে তার নীচে সই করলেন ইংরাজিতেই।

খাতাটা নিয়ে দু-জনকে হাতজোড় করে নমস্কার করে রজনী উঠে দাঁড়াল। দু-জনেই প্রতিনমস্কার জানালেন। তারপরে ঘরের বাইরে এসে রজনী কল্যাণমের সহকারীকে বললে কল্যাণমকে দিয়ে একটা সই করিয়ে দিতে। কল্যাণমকে সরাসরি বলতে তার সাহস হল না। সহকারী অটোগ্রাফ খাতাটা নিয়ে উঠে গিয়ে তাঁর টেবিলে গিয়ে কিছু বলতেই কল্যাণম একবার চোখ তুলে দেখলেন রজনীকে। আগের পাতাদুটো উলটেপালটে দেখে খসখস করে সই দিয়ে খাতাটা ফেরত দিয়ে দিলেন সহকারীকে।

তারপর? তারপরে আচম্বিতেই ঘটে গেল ঘটনাটা। বাইরে থেকে একটা সমবেত চিৎকার শোনা গেল। তার পরক্ষণেই দড়াম করে জানলার কাঁচে এসে লাগল একটা কিছু। ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ল কাঁচটা। ছড়িয়ে গেল অফিসঘরের মেঝেতে।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল সবাই। কল্যাণম আর তাঁর সহকারী উঠে দাঁড়িয়েছেন। বাইরে থেকে ভেসে আসছে উন্মত্ত জনতার চিৎকার। তার মানে, যে অল্পসংখ্যক পুলিশ বাইরের সিকিওরিটির ব্যবস্থায় ছিল, তাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি এই ক্ষিপ্ত জনতাকে। প্রবল ক্ষোভের ধাক্কায় ভেঙে গেছে তাদের পলকা প্রতিরোধের বেড়া। দাঙ্গার সময় থেকেই জনতার মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ ছিলই। কিন্তু কোনো কারণে সেটা যে হঠাৎ এত তীব্র হতে পারে তা পুলিশ আগে আন্দাজ করতে পারেনি।

এদিকে বাইরের বিক্ষুব্ধ জনতা ঢুকতে চায় ভেতরে। একসময় তারা দু-চারজন ঢুকেও পড়ে অফিসঘরের সামনের দিকে। হকিস্টিক, লাঠি আর পাথরের আঘাতে চূর্ণ হতে থাকে দেওয়ালে টাঙানো ছবি, টেবিল, চেয়ার। হাওয়ায় উড়তে থাকে টেবিলের কাগজপত্র। জনতার ক্ষোভ এখন পরিণত হয়েছে আক্রোশে। তাই ক্ষিপ্ত জনতা চিৎকার করতে থাকে। সেই চিৎকার থেকে রজনী যেটুকু বুঝতে পারে, তা হল— কাঁচড়াপাড়ার এক মসজিদের আজানের সময় দু-সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সেই সংঘর্ষ ক্রমে এমনই সাংঘাতিক হয়ে ওঠে যে বাধ্য হয়ে সেখানে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। তাতে নাকি কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে। আর তারই ফলে উন্মত্ত জনতা চায় সুরাওর্দীকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক।

তবুও অফিসঘরের মুখে বাকি যে ক-জন পুলিশ ছিল, তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে অফিসঘর থেকে জনতাকে বের করে দিতে। একসময় অফিসঘরের মুখে তারা জনতাকে আটকে রাখতে সমর্থও হয়। ওদিকে অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ডিসি অ্যান্টি-রায়ট ফোর্স চেয়ে ওয়্যারলেসে খবর পাঠান। গতিক সুবিধের নয় বুঝে কল্যাণম তাঁর সহকারীকে নিয়ে গান্ধীজিকে খবর দিতে ভেতরের ঘরে যান। তাঁর কাছে সব শুনে একটু পরেই গান্ধীজি বেরিয়ে আসেন। এখন তিনি রজনীর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে। জনা চারেক লাঠিধারী পুলিশ

ঘিরে রেখেছে তাঁকে। রজনী যে পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, সে খেয়ালই নেই তাদের। এদিকে ক্রোধান্ধ জনতা ক্রমাগত দাবি করে যাচ্ছে সুরাওর্দীকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্যে।

গান্ধীজি হাতজোড় করে জনতাকে শান্ত হতে বলছেন, কিন্তু তাদের চিৎকারে বাতাসেই হারিয়ে যাচ্ছে তাঁর কথা। তা ছাড়া যদিও বা তারা তাঁর কথা শুনতে পেত, তবুও তারা থামত কি? আর তাই বাইরে থেকে ছুটে আসা ইঁটের আঘাতে গান্ধীজিকে আগলে রাখা দু-জন পুলিশ মাথা চেপে ধরে বসে পড়েছে মাটিতে। বাকি দু-জনও উদ্‌ভ্রান্ত। তারা তাদের আহত সহকর্মীদের সরাবে, নাকি বাপুকে রক্ষা করবে? কল্যাণমও বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন গান্ধীজির ঠিক পিছনেই।

এমনসময় রজনী হঠাৎ দেখে একটা আধলা ইঁট ছুটে আসছে গান্ধীজির দিকে। সে খপ করে ধরে ফেলে সেটা। পরক্ষণেই আর একটা আধলা। গান্ধীজি আর কল্যাণম কোনোরকমে মাথা সরিয়ে নিতেই সেটা গিয়ে আছড়ে পড়ল ঘরের জানলার শার্সিতে।

একের পর এক আধলা ইঁট আর পাথর ছুটে আসছে বাপুর দিকে। যেকোনো মুহূর্তে সেগুলো আঘাত করতে পারে তাঁকে। উন্মত্ত জনতা আজ গান্ধীজিকেও রেয়াত করছে না। ওই যে আবারও দুটো আধলা পথভুলে ছুটে আসছে রজনীর দিকে। রজনী তার একটাকে আটকায় হাত দিয়ে, কিন্তু আরেকটা এসে আঘাত করে তার কাঁধে। সেসবে আমল না দিয়ে সে কল্যাণমকে বলে গান্ধীজিকে ভেতরে নিয়ে যেতে আর নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে দাঁড়ায় তাঁদের। রজনীর কথা শুনে কল্যাণম যতক্ষণে বাপুজিকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছেন, ততক্ষণে রজনীর পিঠে আছড়ে পড়েছে গোটাকয়েক আধলা ইঁট আর পাথর।

এদিকে অফিসঘরের মুখের পুলিশেরাও প্রাণ বাঁচাতে পালিয়েছে আর কল্যাণমও ভেতরের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। এদিকে ক্ষিপ্ত জনতা ঢুকে পড়েছে অফিসঘরে। এখন এই উন্মত্ত আক্রোশের পরিধির বাইরে যেতে হবে তাকে। ঠেলাঠেলি করে দরজা দিয়ে ঢুকছে লোক। তাদের লক্ষ্য ওই বন্ধ দরজার দিকে যার আড়ালে এখন আছেন সুরাওর্দী। রজনী বা বাকি পুলিশ তাদের লক্ষ্য নয় আর সেই সুযোগটাই নেয় রজনী। সে অফিসঘরের একটা থামের আড়ালে গিয়ে তেড়ে আসা একটা লোকের পাঁজরে সজোরে একটা কিক করে। লোকটা পড়ে যায় মাটিতে। তার হাতের হকিস্টিকটা ছিটকে পড়ে মাটিতে। অন্য লোকেরা তা খেয়ালই করে না। তারা এখন রাগে অন্ধ। রাগের চোটে ধেয়ে আসা পেছনের লোক হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ছে সামনের জনের গায়ে। কিন্তু তাতে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা তাদের রাগ মেটাতে হাতের সামনে যা পাচ্ছে তাইই ভাঙছে। আর তাদের সেই বিশৃঙ্খলতার সুযোগ নিয়েই রজনী তুলে নেয় মাটিতে পড়ে থাকা স্টিকটা। সেটা দিয়ে দেওয়ালে, বন্ধ দরজায় আর ভাঙা আসবাবপত্রে পেটাতে পেটাতে ক্রমশ অফিসঘরের খোলা দরজার দিকে এগোতে থাকে। রাগে পাগল জনতা তার এই ভাণ বুঝতে পারে না। কে কাকে খেয়াল করছে তখন? এইরকমভাবেই একসময় দরজা দিয়ে বেরিয়ে উন্মত্ততার অভিনয় করতে করতে বাইরে জড়ো হওয়া জনতার বেষ্টনির বাইরে বেরিয়ে আসে সে। তারপরে খানিকটা দূরে এসে হাতের হকিস্টিকটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় আর বাঁ-দিকের একটা গলিতে ঢুকে পড়ে। এখানে কেউ নেই। এই গলিটাই একটু দূর দিয়ে ঘুরে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে পাক মেরে গিয়ে মিশেছে বড়ো রাস্তায়। রজনী সেইপথেই রাতের বাতাসে ভেসে আসা উন্মত্ততার আওয়াজ শুনতে শুনতে এগিয়ে চলে বড়ো রাস্তার দিকে। যেতে যেতে একসময় প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখে নেয়

অটোগ্রাফের খাতাটা। না, সেটা ঠিকই আছে, শুধু ডামাডোলের মাঝে পড়ে একটু বেঁকে গেছে।

বড়ো রাস্তায় আসতেই সে শুনতে পেল দুম-দুম করে কয়েকটা চাপা আওয়াজ। না, এগুলো হাতবোমার বা ফায়ারিংয়ের শব্দ নয়। ধর্মতলার মিছিলে একসময় সে এই আওয়াজ শুনেছে। টিয়ার-শেল ছোঁড়ার শব্দ। রজনী বুঝতে পারল যে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে অ্যান্টি-রায়ট ফোর্স কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়েছে। তাই হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে সে। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারে যে তার চোখদুটোও জ্বলছে। জল কাটছে। এখন যে করেই হোক গান্ধীজির বাড়ির দিক থেকে ধেয়ে আসা হাওয়ার বাইরে বেরোতেই হবে তাকে। তাই রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সে কোনোরকমে বড়ো রাস্তাটা পার হয়ে গিয়ে একটা রাস্তা ধোয়ার চাপাকলের কাছে পৌঁছয়। তখনও সেটা থেকে গলগল করে গঙ্গার জল বেরোচ্ছে। কলটার পাশে বসে পড়ে সেই জলেরই ঝাপটা দিতে থাকে চোখে। বেশ ভালো করে কয়েকবার ধোওয়ার পরে বুঝতে পারে যে জ্বালাটা ক্রমশ কমছে। তাই ভেজা রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ায় রজনী।

তার মনে হতে থাকে— এই অরাজকতা, এই সাম্প্রদায়িক হানাহানি, এই গণহিস্টিরিয়া কবে কমবে? এভাবেই কি আসবে স্বাধীনতা? জানে না। এর উত্তর সে জানে না। তাহলে জানে কে?... সব বিখ্যাত রাজনৈতিক মুখগুলোই যেন ক্রমে ক্রমে মুখোশ হয়ে যাচ্ছে।

তবে সেইসঙ্গে একটা গভীর সুখও পাচ্ছে সে। একসময় পরিস্থিতির চাপে কয়েকজন মানুষের প্রাণ নিতে হয়েছিল তাকে; কিন্তু মানুষের প্রাণরক্ষা করাতে যে এত তৃপ্তি তা সে আগে জানত না। তাই তার পিঠে লাগা ইঁট-পাথরের আঘাতের ব্যথাও এখন তার কাছে তুচ্ছ। এই ব্যথা যেন তার কাছে কোনো স্নেহময় হাতের স্পর্শের পেলব অনুভূতি। একটা আশীর্বাদ। ব্যথা তো ক-দিন পরে কমে যাবেই; কিন্তু তার এই আত্মতৃপ্তিটা থেকে যাবে আজীবন।

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬

সন্ধেবেলা কানাইকে নিয়ে রজনী হাজির গোপালবাবুর অফিসে। কানাই যথারীতি সঙ্গে নিয়েছে তার নতুন পাওয়া অটোগ্রাফের খাতা।

আজ গোপালবাবু একলা বসে। একটু দূরে অন্য একটা চেয়ারে বসে বসন্ত খবরের কাগজ পড়ছে। তবে আজ গোপালবাবুর মুখটা কেমন যেন থমথমে।

—'নমস্কার দাদা।'

—'আরে রজনীবাবু যে, নমস্কার। বসুন বসুন। আরে বাবা, সঙ্গে তো খোকাবাবুও রয়েছে দেখছি।' দু-জনে গোপালবাবুর সামনের চেয়ারে বসতে গোপাল বললেন— 'ও বসন্ত।'

কাগজ রেখে বসন্ত বলল— 'হ্যাঁ দাদা বলুন।'

—বলি, যুগলদার কাছ থেকে ওনার স্কুলের চেকটা এনেছ?'

—'হ্যাঁ দাদা, দিচ্ছি।' বলে বসন্ত আলমারি খুলতে এগিয়ে যায়।

হাঁ হাঁ করে ওঠেন গোপালবাবু। বলেন— 'আরে চেকটা যখন এসেই গেছে তখন তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তার আগে তুমি বরং সবার জন্যে এক রাউন্ড চায়ের ব্যবস্থা কর আর খোকাবাবু কী খাবে দেখ।'

কানাই বলে উঠল— 'আমি শিঙাড়া খাব জেঠু।'

বসন্ত এসে কানাইয়ের পিঠে সস্নেহে হাত রেখে বলল— 'ঠিক আছে। তোমায় ভালো শিঙাড়া খাওয়াব। তা ক-টা খাবে তুমি?'

—'দুটো।'

—'আচ্ছা, ঠিক আছে। একটু বসো। আনছি।' বলে বসন্ত চলে গেল বাইরে।

—'তারপর কী খবর বলুন রজনীবাবু। সবাই ভালো আছেন তো?'

—'হ্যাঁ, তা একরকম। আপনারা?'

—'একটু দুশ্চিন্তায় আছি।'

—'কি রকম? জানতে পারি কী?'

—'অবশ্যই। দুশ্চিন্তার কারণটা আর কিছুই নয়। একটা আশঙ্কা আর নিজের অক্ষমতা নিয়ে।'

—'কেন? কী হল আবার?'

—'খবরের কাগজে তো নোয়াখালির খবর পড়েছেন নিশ্চয়ই। গত মাসের একত্রিশ তারিখে বেলেঘাটায় গান্ধীজির থাকার জায়গায় হামলাও হল। এখন তো সবাই দেখছে চারপাশ শান্ত। কিন্তু দাঙ্গার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে নোয়াখালিতে। আমার ভয় যে সেখানেও না আবার দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। আর যদি তা হয়, তবে সেটা হয়তো কলকাতার চেয়েও ভয়াবহ হবে। আর আমি? আমাকে কলকাতায় হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। অপরিচিত জায়গা। তাই সেখানে দাঙ্গা বাঁধলে আমি কিচ্ছু করতে পারব না রজনীবাবু, কিচ্ছু না।'

গোপালবাবু থামতে রজনী বলে— 'এখন থেকে এত উতলা হচ্ছেন কেন? আগে দেখুন না সেখানে দাঙ্গা হয় কি না।'

—'হবার সম্ভাবনা প্রবল। ভুলে যাবেন না রজনীবাবু, মুসলিম লীগ চাইছে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ করতে। আর নোয়াখালিতে তো হিন্দুরা মাইনরিটি।'

চুপ করে থাকে রজনী। কী বলবে সে ভাবে পায় না।

এমন সময় বসন্ত ঢোকে। তার পেছন পেছন ট্রে-তে করে ভাঁড়ে চা আর ছোটো একটা চেঙারি ভরা শিঙাড়া নিয়ে একজন বিহারি।

শালপাতায় করে শিঙাড়া আর ভাঁড়ে চা আসে সবার কাছে। শুধু কানাইয়ের ক্ষেত্রে চা টা বাদ।

খেতে খেতেই গোপালবাবু বলতে থাকেন— 'রজনীবাবু, ভারত টুকরো টুকরো হবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না। এটাই আমাদের নিয়তি। খণ্ডাবে কে?' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে গোপালবাবুর বুক চিরে।

খাওয়া শেষ হতেই বসন্ত আলমারি থেকে একটা খাম বের করে আনে। দাদার হাতে দেয় সেটা। তোয়ালেতে হাত মুছে রজনীর হাতে খামটা দিয়ে গোপালবাবু বলেন— 'এইটা পারলাম জোগাড় করতে। আর যদি কিছু প্রয়োজন হয়, সেটা আপনারা চাঁদা তুলে করে নেবেন ভাই।'

খাম থেকে চেকটা বের করে রজনী হাতে নিয়ে দেখে। পনেরো হাজার টাকা। সে তো অনেক। ঠিকমতো বুঝেশুনে খরচ করলে স্কুলটা আবার নতুন হয়ে যাবে। সে আপ্লুত হয়ে গোপালবাবুর দিকে দু-হাত বাড়িয়ে দেয়। গোপালও তার হাতদুটো ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দেন।

কানাই এতক্ষণ ধরে সব দেখছিল, শুনছিল। এবার সে খাতাটা বাড়িয়ে দেয় গোপালবাবুর দিকে।

—'এটা কী গো খোকাবাবু' ?

—'অটোগ্রাফ খাতা। এতে তোমার অটোগ্রাফ দাও জেঠু।'

—'অটোগ্রাফ দেব আমি? কী যে বল খোকাবাবু? আমি কি অটোগ্রাফ দেবার মতো লোক?' হো হো করে হেসে ওঠেন গোপালবাবু।

—'ওসব জানি না জেঠু। তুমি অটোগ্রাফ দেবে, ব্যস।'

—'আচ্ছা বাবা, দিচ্ছি দিচ্ছি। দাঁড়াও, একটু ভাবতে দাও কী লিখব। আগে তো কখনো অটোগ্রাফ দিইনি।'

মিনিটখানেক ভেবে নিয়ে গোপালবাবু খাতায় কিছু একটা লিখে সেটা দেন কানাইয়ের হাতে। কানাই খাতাটা নিয়ে পড়ে দেখে। তাতে লেখা— 'বড়ো হওয়া ভালো, কিন্তু আরও বড়ো হল ভালো হওয়া। শুভেচ্ছা, ভালোবাসা আর অনেক আশীর্বাদ রইলো কানাইবাবুর জন্যে।' নিচে বাংলায় সই করা— গোপাল মুখোপাধ্যায়। আর সইয়ের নিচে তারিখ দেওয়া— ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬।

১৯৫০

মেসোমশাইয়ের ব্ল্যাক-আউট, সোনার বিস্কুট, কানাইয়ের রেজাল্ট আর মোকাম্বোতে প্যাম ক্রেন

ভারত তো স্বাধীন হয়েছে তিন বছর হল। কিন্তু শরণার্থীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা আর পাঞ্জাব। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এই রাজ্যে আসা শরনার্থীর স্রোত সামাল দিতে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, বেকারত্ব আর খাদ্যসংকটের বিপুল সমস্যা মাথায় নিয়েও কাজ করে চলেছেন তিনি। কর্মযোগী পুরুষ। তাই স্বাধীন ভারতকে এক নতুন পশ্চিমবঙ্গ উপহার দিতে চান। সেইজন্যেই দেশের সবাই সম্মান করে, ভালোবাসে এই অকৃতদার মানুষটাকে।

এইরকম সময়ের এক সকালে পরিতোষ বাবু মর্‌নিং-ওয়াক সেরে এসে আর্মচেয়ারে বসে চা খেতে বসেছেন। ইদানীং একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন উনি। একটু বেশি হাঁটাহাঁটি করলেই হাঁপিয়ে পড়ছেন কেমন। মনে হয় যেন বুকে একটা চাপধরা ভাব। অবশ্য বাড়ির কাউকে এসব কথা বলেননি তিনি, পাছে সবাই দুশ্চিন্তা করে। তবে ইচ্ছে আছে দু-চার দিনের মধ্যেই একদিন সন্ধেবেলা বেরিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আসবেন। কেষ্ট চা-বিস্কুট দিয়ে গেলে রেডিয়োর নবটা ঘোরান। একটু পরেই খবর শুরু হবে। কিন্তু কি জানি কেন আজ আর তাঁর খবর শুনতে ইচ্ছে করছে না। তাই অফ করে দিলেন রেডিয়োটা। চেয়ারে শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে বসে রইলেন চুপ করে। মনে হতে লাগল— অনেকদিন দুই মেয়ে আর নাতি-নাতনিদের মুখ দেখেননি তিনি। যুদ্ধ, দাঙ্গা, স্বাধীন ভারতের নতুন নতুন আইন ইত্যাদি নানান ঝক্কির ঠেলায় আসতে পারেনি তারা। তবে ফোনে কথা হয়েছে। এইতো দু-হপ্তা আগেই ছোটোর সঙ্গে কথা হল। ভালোই আছে তারা। তার দিন দশেক আগে ফোন করেছিল বড়োজামাই। তখন মেয়ে আর নাতির সঙ্গেও কথা হল। বড়ো নাতিটা বাংলাতেই কথা বলে তাঁদের সঙ্গে, তবে তাতে ইংরাজি টানটা থাকে। আর সেটাই তো স্বাভাবিক। সে তো ছোটোবেলা থেকেই ইংরাজি ভাষার আবহে বড়ো হচ্ছে কি না। তবে বাড়িতে বাংলার চর্চা আছে বলেই সে বাংলাতেও কথা বলতে আর বুঝতে পারে। তাতে খুশি উনি। অনেক প্রবাসী বাঙালি তো বাংলাকে ব্রাত্য ভাষা বলেই মনে করে। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি।

তবে অনেকদিন ধরেই তাঁর ইচ্ছে করছে ওদের দেখার। আর আজ সকালে যেন তাঁর সেই ইচ্ছেটাই আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। ফ্লোরিডায় এখন প্রায় রাত সাড়ে ন-টা। এই সময়টাতেই কথা হয় বড়োর সঙ্গে। ওরাই ওদের সুবিধেমতো কল করে। আর অস্ট্রেলিয়ার পার্থ থেকে ছোটো ফোন করে বিকেল নাগাদ। তাদের সঙ্গে কথা বললে মনে হয় যে এখনও তাঁর রক্ত বহন করে কয়েকটা মানুষ সুখে আছে পৃথিবীর দুই প্রান্তে।

এদিকে কেষ্টর রেখে যাওয়া চা টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তাই সেটা নেবার জন্যে শরীরটা তুলতে যেতেই সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। বেশ কয়েকমিনিট পরে আস্তে আস্তে চোখ মেললেন তিনি।

না, আজ সন্ধেবেলা ডাক্তারকে দেখাতেই হবে। এই সিম্পটমের অর্থ ভালোই জানেন পরিতোষ বাবু।

১৯৫৩

কানাই এখনও রজনীর সঙ্গে বউবাজারের বাড়িতেই থাকে। তবে আলাদা ঘরে এখন তার ঠাঁই। মাসিমাই সেই ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কারণ ছেলে বড়ো হয়েছে। তার কলেজের বন্ধুবান্ধব এই বাড়িতে আসে, গল্পগুজব করে। তাদের এই ইয়ং জেনারেশনের আড্ডা-ইয়ার্কির রকমটাই অন্য। রজনী তাতে অস্বস্তি বোধ করতে পারে। অস্বস্তি হবে কানাইয়েরও। তাই মাসিমার পাকা মাথার ভাবনায় আলাদা ঘরে ঠাঁই হয়েছে কানাইয়ের।

তবে বছর চারেক থেকেই রজনী দেখছে যে সকালে ছাদে তাইকোন্ডো প্র্যাকটিসের সময়টুকু বাদ দিলে কানাই তার সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। শুধু তার সঙ্গেই নয়, মেসোমশাই আর মাসিমার সঙ্গেও তার একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে ধীরে ধীরে। রজনী বোঝে যে এটাই জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম। তাই সেটা সে মেনেই নিয়েছে। তবে তার নজর থাকে কানাইয়ের ওপর। সে লক্ষ্য করে দেখেছে যে পড়াশোনার বইয়ের বাইরেও কানাই অনেক ধরণের বই পড়ে। তা ছাড়া সে মেসোমশাইয়ের রাখা টাইমস অফ ইন্ডিয়াও পড়ে। তাই কখনো কোনো প্রসঙ্গে যদি কোনো কথা ওঠে তখন কানাই যেসব রেফারেন্স দেয় বা যেসব যুক্তি খাড়া করে, তাতে তার মেধা বা বিশ্লেষণ ক্ষমতা নিয়ে সংশয় থাকে না রজনীর। প্রেসিডেন্সির ছেলেরা বুঝি এমনই হয়। নিজের কলেজ জীবন থেকেই প্রেসিডেন্সির সুনামের কথা জানে সে। আজ কানাই তার মেধার জোরেই ঠাঁই করে নিয়েছে সেই সমাজে। কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়ে সে সেখানে।

১৯৫৬

আজ মাস্টার ডিগ্রির রেজাল্ট বেরোবে। তাই সকাল সকাল ছাদে রজনীর সঙ্গে তাইকোন্ডো ঝালিয়ে নিয়ে কানাই বেরিয়ে পড়েছে একটু আগেই। উদ্দেশ্য হল, বন্ধুদের সঙ্গে কফিহাউসে বসে খানিক আড্ডা মেরে রেজাল্টের আগের টেনশনটা কাটিয়ে নেওয়া। সে জানে যে ফার্স্টক্লাস সে পাবেই কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যান্টনি সিনহাকে সে টপকাতে পারবে কি না, সেটাই এখন তার টেনশনের বিষয়। মার্চেন্ট নেভির ক্যাপ্টেন দেবরাজ সিনহার ছেলে হলেও, প্রাচুর্যে মানুষ হলেও কেমিস্ট্রিতে অ্যান্টনির দখল রীতিমতো ভালো। তাই মার্কসে তাকে টপকে যাওয়াই কানাইয়ের কাছে চ্যালেঞ্জ। আসলে কানাই যে হারতে ভালোবাসে না— তা সে তাইকোন্ডোই হোক, কী লেখাপড়া।

কানাই কফিহাউসে পৌঁছে দেখে সেখানে ইতিমধ্যেই একটা টেবিলে জাঁকিয়ে বসেছে অ্যান্টনি, অরুণোদয়, বৈভব আর সৌগত। এরা সকলেই বেশ ভালো স্টুডেন্ট। কানাই দেখে টেবিলের ওপরে রাখা একটা মার্লবোরোর প্যাকেট। অ্যান্টনির বাবার আনা। এমনকী ওর বুকপকেট থেকে যে রেব্যান ওয়েফেয়ারার সানগ্লাসটা উঁকি মারছে সেটাও। কানাইয়েরও শখ ওইরকম একটা সানগ্লাসের। কিন্তু তার কাছে এটা এখন শুধুই স্বপ্ন। তবে হ্যাঁ, একদিন না একদিন সে সেটা অর্জন করবেই। ভালো একটা কোম্পানিতে চাকরি পেলেই সে ছ-মাসের মধ্যে ওরকম একটা সানগ্লাস কিনবেই। হয়তো আজকের রেজাল্টেই তার ভবিষ্যতের একটা আভাষ পাওয়া যাবে। আজকের রেজাল্টই হয়তো বলে দেবে সে ওই সানগ্লাসের যোগ্য কি না।

একটা চেয়ার দখল করে বসতেই বৈভব বলে উঠল— 'আরে গুরু, প্রায় হাফ অ্যান আওয়ার লেট। কী ব্যাপার বল তো?'

কানাই ইয়ার্কি মেরে মুচকি হেসে বলে— 'আরে বস, তোরা তো জানিস যে রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার একটু হাত-পা ছোঁড়ার অভ্যেস আছে। তাই একটু... যাকগে, একটা কফি বল তো দেখি।'

অ্যান্টনি ধীরেসুস্থে বেয়ারাকে ডেকে কানাইয়ের জন্যে একটা কফির অর্ডার দিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললে— 'আজকের জন্যে অন্তত একটা নে। টেনশনটা কমবে। তোর চোখমুখ দেখেই মনে হচ্ছে যে তুই আজ একটু টেনশনে আছিস।'

কানাই চোখ মেরে হেসে বললে— 'আরে ইয়ার, হাত-পা ছোঁড়া ছেলেরা সিগারেট খায় না। তা ছাড়া রেজাল্টের দিনে একটু টেনশন তো থাকবেই।'

অ্যান্টনিও কম যায় না। সে প্যাকেটটা সরিয়ে নিয়ে টেবিলে রেখে ছদ্মগাম্ভীর্যে বলে— 'তো মিস্টার মিল্কফেড, বলি এতদিন ধরে যে হাত-পা ছুঁড়ছিস, তা কতজনকে একসঙ্গে হাসপাতালে পাঠাতে পারবি শুনি?'

কানাই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভেঙে বললে— 'জনা ছয়েক কোনো ব্যাপার নয়।'

অরুণোদয় একটা খবরের কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। সে কানাইয়ের কথাটা শুনে চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললে— 'আর উইপনস নিয়ে থাকলে?'

—'উইপনস বলতে তুই যদি ছেনি-হাতুড়ি বোঝাস, তাহলে একজনকেও নয়। তবে হাতে বোমা-গ্রেনেড ছাড়া আর অন্য কোনো উইপনস থাকলে সংখ্যাটা ওই ছয়ই থাকবে।' বলে কানাই মৃদু হাসে।

সৌগত ছুঁড়ে দেয়— 'কনফিডেন্ট?'

—'ইয়েস কনফিডেন্ট।'

অ্যান্টনি বললে— 'আর রেজাল্টের ব্যাপারে?'

—'আরে ওটাতেই তো ঠিক কনফিডেন্ট নই। তাই একটু টেনশন...।' হেসে বলে কানাই। শুনে সবাই হেসে ওঠে।

বৈভব হেসে বলে— 'এতক্ষণে কানুর বাঁশি ঠিক সুর মিলিয়েছে আমাদের সাথে।'

—'তাহলে হয়ে যাক বেটিং।' কথাটা অ্যান্টনির।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই অরুণোদয় বলে— 'হ্যাঁরে, কীসের বেটিং রে? অ্যান্টনি, তুই কি আজকাল আবার ঘোড়ার ল্যাজ ধরতে শুরু করেছিস নাকি? কই, জানতাম না তো?'

—'ধ্যার শালা। শোন, দু-পেগ মাল খেলে ক্যাপ্টেন সিনহা হয়তো কিছু বলবে না, কিন্তু ঘোড়ার পেছনে পড়েছি জানলে...। তা ছাড়া গ্যাম্বলিংয়ে আমার তেমন ইন্টারেস্টও নেই। ওটা পুরো প্রোব্যাবলিটির খেল।'

সৌগত খিঁচিয়ে উঠে অ্যান্টনিকে বলে— 'তা কীসের বেটিং বলছিস, সেটা ঝেড়ে কাশ না শালা।'

—'বেটিংটা হবে কানাইয়ের সঙ্গে।'

কানাই খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে বলে— 'মানে? আমার সাথে বেটিং। কীসের বেটিং বল তো?'

অ্যান্টনি বলে— 'এক্সামের মার্কসের।'

—'ও, তাই বল। তা সেটা কীরকম শুনি?' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কানাই।

—'আজ আমার মার্কস পার্সেন্টেজ তোর থেকে বেশি থাকলে ট্রিট দেব আমি, আর তোর পার্সেন্টেজ আমার থেকে বেশি থাকলে ট্রিট দিবি তুই। রাজি? দেখি কে জেতে আর কে হারে।' অ্যান্টনি মিটিমিটি হাসতে থাকে। তার এই কথায় কিন্তু কোনো হিংসে বা ঐশ্বর্যের অহমিকা ছিল না; ছিল অকৃত্রিম বন্ধুত্বমূলক প্রতিযোগিতার আহ্বান। কানাই সেটা বেশ বুঝতে পারল। তবুও কথাটা শুনে কানাই ভেতরে ভেতরে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

সে জানে যে সে গরিব ঘরের ছেলে। তার জীবনে এতকিছু সে পেয়েছে শুধুমাত্র তার স্যারের জন্যে। কখনো মুখ ফুটে চাইতে হয়নি, কিন্তু স্যার ঠিক বুঝে নিয়ে নিজে থেকেই তার পড়াশোনার খরচ, তার হাতখরচা জুগিয়ে এসেছে। এমনকী পড়াশোনার ক্ষতি হবে বলে স্যার তাকে টিউশনিও করতে দেয়নি। কিন্তু ট্রিট দিতে গেলে যে পয়সাটা লাগবে, সেটা কি স্যারের কাছ থেকে চাওয়া যায়? তবু বন্ধুদের কাছে নিজের মান রাখতে সে বলে— 'আচ্ছা। ঠিক আছে। সে দেখা যাবে। তবে আগে রেজাল্টটা তো বেরোক।'

আর্দালি কফি দিয়ে যায় কানাইকে। গরম কফিতে সবে একটা চুমুক দিয়েছে কানাই আর ঠিক তখনই অরুণোদয় খবরের কাগজের একটা খবর সবাইকে দেখিয়ে বলে ওঠে — 'এই দ্যাখ দ্যাখ, কী লিখেছে। বোম্বাই থেকে দমন যাবার পথে একজন নাকি চারটে সোনার বিস্কুট নিয়ে ধরা পড়েছে।... ইস মাইরি, আমরা যদি ওইরকম এক একটা সোনার বিস্কুট পেতাম...।'

বৈভব তাকে ভেঙিয়ে বলে— 'সোনার বিস্কুট পেতাম...। শালা এমনি বিস্কুট জোটে না, আবার সোনার বিস্কুট...।' আরও হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু পাছে কিছু স্ল্যাং বেরিয়ে যায়, তাই সৌগত তাকে থামিয়ে দিয়ে অরুণোদয়কে বলে— 'নে নে, ভ্যান্তারা না করে বাকিটা পড়ত দেখি।'

—'লিখেছে— বোম্বাই পুলিশের ধারণা যে ওই লোকটা নাকি গালিব শেখ নামে এক আরবের লোক হতে পারে; কারণ দিন-পাঁচেক আগে গালিব শেখ বোম্বাইতে এসেছিল আর ওই শেখের সঙ্গে দমনের স্মাগলার সুকুর নারায়াণ বখিয়ার যোগ আছে। তা পুলিশ এখন ওই ক্যারিয়ারটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।'

কফিতে চুমুক দিতে দিতে কানাই অরুণোদয়ের কথা শুনছিল।

এদিকে সব শুনে অ্যান্টনি একটা ধোঁওয়ার রিং উড়িয়ে দিয়ে বললে— 'হ্যাঁ, ক-দিন আগে বাবার কাছে শুনছিলাম যে, বোম্বাইতে এখন নাকি আন্ডারওয়ার্ল্ড খুবই অর্গানাইজড। সবাইকার এলাকা ভাগ করা আছে। কেউ কারোর এলাকায় ঢোকে না। তারজন্যে এখন নাকি খুনোখুনি প্রায় নেই বললেই চলে।'

—'...আর ওখানকার আন্ডারওয়ার্ল্ড এত অর্গানাইজড হয়েছে একজন লোকের জন্যে।' বলেই কফিতে একটা লম্বা চুমুক দেয় কানাই।

সৌগত আর বৈভব প্রায় একসঙ্গেই বলে ওঠে— 'কে? কে সেই মহান ব্যক্তি শুনি? নামটা জানিস নাকি?'

—'নামটা হল "মস্তান হায়দার মির্জা"। তামিল অরিজিন। বোম্বাইয়ের ক্রফোর্ড মার্কেট এলাকায় ওদের সাইকেলের দোকান ছিল। কিন্তু অ্যাম্বিশাস হায়দার সে কাজ ছেড়ে বোম্বাই ডকে পোর্টারের কাজ নেয়। আর কলাটা, মুলোটা স্মাগলিং করতে করতে একসময় তার আলাপ হয় গালিব শেখের সঙ্গে।' একটু থেমে কফিতে আর একটা চুমুক দিয়ে বলতে শুরু করে— 'তারপর থেকেই তার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। আর

ইদানীং নাকি তার কথাই বোম্বাইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ডের শেষ কথা। তবে হ্যাঁ, তার নিজস্ব কোনো গ্যাং নেই... মানে দু-চারজন খুব বিশ্বাসী লোকের মাধ্যমে সে অপারেট করে সবকিছু। আর সবচেয়ে বড়োকথা এই যে, এতসব করতে গিয়ে কখনো একটাও গুলি ছোঁড়েনি। তোরা দেখে নিস, ওই যে লোকটা ধরা পড়েছে, ওর কিচ্ছু হবে না। থানায় একটা ফোন যাবে আর তারপরে সব ধামাচাপা পড়ে যাবে।'

অরুণোদয় ঠেস মেরে বললে— 'তা তুই এতসব জানলি কী করে, অ্যাঁ? আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে কি তোমার টাই-আপ আছে নাকি গুরু?'

—'আরে শালা, তোরা তো শুধু টেক্সট বুক আর তার রেফারেন্স বুকেতেই নিজেদের আটকে রেখেছিস। চারপাশে কী ঘটছে না ঘটছে, কিছুই তো খবর রাখিস না।' কানাই একটু বিরক্তিতেই জবাব দিল।

—'তা তুই কী করে এসব জানলি?' প্রশ্নটা সৌগতর।

—'বাড়িতে দাদু TOI রাখে। সন্ধেবেলা বই নিয়ে বসার আগে তাতে একবার চোখ বোলাই। তা সেখানেই ওই মস্তান হায়দার মির্জাকে নিয়ে কিছুদিন আগে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল। প্রায় আধপাতা জোড়া। সেটাই পড়েছিলাম আর সেটা থেকেই তোদের এখন জ্ঞান ঝাড়লাম। বুঝলি?' কানাই হাসে।

—'মানে পরের ধনে পোদ্দারি করলি, তাই তো?' হো-হো করে হেসে ওঠে সবাই।

রেজাল্ট বেরিয়েছে।

মার্কস দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কানাই। সে পেরেছে। অ্যান্টনি সিনহাকে সে পার্সেন্টেজে টপকেছে। সে পেয়েছে এইট্টি ওয়ান পার্সেন্ট, অ্যান্টনির এইট্টি পয়েন্ট ফাইভ আর অরুণোদয়ের জাস্ট এইট্টি পার্সেন্ট। তফাৎ সামান্যই। তবু, তফাৎ মানে তফাৎই। বাকিদের সবারই মার্কস বেশ ওপরের দিকেই, তবে কেউ আশির কোটা ছুঁতে পারেনি। তিন বন্ধু কানাইকে শুধু যে কনগ্র্যাচুলেশনস জানাল তাইই নয়; অ্যান্টনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সবাই আনন্দে আত্মহারা। কানাইও খুব খুশি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা জিনিস তাকে খোঁচা মেরেই চলেছে; আর সেটা হোলো তার অস্বচ্ছলতা। এবার বন্ধুদের যে ট্রিট দিতে হবে, কিন্তু পকেটে তার অতো পয়সা কোথায়?

ঠিক এমন সময়েই সৌগত বলে উঠল— 'ফার্স্টক্লাস তো হল। টপকালিও তো আমাদের সবাইকে। তা এবার ট্রিট দাও বস। জমিয়ে খাওয়াতে হবে কিন্তু, বলে দিলাম।'

কানাই বলল— 'আচ্ছা, অন্য একদিন হলে হত না? আজ আমি ঠিক প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসিনি।'

বৈভব ফুট কাটলো— 'শালা, ঢপ মারছিস কেন বল তো? খাওয়াবি‌না সেটা বল।'

—'না রে, সত্যি বলছি। আমরা বরং নেক্সট রোববারে মিট করি আমাদের বউবাজারের বাড়িতে। সেদিন জমিয়ে খাব সবাই।'

এদিকে কানাইয়ের কথাবার্তা শুনে অ্যান্টনি আঁচ করে নিয়েছে কানাইয়ের অবস্থা। তা ছাড়া বহুবার কানাইয়ের বাড়িতে যাতায়াতের সুবাদে সে ভালোভাবেই জানে কানাইয়ের আর্থিক অবস্থা। কিন্তু বাকিরা যে আজ নাছোড়বান্দা। তাই সে সুকৌশলে সবাইকে বলে— 'আচ্ছা, আচ্ছা, শোন। দেখ, কানাইয়ের পরেই তো আমি আছি। আজ না হয় আমিই

ট্রিটটা দিই আর নেক্সট রোববার কানাইয়ের বাড়িতেই না হয় কব্জি ডুবিয়ে মাংস-ভাত খাব সবাই। কি রে কানাই, ঠিক আছে তো?'

কানাই তাতে স্বস্তি পেয়ে বলে— 'সার্টেনলি। আজ অ্যান্টনি ট্রিট দিক আর নেক্সট সানডে আমি।'

অরুণোদয় এবার বলে— 'তা অ্যান্টনি, কোথায় ট্রিট দিবি শুনি?'

একটু ভেবে অ্যান্টনি বলল— 'দেখ, সন্ধে তো প্রায় হতেই চলল। আমরা বরং আজ যদি পার্ক স্ট্রিটে যাই?'

—'পার্ক স্ট্রিটে? কোথায় খাওয়াবি?'

—'মোকাম্বোতে যেতে তোদের আপত্তি নেই তো?'

কানাই বলল— 'কিন্তু ওটা তো বার।'

—'তাতে কী হয়েছে? বারে কি লোকে শুধু মদ খেতেই যায়? আরে, রিল্যাক্স করতেও লোকে ওখানে যায়। কতরকম কন্টিনেন্টাল ডিশ পাওয়া যায় জানিস? আর তা ছাড়া মোকাম্বোতে নাকি রিসেন্টলি প্যাম ক্রেন নামে একজন সিঙ্গার এসেছে। দারুণ জ্যাজ গায়। লোকে তাকে বলে "Diva of Calcutta" আর তার সঙ্গে উপরি পাওনা সিক্স প্যাক ব্যান্ড। সন্ধে সাতটা থেকে শুরু। বাবার কাছে শুনেছি, তবে আমি কখনো যাইনি। তাই আজ ইচ্ছে হচ্ছে তোদের সঙ্গে একসাথে প্যামের গান শোনার।'

অরুণোদয়, বৈভব, সৌগত বা কানাই এসব কখনো দেখেওনি বা শোনেওনি। তবে ওরা অ্যান্টনির টেস্ট জানে। তাই সৌগত বলেই ফেলল— 'আমায় কিন্তু স্কচ খাওয়াতে হবে গুরু।'

—'আরে ব্রাদার, তাইই হবে। ক্যাপ্টেন সিনহা আজকে আমায় যা দিয়েছেন তা যথেষ্টই। এখন চল তো, কাটি এখান থেকে।'

মোকাম্বোতে ঢুকে একটা টেবিলে জাঁকিয়ে বসে পাঁচজন। টেবিলে বসে চারপাশের পরিবেশ দেখেই অ্যান্টনি বাদে বাকিদের মুখে আর কথা সরে না। তারা তো এর আগে কখনো কোনো বারে ঢোকেনি। তাই মোকাম্বোর নরম আলো, সুদৃশ্য মেনুকার্ড, সুন্দর ইন্টেরিয়োর ডেকরেশন, প্রতিটা টেবিলের ওপরে ঝুলন্ত ল্যাম্পশেড, এমনকী টেবিলে রাখা ফুলদানিও তাদের কাছে একই সঙ্গে সুন্দর আর রহস্যময়। অনেকক্ষণ সবারই জল খাওয়া হয়নি। খুব পিপাসা পেয়েছে। তাই অ্যান্টনি চোখের ইশারায় টেবল-অ্যাটেনড্যান্টকে ডেকে জল দিতে বলল।

মিনিট চারেকের মধ্যেই এসে গেল জল। এক নিশ্বাসে জলটা খেয়েই অ্যান্টনি বলল— 'এ্যাই, বিফে তোদের আপত্তি নেই তো? নাকি চিকেন বলব?'

সবাই এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করলে। তারপরে সৌগত বলল— 'আরে না না, তুই যা খাওয়াবি তাইই খাব।' কানাই আর অরুণোদয়ের মনে একটু দ্বিধা ছিল। কিন্তু এই বয়সটাই তো অ্যাডভেঞ্চারের সময়, নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আকর্ষণের বয়েস। তাই তারাও আর কিছু বলল না, চুপ করে রইল। দেখাই যাক না কেমন খেতে। তবে অ্যান্টনি যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। সে চায় না কেউ দ্বিধা রেখে খাক। তাই সে অ্যাটেনড্যান্টকে ডেকে বলল— 'চার প্লেট চিকেন কাবাব আর চারটে ডাবল পেগ ভ্যাট উইথ আইস।'

—'থ্যাংক ইউ স্যার' বলে অ্যাটেনড্যান্ট চলে যেতেই কানাই অ্যান্টনিকে বলল—'তুই আমার জন্যে ড্রিঙ্কস বললি কেন?'

—'কী হয়েছে তাতে? একদিন খেয়েই দেখ না। তা ছাড়া কামিং সানডেতে তোর বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার পরে কে কোথায় থাকব কে জানে। তাই একদিন টেস্ট করেই দেখ। জাস্ট ফর সেলিব্রেশন।'

বৈভব বলল— 'ঠিক বলেছিস মাইরি অ্যান্টনি। এরপরে কে কোথায় থাকব, কী করব কে জানে। তবে আমাকে কিন্তু এবারে একটা চাকরি খুঁজতে হবে। বাবার আর পড়ানোর ক্ষমতা নেই। মাস ছয়েক পরেই রিটায়ার করছে।'

টেবিলের ওপরে রাখা খালি জলের গ্লাসটাকে নাড়াচাড়া করতে করতে অরুণোদয় বলল— 'বুঝলি বৈভব, বাবার ইচ্ছে ছিল পি এইচ ডি করি। কিন্তু সত্যি বলছি রে, আমার আর পড়াশোনা ভালো লাগছে না। আসলে মন বসাতে পারছি না আমি।'

—'কেন রে? তোর বাবা পড়াতে চাইছে, আর তুই কিনা...।'

—'ঋতিকাদের বাড়িতে আর দেরি করতে চাইছে না রে। তাই কোনো একটা স্কুলে যদি একটা কেমিস্ট্রি টিচারের চাকরি জুটে যায়...।' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক থেকে।

তার কাঁধে হাত চাপড়ে সৌগত সান্ত্বনা দিয়ে বলল— 'আরে, পেয়ে যাবি, পেয়ে যাবি। তোর মতো ভালো স্টুডেন্ট একটু চেষ্টা করলেই একটা কিছু পেয়ে যাবি।' তারপরে বেশ ক্ষোভের সুরেই বলল— 'শালা, মধ্যবিত্ত বাঙালির এই এক দোষ। মেয়ে গ্রাজুয়েট হল কি হল না, তাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেই শালা বেঁচে যায়। কেন রে বাপ, এতদিন যে মেয়েটাকে মানুষ করে বড়ো করলি, তাকে আরেকটু লেখাপড়া শিখিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দে না। মেয়ে মানেই যেন একবস্তা রাবিশ...শালা।'

অ্যান্টনি এতক্ষণ চুপ করে বসে টিস্যু পেপার দিয়ে একটা নৌকো বানাচ্ছিল আর ওদের কথা শুনছিল। এখন সৌগত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে দেখে সে বলল— 'আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। অরুণোদয় নিশ্চয়ই কিছু একটা জোগাড় করে ফেলবে। ওর ওপরে আমার যথেষ্ট ভরসা আছে। কিন্তু সৌগত, কলেজে তো দেখতাম যে ক্লাস না থাকলেই তুই ইউনিয়ন রুমে গিয়ে পড়ে থাকতিস। তা এবার কি রাজনীতিতে নামবি নাকি? তোর তো এসবে খুব অ্যাফিনিটি আছে।'

—'আরে, ধ্যুস। আর যাইই করি, রাজনীতি নয়। দ্যাখ, ইউনিয়ন রুমে দিনের পর দিন গিয়ে আমি যা বুঝেছি তা হল— ভালো অভিনেতা না হলে তার রাজনীতিতে আসা উচিত নয়। আমার মতো ছেলের সেই ক্ষমতা নেই ব্রাদার। আমি রাজনীতি করে কোনোদিনই কিছু করে উঠতে পারব না। তবে হ্যাঁ, এটাও সত্যি যে কোনো দেশের প্রতিটা মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে আছে। এইই দেখ না, রাজধানীতে বসে আমাদেরই নির্বাচিত করা একমুঠো মানুষ যা সিদ্ধান্ত নেবে, তার প্রভাব পড়বে আমাদের সবার ওপরেই। কেউ বাদ যাবে না। ঠিক কি না বল?'

—'সবই তো বুঝলাম। তা সেই একমুঠো রাজনীতিকদের নীতিটাকে তৈরি করে কারা? এক্সিকিউট করে কারা? সব দোষ কি রাজনীতিকদের?'

—'রাজনীতিকদের দোষ তো আছেই— কারণ পলিসি তৈরি করে আমলারা আর সেই পলিসিতে স্ট্যাম্প দেয় মন্ত্রীমশাই। আমলাদের তৈরি পলিসি যদি সঠিক না হয় তা বোঝার

ক্ষমতা অনেক মিনিস্টারের নেই রে। আসলে আমাদের দেশের আসল নায়ক হল মন্ত্রীর পার্টির নির্দেশ আর সেই অনুযায়ী তৈরি হয় আমলাদের পলিসি আর তার এক্সিকিউশন।' বলতে বলতে খানিকটা উত্তেজিতই হয়ে পড়ে সৌগত।

অ্যান্টনি বলে— 'তোর সব কথা শুনলাম, বুঝলাম, এমনকী ধর মেনেও নিলাম। তা এতগুলো কথা যে বললি, তার সঙ্গে তোর ফিউচার-টার্গেটের সম্বন্ধ কী? তুই তো বললি যে তুই পলিটিশিয়ান হতে চাস না। তাহলে কী হতে চাস, সেটাই বল না বাপ।'

—'ভাবছি আই এ এসের জন্যে প্রিপারেশন নেব। শালা একবার যদি লেগে যায়...। তা গুরু, তোমার কী টার্গেট, সেটা বললে না তো?'

এমনসময় টেবিলে খাবার আর ড্রিঙ্কস হাজির। গরম চিকেন কাবাবের সুবাসের সাথে কাটগ্লাসের মদিরায় ভাসছে আইস কিউব।

যে যার প্লেট টেনে নিল কাছে। গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে বলে উঠল— 'চিয়ার্স' আর তারপরে এক চুমুক দিয়ে এক এক টুকরো কাবাব ফর্ক দিয়ে তুলে মুখে চালান করে দিল চার বন্ধু।

কানাই এবার বলল— 'কি রে অ্যান্টনি, তোকে করা প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু পেলাম না।'

টিস্যু পেপারের নৌকোটা টেবিলে রেখেছিল অ্যান্টনি। এবারে সেটাকে নিয়ে দুমড়ে মুচড়ে একটা দলা পাকিয়ে টেবিলের মাঝখানে রাখল। তারপরে ধীর অথচ গম্ভীর গলায় বলল— 'ক্যাপ্টেন সিনহার মতো বছরে ছ-মাস সমুদ্রে ভেসে বেড়ানোর ইচ্ছে আমার মোটেই নেই।' বলে খানিক চুপ করে যায় সে।

বাকি তিনজন গ্লাসে চুমুক দিতে থাকে। জিভ ছুঁয়ে গলা দিয়ে নামতে থাকা অ্যালকোহলের উষ্ণতাকে ঢাকা দিতে চায় বরফের শীতলতা। এমন বিপরীত অনুভূতি আগে তাদের কখনো হয়নি। তারা চুপচাপ চেয়ে থাকে অ্যান্টনির দিকে, তার বাকি কথা শোনার আশায়।

একটুপরেই অ্যান্টনি বলতে থাকে— 'আচ্ছা, তোরা কি ''বাইসাইকেল থীভস্'' দেখেছিস?'

সবাই চুপ করে থাকে। শুধু একটুকরো কাবাব মুখে পুরে কানাই বলে— 'দেখার সৌভাগ্য হয়নি, তবে কাগজে রিভিউ পড়েছি। এ ছাড়াও অনেক ম্যাগাজিনেও লেখাঝোখা হয়েছে সিনেমাটা নিয়ে। ভিত্তোরিয়ো দ্য সিকার ছবি। যতদূর খেয়াল পড়ছে যে ছবিটা উনিশশো পঞ্চাশে আকাডেমি অনারারি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। এ ছাড়া আরও অনেক অ্যাওয়ার্ড জুটেছিল ছবিটার কপালে। তাই তো?'

—'সেন্ট পার্সেন্ট রাইট বস' অ্যান্টনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তারপরে অন্যদের বলে— 'আচ্ছা, তোরা নিশ্চয়ই সত্যজিৎ রায়ের ''পথের পাঁচালী'' দেখেছিস?'

বৈভব বলে— 'হ্যাঁ, তা দেখেছি। এখন তো ছবিটা নিয়ে চারিদিকে রীতিমতো শোরগোল চলছে। তা এর সঙ্গে তোর কেরিয়ারের সম্পর্ক কী?'

—'সম্পর্ক এটাই, কানাই তুই হয়তো জানিস, যে ফ্রান্সে ফ্রেঞ্চ নিউওয়েভ ফিল্মের যুগ শুরু হয়ে গেছে। সেই ছবিগুলোতে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে অন্যরকমভাবে অন্যকথা বলা হয়। খুবই টাইট বাজেট হয় ছবিগুলোর। তবে খুশির কথা এই যে ইদানীং লোকে ধীরে ধীরে নিতেও শুরু করেছে ওই ধরণের ছবিকে। তাই আমারও ইচ্ছে ওই ধরণের সিনেমা বানানোর; যেখানে আমি অন্যধরণের কথা অন্যভাবে বলতে পারব।'

একটানা কথাগুলো বলে লম্বা একটা চুমুক দেয় গ্লাসে। তারপরে শরীরটা এলিয়ে দেয় চেয়ারে। মনের যে কথাগুলো সে বাড়িতে বলে উঠতে পারেনি, এতদিন পরে বন্ধুদের কাছে সেই কথাগুলো বলতে পেরে খুব হালকা লাগছে তার।

এমনসময় স্পিকারে শব্দ ওঠে। সিক্স পিস ব্যান্ডের বাদকেরা উঠে পড়েছেন ডায়াসে। যে যার নিজেদের যন্ত্র বাজিয়ে সেগুলো টেস্ট করে নিচ্ছেন। এখন সাতটা বেজে পনেরো। আর একটু পরেই আসবেন মোকাম্বোর সেলিব্রিটি গায়িকা প্যাম ক্রেন।

কানাইয়ের শরীরে এখন কেমন যেন একটা অনুভূতি হচ্ছে। এটা সে আগে কখনো অনুভব করেনি। সবকিছু সে দেখছে, শুনছে; অথচ তার শরীর জুড়ে কেমন যেন একটা ভালোলাগার আলতো শৈথিল্য। আঃ, দারুণ রিল্যাক্সড লাগছে তার। সব টেনশন এখন একেবারে ভ্যানিশ। তার শরীর-মন জুড়ে এখন শুধুই ভালোলাগা আর ভালোলাগা। তাই চেয়ারে হেলান দিয়ে শরীরটাকে রিল্যাক্সড মোডে রেখেই একটুকরো কাবাব মুখে পোরে। মদিরা যে এত মদির তা সে আগে জানত না। থাকুক, থাকুক এই মদির শৈথিল্য তার শরীর জুড়ে থাকুক। তাই সে গ্লাসের বাকি তরলটুকু একচুমুকে শেষ করে দেয়। তারপরে অ্যান্টনিকে বলে— 'অ্যান্টনি, তুই যা চাস, তাইই যেন হতে পারিস। তোর তৈরি সিনেমা দেখার অপেক্ষায় রইলাম। গুড উইশেশ ইন অ্যাডভান্স মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড।'

অরুণোদয় বলল— 'তবে তখন আমাদের ভুলে যাস না। মাঝে মাঝে আসিস আমাদের বাড়ি।'

সৌগতও তার গ্লাসে শেষ চুমুকটা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে অ্যান্টনিকে বলল— 'তখন আমাদের তোর অটোগ্রাফ দিস মাইরি। ''না'' বললে শুনব না কিন্তু। নইলে খিস্তি দেব।' সবাই সৌগতর কথায় হো-হো করে হেসে ওঠে। বোঝাই যাচ্ছে যে ডাবল পেগ ভ্যাট তার আবেশ ছড়াতে শুরু করেছে চার বন্ধুর মধ্যেই। তারই মধ্যে ব্যান্ডের আওয়াজ ছাপিয়ে বৈভব বলে— 'আরে এই ব্যাটা কানু, তুই কী করবি সেটা বললি না তো?'

—'আমি?... আমি আর কী করব? এই একটা চাকরি-বাকরি করব। ভদ্রলোকের মতো বেঁচে থাকতে হবে তো।'

অ্যান্টনি বলে— 'এটা তুই ঠিক বলেছিস কানাই। সবার আগে কিন্তু আমাদের ভদ্রলোক হতে হবে।'

এদিকে চারবন্ধুরই গ্লাস শেষ কিন্তু প্লেটে তখনও পড়ে রয়েছে কয়েকটুকরো কাবাব আর স্যালাড। তাই দেখে অ্যান্টনি বলল—'ক্যা দোস্তোঁ, অউর এক এক পেগ হো জায়ে?'

সকলেই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল— 'হাঁ, হাঁ, হো জায়ে বস।' তাই গ্লাসে ফর্ক ঠুকে অ্যান্টনি অ্যাটেনড্যান্টকে ডেকে সবার জন্যে আরও একটা করে পেগের অর্ডার দেয়। কয়েক মিনিটেই টেবিলে পৌঁছে যায় নতুন গ্লাস। এখন আর চার বন্ধুর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তারা আমেজের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করতে চায় যে যার নিজের মধ্যে আত্মস্থ থেকে। ধীরে ধীরে চুমুক দিতে থাকে পানীয়ে। ওদিকে ডায়াসে তখন জ্যাজের মূর্চ্ছনা, আর তারই মধ্যে ডায়াসে উঠলেন প্যাম ক্রেন। তাঁকে দেখেই অন্য সব টেবিল থেকে উঠল হাততালির ঝড়। স্মিত হেসে বাও করে প্যাম শুরু করলেন তাঁর গান—

When I was just a little girl

I asked my mother what will I be?

Will I be pretty? Will I be rich?

Here's what she said to me—

Que sera sera... Whatever will be, will be.

The future's not ours to see.

Que sera sera... Whatever will be, will be.

গান চলছে। সত্যিই অসাধারণ গান গায় প্যাম ক্রেন। গান চলতে থাকে। এদিকে ধীরে ধীরে সুর আর সুরা দুটোই জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে চার বন্ধুর মধ্যে। সৌগত তো ফর্ক দিয়ে সুরের তালে তালে টোকা মেরে চলেছে গ্লাসে। ওদিকে কানাইয়ের মনেও সেই গানের অনুরণন। তার মনে হতে থাকে— প্যাম ক্রেনের ওই গানের কথার মতোই যেন তাদের ভবিষ্যৎ— ...Whatever will be, will be. পুরোটাই অজানা...এক্কেবারে অজানা। যাকগে, যখন যা হবার, তা তখন দেখা যাবে। এখন এই সুন্দর সন্ধেটা ওসব ভেবে মাটি করে লাভ নেই। বরং আজকের এই সেলিব্রেশনটা চুটিয়ে উপভোগ করা যাক। তার মনে হয়, আরেকটা পেগ হলে ভালো হত। আরও মদির হত আজকের সন্ধেটা।

রাত তখন প্রায় দশটা। অ্যান্টনি একটা ট্যাক্সি করে বন্ধুদের প্রত্যেককে তাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে তবেই বাড়ি ফিরবে। সেইমতো সে কানাইকেও নামিয়ে দিল তার বউবাজারের বাড়ির সামনে।

—'বাই বাই, তাহলে সামনের রোববারে এখানে আবার দেখা হবে।' বলতে গিয়েই কানাই টের পেল যে তার জিভটা যেন ভারী হয়ে আছে। সে নিজেকে যতটা সম্ভব সামলে নেবার চেষ্টা করল। ঠিক করে নিল যে কারোর সঙ্গে বিশেষ একটা কথা না বলে সে সোজা ঢুকে পড়বে তার ঘরে।

ট্যাক্সিটা চলে যেতেই কানাই খেয়াল করল যে বাড়ির সদর দরজা তখনও হাট করে খোলা। এমন তো হয় না। কিন্তু ভেতরে ঢুকতেই সে বুঝতে পারল যে বাড়িতে কিছু একটা ঘটেছে।

কেষ্টদার মুখোমুখি হতেই সে কানাইকে বলল— 'এত দেরি করলে তুমি? আর ঘণ্টাদুয়েক আগে আসতে পারলে না?'

—'কেন কী হয়েছে?'

—'বড়দাবাবু আমাদের ছেড়ে চলে গেচেন গো। এই এখন ডাক্তারবাবু এসেচেন।'

কেষ্টদার কথা শুনে কানাইয়ের আমেজে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে থাকে মদিরার আমেজ। সে নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখে যে বাইরের ঘরের তক্তপোশে শুয়ে আছেন তার দাদু। নীথর, নিঃস্পন্দ। তাঁর পায়ের কাছে বসে তার ঠাম্মি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফোঁপাচ্ছেন। পাশে দাঁড়িয়ে অঞ্জনা কাকিমা।

দাওয়ায় উঠে দেখে যে তাদের হাউস-ফিজিসিয়ান অক্ষয় ডাক্তার চেয়ারে বসে তাঁর লেটারহেডে কিছু লিখছেন। তার স্যার, সুবিমলকাকু, পাশের বাড়ির ঘনশ্যাম বাগচী আর দাদুর বন্ধু আনন্দ লাহিড়ীবাবু একপাশে দাঁড়িয়ে। ডাক্তারবাবু তাঁর লেখা কাগজটা

লেটারহেড থেকে ছিঁড়ে সুবিমলকাকুর হাতে দিয়ে বললেন— 'সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম, তবে ঘণ্টাদুয়েক পরে বডি বের করবেন।'

—'ঠিক আছে' বলে সুবিমলকাকু ডাক্তারের ফিসটা দিতে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তারবাবুর ব্যাগটা নিয়ে কেষ্টদা গেল তাঁকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে।

বাগচীবাবু তখন রজনীকে বললেন— 'আপনারা এখানে থাকুন। আমি মন্টুকে সঙ্গে নিয়ে জিনিসপত্রগুলো কিনে আনি বরং। মন্টু দোকান বন্ধ করে এখুনি এল বলে।' রজনী তাঁর হাতে কিছু টাকা তুলে দিল খাট, ফুলমালা, ধূপ, নতুন কাপড়, অগুরু ইত্যাদি কেনার জন্যে। এমনসময় মন্টুদাও এসে ঢুকল। তাকে নিয়ে বাগচীবাবু বেরিয়ে গেলেন।

কানাই এখন স্তম্ভিত, বাক্যহারা। এমনটা যে ঘটে যাবে তা তার কল্পনাতেও আসেনি। তার প্রিয় দাদু এইভাবে তাকে ছেড়ে চলে গেলেন, অথচ তাঁর শেষ সময়ে কানাই তাঁর পাশে থাকতে পারল না। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ঠাম্মির দিকে। তাকে দেখে ঠাম্মি বলে ওঠেন— 'আর খানিক আগে আসতে পারলে না দাদুভাই। সেই বিকেল থেকে মানুষটা বারবার তোমার রেজাল্টের কথা জানতে চাইছিল। বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করছিল— 'দাদুভাই ফিরেছে?'

আর নিজেকে ক্ষমা করতে পারল না কানাই। মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে ঠাম্মির কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল সে। সুবিমল আর রজনী বেশ বুঝতে পারল কানাইয়ের মনস্তাপ। তাই একটু পরে সুবিমল গিয়ে কানাইয়ের পিঠে হাত রেখে বলল— 'কানাই ওঠ। এখন আমাদের অনেক কাজ বাকি।'

আস্তে আস্তে ফোঁপানি কমে এল কানাইয়ের। সে হাতের তালুতে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। তারপরে অপলক চেয়ে রইল তার প্রিয় দাদুর প্রশান্ত মুখের দিকে। দাদু এখন অনন্ত ঘুমে আচ্ছন্ন। তার দাদুর এই প্রশান্তির ঘুম যাতে না ভাঙে তাই সে ধীর পায়ে সুবিমল আর রজনীর পাশ কাটিয়ে বেরোতে যায়। আর তখনই সুবিমল তাকে নরম স্বরে বলে— 'এত দেরি করলি কেন রে?'

—'বন্ধুদের সাথে গল্প করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।'

এবার রজনী একটু কড়া গলাতেই বলল— 'এত রাত অবধি কীসের আড্ডা? রেজাল্ট তো সেই কখন বেরোনোর কথা। কেন সন্ধেবেলা কি বাড়ি ফেরা যেত না?' কানাই মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সুবিমল তাই জিজ্ঞেস করল— 'রেজাল্ট কেমন হল?'

—'এইট্টি ওয়ান পার্সেন্ট।' আর ঠিক তখনই রজনীর নাকে এল সেই বিশেষ গন্ধটা। হালকা হলেও সে বুঝতে পারল কানাইয়ের এত দেরি হবার কারণটা কী। তাই নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে সে চাপা গলায় বলে উঠল— 'কানাই তুই...।' কিন্তু কাঁধে সুবিমলের হাতটা পড়তেই চুপ করে যায় রজনী। নিজেকে সংযত করে নেয় সে। আসলে সে বুঝতে পারেনি যে, কানাই এখন আর ছোটোটি নেই। তাই পরিস্থিতির খেয়াল না করেই সে...।

ঘর থেকে বেরিয়ে কানাই ধীরে ধীরে দাওয়ায় গিয়ে বসে। এতক্ষণ সে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে ধরে রেখেছিল। এবারে তার বিস্ফোরণ ঘটল। হাউহাউ করে ককিয়ে উঠল কানাই। মিনিট কয়েক এইভাবে কাঁদার পরে কিছুটা হালকা হলে দাওয়ার সিঁড়িতে বসে

দু-হাতের চেটোয় চোয়ালের ভর রেখে উঠোনের ওপরের তারাভরা আকাশের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সে।

সেদিন শেষরাতে শ্মশানে দাদুর জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে কানাই চোখের জলে দাদুকে বলেছিল— 'আমি আর কখনো মদ খাব না দাদু। কক্ষনও না। এর জন্যেই তোমাকে...। তুমি আমাকে মাফ করে দিও দাদু, মাফ করে দিও।'

আর বেশ খানিকটা তফাতে বসে থাকা সুবিমল রজনীকে বলছিল— 'এই বয়সে ছেলেরা এমন ভুল করেই থাকে। আমিও তো করেছিলাম। তা ছাড়া যুগটাও পালটেছে রজনী। তাই তুই আর ওকে এসব নিয়ে কিছু বলিস না। ছেলেটার একদিনের এই ছোট্ট ভুলটাকে ক্ষমা করে দিয়ে তুই বরং ওর রেজাল্টের দিকে তাকা। ভেবে দেখ তো, তুই ওকে আগলে আগলে গড়ে তুলেছিলিস বলেই না আজ ও এইট্টি ওয়ান পার্সেন্ট পেয়েছে। নইলে গ্রামে থাকলে তো ও কোথায় তলিয়ে যেত। যাইহোক, তুই আর ওকে বকাঝকা করিস না। তোর নিজের হাতে গড়ে তোলা স্বপ্নটাকে তুই ভেঙে দিস না রজনী।'

১৯৬৪

রজনীর উপলব্ধি

নিয়তি বড়োই অদ্ভুত। সে কখন কাকে নিয়ে কীভাবে খেলবে তা কেউই আগেভাগে জানতে পারে না। সে কখনো দেয় রিক্ত, নিঃস্ব করে, আবার কখনো দেয় অপ্রত্যাশিত, অযাচিত ভাবে ভরিয়ে। প্রকৃতির খেয়ালখুশির খেলার মতোই সেও খেলে চলে মানুষের জীবনকে নিয়ে। আর ঠিক তেমন খেলাই সে খেলল কানাইকে নিয়ে। নিয়তি তার প্রিয় দাদুকে যেমন কেড়ে নিল তার কাছ থেকে, তেমনই তাকে দিলেও অন্য অনেককিছু।

মাসিমার দুই মেয়ে মেসোমশাইয়ের পারলৌকিক কাজের জন্যে মাসখানেকের ছুটি নিয়ে সপরিবারে উড়ে এসেছিল। শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে গেলে তারা লেগে পড়ল মেসোমশইয়ের নামে রাখা বাড়িটা নিয়ে। না, না, এই সম্পত্তির ওপরে তাদের কোনো লোভ ছিল না। সুবিমল আর মাসিমার উপস্থিতিতেই তারা ঠিক করলে যে, এই বাড়ির দেখাশোনা করা মাসিমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া কেষ্টদা, রজনী আর কানাই ছাড়া এই বাড়িতে মাসিমার অবলম্বনই বা কোথায়? তাই মাসিমার কথামতোই দুই মেয়ে আর জামাই রজনীকে প্রস্তাব দিল বাড়িটা কিনে নেওয়ার জন্যে। একেবারে জলের দরেই বলতে হবে। তবে রজনী বিষয়-সম্পদে নিজেকে জড়াতে রাজি নয়। তাই সেও প্রস্তাব দিয়েছিল যে বাড়িটা মাসিমার নাতি কানাইয়ের নামে করে দেওয়া হোক আর সেইসঙ্গে সে একটা শর্তও জুড়ে দিয়েছিল যে— আমৃত্যু মাসিমা বাড়িটা ভোগ করবেন আর তাঁর অবর্তমানে কানাই হবে বাড়ির মালিক। যদিও টাকাটা রজনীই দিয়েছিল, তবু কানাই এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতেই চায়নি। সে এইসব ব্যাপারে নিস্পৃহ।

এইভাবে কানাইয়ের নিয়তি খেলল তার প্রথম খেলা। আর দ্বিতীয় খেলা? মেসোমশাই মারা যাবার মাস সাতেকের মধ্যেই তার ভাগ্যে জুটে গেল বেঙ্গল কেমিক্যালসে একটা

কেমিস্টের চাকরি। এই চাকরিটা পাওয়াতে সে, মাসিমা আর কেষ্টদা যেমন খুশি হয়েছিল, তেমনই খুশি হয়েছিল রজনীও। যাক, কানাই এবারে তাহলে স্বনির্ভর হল।

প্রথম মাসের মাইনে পাবার পরে রজনীর কথামতো দিদার অনুমতি নিয়ে সে তার কলেজের বন্ধুদের ডেকে একটা রবিবারে মাংস-ভাত খাইয়ে তার বকেয়া ট্রিটটা দিয়েছিল। খুব আনন্দ হয়েছিল সেদিন। এদিকে মাসিমার নিঃসঙ্গতা কাটবে বলে রজনীর কথামতো কানাই তার মা-বাবাকে গ্রাম থেকে এনে এখানে রাখবে বলে অনুমতি চেয়ে নিয়েছে।

তবে কানাই প্রতিবার তার সঙ্গী না হলেও প্রতিটা শনি-রবিবার গ্রামে কাটায় রজনী। কিন্তু তার আখড়ায় ছেলের সংখ্যা আজকাল বড়োই কমে গেছে। মাত্র চার-পাঁচজন আসে। আর বাকিরা কেউ মাঠে কাজ করে, কেউবা ছোটোখাটো দোকান খুলে বসেছে দুটো ডাল-ভাতের তাড়নায়। ওদের জন্যে কষ্ট হয় রজনীর। কিন্তু কি-ই বা করবে সে? তারও তো সীমাবদ্ধতা আছে। যাইহোক, এর মধ্যে একটা খুশির খবরও আছে। তার গ্রামের স্কুলটা এখন সরকারি সাহায্য পায়।

এদিকে দেখতে দেখতে কুড়িটা বছর হয়ে গেল তার মিউজিয়মের চাকরি। স্বাধীনতার পরের বছরেই রিটায়ার করেছেন ড্যানীবাবু। তবে যাবার আগে রজনীকে দিয়ে গেছেন অটোগ্রাফ করা ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিকের সেই ভল্যুমটা, যেটাতে তাঁর ফসিল নিয়ে লেখাটা পাবলিশ হয়েছিল। রজনীর ভাবতেও ভালো লাগে যে সে ড্যানীবাবুর ওই লেখাটা টাইপ করে দিয়েছিল।

ড্যানীবাবু যাবার পরে তাঁর জায়গাটা এখনও ফাঁকাই পড়ে আছে। সরকারি দপ্তরের যা দস্তুর। সেখানে কাউকে আদৌ নেওয়া হবে কিনা সন্দেহ, যদিও খাতায়-কলমে পদটার বিলুপ্তি ঘটেনি। তাই মিউজিয়মের সেই ফাঁকা ঘরে রজনীর সঙ্গী এখন নতুন ডিরেক্টর সায়েবের দেওয়া যৎসামান্য কাজ আর মুক্তোরামের বকবকানি মেশানো চা। বাকি সময়টা সে এঘরে ওঘরে ঘুরে বেড়ায়। আড্ডা মারে। কিন্তু এইভাবে সময় কাটাতে ভালো লাগে না তার ।

সত্যি বলতে কী, সুরেশ কাকা মারা যাবার পর থেকেই মনে মনে সে বড়ো একা হয়ে গিয়েছিল। তাই তখন সে কানাইকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল। ভেবেছিল কানাইকে সে তার অধীত বিদ্যার সবটুকু দিয়ে যাবে; রজনীর পরে সেইই হবে নিশিকান্ত রায়ের ঘরাণার প্রতিনিধি। কিন্তু রজনী এখন বোঝে যে— সব পাত্রে জল রাখা যায়, কিন্তু ঘি রাখা যায় না। এটাই তার একটা আফশোষ।

ধ্যুৎ, সন্তানসম কানাইকে নিয়ে এসব কী ভাবছে সে? নিশিকান্ত রায়ের ঘরাণা যে তাকে বয়ে নিয়ে যেতেই হবে, এমন দিব্যি তো কেউ দেয়নি। অন্য কোনো ক্ষেত্রেও তো কানাই সার্থক হতে পারে, সেরা হতে পারে। তবে?

আরও একটা আফশোষ আজও তাকে কুরে কুরে খায়। সে যখন চোখে অপত্য স্নেহের ঠুলি পরে একের পর এক খুন করেছিল, তখন সে পেয়েছিল শুধুই যন্ত্রণা। আজও একা থাকলেই নরহত্যার সেই কষ্ট তাকে ব্যথিত করে; তাকে মানসিক অবসাদের দিকে ঠেলে দেয়। এই বয়সে এসে তার মনে হয়— এতটাই কি দরকার ছিল ওই বিষ্টুচরণ আর দিনেশকে শেষ করার? তবু সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চায় এই ভেবে যে; পরিস্থিতি তাকে ওই খুনগুলো করতে বাধ্য করেছিল। অথচ সেইই যখন গান্ধীজিকে জনতার

আঘাত থেকে বাঁচিয়েছিল, তখন শরীর আধলা ইঁটের আঘাত পেলেও তার মন তৃপ্তিতে ভরে গিয়েছিল। সত্যিই, কী অদ্ভুত মানুষের মন আর কী অদ্ভুত নিয়তির খেলা।

কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও সে আজও অতৃপ্ত। নিশিকান্ত রায়ের ঘরাণা চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একটা যোগ্য আধার চাই। কিন্তু কোথায় পাবে সে এমন কাউকে যে ওই ঘরাণা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে?

অন্ধকার ঘরে একলা শুয়ে শুয়ে এইসব কথাই ভাবছিল রজনী।

—'স্যার,... আসব স্যার?' কানাইয়ের গলা।

—'আয়। আলোটা জ্বালিয়ে দে।...বোস।'

আলো জ্বালিয়ে কানাই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে। বিছানায় উঠে বসে রজনী বলে—'কিছু বলবি?'

—'স্যার, তোমার কী হয়েছে বল তো? কিছুদিন ধরেই দেখছি যে, সকালে প্র্যাকটিসের সময় ছাড়া তুমি তো একা একাই থাক। কারোর সঙ্গে তেমন একটা কথাও বল না। কী হয়েছ স্যার তোমার? আমি কি কোনো দোষ করেছি?'

ম্লান হেসে রজনী বলে— 'কিছু হয়নি রে। কিচ্ছু হয়নি। আর তুই তো কোনো অন্যায় করিসনি।' দুটো বালিশ পিঠের নীচে গুঁজে উঠে বসে সে।

—'না স্যার। তুমি আমার কাছে গোপন করে যাচ্ছ। আমার তো মনে হচ্ছে যে তুমি মনের দিক দিয়ে খুব ক্লান্ত। তাই না স্যার?'

রজনী বুঝতে পারে কানাই তার ঠিক জায়গাটাই ধরে ফেলেছে। তাই আর চেপে গিয়ে লাভ নেই। সত্যি কথাটা বলে ফেলাই ভালো। তাই বলে— 'হ্যাঁরে কানাই, তুই ঠিকই বলেছিস। সত্যি রে এত বছর ধরে লড়তে লড়তে এখন আমি একটু ক্লান্তই হয়ে পড়েছি। তবে তুই চাকরি পেয়ে যেতে খুব শান্তি পেয়েছি আমি, জানিস। কিন্তু এখনও যে একটা লড়াই চলছেই আমার ভেতরে।'

—'কীসের লড়াই? এই তো আমরা সবাই তোমার সাথে রয়েছি। তোমার যা কিছু সমস্যা তুমি আমাদের বলতে পার। আর অন্যদের যদি বলতে নাও পার, তবে শুধু আমাকে বল। আমি কাউকে বলব না।'

—'না রে কানাই, আমার সে লড়াই যে আমার নিজের মনের সঙ্গে। তাই তার সমাধান তো আমাকেই করতে হবে। অন্য কেউ তার সমাধান করতে পারবে না রে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রজনী। তারপর একটু থেমে আবার বলে— 'জানিস কানাই, আমি একটা পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি। হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু পাচ্ছি না।' মাথার ব্যাকব্রাশ করা ঘাড়ছোঁয়া কাঁচাপাকা চুলে হাত বোলাতে থাকে রজনী।

কানাই তার স্যারের এই জটিল কথার তল খুঁজে পায় না। কীসের পাত্র খুঁজছে স্যার? নাকি কোনো মানুষকে? কিন্তু কীসের জন্যে? এতদিন তাকে দেখছে কানাই কাছ থেকে, তবুও তার যেন মনে হয় কোথাও একটা রহস্য লুকিয়ে আছে তার স্যারের মধ্যে, যেটা তার কাছে আজও অধরা। তাই খানিক চুপ করে থেকে সে বলে— 'স্যার তুমি তো সারাটা জীবন শুধু লড়াই করেই কাটালে। এবার না হয় একটু বিশ্রাম নাও। অফিস থেকে প্রয়োজন ছাড়া ছুটি তো তোমায় কখনো নিতে দেখিনি। তাই এবার বরং কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে কোথাও ঘুরে এসো। এবারে নিজের জন্যে ছুটি নাও তুমি। আমি তো আছি আর যদিও বয়স হয়েছে, তবুও কেষ্টদাও তো সঙ্গে আছে। আমরা ঠিক সামলে নিতে

পারব। তুমি যাও স্যার। ক-দিন বাইরে কোথাও ঘুরে এসো। তাতে তোমার মনের ক্লান্তিটা কাটবে।’

নিজের কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে রজনী বলে— ‘কথাটা বোধ হয় তুই ঠিকই বলেছিস কানাই। ভাবছি দিন পনেরো কোথাও ঘুরে আসি। একটু হালকা হওয়ার দরকার।’

—‘সেটাই বেটার স্যার।’

১৯৬৫

ঘরছাড়া রজনী আর কানাইয়ের হা-হুতাশ

কানাইয়ের বেঙ্গল কেমিক্যালসের অবস্থা খুব একটা ভালো না। ভেতরে ভেতরে ক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ সে বুঝতে পারছে যে এইভাবে চললে বেশিদিন কোম্পানির পক্ষে টিকে থাকা মুশকিল। সময় থাকতেই তাই অন্য একটা কিছু আয়ের রাস্তা দেখতে হবে।

অফিসের গেট থেকে বেরোতে বেরোতে এইসবই ভাবছিল কানাই। নাঃ, এসব নিয়ে ভাবলে বড়ো টেনশন হয়। তাই এখন একটু রিল্যাক্সের দরকার। আজ শনিবার। দেখা হবে বৈভব আর অরুণোদয়ের সঙ্গে। প্রতি শনিবারই আকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের চত্বরে দেখা হয় এই তিন বন্ধুর। বৈভব এখন একটা মাঝারি সাইজের প্রাইভেট গ্লু কোম্পানিতে সুপারভাইজারের চাকরি করে আর ঋতিকার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যাবার ফলে অরুণোদয় না করল পি এইচ ডি আর না খুঁজল একটা চাকরি। একগাল দাড়ি আর একমাথা উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে সে এখন একটা বামপন্থী পার্টির হোলটাইমার। এদিকে সৌগতর কোনো খবরই কেউ জানে না। সে কোনো যোগাযোগও আর রাখেনি। আইএএস হল কি না কে জানে? আর অ্যান্টনি? সেও তো এখন ধরাছোঁওয়ার বাইরে। হপ্তাখানেক আগে রাতের দিকে কানাই ফোন করেছিল ওর বাড়িতে। ওর মা ফোনটা ধরেছিলেন। উনিই জানালেন যে, অ্যান্টনি নাকি পুরুলিয়া জেলার ওপরে একটা ডকুমেন্টারি ছবি তৈরি করছে আর তাই সে দিন দশেক হল দলবল নিয়ে সেখানে গেছে। কবে ফিরবে জানা নেই। অ্যান্টনির কথাটা শোনার পরে খুব খারাপ লেগেছিল কানাইয়ের। যে ছেলেটা একদিন স্বপ্ন দেখেছিল যে সে ‘নিউ ওয়েভ’ সিনেমা বানাবে, সে এখন একটা ডকুমেন্টারি ছবি বানাচ্ছে। অবশ্য ডকুমেন্টারি ছবি বানানো যে খারাপ তা নয়। ভালো ডকুমেন্টারি বানালে আন্তর্জাতিক পুরস্কারও জোটে; কিন্তু তাতে অ্যান্টনির স্বপ্নভঙ্গ হচ্ছে না তো? কানাই খুবই আশা করে যে ডকুমেন্টারি ছবি বানাতে বানাতেই অ্যান্টনি হয়তো একদিন সত্যি সত্যিই ‘নিউ ওয়েভ ফিল্ম’ বানাবে। এখন তার সিনেমায় হাতেখড়ি হচ্ছে।

যাইহোক, আড্ডা মেরে সাড়ে ন-টা নাগাদ বাড়ি ফিরে কানাই শুনল যে বাক্স আর ব্যাগ নিয়ে রজনী নাকি বিকেল তিনটে নাগাদ বেরিয়ে গেছে। ঘরের চাবিটা কেষ্টদার হাতে দিয়ে বলে গেছে সেটা কানাইকে দেবার জন্যে। কথাটা শুনে কানাই ভাবলো— এই তো গতবছর স্যার হপ্তা তিনেক কোথায় যেন ঘুরে এল, আর এইবছরে কাউকে কিছু না জানিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল?

—'তা কোথায় গেছে, কিছু বলে যায়নি কেষ্টদা?'

—'না গো, শুধু বললে যে চাবিটা তোমাকে দিলে তুমি সব বুঝতে পারবে।'

—'ও আচ্ছা। দাও, চাবিটা দাও।'

কেষ্টদা ফতুয়ার পকেট থেকে চাবিটা বের করে কানাইকে দেয়।

চান সেরে কানাই চাবি নিয়ে স্যারের ঘরে গিয়ে দরজা খুলে আলোটা জ্বালায়। প্রথমেই চোখ পড়ে আলনায়। একটাও জামাকাপড় নেই সেখানে। খাটের তলায় উঁকি মারে। সেখানেও শুনশান। ঢাউস আয়না লাগানো আবলুশ কাঠের আলমারিটা খোলে। সেখানে ন্যাপথ্যালিনের গন্ধ ছাড়া আর কিছুই নেই। তারপরে তার নজর পড়ে টেবিলে। সেখানে স্যারের মানিব্যাগ, কলম, লেখার প্যাড কিচ্ছু নেই; শুধু আধভরতি একটা জলের গ্লাসের নীচে চাপা দেওয়া রয়েছে একটা সাদা ভাঁজ করা কাগজ। কৌতূহলে কানাই টেনে নেয় সেটা। তারপরে ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু কর—

স্নেহের কানাই,

তোকে কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে পড়ার জন্যে খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু যেতে আমাকে হতই। তাই চললাম। কোথায় যাচ্ছি তা জানতে চাস না। শুধু জেনে রাখ—আমি বেরোলাম খোঁজের পথে। জানিস কানাই, মাসখানেক আগেই আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি। তোরা যাতে জানতে না পারিস, তাই অফিস টাইমে বেরিয়ে কোনোদিন অফিসে গিয়ে রেজিগনেশন সংক্রান্ত কাগজপত্রের কাজকর্ম সেরেছি; আবার কোনোদিন বা ঘুরে বেড়িয়েছি কলকাতার আনাচে-কানাচে। মাঝে একবার গ্রামেও গিয়েছিলাম শেষবারের মতো আখড়া, নদী, হাটতলার বটগাছ, স্কুল দেখতে। সেনেদের ভাঙা ভিটেটাও দেখেছি, যেখানে (তোর ধারণায়) বোমা পড়েছিল। আসলে আমি আর কলকাতা কিংবা চাঁপাডাঙায় ফিরব না কোনোদিন। তাই সবকিছু একবার দেখে নিলাম। স্মৃতিকে আর নিজের শেকড়কে ভুলে থাকা যে বড়ো কঠিন কাজ রে কানাই। তাই পারলে চাঁপাডাঙার বাড়িটার দেখাশোনা করিস তুই।

আর হ্যাঁ, সুবিমল আমার ইস্তফার কথা জানত। কিন্তু আমারই অনুরোধে সে তোদের কিছু জানায়নি। প্রকৃত বন্ধুর মতোই কাজ করেছে সে। কোনো পরামর্শের দরকার হলে তার সাথে দেখা করিস কিংবা ফোনে কথা বলিস।

সৌভাগ্যবশত সুবিমলের উদ্যোগেই আমার প্রাপ্য টাকার চেকও হাতে পেয়ে গিয়েছি খুবই তাড়াতাড়ি। এর জন্যে সুবিমলকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। আর টাকা যা পেয়েছি তাতে বাকি জীবনটা আশাকরি স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। তার সঙ্গে তো মাসিক পেনশনের টাকাটা আছেই। তাই আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করিস না।

কানাই, আমার জানা বিদ্যের প্রায় সবটুকুই দিয়েছি তোকে। আর যেটুকু দিতে পারলাম না, তার জন্যে তুই দায়ী নোস; দায়ী নিয়তি। তোকে তো আর আমার দেবার কিছুই নেই। তাই বেরিয়েই পড়লাম।

এখন আমি তো ভাটির পথের যাত্রী। সেই পথে চলতে চলতে যদি কোনো যোগ্য আধার পাই, তাহলে সেখানেই রেখে যাব আমার সবটুকু।

তোরা সবাই ভালো থাকিস আর তুই রইলি আমার বুকের গভীরে পরম স্নেহের উষ্ণতায়।

আমার ভালোবাসা নিস আর বড়োদের আমার প্রণাম জানাস। ইতি।

তোর স্যার।

পুনশ্চ :- কোন ব্যাঙ্কে আমার পেনশন জমা হবে তা সুবিমলকে জিজ্ঞেস করেও জানতে পারবি না। তাই বৃথা সে চেষ্টা করিস না। ও কথা দিয়েছে যে ও এই ব্যাপারে কাউকে কিছুই বলবে না।

চিঠিটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ দাঁড়িয়ে থাকে কানাই। এক অব্যক্ত ব্যথায় তার ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। সেই যন্ত্রণা তার চোখ থেকে দু-ফোঁটা জল হয়ে গড়িয়ে পড়ে চিঠিটার ওপরে। ধেবড়ে যায় কিছুটা অংশের কালি। সে বিড়বিড় করতে থাকে— 'স্যার, তুমি আমার ওপরে এতটা নির্দয় হতে পারলে? সেই ছোটো থেকে তুমি আমায় আগলে রেখেছ, আমাকে বড়ো করেছ। তুমি কি জানতে না স্যার, যে আমি তোমাকে বাবার মতোই শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। তুমি না থাকলে কোথায় হারিয়ে যেতাম আমি। আজ যখন আমি ভাবছিলাম যে তুমি রিটায়ার করার পরে প্রাণভরে তোমার সেবা করব, তোমাকে কোনো কাজ করতে দেব না, ঠিক তখনই তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে স্যার। কোথায় গেলে তুমি বল? আমি তোমার কাছে যাব। তোমায় ফিরিয়ে আনব। তুমিই বল, তুমি না থাকলে রোজ সকালে আমায় প্র্যাকটিস দেবে কে? বল? কে দেবে বল?'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে কানাই। কান্নার দমকে তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। বেশ খানিকটা কাঁদার পরে তার কষ্ট ধীরে ধীরে পালটে যায় রাগে। সেই রাগের বসে সে বলতে থাকে— 'তুমি বল স্যার, কি ছিল না আমার যে তুমি তোমার সব বিদ্যা আমাকে দিয়ে যেতে পারলে না? আমি কি এতই অযোগ্য? তুমি তো ভালোই জানো যে লড়াইয়ের সময়ে আমি কত সাংঘাতিক হতে পারি। তাহলে? তাহলে কেন তুমি আমাকে সব দিলে না? বল। বল স্যার। চুপ করে থেক না। আজ আমার নিজেকে বড়ো দীন মনে হচ্ছে। অথচ তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না। তুমি আমাকে ভাব কী? আমি দুর্বল? তাহলে এই দেখ তোমার কানাই কত শক্তি ধরে...।' তারপরেই বাড়ি কাঁপিয়ে একটা চিৎকার— 'কী ইহ্যাপ'।

কানাইয়ের একটা পাঞ্চ আছড়ে পড়েছে আবলুশ কাঠের আলমারিতে লাগানো ঢাউস আয়নাটাতে। ঝনঝন করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে কাঁচ। সেই পাঞ্চের জোর এতটাই যে আয়নার পেছনে লাগানো কাঠটায় পর্যন্ত গর্ত হয়ে যায়।

এদিকে নীচ থেকে শোনা গেছে কানাইয়ের হুংকার। মাসিমা রোজ সকালে ছাদ থেকে এই আওয়াজ শুনতে অভ্যস্ত। এটা তো ওদের লড়াইয়ের সময়ে আক্রমণের হুংকার। কিন্তু এই রাত্তিরে কানাই কীসের জন্যে ওই চিৎকার করল? মাসিমা বেরিয়ে আসেন বারান্দায়। কেষ্টদাকে ডেকে বলেন— 'কেষ্ট, দ্যাখ তো ওপরে কানাই কী করছে।'

কেষ্টকে বললেন বটে, কিন্তু মন যে মানে না। তাই কেষ্টদার পেছনে পেছনে মাসিমাও উঠে আসেন। রজনীর ঘরের মুখে ঢুকেই অবাক হয়ে যান। একী করেছে কানাই? সারা মেঝেতে ছড়ানো ভাঙা কাঁচের মাঝে হাঁটু গেড়ে বসে সে। সারা শরীরে ঘাম। মাথা ঝুঁকে পড়েছে হাঁটুর ওপরে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীরটা আর সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে ফোঁপানির আওয়াজ। কাঁদছে কানাই। কিন্তু কোন কষ্টে? তাই মাসিমা বলেন— 'কী হল দাদুভাই? তুমি অমন করে বসে আছ কেন?'

মাসিমার কথা শুনে ধীরে ধীরে সোজা হয় কানাই। তারপরে তার ঠাম্মির দিকে না তাকিয়েই বাঁ-হাতটা এগিয়ে দেয়। সেই হাতের মুঠোয় ধরা একটা কাগজ। তাতে জায়গায় জায়গায় লাল লাল ছোপ। মাসিমা হাত বাড়িয়ে দোমড়ানো কাগজটা নিয়ে ভাঁজ খুলে পড়তে থাকেন। আর যতই পড়েন ততই তাঁর ভুরু দুটো কুঁচকে যেতে থাকে। পড়া শেষ হলে উনি বুঝতে পারেন যে কেন কানাইয়ের এমন দশা হয়েছে। কেন কানাই ভেঙেছে আলমারির আয়নার কাঁচ। তাই পরম স্নেহে বলেন— 'ডান হাতটা দেখাও তো দাদুভাই।' কানাই কোনো জবাব দেয় না, এমনকী তার হাতটাও দেখায় না তার ঠাম্মিকে। তাই একটু অপেক্ষা করে মাসিমা বলেন— 'অক্ষয় ডাক্তারকে একবার ডেকে নিয়ে আয় কেষ্ট। বলবি জরুরি দরকার।'

এপ্রিল, ১৯৬৫

মানিভঞ্জং এর রডোডেনড্রন আর পাইন বনের সুপারম্যান

মানিভঞ্জং এর ট্রেকপথ বেয়ে রোজ সকালে উঠে যায় রজনী। আজও যেমন সে উঠছে। আঁকাবাঁকা চড়াই বেয়ে উঠে নীচের পাইন গাছের সারির মাথার ওপর দিয়ে তাকালে নীচে দেখা যায় এই ছোট্ট গ্রামটার একটুকরো খেলার মাঠ, শিবমন্দিরের সাদা চূড়ো আর একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাড়িগুলোর মাথা। ভারি সুন্দর লাগে দেখতে; যেন একটা লিলিপুটদের গ্রাম। একটা নির্দিষ্ট ছোটো পাথুরে চাতাল থেকে সেই দৃশ্য দেখে রজনী। তবে কোনো কোনো দিন আরও ওপরে উঠে যায় সে। তখন এই পাহাড়ি গ্রীষ্মে দেখা মেলে ডোয়ার্ফ রডোডেনড্রনের। পথের দু-পাশে আর পাহাড়ের খাদের ঢালের গায়ে ফুটে থাকে তাদের লাল বা গোলাপি রঙের ফুল। মনে হয় যেন কেউ পাহাড়ের ওই ঢালে বিছিয়ে দিয়েছে সবুজের ওপরে লাল-গোলাপি নক্সাকাটা কোনো কার্পেট। আগে এত সুন্দর দৃশ্য দেখেনি রজনী। তাই সে রোজই খানিক বিশ্রামের ফাঁকে চোখ ভরে দেখে সেই রূপ।

মাত্র এক হপ্তা হল এখানে পবন প্রধানের হোম-স্টেতে উঠেছে সে, যেমনটা সে থেকেছিল আগেরবার ছুটির সময়েও। পবন লোক ভালো। তাকে খুব সম্মানও করে। এখানে বাঙালি ট্রেকারদের আসা-যাওয়ার সুবাদে বাংলাটা সে মোটামুটি ভালোই বলতে আর বুঝতে পারে। রজনী তাকে বলে রেখেছে, এখানেই কোথাও একটা ভাড়ার ঘর জোগাড় করে দিতে। আসলে পবনের এখানে দেশি-বিদেশি ট্রেকাররা এসে ওঠে। রাতে ঠাঁই নিয়ে ভোর হতে না হতেই তাদের কেউ বেরিয়ে যায় সান্দাকফু-ফালুটের পথে। আবার কেউবা টংলু পর্যন্ত গিয়ে আবার এখানে ফিরে রাতের বিশ্রাম নিয়ে ফিরে যায় দার্জিলিংয়ে। তাই পবনের হোম-স্টেতে থাকতে গেলে খরচটা বেশিই পড়ে যায়। তবে পবন তাকে কথা দিয়েছে যে ট্যুরিস্ট সিজন শেষ হয়ে গেলেই সে রজনীর একটা থাকার ব্যবস্থা করে দেবে।

এখানে দুপুর গড়ালেই পাহাড়ের খাদে থিতিয়ে থাকা কুয়াশার চাঁই রোদের তাপে আস্তে আস্তে মেঘ হয়ে ভেসে ওঠে ওপরে। হাওয়ার সাথে খেলতে খেলতে সেই মেঘ কখনো ঢেকে দেয় পথচলতি মানুষকে আবার কখনো বা খোলা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে

স্যাঁতস্যাঁতে করে দেয় জামাকাপড়, বিছানা। তাই এখানে সন্ধের আগেই কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায় পথঘাট; গাঢ় মেঘলা দিনের মতো অকালছায়া ঘনিয়ে আসে চারপাশ জুড়ে। তারপরে যখন সন্ধে নামে, তখন পাথুরে পথ আর এই গ্রাম নিজেকে আড়াল করে নেয় কুয়াশার চাদরে। খাদ আর পথ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ঠাহর করে না চললেই বিপদ— কেন না এখনও এখানে বিজলী এসে পৌঁছয়নি। আর কাছাকাছি শহর বলতে হয় ঘুম, নয়তো তারপরে দার্জিলিং।

গতবারে ছুটি নিয়ে এসে দার্জিলিংয়ের একটা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে গিয়েছিল রজনী। ভেবেছিল যে বাকি জীবনটা দার্জিলিংয়েই কাটাবে। তখন লোকমুখে শুনে এই গ্রামে এসে ফালুট পর্যন্ত ট্রেক করে গিয়েছিল সে। আর তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে থাকতে হলে বাকি দিনগুলো এখানেই কাটাবে। তাই এবারে এখানে আসার পথে চাকরি ছাড়ার পরে পাওয়া চেকটা দার্জিলিংয়ের ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে এসেছে। সামনের মাস থেকে তার মাসিক পেনশনের টাকাটাও জমা পড়বে সেই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে। তাই প্রতি মাসেই অন্তত একবার তাকে যেতেই হবে দার্জিলিংয়ে।

বিকেল বেলায় গ্রামের ছোটো মাঠটায় ছেলেরা ফুটবল খেলে। সাইড লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে রজনী তাদের খেলা দেখে। তখন মনে পড়ে যায় তার গ্রামের কথা, তার ছোটোবেলায় বাতাবী লেবু দিয়ে ফুটবল খেলার কথা। তারপরে সন্ধে নামলে খেলা শেষে ছেলেরা যখন বাড়ি ফিরে যায়, তখন রজনী সেই মাঠে শুরু করে তার প্র্যাকটিস। তবে এখানে আসার দিন চারেক পর থেকেই সে খেয়াল করেছে যে বছর বারোর একটা ছেলে অন্ধকার কুয়াশায় মিশে মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে যায়। অন্ধকারেও রজনী বুঝতে পারে যে তার কপালে একটা কাটা দাগ আছে। তার মনে একটা সন্দেহ উঁকি মারে— ছেলেটাও কি তার মতোই অন্ধকারেও দেখতে পায়? নইলে কী করে দেখে সে অন্ধকার মাঠে রজনীর প্র্যাকটিস? তাই সে ঠিকই করেছে যে আজ যদি ছেলেটার দেখা পায়, তবে তার সঙ্গে আলাপ করবে।

কোমরে ঝোলানো বোতল থেকে কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে নেয় রজনী। গায়ের ঘাম এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে। এবার উৎরাই ধরে ফিরতে হবে গ্রামে।

সন্ধেবেলা ছেলের দলের খেলা শেষ হতে রোজকার মতোই তাইকোণ্ডোর গাউন পরে রজনী শুরু করে তার প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস করে আর মাঝেমাঝেই তার চোখ খুঁজে ফেরে অন্ধকারের আড়ালে থাকা সেই কপালে কাটা দাগওয়ালা ছেলেটাকে। কিন্তু কই? আজ তো সে এল না। তাকে না দেখতে পেয়ে খানিকটা হতাশই হল রজনী। এদিকে ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তার মানে শিবমন্দিরে সন্ধ্যার আরতি শুরু হয়ে গেছে। প্র্যাকটিস শেষ করে তাই সে হাঁটা লাগায় মন্দিরের দিকে। আজকাল রোজই প্র্যাকটিস শেষে সে মন্দিরে আসে। চুপ করে বসে থাকে খানিকক্ষণ। কারোর সাথে কথা বলে না। এমনকী মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গেও না। দেবমূর্তিকেও প্রণাম করে না। মনটাকে একেবারে শূণ্য করে দিয়ে হালকা করে নেয় তার মনের ভার।

মন্দিরে পৌঁছে দেখে যে গ্রামের বেশ কয়েকজন পুরুষ-মহিলা মন্দির চাতালে বসে আরতি দেখছে। এই ছোট্ট গ্রাম্য মন্দিরে এত লোকসমাগম সে আগে কখনো দেখেনি। আজ বোধ হয় কোনো বিশেষ তিথি হয়ে থাকবে, আর সেইজন্যেই এত লোকজন এসেছে। তাই চুপচাপ গিয়ে ভিড়ের পেছনে দাঁড়ায়। হঠাৎই তার নজর পড়ে বিশেষ একজনের ওপরে। আরে, ওই তো সেই ছেলেটা। আর তখনি সে ঠিক করে ফেলে যে আজকে ওকে ধরতেই হবে। আজই সেরা সময়। তাই সে চুপ করে অপেক্ষা করে থাকে।

একসময় আরতি আর পুজো শেষ হয়। রজনী আনচান করতে থাকে। ভিড়টা একটু হালকা হলেই ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে হবে। কিন্তু বৃথাই আশা তার। ছেলেটা এক মহিলার হাত ধরে, তাঁর গায়ের সঙ্গে প্রায় লেপটে পুরোহিতের কাছ থেকে প্রসাদ নিয়ে আর সকলের সঙ্গে মন্দির চাতাল থেকে বেরিয়ে যায়। এভাবেই একে একে জড়ো হওয়া লোকেরা মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে মিশে যায় অন্ধকার মেঘ ঢাকা পথে। ধ্যুস, ছেলেটাকে নাগালে পেয়েও সে পারল না কথা বলতে। নির্বাক রজনী শুধু সেই অন্ধকার পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একা সেই পাহাড়ি গ্রামের মন্দির-চাতালে।

—'প্রসাদ লিজিয়ে বাবুজি।'

রজনী ঘুরে দেখে গায়ে শাল দেওয়া মন্দিরের পুরোহিত প্রসাদের থালা নিয়ে তার পেছনে দাঁড়িয়ে। সে প্রসাদ নিয়ে মুখে পুরে তাঁকে জিজ্ঞেস করে— 'অচ্ছা, ওহ যো বচ্চা মা কে সাথ বৈঠা থা, আপ উসে জানতে হ্যায়?'

—'কৌন সা বাচ্চা বাবুজি? ইধার তো বহোত সারে বাচ্চা আতে হ্যায়। আপ কিসকা বাত বোল রহা হ্যায়?'

—'ওহি এক লড়কা। বারা ইয়া তেরা সাল উমর হোগা। উসকা শির কি বাঁয়া তরফ এক চোট কি নিশান হ্যায়। মা কে সাথ বৈঠা থা উধর।' রজনী আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেয়।

—'ক্যা, আপ নিহিতান কা বাত বোল তো নেহি রহে হ্যায়? বহোত জিদ্দি অউর হিম্মতদার লড়কা হ্যায় ও। লেকিন বাবুজি, আপ উসকা বারে মে কিঁউ পুছ রহে? ও আপসে কুছ বত্তমিজি কিয়া হ্যায় ক্যা?'

অপ্রস্তুত হয়ে যায় রজনী। সত্যিই তো, ওই ছেলেটার সঙ্গে তো তার কোনো সম্পর্কই নেই। একজন অজানা, অচেনা ছেলের সম্বন্ধে কাউকে জিজ্ঞেস করলে সে তো সন্ধিহান হবেই। তাই পুরোহিতকে সে বলে— 'নেহি নেহি। মেরে সাথ কোই বত্তমিজি নেহি কিয়া হ্যায় ও। মৈনে তো অ্যায়সা হি পুছ রহা থা।'

পুরোহিতের কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে ঠেকে। তিনি বলেন— 'আপকা শুভনাম ক্যা হ্যায় বাবুজি? ইধর কাঁহা ঠহরে হ্যায় আপ?'

—'মেরা নাম রজনীকান্ত। ... রজনীকান্ত রায়। ইধর পবন প্রধান কি হোম-স্টে মে ঠহরে হ্যায়।'

—'অচ্ছা, অচ্ছা। আপ বঙালি হ্যায়। তো আপ কব আয়ে হ্যায় ইধর? কুছ দিনোঁ সে আপকো মন্দির মে আতে হুয়ে দেখ রহা হ্যায়।'

—'হাঁ, ম্যায় বঙালি হুঁ। ইধর সাতদিন হো চুকা হ্যায়।'

—'অচ্ছা, অচ্ছা। আপসে মিলকর বড়ি খুশি মিলা। মৌকা মিলেনেসে মন্দিরমে চলে আনা বাবুজি। শিউজি আপকা ভালা করে।'

—'হাঁ আউঙ্গা। জরুর আউঙ্গা। অচ্ছা নমস্তে জি। অব চলে?' রজনী নমস্কার জানায় পুরোহিতকে।

—'নমস্তে বাবুজি।' পূজারিও একহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রতিনমস্কার জানান।

রজনী বেরিয়ে আসে বাইরে। প্রায় জনহীন মেঘঢাকা অন্ধকার পথে খানিকক্ষণ ঘুরেফিরে ফিরে আসে হোম-স্টেতে। তাইকোন্ডোর গাউন পালটে মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে

তৈরি হয় রাতের খাবারের জন্যে। এখানে লোকে তাড়াতাড়িই খেয়ে নেয়। এতক্ষণে হয়তো অতিথিরা অনেকেই খেয়ে নিয়েছে রাতের খাবার। সাতসকালেই তাদের বেরোতে হবে যে।

একটু পরেই পবনের লোক খাবার নিয়ে আসে। তার পেছনে পেছনে পবনও হাজির। হয়তো সে হাতে খানিকটা সময় পেয়েছে। রজনীর খাবার টেবিলে নামিয়ে রেখে লোকটা চলে গেলে পবন একটা চেয়ার নিয়ে বসে। মনে হয় তার কিছু কথা আছে।

—'আপকা সাথ আজ বিবেকজির মুলাকাত হয়েছে? তো ক্যায়সা লাগা?'

একটু বিস্মিত হয়েই রজনী বলে— 'বিবেকজি? মানে কে বলুন তো?'

—'মন্দিরকা পূজারি বাবুজি। উনকা নাম আছে বিবেক ভট্টরাই। বহোত ভালো আদমি। উনহি নে বোলা কি আপনি নিহিতানের তালাশ করছেন।'

রজনী বুঝে গেল যে এরই মধ্যে মন্দিরের খবর পৌঁছে গেছে পবনের কাছে। তার মানে পবনের এখানে যেমন প্রতিপত্তি আছে, তেমনি এই ছোট্টো পাহাড়ি গ্রামে খবর ছড়াতেও দেরি লাগে না।

—'দেখুন পবনজি, আমি তো বাচ্চাটার নাম জানি না। তবে আমি যখনই সন্ধেবেলা মাঠে প্র্যাকটিস করি, তখনই দেখি ওই নিহিতান নামের ছেলেটা অন্ধকারে মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে আমার প্র্যাকটিস দেখে। আর আজকে শিউজির মন্দিরেও মায়ের সাথে ওই ছেলেটাকে দেখলাম। আমার মনে হয়, আমি যে কসরত করি, সেটা ওই ছেলেটা শিখতে চায়। তাই আমি ভট্টরাইজির কাছে...।'

—'আপ মৈদান মে কী কসরত করেন?'

—'তাইকোন্ডো পবনজি। আপনি জানেন তো তাইকোন্ডো কি?'

—'ক্যা হ্যায় ও চিজ?' পবন প্রধান এবারে খানিক বিব্রত।

—'ওটা একটা মার্শাল আর্ট। তা মার্শাল আর্ট কি জিনিস সেটা জানেন কি?'

পবন এবারে বোকা বোকা হেসে বলেন— 'হাঁ হাঁ, ওটা হামি জানি। তাইকোন্ডা মার্শাল আর্ট আছে। শুনা হ্যায় কি দার্জিলিং কা ইংলিশ স্কুলে মার্শাল আর্ট শেখানো হোয়।'

—'ওটা তাইকোন্ডা নয়। তাইকোন্ডো। ওটা জানলে আত্মরক্ষা করা যায়। তাই আমার ইচ্ছে যে আমি এই গ্রামের ছেলেদের তাইকোন্ডো শেখাব। তাতে ছেলেরা আরও হিম্মতদার হবে, কেউ অ্যাটাক করলে খালিহাতেই লড়তে পারবে। তার সাথে মনেও শান্তি আসবে। খেলার মাঠটা তো আছেই। আর সেইজন্যেই আমি নিহিতানের খোঁজ করছিলাম।'

—'ও, তাই বোলেন। এ তো বড়িয়া কোথা আছে।' এবারে যেন পবনজি রজনীর কথায় সন্তুষ্ট হন।

—'তা পবনজি, ছেলেটার কপালে কাটা দাগ হল কী করে?' একটুকরো রুটি ডালে ডুবিয়ে মুখে তুলে বলে রজনী।

—'ও অনেক বাত আছে বাবুজি। শুনবেন?'

—'বলুন না, আপনার হাতে সময় থাকলে বলুন না। ওর গল্প শুনতে আমার ভালোই লাগবে।'

হাতে সময় আছে। অথিতিদের সবার ঘরে খাবার পৌছানো হয়ে গেছে। এবারে বাকি কাজ বেয়ারাদের। তাই চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে পবন প্রধান শুরু করেন নিহিতানের গল্প।

‘নিহিতানের বাবার নাম ছিল বিজয় ছেত্রী। সে দার্জিলিংয়ে ট্যুরিস্ট জিপ চালাত। ঘরে ছিল ওর বিবি কুসুম অউর লড়কা নিহিতান। বহোত সুখী থে ও লোগ। লেকিন বাবুজি, নসিব খারাপ হোলে যা হোয়। একরোজ বারিশ কে পানি সে ভিগা হুয়া রাস্তে সে জিপ চলাকর দার্জিলিং সে ইস গাঁও কে লিয়ে সবজি, চাওল অউর বহোত সারে সামান লেকর লৌট রহা থা বিজয়। লেকিন ওনেক রাত হো যানে কে বাদ ভি বিজয় নেহি লৌটা। হমার তো টেনশন হোনে লগা। তো আমি তোখোন ফোন লাগাই দার্জিলিংয়ে হমার এক জিপ অপারেটর দোস্ত কে।’ একটু থামেন পবন। তারপরে উদাস দৃষ্টিতে ঘরের ছোটো খোলা জানলা দিয়ে দূরের গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন— ‘তো বাবুজি, ও দোস্ত নে কহা কি বিজয় বহোত পহলে নিকল গয়া, অউর ও লোগ কা পাশ খবর হ্যায় কি সুখিয়াপোখরি কে বাদ নাগরি মে ল্যান্ডস্লাইড হুয়া হ্যায়। শুনকর তো মুঝে লগা, জরুর কুছ গড়বড় হয়েছে। বিজয়কা জিপমে হমার ভি রেশন থা। তো হামি অউর দের না করে হমার বাইক লেকর নিকল পড়ে। সীমানা বস্তি ক্রশ করকে নাগরি কে থোড়া আগে যাকে দেখা কি রাস্তা বন্ধ। হামি বাইক ঘুমাকর লৌটতে সময় সোচ রহা থা কি বিজয় কা বিবি কুসুম কো ম্যায় ক্যা কহুঙ্গা। ঝুট তো বোলতেই হোবে। ইসিলিয়ে হামি উসকো বোলা কি বারিশ কে বজয় সে বিজয় দার্জিলিং মে রুখ গয়া। বিসোয়াস কোরেন বাবুজি, উসি রাত মুঝে নিদ নেহি আয়া।... দুসরা দিন সুবহ হোতে হি হামি নাগরি মে গয়া। পৌঁছুছনেকে বাদ দেখা কি মিলিটারি কা আদমিয়োঁ নে কাম শুরু কর দিয়া।... উসকে বাদ বাবুজি... দো দিন কে বাদ বিজয় কা বডি...।’ মাথা ঝুঁকে পড়ে পবনের। রজনীও খাওয়ার কথা ভুলে চুপ করে বসে থাকে। তার কল্পনায় সত্যি হয়ে ভাসতে থাকে পবনের বলা কথাগুলো। সময় কেটে যায়...। খোলা জানলা দিয়ে ছোটো একটুকরো মেঘ ঘরে ঢুকে মুখ ভিজিয়ে দিতেই বাস্তবে ফিরে আসে রজনী।

—‘তা সেটা কতদিন আগেকার ঘটনা, পবনজি?’

মুখ তুলে হাত দিয়ে মুখটা রগড়ে পবন বলেন— ‘নিহিতান কা উমর তব পাঁচ সাল হোবে।’

—‘তার মানে প্রায় সাত-আট বছর আগেকার ঘটনা, তাই না?’

—হাঁ বাবুজি।’

—‘তা ওদের চলে কী করে?’

—‘গাঁও কা আদমি যো জিতনা দে সকতা হ্যায়, দেতা। হাম ভি কুছ দেতা হ্যায়। অউর ভট্টরাইজি হররোজ মন্দির সে কুছ না কুছ ভেজ দেতে হ্যায়। ইসি তরহা চল রহা হ্যায়।’

রজনীর আর খেতে ইচ্ছে করছিল না। তাই দেখে পবন তাড়া দিলেন— ‘আরে বাবুজি, খানা তো খেয়ে নিন।’

পবনের অনুরোধে ‘হ্যাঁ খাচ্ছি’ বলে আর এক টুকরো রুটি মুখে পুরে জিজ্ঞেস করল— ‘তা বাচ্চাটার কপালটা কাটল কী করে?’

—‘আরে বাবুজি, বোলিয়ে মত... পাইন কা ফল হোতা হ্যায় না, ও বহোত হার্ড আছে।’ তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেওয়ালের গায়ে কাঠের রাকে রাখা খাঁজকাটা

কাঠের আনারসের মতো দেখতে একটা ক্যান্ডেল-স্ট্যান্ড দেখিয়ে বলে— 'ওহি হ্যায় বাবুজি পাইন কা ফল।'

—'ও আচ্ছা, বুঝলাম। তারপর?'

—'দো সাল আগে ওরা ইয়ার-দোস্ত খেলা কোরছিল ওহি ফল নিয়ে। উসি টাইম দুসরা এক বাচ্চা পাইন ফলকে বদলে মে একটা পত্থর ফেকে দেয়। ওহি পত্থর লাগ কর নিহিতানের শির ফাট যায়। আমি তোখোন ওকে বাইকে করে সুখিয়ার হেলথ-সেন্টারে নিয়ে যাই। উসকা শিরমে চারটে স্টিচ হোয়। লেকিন ইতনা খুন দেখকর অউর স্টিচ কা টাইম মে ভি ও রোয়ে নেহি। তভি হামি সমঝা কি ও এক সাচ্চা গোর্খা লড়কা হ্যায় বাবুজি। উসকা নস নস মে বিজয় কা জ্যায়সা গোর্খা খুন আছে।'

—'ও আচ্ছা, আর সেই দাগটাই রয়ে গেছে ওর কপালে।'

—'হাঁ বাবুজি। অচ্ছা, আপ খানা খা লিজিয়ে। আভি হামি যাচ্ছে। বাতোঁ বাতোঁ মে বহোত দের হো গয়া।' পবন প্রধান উঠে দাঁড়ান।

—'আচ্ছা পবনজি, আর একটা কথা বলবেন?'

—'কী বাবুজি?'

—'মানে, আমাদের বাঙালিদের নামের একটা মানে থাকে। আপনাদেরও তো থাকে। এই যেমন আপনার নামের মানে হল ''হাওয়া''। তা নিহিতান নামটা তো আগে কখনো শুনিনি। মনে হয় এটারও কোনো একটা মানে আছে। তাই নয় কি পবনজি?'

—'হাঁ, আছে তো। বিজয় খুব আংরেজি সিনেমা দেখতে ভালবাসতো। ওহি লড়কার নাম রাখল নিহিতান; মতলব ''সুপারম্যান''। না জানে কিঁউ। লেকিন একরোজ বিজয় হামাকে বোলা থা কি ও একটা সিনেমা মে ''সুপারম্যান'' নাম কা এক ইংলিশ সিনেমার হিরোকো দেখা থা। ও হিরো আসমান মে উড় সকতা হ্যায় অউর দুনিয়া কো কিসি ভি খতরোঁ সে সেভ করতা হ্যায়। সায়দ ইসি সে ও আপনা লড়কার নাম রাখল...।'

—'ও...আচ্ছা। এবারে বুঝলাম নিহিতান নামের মানে। থ্যাংক ইউ পবনজি।'

পবন চলে গেলে রজনীর কেন জানি না মনে হতে লাগলো যে হয়তো এই নিহিতানের মধ্যেই সে খুঁজে পাবে তার সবটুকু বিদ্যে ঢেলে দেবার আধার। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এরপরে প্রায় তিনমাস কেটে গেছে। গ্রামের সরপঞ্চের মাথা ভট্টরাইজির সাথে পঞ্চায়েতের সবাই একমত হয়ে তার মতো একজন আগন্তুককে ঠাঁই দিয়েছে এই গ্রামে। বিশ্বাস রেখেছে তার ওপরে। তাই পবন প্রধান নিজেই উদ্যোগী হয়ে একটা ঘর খুঁজে দিয়েছে তাকে। সেখানে রজনী নিজেই রেঁধে খায়। তাতে খরচ অনেক কম পড়ে। এদিকে রোজই সন্ধের আঁধার নামলে রজনী যখন খেলার মাঠে প্র্যাকটিস করে, তখন তার কিক বা পাঞ্চের সময়ের চিৎকার শুনে ধীরে ধীরে শুধু নিহিতান কেন, আরও চার পাঁচজন ছেলে মেঘমাখা অন্ধকারে মিশে তার কসরত দেখে।

এদিকে বর্ষা এসে গেছে পাহাড়ে। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রজনী দেখে আকাশটা মেঘলা। গম্ভীর। হয়তো বৃষ্টি হলেও হতে পারে। পাহাড়ি বৃষ্টির মর্জি বোঝা ভার। বছরের এই সময়টায় এখানে বৃষ্টিই হিরো। রোদ্দুর এখন মুখ লুকিয়ে থাকে মেঘের

মুখোশের আড়ালে। তাই ব্রেকফাস্ট খেয়ে সে বেরিয়ে পড়ে চড়াই পথে জগিং করতে। বৃষ্টি আসার আগেই যে রোজকার কাজটা শেষ করতে হবে।

গ্রামটাকে অনেক নীচে ফেলে পাথুরে রাস্তায় সে জগিং করে চলেছে। পথে দেখা হল জনা ছয়েকের একটা বিদেশি ট্রেকার দলের সঙ্গে। তারা চলেছে সান্দাকফুর পথে। চড়াই পথে উঠতেই মনে হচ্ছে যেন তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। হাঁপাচ্ছে। তাই তার মতো একজন বয়স্ক লোককে তাদের পাশ কাটিয়ে জগিং করে উঠে যেতে দেখে তারা অবাক। রজনী তাদের উদ্দেশ্যে থামস আপ করে হেসে এগিয়ে গেল আপন পথে।

মাইল দেড়েক উঠে যাবার পরেই ঘন পাইন বনের শুরু। সেখানেই থামল সে। মুখ বন্ধ রেখে লম্বা গভীর শ্বাস নিতে নিতে ঢুকে পড়ল বনের ভেতরে। এখানে সে আগেও এসেছে। খানিকটা ভেতরে গেলে একটা পাথরের চাঁই আছে। সেখানেই বসে রজনী বিশ্রাম নেয় আর গাছপালার, পাখপাখালির কথা শোনে। ক-দিন আগে সে একটা অজানা পাখির ডাক শুনেছিল ওই পাথরের চাতালটায় বসে। দু-একবার ভালো করে ডাকটা শোনার পরে সেও ডেকে উঠেছিল পাখিটার ডাক। দু-তিনবার ডাকতেই একটু দূরের ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটা মুরগির মতো দেখতে নীলরঙা পাখি। তার চোখের কাছটা লাল। রজনী আর একবার ডাক দিতেই পাখিটা রজনীর দিকে একবার তাকিয়েই মাটি ঘেঁষে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মিলিয়ে গেল দূরের একটা ঝোপের মধ্যে। কলকাতার মিউজিয়মে সে ওই পাখিটার স্টাফড স্পেসিমেন দেখেছে। তাই খানিকক্ষণ স্মৃতি হাতড়াতেই মনে পড়ে গেল পাখিটার নাম। ওটা ছিল একটা পুরুষ কালিজ ফেজেন্ট।

নিশ্চিন্তে কোমরে বাঁধা জলের বোতল থেকে খানিকটা জল খেয়ে হিমালয়ের বনের সৌন্দর্য দেখতে থাকে সে। আদতে সে তো গ্রামের ছেলে। তার ওপরে জঙ্গলের গন্ধ তার শিরায় শিরায়। সত্যি বলতে কী, এতদিনের শহরের জীবন একটুও ভালো লাগেনি তার। শুধু পেটের দায়ে সেখানে টিকে ছিল সে। তাই এই হিমালয়ের বনের শ্যাওলাধরা দেবদারু-পাইনের গন্ধে মুক্তির স্বাদ পায় রজনী। ওইসব গাছের ডাল থেকে ঝুলে থাকা পরগাছার শ্বাসমূল, নানান রঙের অর্কিড মুগ্ধ হয়ে দেখে সে। তার মনে হয় জঙ্গল যেন রোজই তার রূপ বদল করে; পুরোনো হয় না তা। তার সাথে মিশে থাকে কতরকম জংলি গন্ধ। পায়ের নীচের ভেজা পাতার সোঁদা গন্ধের সাথে মিশে থাকে অর্কিডের ফুলের হালকা গন্ধ। ভালো লাগে; রজনীর বড়ো ভালো লাগে এই গন্ধ। তাই সেই গন্ধটা বুক ভরে নেয়। এখানে আসার পরে সে বুঝতে পেরেছে যে মেঘেরও গন্ধ আছে। এক এক রকম মেঘের এক এক রকম গন্ধ। নীচের দিক থেকে ভেসে আসা মেঘে মিশে থাকে চমরি গাইয়ের গায়ের আর চুলা জ্বালাবার পোড়া কাঠের গন্ধ আবার ওপর থেকে নেমে আসা মেঘে মিশে থাকে পাইনের গন্ধ আর কখনো বা নাম না জানা পাহাড়ি ফুলের গন্ধ। আর রোজই সে বারে বারেই চোখ বন্ধ করে কানপেতে শুনতে থাকে এই জঙ্গলের অজানা ভাষা। নতুন পাহাড়ি জঙ্গলে এসে নতুন করে এখানকার প্রকৃতির পাঠ শুরু করেছে রজনী আবার।

কিন্তু একটা অন্যধরণের শব্দ আসছে না আজ? পচা পাতার ওপরে একজন মানুষের পায়ের হালকা শব্দ। কে আসে এই বনের ভেতরে? দেখতে হবে তো। চোখ খোলে রজনী। কিন্তু....

তাই সে চটপট কোমরে জলের বোতলটা আটকে লুকিয়ে পড়ে পাথরের চাঁইটার আড়ালে। যে আসছে আগে তাকে দেখে তবেই সে তার নিজের অস্তিত্ব জানান দেবে

তাকে। এমনও তো হতে পারে, যে আসছে সে জঙ্গলের কাঠের চোরাচালানকারী দলের লোক। জঙ্গলের ভেতরে হয়তো কোথাও তাদের ঠেক আছে। তাই আগে যাচাই করে নেওয়াই শ্রেয়।

কিন্তু একী? এ যে নিহিতান। একটা হাত দুয়েক লম্বা পাইন গাছের ডাল তার হাতে। কোমরে বেল্টের মতো করে বাঁধা দড়ি থেকে ঝুলছে একটা কুকরি। সে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে আসছে গাছের ওপরের ডালপালার দিকে নজর ফেরাতে ফেরাতে। কিন্তু কী করতে এই পাইন বনে ঢুকেছে সে? কী খুঁজছে গাছের ডালে ডালে? দেখতে হবে।

পাথরের যে চাঁইটার পেছনে নিজেকে আড়াল করেছে রজনী তার সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানেই এসে দাঁড়াল নিহিতান। তারপরে ঝুঁকে আসা পাইন আর দেবদারুর ডালে ভালো করে নজর চালিয়ে ডেকে উঠল কাঠবেড়ালির ডাক। একেবারে নিঁখুত। দু-তিনবার ডেকেই চুপ করে গেল। এরপরে খানিক্ষণের অপেক্ষা। তারপরে আবার ডেকে উঠল সে।

রজনীর এখান থেকে বড়োজোর হাত দশেক দূরের একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে নিহিতান। কাঠবেড়ালির ডাক ডাকছে আর মাঝেমাঝেই থেমে গিয়ে কানপেতে কিছু যেন শোনার চেষ্টা করছে। সেইসঙ্গে গাছের ডালে ঘুরছে ফিরছে তার দৃষ্টি।

মিনিট পাঁচেক এইভাবে কাটার পরে হঠাৎই তার হাতে ধরা গাছের ডালটা অল্প অল্প দোলাতে থাকে সে। তারপরে আরও একবার ডেকে ওঠে। এবারে রজনীকে অবাক করে ফিরতি জবাব এল গাছের ডাল থেকে। পাতার আবডালে দেখা যাচ্ছে না প্রাণীটাকে; তবে ডাক শুনে বোঝা যাচ্ছে যে সেটা একটা কাঠবেড়ালি।

কয়েক পলক। তারপরেই নিহিতানের হাতের ভারী ডালটা উড়ে গেল বাতাস কেটে। সাঁ করে গিয়ে সেটা লাগল একটা গাছের ডালে আর পরক্ষণেই নিহিতানের শরীরটা যেন উড়ে গেল। হাত আষ্টেক দূরে গিয়ে সে মাটি ছুঁয়েই চকিতে দিল একটা সামার সল্ট। তখন তার হাতে ধরা পড়েছে একটা একটু বড়ো সাইজের কাঠবেড়ালি। সাধারণ কাঠবেড়ালির মতো নয় সেটা। পেটের কাছটা হালকা কমলা রঙের। চিঁ চিঁ করে তারস্বরে ডাকছে মুক্তির আশায়। নিহিতানের এইসব ব্যাপার স্যাপার দেখে রজনী অবাক। ... ওঃ! কী সাঙ্ঘাতিক স্কিল ছেলেটার। সার্থক নাম বটে।

ততক্ষণে নিহিতান উঠে দাঁড়িয়েছে। তার বাঁ-হাতে ধরা প্রাণীটা ছাড়া পাবার আশায় ডেকেই চলেছে আর হাওয়ায় পা ছুঁড়ছে। কিন্তু নিহিতানের তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। তার হাত গিয়ে পড়েছে কুকরির বাঁটে।

না, কাঠবেড়ালিটাকে বাঁচাতে হলে রজনীকে কিছু একটা করতেই হয়। কিন্তু কী করবে সে? এই ছেলেটাকে বশে আনতে গেলে ধমক-ধামকে কাজ হবে না। তাই তাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে নাকি কাঠবেড়ালির গলায় কুকরির কোপ বসানোর আগেই ছেলেটা ঘাবড়ে যায়। তাই সন্তর্পণে পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে সে। এদিকে নিহিতানও ততক্ষণে কোপ বসাবে বলে সামান্য ডানদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার কুকরি। এখন রজনীকে যা করার তা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু তার থেকে নিহিতানের দূরত্ব এখন প্রায় বারো ফুট। তাই হাতের ওপরে ভর দিয়ে পরপর তিনটে ভল্ট। রজনী গিয়ে ল্যান্ড করে ওর থেকে মাত্র ফুট তিনেক দূরে। তার এই আকস্মিক আগমনে ঘাবড়ে যায় নিহিতান। চমকে উঠে দু-তিন পা পিছিয়ে যায় সে। আর সেই সুযোগে রজনী বসে পড়ে চকিতে বাঁ-পায়ের একটা হালকা কিক চালায় নিহিতানের বাঁ-

হাতে। মাপা ওজনের কিকের ধাক্কায় হাত থেকে ছিটকে যায় কাঠবেড়ালি। জঙ্গলের দিকে দৌড়ে একটা গাছে উঠে পড়ে সেটা। কয়েক সেকেন্ডের দেখা; তবু রজনী চিনতে পারে প্রাণীটাকে। সেটা ছিল একটা অরেঞ্জ বেলিড হিমালয়ান স্কুইরেল।

এবারে দু-জনে মুখোমুখি। কিন্তু হাতের শিকার ফস্কে যাওয়ায় নিহিতানের গোর্খা রক্তের গর্বে আঘাত লাগে। সে বাগিয়ে ধরে তার কুকরি। ওইটুকু ছেলের সাহস দেখে রজনী অবাক। কিন্তু নিহিতানকে ব্যথা না দিয়ে তার হাতের কুকরিটা কেড়ে নিতে হবে। তাই সে এমন ভাণ করে যেন সে নিহিতানের পেছনে কিছু একটা দেখেছে। মুখ দিয়ে 'চুঃ চুঃ' আওয়াজ করতেই নিহিতান পেছনে তাকায় আর সেই মুহূর্তেই রজনীর হাতের মুঠোয় ধরা পড়ে যায় তার কুকরি ধরা হাত। সে আপ্রাণ চেষ্টা করে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার; কিন্তু তার তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাঝে রজনী একটু জোরে আঙুল দিয়ে চাপ দিতেই হাত থেকে খসে পড়ে কুকরি। 'আঃ' বলে কাতরে উঠে হাতটা ঝাঁকাতে থাকে নিহিতান। রজনী এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা নিয়ে ম্যাসাজ করে দিতেই একটু পরেই কমে যায় ব্যথাটা। তখন মাটি থেকে কুকরিটা তুলে গুঁজে দেয় সে নিহিতানের কোমরে ঝোলানো খাপে। তারপরে নাম জানা সত্ত্বেও আলাপ জমাতে তার কাঁধে হাত রেখে বলে— 'নাম ক্যা হ্যায় তেরা?'

নিহিতান তাদের খেলার মাঠের অন্ধকারে অনেকদিন ধরে এই লোকটাকে কীসব কসরত করতে দেখেছে। তারপরে আজ যেভাবে লোকটা তার সামনে উড়ে এসে পড়ল, তার হাত থেকে কাঠবেড়ালিটাকে মুক্তি দিল, এমনকী তার কুকরিটা কেড়ে নিয়েও আবার তার কোমরে গুঁজেও দিল— তাতে সে কেমন যেন একটু ভয় পেয়ে গেছে লোকটাকে। তাই সে চুপ করে থাকে।

রজনীও বুঝতে পারে তার এই থতমত অবস্থা। তাই আরও নরম গলায় বলে— 'বোল বেটা, ক্যা নাম হ্যায় তেরা?' এবারে নিহিতান ভয় কাটিয়ে বলে— 'নিহিতান। নিহিতান ছেত্রী।'

—'ডরো মত। আচ্ছা, তেরা পিতাজিকা নাম বিজয় ছেত্রী, হ্যায় না?'

নিহিতান ভাবে— লোকটা কি তাকে চেনে?... নইলে তার বাবার নাম জানল কী করে? হয়তো বা লোকটা চিনতো তার বাবাকে। তাই সে চোখ নামিয়ে বলে— 'হাঁ'। তারপরেই সোজা রজনীর দিকে তাকিয়ে বলে— 'লেকিন আপ মেরা শিকার কো ভাগনে দিয়া কিঁউ? অব গোস্ত মিলেগা কঁহা?'

রজনীও বুঝতে পারে যে এটা গোর্খাদের আত্মসম্মানবোধের প্রকাশ। তাই সে নরম সুরেই বুঝিয়ে বলে— 'জঙ্গল কা জানোয়ারোঁকো মারনা সহি নেহি হ্যায়। অগর তুঝে গোস্ত খানা হ্যায় তো বাজার সে খরিদকে খানা অচ্ছা হ্যায়।' বলেই রজনীর মনে পড়ে গেল যে এই পিতৃহারা ছেলেটা মাংস কেনার পয়সা কোথায় পাবে?

—'গোস্ত খরিদনেকা পৈসা আপ দেঙ্গে ক্যা?' নিহিতানের কচি স্বরে একই সঙ্গে ব্যঙ্গ আর রাগ ফুটে বেরোয়।

—'ম্যায় তেরা পিতাজিকা দোস্ত হুঁ।' অম্লানবদনে মিথ্যে বলে রজনী। তারপরে বলে — 'মুঝসে পৈসা লেনে মে তো ইতরাজ নেহি?'

—'নেহি। আপ যো ভি হো, ম্যায় কিসিসে পৈসা নেহি লেতা হুঁ।'

রজনী বুঝে গেল যে, এই ছেলে গরিব হতে পারে কিন্তু এর আত্মসম্মান প্রখর। তাই সে ঠিক করল যে সে পবনজিকে দিয়ে ওর বাড়িতে খানিকটা মাংস পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু এখন আগে নিহিতানের রাগটা কমাতে হবে। তাই সে মন্দিরের পূজারি ভট্টরাইয়ের গলা নকল করে বলে উঠল— 'আরে এ নিহিতান, কভি গুসসা না কর না। গুসসা হোনে সে আদমীকা দিমাগ ঠিক সে নেহি চলতা হ্যায় বেটা।'

নিহিতান রজনীর গলায় পূজারিজির কণ্ঠস্বর শুনে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেল। বিস্ময়ে তার ভুরুদুটো কুঁচকে গেছে। সে নিজে তার মায়ের স্বর, পবনজির স্বর, তার দু-তিনজন বন্ধুর স্বর আর নানান পশুপাখির ডাক নকল করতে পারে। এই খেলাটা তার আর তার বন্ধুদের বেশ ভালোই লাগে। তবে বুড়ো পূজারিজির স্বর সে নকল করতে পারে না এখনও। কিন্তু এই নাম না জানা লোকটা কী করে পূজারিজির স্বর নকল করল? এই লোকটাও কি তাহলে তারই মতো অন্যের স্বর নকল করতে পারে? নাকি লোকটা জাদু জানে?

নিহিতানের বিস্ময় দেখে রজনী এবার নিজের স্বাভাবিক গলায় বলল— 'আচ্ছা, অব ম্যায় গিলহরী কা বোল শুনাতা হুঁ। এ ভি হো সকতা কি ইয়ে বোল শুনকর ওহ দুবারা আ যায়ে, নেহি তো কোই দুসরা। লেকিন চল; পহলে হামলোগ উস পথর কে পিছে ছুপ যায়ে।' বলে সে আগে যে পাথরটার পেছনে বসেছিল সেটাকে দেখাল। কিন্তু নিহিতান এখনও তাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না; ভরসা করতে পারছে না তাকে। তবু চেষ্টা করতে হবে। তাই সে পাথরটার দিকে এগোতে এগোতেই নিহিতানের মতো করেই কাঠবেড়ালির ডাক ডাকতে থাকে। কিন্তু কয়েকপা এগিয়েই পেছন ফিরে দেখে যে নিহিতান তখনও ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়েই আছে। তবু রজনী তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিজে পাথরটার পেছনে লুকিয়ে যায়। নিজের চোখ পর্যন্ত পাথরের ওপরে জাগিয়ে রেখে আবার কাঠবেড়ালির ডাক দেয়।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। তারপরই দূর থেকে একটা কাঠবেড়ালির ডাক শোনা যায়। তাই আরেকবার ডাক ডেকে সে নিহিতানকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। হ্যাঁ, এইবারে কাজ হয়। নিহিতান দৌড়ে এসে পাথরের পেছনে তার পাশে বসে দেখতে থাকে কী ঘটে। একটুপরেই আবার কাঠবেড়ালির ডাক শোনা যায়। তবে এবারে অনেকটাই কাছে। তাই রজনী আর একবার ডাক ছোঁড়ে।

এরপরে অপেক্ষা...। খানিক পরে আবার কাঠবেড়ালির ডাক শোনা যায়। এবারে খুবই কাছে। দু-জনেই দেখে যে নিহিতান আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই হাজির হয়েছে একটা অরেঞ্জ বেলিড হিমালয়ান স্কুইরেল। লেজটা তুলে পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সেটা। রজনী আবার নীচু গলায় ডাক ছোঁড়ে। তাই শুনে কাঠবেড়ালিটা আরও খানিকটা এগিয়ে আসে। কিন্তু এমন একটা মোক্ষম সময়ে নিহিতান উঠে দাঁড়ায়। বোধ হয় তার ভেতরের শিকারি স্বত্বা জেগে উঠেছিল। ব্যাস, সেটাই হল কাল। নিহিতানকে দেখতে পেয়েই কাঠবেড়ালিটা লেজ তুলে ভোঁ দৌড়। তড়বড়িয়ে একটা দেবদারুর গুঁড়িতে খানিকটা উঠে সে দেখতে থাকে নিহিতানকে। আর আশা নেই বুঝে রজনী যেই না উঠে দাঁড়ায় ওমনি কাঠবেড়ালিটা তরতরিয়ে গাছ বেয়ে উঠে মিলিয়ে যায়।

আর হবে না। তাই পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে রজনী নিহিতানের কাঁধে হাত রেখে বলে— 'চল, আভি ওয়াপস চলে। বারিশ আ সকতা হ্যায়।' এইবারে আর নিহিতান কিছু বলে না। চুপচাপ রজনীর পেছনে পেছনে চলতে থাকে।

প্রায় ফুট চল্লিশেক বনের মধ্যে দিয়ে যাবার পরে হঠাৎই রজনী দাঁড়িয়ে পরে। মাটিতে বিছিয়ে থাকা ভেজা পাতার ওপরে একটা ঘসটানো কিছুর আওয়াজ শুনতে পেয়েছে তার সজাগ কান। পাছে নিহিতান এগিয়ে যায়, তাই সে খপ করে তার হাতটা ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। ঠোঁটের ওপরে আঙুল রেখে ইশারায় তাকে চুপ করে থাকতে বলে। রহস্যময় একটা কিছু ঘটতে চলেছে বুঝে নিহিতানও চুপ করে দাঁড়িয়ে যায়। এতক্ষণে পাতার ওপরে ঘসটানো আওয়াজটা তারও কানে গেছে। এতদিন এই জঙ্গলে সে আসছে, কিন্তু এই আওয়াজটা সে আগে কখনো শোনেনি।

আওয়াজটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। আর একটু পরেই তার বিস্ফারিত চোখের সামনে ধরা পড়ল আওয়াজের উৎস। অদ্ভুত দেখতে ফুট চারেক লম্বা কুমিরের মতো একটা প্রাণী, তবে সারা গায়ে মাছের আঁশের মতো বর্ম দিয়ে ঢাকা। সেটা চারপায়ে ধীরে ধীরে হেলেদুলে হাঁটছে আর তার লম্বা আঁশে ঢাকা লেজটা ঘসটে যাচ্ছে ভেজা পচা পাতার ওপরে। তাতেই ওইরকম ঘসটানির শব্দ হচ্ছে। ছুঁচলো মুখের প্রাণীটার মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে সরু লম্বা লকলকে জিভ। ভেজা পাতার তলায় মাঝেমধ্যেই চালাচ্ছে সে জিভটা। সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানেই চরে বেড়াচ্ছে জন্তুটা। এই জঙ্গলে এলেও নিহিতান কখনো দেখেনি এই প্রাণীটাকে। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দেখে সে রজনীর হাতে অল্প টান দেয়। রজনী তাকায় তার দিকে। নিহিতান বোধ হয় তাকে কিছু বলতে চায়। তাই ফিসফিসিয়ে বলে— 'ক্যা?'

নিহিতানও ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে— 'ইয়ে ক্যা হ্যায় বাবুজি?'

—'ইসে প্যাঙ্গোলিন কহা যাতা হ্যায়। ইয়ে জানোয়ার দীমক অউর চিট্টিয়াঁ খাতে হ্যায়। বহোত হি নাজুক হ্যায় ইয়ে।'

নিহিতান এবারেও খুব নীচু স্বরে বলে— 'ইসকা গোস্ত খায়া যা সকতা হ্যায় ক্যা?'

—'নেহি। ইসকা পৈর মে যো নোখুন হ্যায়, ওহ বহোত খতরনাক হোতে হ্যায়। কভি ইসে পকড়নেকা কোশিশ না কর না।'

তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে থাকতে প্যাঙ্গোলিনের হালচাল। আর নিহিতান তার ছোট্ট মাথায় ভাবতে থাকে— জঙ্গলের কতোই না রহস্য। এখানে চুপ করে না থাকলে, চোখ আর কান খোলা না রাখলে সেই রহস্য ধরা দেয় না। আর এই বাবুজি তার থেকে অনেক বেশি জঙ্গলকে জানে।

ওদিকে খাবারের সন্ধানে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে প্যাঙ্গোলিনটা চলে এসেছিল অনেকটাই কাছে আর তখনই তার চোখে পড়ে যায় রজনী আর নিহিতানকে। আচমকা মানুষের দেখা পেয়ে ভয়ে প্রাণীটা পড়িমড়ি করে টাল খেতে খেতে দৌড় লাগায়। কয়েক সেকেন্ডেই সেটা অদৃশ্য হয়ে যায় একটা ঝোপের মধ্যে। তার এই হালচাল দেখে হেসে ফেলে নিহিতান।

রজনীও মিষ্টি হেসে বলে— 'অব ঘর চলে?'

—'হাঁ বাবুজি, চল।' এখন অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে নিহিতান। 'আপনি' থেকে নিজের অজান্তেই নেমে এসেছে 'তুমি' তে; আর এটাই তো চেয়েছিল রজনী।

একটুপরেই দু-জনে মিলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে উৎরাই ধরে নামতে থাকে। শ-দুয়েক ফুট নামতেই দেখা হয়ে যায় আগের সেই বিদেশি ট্রেকার দলের সঙ্গে। রজনী হাত নাড়াতে তারাও হাত তুলে তাদের থামতে বলে। তারপর তাদেরই একজন নিহিতানের

হাতে তুলে দেয় একমুঠো লজেন্স। রজনীকেও দেয় দুটো। নিহিতান তো লজেন্স পেয়ে খুব খুশি। সে হাসিমুখে রজনীর দিকে তাকায়। রজনী একটা লজেন্স মুখে পুরে তাকেও বলে খেতে। নিহিতান একটা লজেন্স মুখে পুরে বাকিগুলো প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলে— 'মাম্মি কো দুঙ্গা। বড়ি খুশি হোগি ও।'

তারপরে ট্রেকার দলটাকে 'থ্যাঙ্কস। এনজয় দ্য হিমালয়ান বিউটি অ্যান্ড উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক' বলে রজনী আবার জগিং করে নামতে থাকে নীচে। পাশে পাশে নামছে নিহিতানও। নামতে নামতেই সে বলে— 'বাবুজি, তুমনে ও সাহাব লোগোঁ কো ক্যা কহা?'

—'ইধর আনে কে লিয়ে মৈনে উনলোগোঁ কো বধাই দিয়া অউর বোলা ইস পাহাড়িয়োঁ কা মজা লেনে কা।'

—'হাঁ, তুমনে সহি বোলা বাবুজি। ইস পাহাড়িয়াঁ অউর জঙ্গল বহোত খুবসুরত হ্যায়।' রজনী নিহিতানের কথা শুনে হাসে। তার পিঠ চাপড়ে দেয়। হাসে নিহিতানও।

তারপরেই নিহিতান বলে ওঠে— 'বাবুজি, তুম বঙ্গালি হো না?'

—'ক্যায়সে সমঝা তু?'

—'তুমহারা বোলি সে।' রজনী হাত দিয়ে ওর মাথার চুল এলোমেলো করে দেয়।

—'বাবুজি, তুমহারা কোই নেহি হ্যায়?' নামতে নামতেই বলে নিহিতান।

—'কৌন বোলা কোই নেহি হ্যায়? তু তো হ্যায় না মেরে সাথ'। শুনে আবারও হেসে ফেলে নিহিতান।

তারপরে বলে— 'আচ্ছা বাবুজি, তুম ইধার হি রহোগে না?'

—'হাঁ বেটা। লেকিন কিঁউ ইয়ে বাত মুঝসে পুছা?'

—'তব তো তুমহে তুমহারা ওহ কসরত মুঝে শিখানে পড়েগা।'

—'জরুর। জরুর তুঝে শিখাউঙ্গা বেটা।'

—'মেরা দোস্তোঁ কো ভি শিখাওগে?'

—'কিঁউ নেহি। মৈ সবকো শিখাউঙ্গা।... ঠিক হ্যায়, অগর বারিশ না হো তো দোস্তোঁ কে সাথ আজ শাম কো মৈদান মে চলে আনা।'

—'ঠিক হ্যায়। আউঙ্গা। লেকিন বাবুজি একরোজ মেরা ঘর মে আও না। মাম্মি বহোত খুশ হোগি।'

—'ঠিক হ্যায়। একরোজ জরুর আউঙ্গা। লেকিন পহলে তো কসরত শিখনা শুরু করেঁ। মুঝে দেখনা হ্যায় তুঝমে কিতনা দম হ্যায়।'

—'বাবুজি, মৈ গোর্খা হুঁ। অউর হামলোগ কভি হার নেহি মানতে, সির্ফ মৌত কে সিবা।' বলে হাসতে থাকে পাহাড়ি 'সুপারম্যান' নিহিতান।

আর ঢালু পথে নামতে নামতে রজনীর মনে হয়— সে উপযুক্ত কাঁচামাটি বোধ হয় পেয়েই গেছে। এখন এই কাঁচামাটিকে রূপ দিতে হবে ধীরে ধীরে। অতি যত্নে গড়ে তুলতে হবে তার অধীত সবটুকু বিদ্যে রাখার আধার। নিশিকান্ত রায়ের ঘরাণা যেন হারিয়ে না যায়।

ক্রমে দু-জনে নেমে আসে গ্রামের সমতলে। নিহিতান বাড়ি চলে যায় আর রজনী দূরের ওই সবুজ পাহাড়ের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে মনে মনে বিড়বিড় করে বলতে থাকে — 'দাদু, এবারে আর কিছুদিন পরে হয়তো আমার পথচলা শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু তার আগেই আমার নিয়তি আমায় দিয়ে গেল এমন একজনকে যে হয়তো বা তোমার ঘরাণা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আমাকে আশীর্বাদ কর দাদু, আমি যেন তোমার ইচ্ছে পূর্ণ করতে পারি।'

এমন সময় আকাশ চুঁইয়ে নেমে আসে বৃষ্টি। ভিজতে থাকে রজনী। একটুকুও নড়ে না। এখন সে পরম তৃপ্তিতে তার দাদুর আশীর্বাদ মেখে নিচ্ছে সারা শরীর জুড়ে যে।

---

* পরবর্তীকালে কিশোরকুমার এই গানের সুরেই গান—'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ...'